Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/ 168	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): SUDHINDRA NĀTH DUTTA (1931 - 1943) SUDHINDRANĀTH DUTTA & HIRANKUMĀR SĀNYĀL (JULY 1940 - JUNE 1943)	
Title: পরিচয় PARICAYA	
Volume(s): VOL. 1 no1 (SRABAN 1338 [JULY 1931] - VOL 12 [ASHADHA 1350 [JUNE 1943]	
Place (s) of Publication: CALCUTTA	Publisher: JAGATBANDHU DUTTA 485 DALAHAUSI SQUARE. SRI KUNDABHUSAN BHADURI 11 COLLEGE SQUARE ETAL
Year / edition:	
Size: 23·2	Condition of the original: BAITTLE
Remarks: TITLE PAGE MISSING - VOL 4, VOL.9 PART II VOL 10 PART II TORN VOLUME - VOL. 5 (LITTLE TORN) VOL 7 PART I	
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

পিউমিলেট

রোগবীজনাশক সুস্বাদু লজেঞ্জ

ফুসফুস ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ নিরাকরণে পাইন নির্যাসের উপযোগিতা সুবিদিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের 'পিউমিলেট' উক্ত নির্যাস ও অপর কয়েকটি সমধর্মী উপাদানে প্রস্তুত সুখলেহ্য লজেঞ্জ। ইহা গলদেশ ও শ্বাসযন্ত্রকে রোগবীজশূন্য, স্নিগ্ধ এবং বাহিরের অজ্ঞাত বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে।

ফুসফুস সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ যথা ব্রঙ্কাইটিস ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, এমন কি যক্ষ্মা প্রভৃতিতে 'পিউমিলেট' ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। ফ্যারিঞ্জাইটিস, টন্‌সিলাইটিস, গলাধরা ইত্যাদি কণ্ঠনালীর বহুবিধ রোগেও ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। পিউমিলেট শিশুকেও নির্ভয়ে দেওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

পরিচয়—মাঘ ১৩৪৭

বিষয়-সূচী

স্বারাজ্য-সিদ্ধি ... ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাকো (উপন্যাস) ... শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ... শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাব, রস ও রূপ ... ... শ্রীনবেন্দু বসু

পথ (গল্প) ... ... শ্রীমণীন্দ্র রায়

রসায়ন (কবিতা) ... শ্রীবিষ্ণু দে

ভ্রমণ („) ... শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

গণ-সাহিত্য, শ্রেণী-সাহিত্য ও নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য ... শ্রীবীরেন দাশ

পুস্তক পরিচয়

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীঅন্নদাচরণ রক্ষিত, শ্রীরণেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পাঠক-গোষ্ঠী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ নাগ

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY

দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৮৯৫ সালে স্থাপিত

অধিকৃত মূলধন……১,০০,০০,০০০৲ রিজার্ভ ফণ্ড……১৫,১৫,৩৬৮৲
গৃহীত মূলধন ……৫০,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন
আদায়ীকৃত মূলধন … ৩১,৪৬,৮০৪৲ ৩০.৬.৪০ তারিখে…৮,৫৮,১০,৬৮৩৲

হেড অফিস ঃ—৪৭, দি ম্যল, লাহোর।

চেয়ারম্যান ঃ রাও বাহাদুর দেওয়ান বদ্রী দাস, এম,এ, এল-এল, বি, এ্যাডভোকেট, লাহোর।

ব্রাঞ্চঃ—এবটাবাদ, এবহার, আগ্রা, এলাহাবাদ, আম্বালা ক্যান্টনমেণ্ট, আম্বালা সিটি, অমৃতসর, বোম্বাই, বিজনৌর, কলিকাতা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা নিউ মার্কেট, কানপুর, চাকওয়াল, ডেরা ইসমাইল খান, দেরাদুন, দিল্লী চাঁদনীচক, দিল্লী সদর বাজার, নিউ দিল্লী, ফিরোজপুর সিটি, গুজরানওয়ালা, গুজরাট (পাঞ্জাব), হাফিজাবাদ, হোসিয়ারপুর, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), জম্মু, ঝাঙ মাখিয়ানা, ঝিলাম, জলন্ধর সিটি, করাচী কর্ণাল, কসুর, লাহোর সিটি, লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ, লায়ালপুর, মীরাট সিটি, মণ্ডী বাহাউদ্দীন, মোগা, মণ্টোগমারী, মুলতান ক্যান্টনমেণ্ট, মুলতান সিটি, মজাফরনগর (ইউ,পি) মুসৌরী, ওকারা, পাতিয়ালা, পেশাওয়ার ক্যান্টনমেণ্ট, পেশাওয়ার সিটি, কুইলা সেখুপুরা, কোয়েটা, রাওয়ালপিণ্ডি ক্যান্টনমেণ্ট, রাওয়ালপিণ্ডি সিটি, সাহারানপুর, সারগোধা, শিয়ালকোট সিটি, শ্রীনগর (কাশ্মীর), সিমলা, সুক্কুর।

সাব-অফিসঃ—আবদুল্লাপুর, করতারপুর, শাহালমি গেট লাহোর, লালামুসা, পানিপথ, মালাকওয়াল, জারানওয়াল, মোরাদাবাদ, সীতাপুর, মজিথ মণ্ডী (অমৃতসর), কামোকে (গুজরানওয়ালা)।

এজেন্সীঃ—আমেদাবাদ, রেঙ্গুন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, কোবে।

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং এবং বৈদেশিক কারবার সুবিধাজনক হারে সম্পন্ন করা হয়। নিয়মাবলী এবং অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য ম্যানেজার, হেড অফিস কিম্বা যে কোন শাখায় লিখুন।

পি, আর, মেহেতা — ম্যানেজার, কলিকাতা মেন অফিস
যোধরাজ — সেক্রেটারী

'কাসারিন'

শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ

সুনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখ সেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা সেবনেই সঞ্চিত কফ তরল হইয়া বাহির হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র স্নিগ্ধ হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিআ, হুপিং-কফ, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতিতে তুল্য উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

পরিচয়—ফাল্গুন ১৩৪৭

বিষয়-সূচী

বিদেহ-কৈবল্য …	…	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাফো (উপন্যাস)	…	শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
সম্রাট অশোকের শিলালিপি	…	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
কালীপূজা (কবিতা)	…	শ্রীসুধীরচন্দ্র কর
পটভূমি („)	…	শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
ফাল্গুনী („)	…	শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়
ভারতী সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস	…	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থা	…	শ্রীনরেশচন্দ্র রায়
দ্বিতীয় প্রকৃতি (গল্প)	…	শ্রীসরোজকুমার নন্দী
ছন্দ …	…	শ্রীনবেন্দু বসু

পুস্তক পরিচয়

শ্রীশচীন সেন, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅজিত দত্ত।

কয়েকখানি কিনে পড়বার মত বই

প্রমথ চৌধুরী—

নীললোহিতের আদি প্রেম ১৲
ঘরে-বাইরে ১৲

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও
ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

সুর ও সঙ্গতি ১৲

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—

ভারত ও ইন্দোচান ১৲
ভারত ও মধ্যএসিয়া ১৲

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

অন্তঃশীলা (উপন্যাস) ২৲
আবর্ত্ত (উপন্যাস) ২৲
রিয়ালিষ্ট (গল্প) ১৲
চিন্তয়সি (প্রবন্ধ) ১৷৹

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য ১৲

জ্যোতির্ম্ময় রায়—

দৈনন্দিন ১৷৹

কাসাবিন

শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ

সুনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখ সেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা
সেবনেই সঞ্চিত কফ তরল হইয়া বাহির হয়
এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র স্নিগ্ধ হয়।
ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিআ, হুপিং কফ, সর্দ্দি, কাসি
প্রভৃতিতে তুল্য উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

পরিচয়—চৈত্র ১৩৪৭

বিষয়-সূচী

বিদেহ-কৈবল্য ... ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাফো (উপন্যাস) ... শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ... শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
ভারতবর্ষ ও কার্ল্ মার্ক্স ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রপ্রস্থ (কবিতা) ... শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
প্রশ্ন („) ... শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত
স্তম্ভ („) ... শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্রাট অশোকের শিলালিপি ... শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
বসন্ত-অভিযান (গল্প) ... শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

পুস্তক পরিচয়

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা প্রসঙ্গ

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করুন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯১১ সালে স্থাপিত

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মূলধনে ও আমানতে ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

রেজিষ্ট্রীকৃত মূলধন	৩,৫০,০০,০০০৲	রিজার্ভ ও অন্যান্য ফণ্ড	১,২৪,০২,০০০৲
[illegible] মূলধন	৩,৩৬,২৬,৪০০৲	৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত আমানতের পরিমাণ	৩২,৪৯,৮৮,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৬৮,১৩,২০০৲	ঐ তারিখে কোম্পানীর কাগজ ও ট্রেজারি বিলে নিয়োজিত ও	
অংশীদারদিগের নির্দ্দিষ্ট দায়	১,৬৮,১৩,২০০৲	কল ডিপোজিট ও নগদ টাকার পরিমাণ	২১,৯০,৩২,৬৮৫৲

জেনারল্ ম্যানেজার—মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন জে, পি

হেড অফিস—বোম্বাই

ডিরেক্টরগণ

সার এইচ, পি, মোদী কেটি, কে বি, ই—চেয়ারম্যান
দি রাইট অনারেবল নবাব সার আকবর হায়দরী কেটি, পি, সি,
মিঃ আরদেশীর বোমানজি ডুবাস
মিঃ হরিদাস মাধবদাস
মিঃ দিনশ ডি রোমার
মিঃ ভিঠলদাস কাঞ্জি
মিঃ নুরমহম্মদ এম, চিণয়
মিঃ বাপুজী ডি, লাম
মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাটাউ
সার এ, আর, দালাল কেটি

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস বর্ত্তমান। বৈদেশিক কারবার করা হয়।

প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়।

চলতি আমানতী, স্থায়ী আমানতী এবং সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলুন।

ব্যাঙ্কের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :—

আমাদের রুপী ট্রাভেলার্স চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিরেকে ইন্সিওরেন্স পলিসি, পাঁচ ও দশ তোলার খাঁটি স্বর্ণ বার, শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্জ্জনকারী ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার ও ট্রাষ্টি কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক ট্রাষ্ট ও উইলের কার্য্য পরিচালনা।

গহনাপত্র দলিলাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য সেফ ডিপোজিট ভল্ট—
বার্ষিক ভাড়া ১২৲। একটি লকার আপনার আয়ত্বাধীনে থাকিবে।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১, ক্রস ষ্ট্রীট,
ভবানীপুর শাখা—৮-এ, রসা রোড, নিউ মার্কেট শাখা—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার শাখা—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাংলা ও বিহারের শাখা সমূহ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, মজঃফরপুর এবং গয়া।

লণ্ডনের এজেণ্ট—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউ ইয়র্কের এজেণ্ট—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক।

পরিচয়—বৈশাখ ১৩৪৮

বিষয়-সূচী

প্রমথ চৌধুরী ... শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সু-যোগ ও কু-যোগ ... ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাফো (উপন্যাস) ... শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ... শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন্ ... শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
ঘটক (গল্প) ... ... শ্রীমানিক বন্দোপাধ্যায়
বাঙালী মেয়ে (কবিতা) .. শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তোমাকে („) ... শ্রীজীবনানন্দ দাশ
সময় („) ... শ্রীপরিতোষ খাঁ
পরিক্রমা („) ... শ্রীগোপাল ভৌমিক
প্রচীন সিংহলীয় সংস্কৃতির এক অধ্যায় শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

পুস্তক পরিচয়

শ্রীঅজয় সেন, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীশচীন সেন, শ্রীবিশ্বামিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।

পত্রিকা প্রসঙ্গ

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

পোষণের উপযোগী পদার্থের অভাবে যখন কেশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তকে খুস্কি, মরামাস প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করিলে কেশমূল নীরোগ হয় এবং বিরলতা ও পতন নিবারিত হইয়া কেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী পরিবর্দ্ধিত হয়।

একাধারে কেশচর্য্যা ও কেশচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

11 8 57

কয়েকখানি কিনে পড়বার মত বই

প্রমথ চৌধুরী—

নীললোহিতের আদি প্রেম ১৲

ঘরে-বাইরে ১৲

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

আবর্ত্ত (উপন্যাস) ২৲

অন্তঃশীলা (উপন্যাস) ২৲

রিয়ালিষ্ট (গল্প) ১৲

চিন্তয়সি (প্রবন্ধ) ১।০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

সুর ও সঙ্গতি ১৲

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—

ভারত ও ইন্দোচীন ১৲

ভারত ও মধ্যএসিয়া ১৲

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য ১৲

জ্যোতির্ম্ময় রায়—

দৈনন্দিন ১।।০

বৈশাখী

বাংলার অভিনব বার্ষিকী

আগামী ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে

দাম এক টাকা

গ্রীষ্মাবকাশে পাহাড়ে কি সমুদ্রতীরে, কলকাতায় কি পল্লীগ্রামে, যেখানেই আপনি থাকুন, বৈশাখী হবে আপনার প্রিয় সঙ্গী। এতে থাকবে অবকাশ যাপনের রঙিন উপাদান, অথচ চিন্তাশীল সাবালক মনের খোরাকও এতে পাবেন। ১লা বৈশাখের পূর্বে মঃ-অঃ যোগে এক টাকা পাঠালে **বিনা ডাকখরচে** ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় ঘরে বসে একখানা পাবেন।

কবিতা

'কবিতা'র আগামী আষাঢ় সংখ্যা ২৫শে বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে **রবীন্দ্র-সংখ্যা** হ'য়ে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে—আলোচনা করবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকরা। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধসংগ্রহে বাংলা সাহিত্যে এই সংখ্যাটির মূল্য ও মর্যাদা হবে স্থায়ী। বাংলা সাহিত্য যাঁরা ভালোবাসেন, এই সংখ্যাটি তাঁদের অপরিহার্য।

এই সংখ্যার মূল্য বারো আনা।

কবিতা ভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

পরিচয়—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

বিষয়-সূচী

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ... ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রকাব্য আধুনিক কেন? ... শ্রীশচীন সেন

গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ ... ... শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্মৃতি ... শ্রীজীবনময় রায়

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি ... শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ... ... শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি ... .. শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ... শ্রীবসুধা চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ ও গান ... ... শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

কবির চিঠি ... ... শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ... এজ্‌রা পাউণ্ড

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ ... ... শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

সম্পাদকী

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

পোষণের উপযোগী পদার্থের অভাবে যখন কেশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তকে খুস্‌কি, মরামাস প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করিলে কেশমূল নীরোগ হয় এবং বিরলতা ও পতন নিবারিত হইয়া কেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী পরিবর্ধিত হয়।

একাধারে কেশচর্য্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করুন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯১১ সালে স্থাপিত

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মূলধনে ও আমানতে ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

রেজিষ্ট্রীকৃত মূলধন	৩,৫০,০০,০০০৲	রিজার্ভ ও অন্যান্য ফণ্ড	১,২৪,০২,০০০৲
বিক্রিত মূলধন	৩,৩৬,২৬,৪০০৲	৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত আমানতের পরিমাণ	৩২,৪৯,৮৮,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৬৮,১৩,২০০৲	ঐ তারিখে কোম্পানীর কাগজ ও ট্রেজারি বিলে নিয়োজিত ও	
অংশীদারদিগের নির্দ্দিষ্ট দায়	১,৬৮,১৩,২০০৲	কল ডিপোজিট ও নগদ টাকার পরিমাণ	২১,৯০,৩২,৬৮৫৲

জেনারল্ ম্যানেজার—মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন জে, পি

হেড অফিস—বোম্বাই

ডিরেক্টরগণ

সার এইচ, পি, মোদী কেটি, কে বি, ই—চেয়ারম্যান
দি রাইট অনারেবল নবাব সার আকবর হায়দরী কেটি, পি, সি,
মিঃ আরদেশীর যোমানজি ডুবাস
মিঃ হরিদাস মাধবদাস
মিঃ দিনশ ডি, রোমার
মিঃ ভিঠলদাস কাঞ্জি
মিঃ নুরমহম্মদ এম, চিণয়
মিঃ বাপুজী ডি, লাম
মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাটাউ
সার এ, আর, দালাল কেটি

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস বর্ত্তমান। বৈদেশিক কারবার করা হয়।

প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়।

চল্‌তি আমানতী, স্থায়ী আমানতী এবং সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলুন।

ব্যাঙ্কের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :—

আমাদের রুপী ট্রাভেলার্স চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিরেকে ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, পাঁচ ও দশ তোলার খাঁটি স্বর্ণ বার, শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্জ্জনকারী ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার ও ট্রাষ্টি কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক ট্রাষ্ট ও উইলের কার্য্য পরিচালনা।

গহনাপত্র দলিলাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য সেফ ডিপোজিট ভল্ট—
বার্ষিক ভাড়া ১২৲। একটি লকার আপনার আয়ত্তাধীনে থাকিবে।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১, ক্রস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮-এ, রসা রোড, নিউ মার্কেট শাখা—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাংলা ও বিহারের শাখা সমূহ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, মজঃফরপুর গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারী, বেটিয়া, মধুবাণী, খাগারিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ।

লণ্ডনের এজেণ্ট—বার্কিলেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউইয়র্কের এজেণ্ট—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক।

পরিচয়—আষাঢ় ১৩৪৮

বিষয়-সূচী

কবিতার প্রকার	শ্রীনবেন্দু বসু
প্রহসন (গল্প)	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
সুযোগ ও কুযোগ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাফো (উপন্যাস)	শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
একটি প্রেমের কবিতা (কবিতা) ...	শ্রীবিষ্ণু দে
রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায় (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগরের য (j) ফলা (কবিতা) ...	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
রুশিয়াতে দিন কয়েক ...	শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীশচীন সেন, শ্রীসমরেন্দ্র সিংহ

পার্ল পাউডার

পরাগ-কোমল চূর্ণ প্রসাধন

আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অল্প আয়াসেই চতুর্গুণ শ্রান্তিতে দেহ মন অবসন্ন হয়। অবসর কালেও শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া ক্লান্তি আসে। এই অবস্থায় সুরভিত 'পার্ল পাউডার' ব্যবহারে দেহে অনেকখানি স্নিগ্ধতা বোধ হয়, ঘামাচি সারিয়া যায়। গ্রীষ্মের ক্লান্তি দূর হইয়া মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করুন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯১১ সালে স্থাপিত

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মূলধনে ও আমানতে ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

রেজিষ্টীকৃত মূলধন	৩,৫০,০০,০০০৲	রিজার্ভ ও অন্যান্য ফণ্ড	১,২৪,০২,০০০৲
বিক্রিত মূলধন	৩,৩৬,২৬,৪০০৲	৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত আমানতের পরিমাণ	৩২,৪৯,৮৮,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৬৮,১৩,২০০৲	ঐ তারিখে কোম্পানীর কাগজ ও ট্রেজারি বিলে নিয়োজিত ও	
অংশীদারদিগের নির্দ্দিষ্ট দায়	১,৬৮,১৩,২০০৲	কল ডিপোজিট ও নগদ টাকার পরিমাণ	২১,৯০,৩২,৬৮৫৲

জেনারল্ ম্যানেজার—মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন জে, পি

হেড অফিস—বোম্বাই

ডিরেক্টরগণ

সার এইচ, পি, মোদী কেটি, কে বি, ই—চেয়ারম্যান
দি রাইট অনারেবল নবাব সার আকবর হায়দরী কেটি, পি, সি,
মিঃ আরদেশীর বোমানজি ডুবাস
মিঃ হরিদাস মাধবদাস
মিঃ দিনশ ডি, রোমার
মিঃ ভিঠলদাস কাঞ্চি
মিঃ নুরমহম্মদ এম, চিণয়
মিঃ বাপুজী ডি, লাম
মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাটাউ
সার এ, আর, দালাল কেটি

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস বর্ত্তমান। বৈদেশিক কারবার করা হয়।

প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়।

চল্‌তি আমানতী, স্থায়ী আমানতী এবং সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলুন।

ব্যাঙ্কের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ—

আমাদের রূপী ট্রাভেলার্স চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিরেকে ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, পাঁচ ও দশ তোলার খাঁটি স্বর্ণ বার, শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্জ্জনকারী ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার ও ট্রাষ্টি কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক ট্রাষ্ট ও উইলের কার্য্য পরিচালনা।

গহনাপত্র দলিলাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য সেফ ডিপোজিট ভল্ট—
বার্ষিক ভাড়া ১২৲। একটি লকার আপনার আয়ত্তাধীনে থাকিবে।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১, ক্রস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮-এ, রসা রোড, নিউ মার্কেট শাখা—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাংলা ও বিহারের শাখা সমূহ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, মজঃফরপুর গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারী, বেটিয়া, মধুবাণী, খাগারিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ।

লণ্ডনের এজেণ্ট—বার্কিলেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউইয়র্কের এজেণ্ট—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J 1806

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৪৭

পরিচয়

স্বারাজ্য-সিদ্ধি

(২)

গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি কেন মোক্ষকে 'স্বরূপাবস্থান' বলে—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—ভাগবত

সে কথার এখানে পুনরাবৃত্তি করিব না। আর এক ভাবে দেখিলে কিন্তু মোক্ষকে স্ব-রূপে অবস্থান না বলিয়া স্ব-ধামে প্রত্যাবর্তন বলা যাইতে পারে।

ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া তাই বলিয়াছেন—হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তমেহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

'হে জীব। অবদ্য (অঞ্জন, Stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।'

আমরা এখন যেমন বলি সূর্য অস্ত গেলেন 'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন বলিয়াছেন—যাত্যেকতোঽস্ত-শিখরং পতিরোষধীনাম্—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে চলিলেন,—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন, 'অস্তে'র অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্বেদ, ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের অস্তে (গৃহে) প্রবেশ করে।'
উপনিষদের স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি

—ছান্দোগ্য, ১।৯।১

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বা অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা মলিনতা পরিহার করিয়া 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।' আমরা দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিরঞ্জন—'শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহ-রূপ 'পুরের' সহিত সংযুক্ত হইয়া সে পুরঞ্জন হয়—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ

—বৃহ, ২।৫।১৮

সেইজন্যই জীবের নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহার বসতি। ঐ পুরের অঞ্জন (stain) যেন তাহাকে উপরক্ত করে।

স বা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপরাগ ধৌত করিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া, 'নিরবদ্য নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন কর। এই রূপে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনিই অস্তং গতঃ।

বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

অত্থং গতস্স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেয়ুঃ) তং তস্স নত্থি (সুত্তনিপাত, ৫)

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

For him, who has gone home, there is no standard of measure—এবং আমাদের স্মরণ করাইয়াছেন যে, Those acquainted with the older Sanskrit literature will see at once that in the Pali word 'Attam gatassa' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'Astamgata', the root meaning of which is 'gone home.''

বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন যে, যিনি পরিনির্বাণী (মুক্ত পুরুষ—the Delivered one), তিনি 'is submerged in the Deathless'.

—তে পতিপন্না অমতং (অমৃতং) বিগয়্হ লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা (সুত্তনিপাত)।

গ্রিম বলেন—'Neither this deathless Nirvana is thus my I; it is rather home in which I am submerged. (Doctrine of the Buddha, p. 519). কেননা, মুক্তিতে কি হয়? (We) reach that realm (ধাম), our own proper realm (প্রকৃত স্ব-ধাম), "where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair" (Doctrine of the Buddha, p.197).

নির্বাণের এই বর্ণনার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার তুলনা করুন—দেখিবেন, দুইটি একই সুরে বাঁধা।

যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১
'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত।'

আমাদের গন্তব্য ঐ স্বধাম কি? আমাদের 'মুলুক' (Real Home) কোথায়? কোন মুলুকসে আয়সি হংসা (কবীর)?—হে হংস (জীব)! তুমি কুতঃ আয়াতঃ—তোমার আয়তি কোথা হইতে? কুতঃ? কোথা হইতে? ব্রহ্ম হইতে—

From God who is our Home.—Wordsworth.

অতএব ব্রহ্মই আমার স্বধাম—

ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২

'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎ সৎ') বিচ্ছুরিত হইয়াছে'—For, man who is from God sent forth. (Wordsworth)—যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি

—বৃহ, ২।১।২০।

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত ঐ জীব বিবর্ত্তনের নিঃশ্রেণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া বহু যুগ যুগান্তে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ।

মনুষ্য হইলেও জীব অনেকদিন পর্যন্ত আত্ম-বিস্মৃত থাকে—সে যে অমৃতের পুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী থাকে—Gods in

exile—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া, 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া—যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থেরও উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth,
Doth again to God return.

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তগত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এতদিনে, 'the wheel has come full circle, I am here.' (Shakespeare)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark.—J. Krishnamurti's 'By what Authority', p. 29.

উপনিষদও এই কথাই বলিয়াছেন—

যত্র বিদ্বান্, তত্রৈব আত্মা বিগতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।'

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—মুণ্ডক ১।৩

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪

মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—মুণ্ডক, ১।৩

সেই বিষ্ণুর পরমপদ যাহা সংসার পথের পার, সুরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন,—যিনি 'অস্তগত' তিনি সেই পদে প্রত্যাবর্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—ঋগ্বেদ

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬)—

তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি—মুণ্ডক, ২।১।১

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১।১

'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।

সেই বেদের প্রাচীন বাণী—

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্বম্—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখন মুক্ত পুরুষের অন্তিম দেহের পতন হয়, তখন তিনি কি করেন? এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক অমৃতধামে তীর্থযাত্রা করেন।

প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।১৩

তাঁহার জন্য বৈতরণীর ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল (ওঁকার-প্লবেন অস্তহৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী, ৬।২৮)—এখন তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা চ সারথিম্।
ব্রহ্মলোক-পদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ॥
—অমৃতনাদ

অধ্যাপক ডয়সন্ ঐ মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের সুরে বলিয়াছেন—

He who has recognised 'Aham Brahma Ashmi' 'I am Brahman', he already is, not *will be* delivered; he sees through the illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম).

প্রশ্ন উঠে—জীবন্মুক্তের দেহপাতে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় কিনা? বৃহদারণ্যকে দেখি আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উৎ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো ন ইতি—৩।২।১১

'মুক্ত পুরুষ যখন মরেন, তখন তাঁহার প্রাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ) উৎক্রান্ত হয় কিনা?'

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, উৎক্রান্ত হয় না—এখানেই বিলীন হয়—

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।

ন উৎক্রামন্তি, অত্রৈব অস্মিন্ এব পরেণ আত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তি। বিদুষি কার্যাণি করণানি চ স্ব-যোনৌ পরব্রহ্মতত্ত্বে সমবনীয়ন্তে একীভাবেন সমবস্থজ্যন্তে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ, ঊর্ম্ময় ইব সমুদ্রে—শঙ্কর-ভাষ্য।

'প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না—এখানেই পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়। বিদ্বান্ পুরুষের (ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীর) দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ—সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায়, স্বযোনি পরব্রহ্মে বিলীন হয়, একীভূত হয়, নিলীন হয়।'

এ স্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞানী মুক্ত পুরুষই যে শ্রুতির লক্ষ্য, শঙ্করাচার্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন—পরমাত্ম-দর্শনেন যোঽসৌ মুক্তো বিদ্বান্। *

আমরা দেখিয়াছি, সাধারণ জীবমাত্রেরই উৎক্রান্তি হয়—

তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণং অনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি
—বৃহ, ৪।৪।২

এখানে দেখিলাম যিনি অসাধারণ জীব, যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত—তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্রও ঐ কথা বলিয়াছেন—

যঃ অকামঃ নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম,—তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে একীভূত হন।'

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এই :—

তস্য এবম্ অকাময়মানস্য কর্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণা বাগাদয় ন উৎক্রামন্তি * * য় চ বিদ্বান্ আপ্তকামঃ আপ্তকামতয়া ইহৈব ব্রহ্মভূতঃ * * স ইহৈব ব্রহ্ম, যদ্যপি দেহবান্ ইব লক্ষ্যতে, স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—ন শরীরপাতোত্তরকালম্। ন হি বিদুষো মৃতস্য

* অধ্যাপক ডয়সনেরও ঐ মত। তিনি বলেন—

Yet we are compelled, as seems to have been done already by the Madhyandinas, to interpret the words only of the *emancipated*, if we w[o]uld not set ourselves in irreconcilable contradiction with the words of Yajnavalkya elsewhere :—'When the life departs, all the vital organs depart with it'.—The Philosophy of the Upanisads, p 349

ভাবান্তরাপত্তিঃ জীবতঃ অন্যো ভাবঃ, দেহান্তরপ্রতিসন্ধানাভাবমাত্রেণৈব তু ব্রহ্ম অপ্যেতি ইতি উচ্যতে।

অর্থাৎ, যিনি অকাম-নিষ্কাম তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি উৎক্রান্ত হয় না। তিনি যখন কর্মশূন্য, তখন তাঁহার দেশান্তর প্রাপ্তি ঘটিবে কিরূপে? ব্রহ্মবিজ্ঞানী আপ্তকাম এবং যেহেতু তিনি আপ্তকাম অতএব এখানেই ব্রহ্মের সহিত একীভূত। যদ্যপি তাঁহাকে দেহধারী বলিয়া মনে হয় তথাপি তিনি ব্রহ্ম—অতএব তাঁহার ব্রহ্মে 'অপ্যয়' হয়—সেজন্য শরীরপাতের অপেক্ষা থাকে না। তাঁহার শরীর পাত হইলে জীবিতাবস্থা হইতে যে ভাবান্তর হয় তাহা নয়, তবে অজ্ঞ লোকের মৃত্যুর পর যেরূপ দেহান্তর-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাঁহার সেরূপ হয় না; এইজন্যই 'ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মে অপ্যয় হয়' এইরূপ বলা হইয়া থাকে।'

৫।১০।১ ছান্দোগ্য-ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর এ সম্পর্কে অন্যভাবে বলিয়াছেন—

ন চ প্রাণৈর্বিযুক্তস্য গতিঃ উপপদ্যতে জীবত্বং বা। সর্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধ-মাত্রমেব অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্বভেদকারণম্ ইত্যতঃ তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুম্—শ্রুতয়ঃ চেৎ প্রমাণম্।

অর্থাৎ, শ্রুতি যখন বলিলেন—'(প্রাণাঃ) অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—তখন প্রাণ-বিযুক্ত আত্মার গতি বা জীবত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি পরমাত্মা, তিনি সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব—তাঁহার প্রাণসম্বন্ধই জীবব্রহ্মের ভেদকারণ—যেমন অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের ভেদ। সেই প্রাণের প্রলয়ে তাঁহার জীবত্ব বা গতি কিরূপে কল্পিত হইতে পারে—যদি শ্রুতিকে প্রমাণ-স্বীকার করা যায়?

নৃসিংহ উত্তরতাপনী উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকের ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

য এবং বেদ, স অকামঃ নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—তৃতীয় খণ্ড।

'ব্রহ্ম অপ্যেতি'—ব্রহ্মের সহিত একীভাব—ইহা দ্বারা 'বিদেহ-কৈবল্য' বুঝিতে হয়—শঙ্করাচার্য যাহাকে ব্রহ্মে নিলীন হওয়া বলিলেন—'একীভাবেন সমবস্থজ্যন্তে প্রলীয়ন্তে।' এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন-উপনিষদ্ হইতে এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তথা চ শ্রুত্যন্তরং কলাশব্দবাচ্যানাং প্রাণানাং পরস্মিন্ আত্মনি প্রলয়ং দর্শয়তি—"এবমেব

অস্ত পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" ইতি পরেণ আত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তি ইতি দর্শিতম্।

'অপর শ্রুতিতেও কলা-নামে অভিহিত প্রাণ সমূহের পরব্রহ্মে বিলয়ের কথা উক্ত হইয়াছে—যথা, 'ঠিক এইরূপই ব্রহ্মদ্রষ্টা পুরুষের ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়।' অর্থাৎ প্রাণসমূহ পরমাত্মার সহিত অবিভাগ প্রাপ্ত হয়।

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে জীবন্মুক্ত দেহপাতে 'কৈবল্য-মুক্তি' গ্রহণ করেন, তাঁহারই প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না। কিন্তু তিনি যদি নির্বাণ-মুক্তি অস্বীকার করিয়া নির্মাণ-মুক্তি গ্রহণ করেন কিম্বা দেহপাতের পর যদি 'স্বারাজ্য-সিদ্ধি' তাঁহার অভিপ্রেত হয়—তবে তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় কি না ? ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ বলেন 'হয়'।

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন, শারীরাৎ—৪।২।১২ *

ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানাম্ উৎক্রান্তিরস্তি ইতি চেৎ—ন ইত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাৎ (আত্মনঃ) এষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং—ন শরীরাৎ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, ব্রহ্মবিজ্ঞানীর দেহ হইতে যে প্রাণ সমূহ উৎক্রান্ত হয় না তাহা নহে। আত্মা হইতে উৎক্রান্ত হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত—কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যাঁহার আত্মা হইতেও প্রাণ-সমূহের উৎক্রান্তি হয়, তিনি বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন। অতএব আমরা বলিতে চাই নির্মাণ- মুক্তের ও স্বারাজ্য-সিদ্ধের দেহপাতের অনন্তর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বাদরায়ণ ঐরূপ সূত্র করিলেন।

নির্মাণ-মুক্তির কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ঐ অবস্থায় মুক্ত জীব 'নির্মাণ-কায়ম্ অধিষ্ঠায়' (অপ্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া) ব্যাবহারিক ভেদের গন্ধটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত থাকেন ; নামরূপ হারাইয়া মিশ্রিত হন না—জলস্তম্ভে জলদ যেমন জলধির সহিত মিলিত হয়, মিশ্রিত হয় না।

'In that apparently selfless state "the I, the Me, the Mine," though spiritualised, remain intact' এ সম্পর্কে আমরা 'অনাদ-নাদ'

* আচার্য শঙ্কর এই সূত্রকে পূর্বপক্ষ সূত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। আমি রামানুজের মতই অনুসরণ করিতেছি।

গ্রন্থ হইতে স্থানান্তরে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

"To don Nirmanakaya's humble robe is to forego eternal bliss for self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path.

Know, O desciple, this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the self to weaker selves. †

প্রাচীন ব্যাসভাষ্যেও আমরা 'তে নির্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায়'—এইরূপ কথা শুনিয়াছি। শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকায় 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কুর্বন্তি' এই বচন শ্রুতিবাক্য বলিয়া যে উদ্ধার করিয়াছেন—উহাও বোধ হয় নির্বাণ-মুক্তির পরিবর্তে নির্মাণ-মুক্তি লক্ষ্য করিয়া।

এইবার 'স্বারাজ্য-সিদ্ধির' কথা বলি। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'সম্ভোগকায়' বলেন। এ সম্পর্কে ঐ অনাদ-নাদ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'Sambhogakaya is greater than a Nirvanee and greater still is a Nirmanakaya—the Buddha of compassion.

যিনি সম্ভোগকায়ী, তিনি স্বরাট্ হন। তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়। তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন (সঙ্কল্পাৎ এব তু তৎ শ্রুতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮)। সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন—

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ * * তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। × × সংকল্পাদ্ এবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি। * * সর্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

সেইজন্য বাদরায়ণ তাঁহাকে 'অনন্যাধিপতি' বলিয়াছেন—

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এই—

যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—৮।১।৬

† ইহার টীকায় মাদাম ব্লাভাট্স্কি লিখিয়াছেন :—Having reached the goal and refused its fruition, he remains on earth, as an Adept (জীবন্মুক্ত) and when he dies, instead of going into Nirvana, he remains in that glorious body (নির্মাণকায়) he has woven for himself, invisible to uninitiated mankind, to watch over and protect it.

'যিনি পরমাত্মাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার হয়।'

এই কামচারিত্বের বিবৃতি করিয়া ছান্দোগ্যের ঋষি বলিতেছেন—

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্য-লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য অন্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন অন্নপান-লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিতে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিতলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

যং যম্ অন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

—ছান্দোগ্য, ৮।২।১-১০

'তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন তবে সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উত্থিত হন এবং তিনি পিতৃগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।'

(শঙ্কর বলেন ঐ পিতৃলোক স্বতন্ত্র স্থান নহে—পিতরো জনয়িতারঃ তে এব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে)

এইরূপ তিনি যদি মাতৃলোকের কামনা করেন, ভ্রাতৃলোকের কামনা করেন, ভগিনী-লোকের কামনা করেন, সুহৃৎলোকের কামনা করেন, স্ত্রী-লোকের কামনা করেন, গন্ধমাল্য-লোকের কামনা করেন, অন্নপানলোকের কামনা করেন, গীতবাদ্যলোকের কামনা করেন

তবে সংকল্পমাত্রে ঐ ঐ কামনার বস্তু উত্থিত হয় এবং তিনি তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।

তিনি যে যে দেশের কামনা করেন, যে যে কামের কামনা করেন, সংকল্প মাত্রে তিনি তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।

প্রশ্ন উঠিবে স্বারাজ্যসিদ্ধের শরীর থাকে কিনা? বাদরি বলেন—থাকে না, জৈমিনি বলেন—থাকে। বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্। ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ। তন্বভাবে সন্ধ্যবদ্ উপপত্তেঃ ভাবে জাগ্রদ্বৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশস্তথা হি দর্শয়তি—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা। 'তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।'

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না।

জগদ্ব্যাপারবর্জম্—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

আর তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা ঐ সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮

'যদি বল মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যই শ্রুতি-উপদিষ্ট—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্,"—উত্তরে বলি, সে ঐশ্বর্য অধিকৃত-মণ্ডলে সীমাবদ্ধ।'

এ সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন—

যে সগুণব্রহ্মোপাসনায় সহৈব মনসা ঈশ্বর-সাযুজ্যং ব্রজন্তি * * জগৎ-উৎপত্তিব্যাপারং বর্জয়িত্বা অন্যদ্ অণিমাদ্যৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুম্ অর্হন্তি।

'সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনার ফলে কেহ কেহ ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ করেন। ঐ মুক্তদিগের অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্যসিদ্ধি হয়—কেবল জগদ্ব্যাপারে অধিকার জন্মে না।'

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়।

ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১

ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্কর

'মুক্তের ভোগই কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমান হয়'

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না। সেইজন্য, ঈশ্বরের মত মুক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না। এই মর্মে বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন—

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানাম্ ঈশ্বরস্য চ।
সর্বকর্তৃত্বম্ এবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥

"মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মের সহিত সমান গুণ হয়—কিন্তু বিশেষ এই থাকে যে একমাত্র ব্রহ্মেই সর্বকর্তৃত্ব সম্ভব।'

স্বারাজ্যসিদ্ধির কথা এখানেই সাঙ্গ করি। বিদেহ-মুক্তির কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাফো

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৪)

সকালে গোস্যাঁর ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ মাশোমের চীৎকারে। মাশোম্ ডাকছে ফানিকে : "তিনি এসেছেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি।"

রহস্যের অন্তরাল রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করে না মাশোম্।

ফানিও চেঁচিয়ে ওঠে—"কী! সে কথা বলতে চায়! আমি কি তাহ'লে আমার নিজের বাড়ির মালিক নই? তুমি আবার তাকে আসতে দিয়েছ?"

রাগান্বিত হয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে ফানি—অসম্বৃত বেশবাস নিয়েই বেগে বেরিয়ে যায় বাইরে। যাবার সময় বলে যায় গোস্যাঁকে :

"আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি, প্রিয়তম।"

গোস্যাঁ কিন্তু ফানির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে না। বিছানা ছেড়ে উঠে নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে নেয়। দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে।

বন্ধ ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকে জাঁ। সেখান থেকেই সে শুনতে পায়, নেপথ্যের চেঁচামেচি। ড্রইংরুমে তুমুল ঝগড়া বেধেছে। একই পুরুষের কণ্ঠস্বর, প্রথমে উদ্ধত, তারপরে বিনীত, তারপরে অশ্রুবাষ্পের মধ্যে বিজড়িত ও ভগ্ন হয়ে তার কানে আসে,—তার সঙ্গে আরেকটা গলার আওয়াজ, প্রথমে সে চিনতে পারে না, কর্কশতা ও কঠিনতায় অদ্ভুত—ঘৃণিত ও জঘন্য বাক্যপুঞ্জে পরিপূর্ণ—বারাঙ্গনাদের বস্তিতেই সে সব শব্দের আদান-প্রদান চলে—এই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কার ক্রমশ তার হৃদয়ঙ্গম হয়। তার প্রিয়া ফানির, আর কারো নয়।

গতকল্য রজনীর সমস্ত ভালোবাসা যেন বিষ হয়ে বিষিয়ে ওঠে জাঁর মনে। ফানি—ফানিও তাহ'লে আর সব মেয়ের মতই—নিতান্তই নগণ্যা আর সামান্যা, যাদের এতদিন সে ঘৃণাই ক'রে এসেছে।

ফানি ফিরে আসে—মুক্ত কেশগুচ্ছকে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে।

"কী বিশ্রী দৃশ্য! পুরুষ মানুষের কান্না!"

তারপর যখন সে দেখতে পায়, গোস্যাঁ ইতোমধ্যেই উঠে, বেশভূষা ক'রে যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে রয়েছে, সে যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে আবার। রাগ আর সে চাপতে পারে না:

"বাঃ! উঠে পড়েছ যে দেখছি এর মধ্যেই! উঃ, কী তোমার যাবার তাড়া!"

কিন্তু পরমুহূর্তেই তক্ষুনি আবার সে ঘুরে আসে—"না, না! যেয়ো না। এ-অবস্থায় এমন ক'রে চলে যেয়ো না তুমি। তাহ'লে আমি জানি আর তুমি আসবে না কখনো।"

"আসব বই কি! কেন, আসব না কেন?"

"সত্যি ক'রে বলো যে তুমি রাগ করো নি? আবার তুমি আসবে? না, আমার বিশ্বাস হয় না, তোমাকে ভালোরকমই আমি চিনেছি এতদিনে!"

ফানি যেমন বলে তেমনি শপথ করে সে—কিন্তু কিছুতেই সে আর সেখানে থাকতে রাজি হয় না, ওটা যে ফানিরই নিজস্ব, নিজের একার দখলের বাড়ি বারম্বার এই আশ্বাস-সত্ত্বেও। অবশেষে ফানি হাল ছেড়ে দেয়, গোস্যাঁর সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত যায়, তাকে বিদায় দিতে—একটু আগের ক্রুদ্ধা ফণিনীর উদ্ধত-ফণার চিহ্নমাত্রও তখন অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে, তার পরিবর্তে, এখন সে অতি-বিনীতা, মার্জ্জনার ভিখারিণী—গোস্যাঁর কাছে।

বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায় তারা। দীর্ঘকালব্যাপী বিদায়-আলিঙ্গনের পালা।

"তাহলে আসবে ত'?" ফানি তাকায় গোস্যাঁর চোখে—যেন তার গভীরতার তলদেশ থেকে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়—"আসবে ত আবার?"

গোস্যাঁ মিথ্যা ক'রে বলতে চায়, বাইরে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে; একটা উত্তরও দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে সদর দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

মাশোম্ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ফানি তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করে—"না খুলো না দরজা।"

তিনজনে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে—মুখোমুখি নিস্তব্ধ।

বাহিরের লোকটির অভিযোগের কণ্ঠ যেন শোনা যায়, তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে একটা চিঠি গুঁলে আসে, এবং তারপরই ধীরে ধীরে পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শোনা যায়।

"দেখ, আমি বলেছিলুম যে আমি স্বাধীন—এই দেখ!"

ফানি চিঠিখানা খুলে, চোখ বুলিয়েই, তার প্রণয়ীর হাতে দেয়।

পেন্সিলে রচনা, সামান্য একখানা প্রেমপত্র—তাড়াতাড়িতে লেখা—কাকুতি-মিনতিতে ভরা কেবল। সকালবেলার হঠকারিতার জন্যে সেই হতভাগ্য ক্ষমা ভিক্ষা করেছে, স্বীকার করেছে যে ফানির উপরে সত্যিই কোন অধিকার নেই তার, ফানি তার নিজের ইচ্ছায় যতটুকু অধিকার তাকে দেবে দয়া করে, তার বেশি আর দাবি নেই তার, কেবল তার এই অনুনয় যে ফানি যেন তাকে একেবারে নির্ব্বাসিত না করে চিরদিনের জন্য। সব কিছু, সমস্ত অবস্থাই সে স্বীকার ক'রে নিতে রাজি, কেবল ফানিকে হারাতে সে রাজি নয়, হা ভগবান! কেবল ফানিকে হারাতে!

বিরক্তিপূর্ণ হাসি হেসে ফানি বলে:

"ভাবখানা দেখো একবার!"

এবং এই হাসির দ্বারাই, যে-হৃদয় সে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলো তাই হারানোর কাজ সুসমাধা করে। গোস্যাঁর মনে হয়, ফানি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তখনো সে জানেনা, যে (নিতান্তই ছেলেমানুষ সে তখনো) যে-মেয়ে প্রেমে পড়ে, তার কাছে নিজের প্রেম এবং সেই প্রণয়ী, সেই একমাত্র ব্যক্তি ব্যতীত, আর কারো, আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই—না অন্য কোন টান, অন্য কোন আকর্ষণ, দয়া, মমতা, কি দাক্ষিণ্যের।

"এ-নিয়ে তামাসা করা ভারী অন্যায় তোমার!" গোস্যাঁ বলে। "অতি-চমৎকার এই চিঠি—হৃদয় বিদারক।"

তারপর ফানিকে টেনে তার দু'হাত ধ'রে চাপা গম্ভীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে:

"কেন লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে, কেন?"

'আমি চাই না ওকে আর। ওকে আমি ভালোবাসি না।"

"কিন্তু সে তোমার প্রণয়ী ছিল একদিন। এই বাড়ি ঘর, আসবাব, আরাম, বিলাস-সজ্জা সেই দিয়েছে তোমায়—যার মধ্যে তুমি আছো, বাস ক'রে এসেছ এতদিন—যা নাহ'লে চলে না তোমার, চলবে না তোমার।"

"প্রিয়তম," সরল কণ্ঠেই ফানি জবাব দেয়: যতদিন আমি তোমাকে জানি নি, ততদিন এ-সবই খুব ভালো লেগেছে আমার। কিন্তু আজ এ-সবই আমার কাছে বাজে আর বোঝা—আমার হৃদয় এ-সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জানি, জানি তুমি বলতে চাও যে আমাদের মধ্যেও ত' চিরস্থায়ী সম্পর্ক কিছু হয় নি—জানি তুমি বলবে যে, তুমি আমাকে ভালোবাস না। কিন্তু সে হচ্ছে আমার বিবেচ্য বিষয়। তুমি চাও বা না চাও, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়ে নেবই।"

গোস্যাঁ এর কোন জবাব দেয় না। পরের দিন আবার সে আসছে, কেবল এই কথা বলে সে চলে যায়। যাবার আগে, মাশোমের হাতে কয়েকটি লুই সে প্রদান করে।

তার দিক থেকে, এই প্রণয়-ব্যাপারের যবনিকা পড়ে গেছে। কী অধিকার আছে তার, এই নারীর জীবনে অশান্তি আনবার? তার সঙ্গে ভালোবাসার ফলে মেয়েটি যা হারাবে তার বিনিময়ে কী দেবার আছে তার? কোন সুখ, কোন স্বাচ্ছন্দ্য?

সেই দিনই এই সব কথা জানিয়ে ফানিকে সে চিঠি লিখে দেয়; খুব কোমল ও আন্তরিক ভাবেই এ-সব কথা লেখে। সেদিন সকালের সেই ব্যাপারে, প্রবঞ্চিত প্রণয়ীর অশ্রুভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফানির উচ্চহাসি তার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল,—তার কেবলি মনে হচ্ছিল তাদের ক্ষণিক বিলাস-লীলার যে এখনই ও এখানেই শেষ-যবনিকা পতন হোলো সে ভালোই।

যথারীতি পরিত্যক্তা হলেও, ফানি কিন্তু উৎসাহ পরিত্যাগ করল না। গোস্যাঁ আর দেখা করতে আসছে না জেনেও, সে লিখল তাকে: "আমার আত্ম-সম্মানের কোন জ্ঞান নেই।"

এবং তারপর থেকে সে যেন ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল জাঁকে।

জাঁ যে রেঁস্তোরায় খায়, তার সম্মুখের টেবিলে গিয়ে সে বসে; জাঁ

যে-পাঠাগারে গিয়ে কাগজ পড়ে, তার বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে। কোন অশ্রুবর্ষণ বা দৃশ্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেই। জাঁ যদি কোন লোকের সঙ্গে থাকে তাহ'লে সে নিজেকে দূরে রাখে—যখন জাঁ একাকী হবে সেই সুযোগ-মুহূর্তের প্রতীক্ষা ক'রে।

এবং দেখা হ'লে বা সামনা-সামনি জাঁকে একাকী পেলে কী কথা সে বলে?

'আজ সন্ধ্যায় আসবে? না? আচ্ছা, তাহ'লে অন্য আরেক দিন।"

এই বলে ফানি চলে যায় অন্যত্র। নিজের রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হয় গোস্যাঁ। প্রত্যেকবারই তাকে মিথ্যা ক'রে বলতে হয় বানিয়ে: "পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে কিনা! এই কটা দিন গেলেই—তখন আবার! অবশ্য তখনো যদি ফানির এমনি ঝোঁক থাকে তবেই—!"

প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছা, পরীক্ষা চুকে গেলেই মাসখানেকের জন্য প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও সে চলে যাবে—তার দৃঢ়বিশ্বাস, এই অবকাশের মধ্যে ফানি ভুলে যেতে পারবে তাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, পরীক্ষা যখন চুকে গেল তখন জাঁ পড়ল অসুখে। ঠাণ্ডা লেগে প্রথমে সামান্য সর্দ্দি, তারপরে অবহেলায়, অন্যান্য উপসর্গে জড়িত হয়ে তাই দারুণ হয়ে উঠল। ক্রমশ সে শয্যাগত হয়ে পড়ল।

প্যারিসে এক জনেরও সঙ্গে তার জানা শোনা নেই—ফানি ছাড়া আর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করেনি সে, বরং এড়িয়েই এসেছে সবাইকে এতদিন। কাজেই সহযোগী ছাত্রদের কারো সাহায্যের ভরসা তার ছিল না। এবং এ-যেমন শক্ত অসুখ, তাঁতে সামান্য সেবা-শুশ্রূষার কাজ নয়।

ফানি লগ্রাঁ অসুখের খবর পাবা মাত্র ছুটে এল—এবং সুদক্ষ নার্সের মত সেবায়, ওষুধ এবং পথ্যে, আস্তে আস্তে আরোগ্যের পথে ফিরিয়ে আনল গোস্যাঁকে।

বিকারের ঘোরে ফানিকে দেখে গোস্যাঁর মনে হয় তার খুড়ি দিভোনকে। সে বলে: "দিভোন্ বাঁচাও আমায়!"

"দিভোন্ নই, আমি। আমি দেখছি তোমায়।" ফানি বলে।

বাইশ ঘণ্টা সে গোস্যাঁর সেবা করে—কেবল দু'ঘণ্টা সে ঘুমোয় সোফার উপর।

অবশেষে গোস্যাঁ সেরে ওঠে। একদিন সে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা তুমি কি বাড়ি যাও না একেবারেই, ফানি ?"

ফানি হাসতে থাকে। বাড়ি ?

বাড়ির অবস্থা তখন চমৎকার! মাশোম পালিয়েছে, সমস্ত আসবাব পত্র—পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা পর্য্যন্ত নিলামে উঠেছে! যে-একবস্ত্রে সে এখানে এসেছে কেবল সেই পোষাকই তার এক মাত্র সম্বল এখন। এখন যদি গোস্যাঁ তাকে চলে যেতে বলে তাহ'লে নিঃসন্দেহে রাস্তাতেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

(৫)

"পেয়েছি বলেই মনে হচ্ছে এবার। রেলওয়ে ষ্টেশনের কাঁছাকাছি। তিনটে ঘর—একটা বারান্দা। যদি চাও'ত', আপিসের কাজ সেরে ফেরবার পথে তুমি নিজেও দেখে আসতে পারো।" বলে ফানি।

পরীক্ষা পাশ করার ফলে, সেরে উঠেই, অপিসে চাকরী পেয়েছে গোস্যাঁ।

"খুব উঁচুতে অবিশ্যি—সেই একেবারে পাঁচতলায়।" যোগ করে জাঁ :

"কিন্তু তুমি ত' আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে! কোলে চেপে উপরে উঠতে ভারী মজা,—সেই, তোমার মনে আছে ?"

পুরাতন-স্মৃতির আবেশে বিহ্বল হয়ে, ফানি গোস্যাঁর বুকে নিজেকে কুণ্ডলিত ক'রে আনে—যেন এখনই সে উপরে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজেকে যথাস্থানে যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট করছে।

পঞ্চাশ জনের মধ্যে ভাড়াবাড়িতে বাস ক'রে তাদের দু'জনের জীবন যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। আর সকলের রুচি বা অভ্যাসের সঙ্গে তাদের রুচির অভ্যাসের খাপ খায় না—তাছাড়া আরো কতই অসুবিধা! নিজেদের একেবারে নিজস্ব, স্বতন্ত্র এবং সাজানো-গোজানো একখানা ছোটখাটো বাড়ি না হ'লে আর চলছে না কিছুতেই তাদের।

ফানির পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ ততো অসহ্য নয়, অবশ্য। যদি জাঁ থাকে

তার সঙ্গে, তার কাছাকাছি, তার পাশেই, তাহ'লে পৃথিবীর যে কোন জায়গা—স্বর্গ তার কাছে—তা সে ছাদের ওপরই হোক, কি মাটির তলায় অন্তর্বর্ত্তী গুদামঘরই হোক, কিম্বা আবর্জ্জনা ভরা অলিগলিতেই হোক। জাঁর কিন্তু ভালো লাগে না বাসাবাড়ি—পঞ্চাশ রকম প্রকৃতির পঞ্চাশ জনের সঙ্গে একত্র থাকা। তার অসন্তোষের পেয়ালাই দিনকে-দিন ছাপিয়ে উঠছে ক্রমশ।

যাক্—এতদিনে একটা চমৎকার ছোট্ট বাড়ি খুঁজে পেয়েছে ফানি। সেইখানেই এবার উঠবে গিয়ে তারা। বাজার থেকে সস্তাদরের আসবাবপত্র কিনে মনের মত ক'রে ঘর সাজাবে। তাদের সুখের নীড় হবে সেই ঘরগুলি। স্নেহে স্নিগ্ধ, ভালোবাসায় উজ্জ্বল, রূপ-লালিত্যে অপরূপ!

জাঁ বাড়িতে খুড়ি দিভোনের কাছে চিঠি লিখে কিছু টাকা আনিয়ে নিয়েছে,—উপরন্তু খুড়ি জানিয়েছে যে শীঘ্রই তিনি এক সিন্দুক পোষাক পাঠাচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গে আলমারী,দেরাজ আর ড্রয়ার। আর সেই প্রকাণ্ড বেতের আরাম-চেয়ারটা।

বাঃ! তাহ'লে ত' সুখের আর সীমাই থাকবে না বলতে গেলে—বিশেষ ক'রে সেই বেতের আরাম-চেয়ারটায়, তারা দু'জনে যদি একসঙ্গে বসতে পায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়, জাঁ অপিস থেকে খেটেখুটে বাড়ি ফিরে এলে।

নতুন জীবন সুরু হয় তাদের। অপূর্ব্ব আর চমৎকার জীবন! স্বপ্নের মত মোহময়, ফুলের মত সুরভিত জীবন!

অপিসের কাজ শেষ হলেই, জাঁ বাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়—তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করে। কখন সে বাড়ি ফিরে, স্লিপার পায়ে দিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে বসবে ফানিকে পাশে নিয়ে! রাস্তার ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এই স্বপ্নই সে দেখে!

যেমনি সে দরজার ঘণ্টা বাজায়, ফানি ছুটে আসে তৎক্ষণাৎ! এসে দরজা খুলে দেয়। এমন চমৎকার লাগে ফানিকে দেখতে গোস্যাঁর! যে-পোষাকই দাওনা কেন, তাতেই অদ্ভুত মানায় ওকে! পরবার—মানাবার কেমন এক কায়দাই যেন ওর জানা আছে!

আর এত রকমের রান্নাবান্নায় ও ওস্তাদ্—কি উত্তর, কি দক্ষিণ প্রদেশের যত রকম ঘরোয়া রান্না আছে—আর ফানির রান্নাও হয় এমন মিষ্টি যে গোর্স্যা এতদিন রেঁস্তোরায় খেয়ে যে-স্বাদ পায় নি, আজ বাড়িতে ফানির হাতের রাঁধা খাবার আর পরিবেশনে তার জীবনের যেন নতুন পরিচ্ছেদ খুলে যায়।

সত্যিই, ভারী সুখী গোর্স্যা। গোর্স্যা এই কথাই মনে করে—মনে করতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি সে প্রেমে পড়েছে ? না। না, প্রেমে সে পড়েনি, কিন্তু যে-প্রেম, যে-ভালোবাসা, যে-মমতা তাকে ঘিরে রেখেছে, আচ্ছন্ন রেখেছে, আরামে রেখেছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞ-চিত্ত। ফানিকে সে ভালোবাসে না, সত্যিই, কিন্তু ফানিকে তার ভালো লাগে। ভারী ভালো লাগে, এ-কথাও মিথ্যে নয়।

এমনি ক'রে দিন যায়, সপ্তাহ যায়,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে। অবশেষে একদিন ফানি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে এসে জানায়, বোধ হয়, বোধ হয় সে—

উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াচ লেগে তারও আনন্দ হয়। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভীত হয়ে ওঠে সে। তার এই বয়সে, এত অল্প বয়সে হবে শিশু ? সে হবে সন্তানের পিতা ? সেই পুত্রকে নিয়ে কি করবে সে ? তাকে কি সামাজিক ভাবে স্বীকার করতে পারবে ? এই নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী ? কত রকম সমস্যার সম্ভাবনীয়তাই তার মাথায় জাগে !

অকস্মাৎ চোখের এক পলকে, যেন সে দেখতে পায় পারিবারিক শৃঙ্খল—সুদীর্ঘ, শীতল আর ভারী। রাত্রে তার ঘুম হয় না, পাশাপাশি বিনিদ্র শুয়ে তারা দেখে যেন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ; তাদের মধ্যে শত সহস্র যোজনের ব্যবধান।

ভাগ্যক্রমে, পুত্রের সম্ভাবনীয়তা কেটে যায়—মিথ্যা আশঙ্কাই ওটা। আবার তাদের জীবন অবিচ্ছেদ আনন্দের একটানা স্রোতে ভাসতে থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আলফোঁস দোদে-র "সাফো" হইতে অনূদিত

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J 1806

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৫)

এই সকল শ্লোক হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে 'রাজন্য'রা ব্রাহ্মণের স্ত্রী কাড়িয়া নিত এবং তাহার গরুও কাটিয়া খাইয়া ফেলিত। এইজন্যই ব্রাহ্মণের এত কাতরোক্তি, এত অভিসম্পাত প্রদান। এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে ওয়েবার ও সিমার প্রভৃতি মনে করেন যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের সময় এইসব জোর-জুলুম 'রাজন্য'রা ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যবস্থাসমূহ আমরা উপরোক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে পাই না (১)। জগতের কোন দেশেই শাসকশ্রেণী নিজেদের ঘরের মেয়েদের তাঁবেদার পুরোহিতদের ভোগের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে নাই। ইহা মানবের মনস্তত্ত্ব বিরুদ্ধও বটে। ভারতে স্বাধীন ক্ষত্রিয়কুল সমূহের মধ্যেও পৌরহিত্যবাদ সত্ত্বেও উহা সম্ভব হয় নাই। ঈজিপ্তে ও বাবিলনে পুরোহিতশ্রেণীও এই প্রকারের দাবী উপস্থিত করে নাই।

এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মিটমাটের পর হইতে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শ্রেণীর কর্ম্ম জন্মগত হইতে লাগিল। ইহা রাজা ও অভিজাতশ্রেণী হইতে অধিকাংশ সভ্য লইয়া সংগঠিত হইত ; এবং ইহা পূর্ব্ব হইতেই কৃষি ও ব্যবসাজীবী স্বাধীন জনসাধারণ

১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, ওয়েবার, সিমার, গ্রিফিথ্ প্রভৃতি কেহই শ্লোকগুলির শাস্ত্রিজী প্রদত্ত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেন নাই। শাস্ত্রিজী দক্ষিণাপথবাসী। সেখানে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা নিজেদের কামলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নায়ার স্ত্রীলোকদের উপর যে জঘন্য ব্যবহার করে, উহা ঢাকিবার জন্যই কি বেদের এইসকল শ্লোকের এই উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়া বেদের দোহাই দিয়া নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের পাশব প্রবৃত্তির তিনি white-wash করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ?

হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই প্রকারে যোদ্ধৃশ্রেণী বা ক্ষত্রিয়শ্রেণী সংগঠিত হইয়া আর্য্যজাতির মধ্যে আর একটি স্তর সৃষ্টি হয়। যে সকল 'বিশ'-সংশ্লিষ্ট স্বাধীন জনসাধারণ ছিল তাহারা তৃতীয় বর্ণ—"বৈশ্য" শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হয়। এই বিশ জনসাধারণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীদ্বয় উদ্ভূত হয় এবং ইহারা একত্রিত হইয়াই জনসাধারণকে (বিশ) শোষণ করিত। এই উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্বার্থের পরিচয় "পুরোহিতদের দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়দের দৃঢ় কর" (বাজসনেয় ৫,২৭) শ্লোকে পাওয়া যায়। উপরোক্ত শ্রেণী দুইটি সমস্বার্থ সম্পন্ন হইয়া বিশের বংশধর বৈশ্যের নিকট হইতে সমস্ত অধিকার কাড়িয়া নিয়া উহাকে তৃতীয় শ্রেণী করিয়া নামাইয়া দেয়। এইসঙ্গে প্রাচীন "আর্য্য" নামটিরও অধঃপতন হয়। 'আর্য্য' অর্থে তৃতীয় শ্রেণী বা 'বৈশ্য' বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় "গ্রামাণী" পদ প্রাপ্ত বৈশ্যের চরম উন্নতির পরিচয় হইয়াছিল (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২,৫,৪,৪)। এই প্রকারে তিন শ্রেণীর বিবর্ত্তন হইয়া আমরা চতুর্থ ও শেষ শ্রেণীকে দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার এই শ্রেণীর ছিল, যদিচ ইহারা পদদলিত হইত—ইহাদিগকে 'শূদ্র' বলা হইত। 'শূদ্র' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত; যজুর্ব্বেদে প্রথমে এই শব্দটি পাওয়া যায়। শূদ্রকে দুঃখের (তাপ) দেবতার বংশে উৎপন্ন বলা হইয়াছে (বাজসনেয় ৩০,৫); তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহাকে যজ্ঞ করিতে অনুপযুক্ত বা অপারগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭,১,১,৬)। অনেকে অনুমান করেন, যেসব আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও রীতি গ্রহণ করে তাহারাই শূদ্র নামে পরিচিত হয়। কেহ কেহ বলেন, আদিম অধিবাসীদের একটি বড় কৌমের এই নাম ছিল। কারণ টলেমী তাঁহার ভারতীয় ভূগোলে (৬,২০) আজকালকার বেলুচিস্থানের যেখানে 'ব্রাহুয়ি' কৌম বাস করে সেখানে Sudroi নামে একটি বড় জাতি বাস করিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'ব্রাহুয়ি'গণ দ্রাবিড়ভাষী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ইহারা তখনও আর্য্যদের দ্বারা বিজিত হয় নাই। এই জাতির অন্যান্য লোকেরা বিজিতাবস্থায় আর্যীভূত হইয়া আর্য্যসমাজের 'শূদ্র' নামে নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টি করে (Vedic Index দ্রষ্টব্য)। কিন্তু টলেমীর বিবরণ আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর লিখিত হয়; তখন ভারতে চতুর্ব্বর্ণ

সৃষ্ট হইয়াছে; শূদ্র বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীটি তখন উদ্ভূত হইয়াছে। আবার জাতির একাংশের একটা লক্ষণ থেকে সমগ্র জাতির নামকরণ হওয়াও ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন প্রাচীন কালে টিউটন জাতি পূর্ব্ব-ইউরোপের কৌমগুলির লোক ধরিয়া রোমান সাম্রাজ্যে দাসরূপে বিক্রয় করিত; সেই কারণে সমগ্র পূর্ব্ব-ইউরোপের অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত Slav ও Serv বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এই প্রকারে 'শূদ্র' নামটির উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়, যদিচ ইহার কোন প্রমাণ নাই।

যখন ভারতীয় ও ইরাণী আর্য্য কৌমগুলি একত্রীভূত ছিল বা একত্রে বাস করিত, তখন তাহারা নিজেদের 'আর্য্য' (পুরাতন বক্রীয় 'আইরা', প্রাচীন ফার্সী 'আরিয়া') নামে পরিচয় দিত। এই কৌম সমূহের সভ্যেরা ও তাহাদের বংশধরেরা 'আর্য্য' অর্থাৎ 'বন্ধু' কৌমের লোক বলিয়া পরিচিত হইত। এই নাম গ্রহণ করিয়া বৈদিক কৌমগুলি ভারতীয় ইতিহাসে আবির্ভূত হয়। ব্রাহ্মণযুগে এই নামেই সমাজের উপরের স্তরের তিন শ্রেণী পরিচিত হইত। "আর্য্য এব ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা বৈশ্যো বা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮,১৬)"। ঋকবেদে প্রথমে 'আর্য্য' শব্দের বিশ্বাসী, দয়ালু বা ভাল প্রভৃতি অর্থ ছিল। যখন পুরোহিত ব্রাহ্মণের দল ও ভূম্যধিকারী ক্ষত্রিয়ের দল নিজদিগকে 'আর্য্য' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত তখন তাহাদের কথায়ই ধরা পড়ে যে তাহারা বৈশ্যশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বৈশ্যশ্রেণী ঐতিহাসিক যুগে পতিত হয়। বৈশ্যদের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। তাহাদিগের উপরের দুই শ্রেণীকে কর বা বলি দিতে হইত এবং তাহাদের দ্বারা খেয়াল মাফিক ব্যবহৃত (exploited) হইত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭,২৯)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪,৩,১০,৮) বলা হইয়াছে নবম স্তরে "শূদ্রারাইয়াউ"র (Sudra-ryau) স্থান। এই শব্দের অর্থ শূদ্র ও বৈশ্য বুঝায়। ইহা 'শূদ্র' এবং 'আর্য্যাউ' শব্দদ্বয়ের সন্ধিযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। মহীধরের মতে (বাজসনেয় ২৬,৭ টীকা) 'আর্য্য'ও 'বৈশ্য' শব্দের একই অর্থ। আর্য্যজাতির (race) একটি বিশিষ্ট অংশ হইতে বৈশ্য জাতির উৎপত্তি হয় নাই। পূর্ব্বে "বৈশ্য" অর্থে জাতির সকলকেই বুঝাইত (প্রাচীন 'বিশ্য'—অথর্ব্ব ৬,১৩,১; বাজসনেয় ১৮,৪৮)।

গ্রীকদের রচিত গ্রন্থসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে এই যুক্তির অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে। একদিকে মেগাস্থিনিস্ বলিতেছেন: "All the Indians are free, and not one of them is a slave....but the Indians do not use aliens as slaves and much less a countryman of their own" (McCrindle—Fragments XXVI. Ar. Ind. 10)। অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতবাসীই মুক্ত; তাহাদের মধ্যে একজনও গোলাম (দাস) নাই···ভারতীয়েরা বিদেশীদের গোলামের কার্য্যে লাগায় না, স্বদেশবাসীদের এই কার্য্যে কমই লাগায়। তাহা হইলে ভারতীয়দের একটি অংশকে গোলাম করিয়া 'শূদ্র' করা অথবা গোলামদের বংশধরদিগকে অধিকার-বিহীন করিয়া নিম্নস্তরে রাখিবার কথা উঠিতে পারে না।

এই Sudroi সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলিয়া গিয়াছেন, পারসিকেরা ভারতীয় Hydrakai-দের ভারাটিয়া সৈন্যরূপে ব্যবহার করিত (Strabo—XV 16—8)। এই সম্বন্ধে ম্যাকক্রিণ্ডেল বলেন—হাইড্রাকাইদেরই (Hydrakai) Oxydrakai বলা হয়। লাসেন তাহাদের সংস্কৃত "ক্ষুদ্রক" কৌমের সহিত এক বলিয়া মনে করেন। ইহাদিগকে Sydrakai, Syrakusai, Sabograe প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হইত (McCrindle—BK. IV; Fragments, XLVI P. 109)। আরিয়ান তাঁহার Anabasis নামক পুস্তকে Malloi ও Oxydrakai জাতিদ্বয়ের আলেকজাণ্ডারের নিকট অধীনতা (বশ্যতা) স্বীকার করিবার কথাও বলেন (Anabasis—Ch. XIV)। ইনি পরে আবার বলিতেছেন: "আলেকজাণ্ডার Sogdoi-দের রাজধানীতে গেলেন (Ch. XV)। ডিওডোরস সিকুলুস পরে বলিতেছেন—"তিনি (আলেকজাণ্ডার) Sodrai ও Massanoi-দের সহরে গেলেন (Ch. CII)"। ম্যাকক্রিণ্ডল বলেন—"Sogdoi ডিওডোরসের কাছে Sodrai আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনঃ তিনি Syrakousaiদের Oxydrakai বলিয়াছেন (P. 231.)। অন্যপক্ষে Q. Curtius Rufus এই জাতিদের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধবর্ণনাকালে বলেন:—"In the meantime one hurdred ambassadors came to the King from the two nations (Sudracae

and Malli.). They all rode in chariots and were men of uncommon stature and of a very dignified bearing. Their robes were of linen and embroidered with inwrought gold and purple. (Quoted in McCrindle P. 248. Ch. VII) ইহার অর্থ:—ইতিমধ্যে 'সুদ্রকে' ও 'মল্লি' জাতিদিগের নিকট হইতে একশত রাজপ্রতিনিধি রাজার নিকট আসে। তাহারা সকলেই রথারোহণে আগমন করে, তাহারা অসাধারণ শারীরিক দীর্ঘতাযুক্ত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন চেহারার লোক, তাহাদের পোষাক linen ও পারপল (purple) এবং উহা স্বর্ণখচিত ছিল।"

হিন্দুর শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের জাতিতাত্ত্বিক যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয়—ইহাই তাহার ভিত্তি। আমরা ইহাতে দেখিতে পাই—গ্রীক ভাষায় লিখিত Oxydrakai, লাটিনে Sudrai ও Sudracae পরিবর্ত্তিত হইয়া অধুনা টলেমীর লিখিত বানানে Sudroi হইয়াছে! আসলে পাঞ্জাবের 'মালব' ও 'ক্ষুদ্রক' নামক দুইটি ক্ষত্রিয় জাতির কথা এখানে বিবেচিত হইতেছে। মহাভারতের রাজসূয়পর্ব্বে ক্ষুদ্রক কৌমকে উত্তম ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রক' শব্দের Phonetic পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া Vedic Index পুস্তকে Sudroi শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে Sudroi নামক কোন কৌমের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয় নাই। রুফস Sudracae-দের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগকে পতিত শূদ্র বলিয়া ধারণা হয় কি? উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে দিয়া নিজেদের hypothesis প্রমাণ করিবার জন্য "ক্ষুদ্রক" শব্দের বর্ত্তমান রূপ Sudroi অর্থাৎ ইংরেজী Sudras শব্দের উৎপত্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

ইদানীং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'শূদ্র' শব্দের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন (The Indian Antiquary. Vol. LI. P. 922)। তিনি সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' (Ksudra) হইতে 'শূদ্র' (Sudra) শব্দের উৎপত্তি বলিয়া অনুমান করেন। Phonetic বিজ্ঞান অনুযায়ী ইহার সত্যতা ভাষাতত্ত্ববিদগণই নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু সংস্কৃত "ক্ষ" যদি কালক্রমে "শূ"-তে পরিণত হয় তাহা হইলে 'ক্ষত্রিয়' বা 'ক্ষত্র' শব্দের 'ক্ষ' কেন সেইপ্রকারে

পরিবর্ত্তিত হইবে না ? কিন্তু আমরা পালিতে ইহার পরিবর্ত্তে 'ক্ষত্তিয়' এবং হিন্দিতে 'ছত্রি' শব্দ পাইয়া থাকি। কোন কোন সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিতের মুখে লেখক শুনিয়াছেন যে সংস্কৃত 'ক্ষ'-র উচ্চারণ হইতেছে—ক্ষ=ক+ষ সেইজন্য 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে Sudra শব্দের উৎপত্তি হইলে উহার বানান হইবে "ষূদ্র"। এই পণ্ডিতেরা বলেন যে "ক্ষ" হইতে "শ"-এর উৎপত্তি হইবার কোন নজীর সংস্কৃত সাহিত্যে নাই ; বরং "ক্ষ" হইতে পালি ও প্রাকৃতের মধ্য দিয়া "ছ"-এর উৎপত্তির প্রমাণ আছে : যথা 'ক্ষত্রিয়' হইতে হালের 'ছত্রি'। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বৈদিক ভাষায় তিন প্রকারের "S" এই একই প্রকারে উচ্চারিত হওয়ার নজীর আছে। এই বিষয়ে আরও ফোটতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। সংস্কৃত 'ক্ষ'=গ্রীক 'X" ; সেইজন্য 'ক্ষুদ্রক' শব্দ গ্রীক বহুবচনে Oxydrakai (আসলে Xudrokoi) হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু 'ক্ষুদ্র'—অতএব 'শূদ্র', এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা রাষ্ট্রে ও সমাজে অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীকে তাপের অর্থাৎ শোচনার সন্তান,—অতএব 'শূদ্র'—এই ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। "ক্ষত্র" প্রভৃতি বর্ণের নাম যখন রূপক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বলা হয়, "শূদ্র" শব্দটিও তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব নয়। শূদ্রেরা যে আদিম অধিবাসীর বংশধর তাহার কোন প্রমাণ নাই (২)। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার আর্য্যজাতীয় লোক ছিলেন (পুরাণ সমূহে উল্লিখিত আছে যে ক্ষত্রিয় প্রসাধ, তাঁহার গুরুর গো-হত্যার পাপের জন্য তাঁহার শাপে শূদ্র হইয়াছিলেন (ব্রহ্মাণ্ড ৭,৪৯ ; হরিবংশ ১১,৬৫৯ ; মৎস্য ১২,২৫ ; অগ্নি ২৭২,১৪)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১,১,৪,৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাদের সহিত রথকারদের একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১,১,৯) ইহাদিগকে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে। আবার বাজসনেয় সংহিতা (৩০,৬,৭) এবং শতপথ

২। নরতত্ত্ববিদ্‌দের তথাকথিত অনার্য্যের লক্ষণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং শূদ্রের মধ্যেও আর্য্যের লক্ষণ পাওয়া যায় (Vide Dr. B. N. Datta—"Das Indische Kasten System" in Anthrops, 1925 ; Thurston—"Tribes and Castes of South India" ; also Vide Dr. B. N. Datta—"Races of India," Calcutta University Publication. Risley—Peoples of India দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণের (১৩,৪,২,১৭) রথকার ও কর্ম্মকারদের সম্মানজনকভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয় শারীরিক শ্রম ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই জাতিদ্বয়কে সমাজের নিম্নস্তরে অবনমিত করা হয়। এতদ্বারা বর্ত্তমান ইউরোপীয় শ্রেণীবিভাগের অঁচ পাওয়া যায় (৩)। এই প্রকারে 'তক্ষণ', 'চর্ম্মনী (tanner), তাঁতি এবং অন্যান্যগণ যাহাদিগকে ঋকবেদে সম্মানজনক বৃত্তির (পেশার) লোক ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা পরবর্ত্তীযুগে পালি পুস্তক সমূহে 'শূদ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪)।

রাষ্ট্রের বাহিরে শূদ্রের নীচে আরও কতকগুলি শ্রেণী সৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে ব্রাত্য ও শ্রেণীহীন বা জাতি-বিহীন লোক বলা হইত। ব্রাত্যেরাও আর্য্য ছিল ; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই। সরস্বতীর পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত কৌমই এই নামযুক্ত হয়। বাজসনেয় সংহিতাতে পুরুষমেধ যজ্ঞকালে ব্রাত্যদের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩০,৮)। এতদ্বারা ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। এই প্রকারে মাগধজাতি (অথর্ব্ব ১৫,২,১ ; বাজসনেয় ২০,৫), পৌল্কস (বাজসনেয় ৩০,১৭), চণ্ডাল (বাজসনেয় ৩০,২১), শতরুদ্রিয়ে উল্লিখিত সঙ্করজাতিগুলিও (বাজসনেয় ১৬,২৬,২৭) গণ্য করা হইয়াছে ; পুনঃ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের বুদ্ধের শিষ্য—তজ্জন্য ব্রাত্য বলা হইয়াছে।

এইপ্রকারে ভারতীয় আর্য্য-রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়। অবশ্য এই স্তরভেদ একদিনে হয় নাই। বেদরচনার কাল প্রায় দুই হাজার বা ততোধিক বৎসর ব্যাপী ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন। যজুর্ব্বেদে সমাজের যে স্তর-ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন কৌমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বি-সহস্র বা ততোধিক কালে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য বিভিন্ন বেদসমূহে বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা বেদে পশুপালক কৌমাবস্থার কমুনিসমের (সাম্যবাদ) সংবাদ পাই না ; বরং ইহাতে রাজা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ অনুষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত হইতে দেখিতে

৩। Vedic Index—Vol. II. P. 266.

৪। Fick—"Sociale Gliederung"...Pp. 160, 210.

পাই। সিমার বলেন, (৫) "বেদ রচনার সময়ে বৈদিক কৌমগুলির বাল্যাবস্থার বিবরণ পাই না" (৬)।

আর্য্যদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তির (৭) একটা মোটামুটি সন্তবপর বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আরও একটু অনুসন্ধান করিব। ইতিপূর্ব্বে চারিশ্রেণীর উদ্ভবের আলোচনা প্রসঙ্গ হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে বৈদিক কৌমগুলির রাজাদের স্তুতিগায়কেরা (প্রাচীন জার্ম্মানদের minniesaenger-এর ন্যায়) নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত; পরে ইহারা বংশানুক্রমিকরূপে 'ব্রাহ্মণ' হয়। অবশেষে শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে প্রত্যেকের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া অজেয় এবং অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই ভাটেরাই কালক্রমে "ঋষি" বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিল। শাসকশ্রেণীকে অর্থাৎ রাজবংশীয় এবং অভিজাত বংশের লোকদিগকে 'রাজন্য' বলিত।

রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল রাজা। এই প্রথা সর্ব্বজনীন না হইলেও স্বাভাবিক ছিল। বৈদিকযুগে রাজপদ (Monarchy) মধ্যে মধ্যে বংশানুক্রমিক হইলেও (৮) কোন কোন স্থলে নির্ব্বাচিত হইত, কিন্তু এই বিষয়ে কোন

৫। Zimmer—Altindisches Leben : Preface VII.

৬। Winternitz বলেন বেদের প্রথম রচনার যুগ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর (History of Sanskrit Literature Vol. I. Winternitz); Jacobi বলেন, চারহাজার বৎসরের উপর।

৭। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে হিন্দুদের 'বর্ণ' শব্দের উৎপত্তি গাত্রবর্ণ হইতে আসে নাই। বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে এক একটি শ্রেণী এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের কাপড় বা পোষাক পরিধান করিয়া অপর শ্রেণী হইতে পৃথকীকৃত হইত (ইউরোপের মধ্যযুগে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল; পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে ব্রাহ্মণের বস্ত্র শ্বেত বর্ণের হইবে। আবার বিভিন্ন কুলও বিভিন্ন প্রকার বর্ণের কাপড় পরিধান করিত; যথা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কুলের বস্ত্রের বর্ণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মাথায় শিখার সংখ্যা (১-৫ পর্য্যন্ত!) দেখিয়া কুলের পরিচয় পাওয়া যাইত! স্মিথের মতে সংস্কৃত 'বর্ণ' শব্দের অর্থ—'Class,'—caste নয়। ফিকও এই মত পোষণ করেন।

৮—১৪। Vedic Index. Vol. II. P. 211, 213; 225; Hopkins—"India Old and New." P. 221; 225.

দৃঢ় নজীর নাই। কিন্তু রাজশক্তি সুনিশ্চিত ছিল না। রাজাদের বিতাড়ন এবং রাজপদ পুনঃপ্রাপ্তির প্রচেষ্টার নজীরও বেদে আছে (৯)। যুদ্ধ ও শান্তিরক্ষার জন্য জনগণ রাজার নিকট বৈশ্যতা স্বীকার করিত (১০)। ইহার পরিবর্ত্তে রাজা বিচারকের (Judge) কর্ম্ম করিত (১১)। রাজা তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করিত। স্থানীয় শাসন "গ্রামাণী" বা গ্রামের সর্দ্দারের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। তিনি হয়ত রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। রাজা সমস্ত জমির মালিক ছিল (১২), যদিচ কোন ব্যক্তি অথবা একটি একান্নভুক্ত পরিবারও (Joint-Family) জমির মালিক থাকিত (১৩)। ঋকবেদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথাও উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং সম্পত্তির সাধারণ নাম ছিল—'রেখনস্' (১৪)।

প্রথমত রাজা নিজের জন্য এবং জনগণের (প্রজার) জন্য দেবতার নিকট উপাসনা বা বলি প্রদান করিতে পারিত। কিন্তু পরে উক্ত ভার পুরোহিতদের হস্তে ন্যস্ত হয়, যদিচ দেবাপি আরতি সেনার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে প্রয়োজন হইলে রাজন্যবর্গ পুরোহিতের কার্য্যও করিত। পূর্ব্বে কৌমের সাধারণ লোক যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইত। ক্ষত্রিয় অর্থে প্রথমত অভিজাত শ্রেণীর লোক,—পরে এই শ্রেণীর মাহিয়ানাভুক যোদ্ধাদেরও (retainers) বুঝাইত। এই শ্রেণীবিভাগ ইতিহাসের সংহিতার যুগে আরম্ভ হইয়া ব্রাহ্মণযুগে পাকাপাকি হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এইস্থলে প্রশ্ন উঠে যে, এই শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠানটি ভারতের জমিতেই উদ্ভূত হইয়াছিল কিম্বা আর্য্যেরা অন্য কোথাও হইতে উহা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিত Senart বলেন (১৫) আর্য্যেরা উহা পার্শ্ব দেশ, অর্থাৎ যখন ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণীরা একত্র বাস করিত সেই সময় ইরাণীদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভেদ বর্ত্তমান ছিল, বৈদিক আর্য্যেরা তাহাই ইরাণ হইতে ভারতে আনয়ন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন—আবেস্তার পুরোহিতদের "অথরাবান" বা 'অথর্ব্বান" বলা হইত; যোদ্ধৃশ্রেণীকে 'রথেষ্ট্র' বলা হইত; তৎপর 'বিশ' ব্যবসায়ী জাতি ছিল। সর্ব্বশেষ হিউটি (Huiti) নামে একটি 'দাস' জাতি ছিল। এই শ্রেণীভেদটী ভারতের শ্রেণীভেদের সহিত মিলে। অথর্ব্ববেদের পুরোহিতদের 'অথর্ব্বান' বলা হইত

১৫। Senart—Caste in India.

এবং যোদ্ধৃবৃন্দকে ক্ষত্রিয় বলা হইত (উক্ত শব্দও পারস্যে প্রচলিত ছিল ; যেমন 'হোম ক্ষত্রিয়', দারায়ুসের পদবী—"ক্ষয়থিয়া ক্ষয়থিয়ানাম"), ব্যবসায়ী-গণ 'বিশ্' বলিয়া পরিচিত ছিল ; কেবল ভারতীয় দাসশ্রেণীর 'শূদ্র' বলিয়া নূতন নামকরণ হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের জোরে Senart উপরোল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত মত গৃহীত হয় নাই। আমাদের বোধ হয় এই মতের পশ্চাতে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে। পুরাকালে প্রাচ্য দেশসমূহের অনেকস্থলেই সমাজে চারিটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। এমন কি প্রাচীন এশিয়া মাইনরেও সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল (১৬)। আবার উত্তর ইউরোপের প্রাচীন টিউটন জাতির জনশ্রুতি বলে যে ঋগ্বেদতা তিন রকমের মানুষ সৃষ্টি করেন ; তাহারাই তিনটি শ্রেণী উদ্ভূত করে (১৭) ; পারস্যেও তাহাই ছিল। অবশ্য এইসকল দেশে জাতিবিভাগ (caste system) বিবর্ত্তিত হয় নাই ; ভারতে জাতিবিভাগ অভিব্যক্ত হইয়াছিল! এইস্থলেই পণ্ডিতগণের Senartর মত গ্রহণে আপত্তি। তাঁহারা এই কথা বিবেচনা করিতেছেন না যে, বেদে সংহিতার যুগে জাতিবিভাগ ছিল না,—উহা ব্রাহ্মণ-যুগে আরম্ভ হয়। অধুনা ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলেন—ভারতে জাতিবিভাগ হালের সৃষ্টি। সামশাস্ত্রী বলেন, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে জাতিভেদ প্রথা ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, অসবর্ণবিবাহবন্ধ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় (১৮)। "জাতিভেদ" সেই সময় হইতে আরম্ভ হয় বলিতে হইবে। যখন বিভিন্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহ (Connubium) ও আহারাদি (Commensality) বন্ধ হইয়া যায় তখন ঐ শ্রেণীগুলি (Class) জাতিতে (Caste) পরিণত হয়। ভারতীয় সমাজে এই কুর্ম্মাবস্থা হালের সৃষ্টি। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগসমূহে বিভিন্নবর্ণের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সেইজন্য বলিতে হইবে যে বৈদিক

১৬। Sir William Ramsay—Asianic Elements in Greek Culture.

১৭। Macculloch—The Mythology of All Races. Eddic. Vol. II. ; Bluntschli—The Theory of State দ্রষ্টব্য।

১৮। Shama Shastry—P. 40—41 ; Dr. R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India. P. 374.

যুগে এবম্প্রকারের জাতিভেদ ছিল না। বৈদিক আর্য্যরাও, সম্ভবতঃ, যেমন 'দস্যু' ও 'দাসের' connotation ইণ্ডো-ইরাণীয়ান সময়ের 'দহু' ও 'দহ' হইতে পাইয়াছিল, ইহাও অসম্ভব নহে যে পুরোহিত (অথর্ব্বান), রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধকারী 'ক্ষত্রিয়', 'বিশ' শব্দগুলিও ইরাণী প্রতিশব্দকে connote করে, কেবল ভারতে 'শূদ্র' শব্দ সৃষ্ট হয়। আসল কথা এই যে শ্রেণীভেদের বীজ আর্য্যদিগের আদিম অবস্থা হইতেই ছিল ; ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরে উহা জাতিভেদে পরিবর্ত্তিত হয়।

উপরোক্ত তিন শ্রেণী শূদ্রশ্রেণী হইতে বিভিন্ন আচরণের ছিল। যে-গরুর দুগ্ধ অগ্নিহোত্র কর্ম্মে ব্যবহৃত হইবে, সেই গরুকে শূদ্র দোহন করিতে পারিবে না (কথক সংহিতা ৩১,২)। আবার কতকগুলি শ্লোকে শূদ্রকে সোমযজ্ঞে স্থান দেওয়া হইতেছে (শতপথ ব্রাহ্মণ ১,১,৪,১২ ; ৫,৫,৪,৯)। রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল 'বিশ' ; কিন্তু রাষ্ট্রের যথার্থ শক্তি রাজা, তাহার অভিজাত শ্রেণীর সভ্যবৃন্দ ও তাহাদের তাবেদারদের হাতে ছিল ; ইহারাই ক্ষত্রিয়শ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল। অভিজাতশ্রেণী জনসাধারণের নিকট হইতে খাজনা স্বরূপ মাল গ্রহণ (revenue in kind) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অভিজাতবর্গ নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্য 'গ্রাম' পাইত। এইগুলি হয় প্রজা অথবা দাসদের দ্বারা চাষ করান হইত। এই সময়কার রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ছিল। সাধারণ লোক কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিত ; তাহাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজা ও অভিজাতবর্গকে নজর (tribute) দিত। যুদ্ধ-কালে জনসাধারণ অভিজাতদের সহিত সহযোগিতা করিত। প্রথমেই শ্রেণী সমূহের কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিভিন্ন হয় নাই। পরে ব্রাহ্মণ-যুগে উহা ক্রমশঃ পৃথক ও বিভিন্ন হইতে থাকে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য-বাদের গোড়া পত্তনের ব্যাখ্যা আছে)। এই সময় বৈশ্যগণ অপরের করদাতৃ ছিল ; করগ্রহীতার খামখেয়াল অনুযায়ী তাহাদের উপর অত্যাচার চলিত। শূদ্র অপরের দাস ছিল। প্রভু স্বীয় খেয়াল ও মর্জ্জিমাফিক তাহার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারিত ; এমন কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পারিত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭,২৯,৪)। কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিত ; বৈশ্য রাজার নীচে ছিল—তাহাকে রাজা বিনাকারণে অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্গত

কারণ না দর্শাইয়াই তাহার (রাজার) জমি হইতে বিতাড়িত করিতে পারিত (১৯)। কিন্তু বৈশ্যকে রাজা বিনাবিচারে মারিতে বা জখম করিতে পারিত না। অন্যপক্ষে শূদ্র রাজা বা অভিজাত শ্রেণীর নিকট হইতে জীবনের ও সম্পত্তির অধিকার পাইত না। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত শ্লোকটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার বাহাদুরি বর্ণিত হইয়াছে (২০)।

এই সকল বর্ণনা ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বলিয়া আমরা এগুলিকে পুরাপুরি দাম দিতে পারি না। পুরোহিতেরা নিজেদের ক্ষমতার আদর্শ এবং মধ্যদেশে যে-কতকটা ক্ষমতা পাইয়াছিল তাহাই ধর্ম্মপুস্তক সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন পুস্তক সমূহে সামাজিক অবস্থার ভিন্ন দিক প্রদর্শন করিয়া তাহাতে পুরোহিতদিগকে খুব ছোট করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার মহাকাব্যে ব্রাহ্মণদের কলমের কাটকুট (censorship) থাকা সত্ত্বেও রাজন্যবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (২১)।

বেদে "ছুৎমার্গের" কথা পাওয়া যায় না। নিম্নশ্রেণীর হাত হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেয়, এমন দৃষ্টান্ত বেদে নাই। কিন্তু বহুপরে রচিত ছান্দোগ্য উপনিষদ মধ্যে উহার উল্লেখ আছে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ঋষিবংশ এবং বংশের

১৯। Hopkins—India Old and New, Pp. 222—223.

২০। Vedic Index Vol. II., p. 256.

২১। Hopkins—Journal of American Oriental Society P. 13, 984. পার্জিটারের মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিদের জনশ্রুতির (tradition) মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতিগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়বস্তু নিয়া সৃষ্ট হইয়াছে—রাজনীতিক ও জাগতিক ব্যাপারের জনশ্রুতি আলাদা ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের জনশ্রুতি রাষ্ট্রীয় ও জাগতিক ব্যাপার নিয়াই সৃষ্ট হয়। একটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদল ছিল যাহারা এইগুলি পুরাণে লিপিবদ্ধ করে। এই দুইপ্রকার জনশ্রুতির মধ্যে আবার রেষারেষিও বেশ বিদ্যমান ছিল। যে সকল রাজগণের কথা ঋকবেদে আছে—তাহারা ক্ষত্রিয় জনশ্রুতি সম্বন্ধে অজ্ঞাত! পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করণের কাহিনীটি পুরাণে ভিন্নভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তাহাতে (পুরাণের বর্ণনায়) যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু নিঃক্ষত্রিয় করণের কোন কথাই নাই। ইনি বলেন, বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদের ভাবানুযায়ী পুরাকালের সংবাদ রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় জনশ্রুতিতে ধর্ম্মভাবানুযায়ী প্রাচীন ভারতের এবং উহার রাজনীতিক অবস্থার সংবাদ আছে। (৭-২)

বিশুদ্ধতার উপর নজর রাখা হইত। ব্রাহ্মণেরা সকলেই খাঁটিরক্ত বিশিষ্ট ছিল না। দাসীপুত্র কবষ আইলুস ও উনিজ দাসীপুত্র কক্ষিবত এবং বাংস্য ঋষি যাহাকে শূদ্রপুত্র বলিয়া অনুমান (সন্দেহ) করা হইয়াছিল—তাহারাই এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। কথঋষির সম্বন্ধেও উক্ত প্রকারের অপবাদ বা দুর্নাম আছে (তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন); যে পণ্ডিত হইত সে-ই ব্রাহ্মণ হইত। গোত্র-বিহীন জবলানন্দন সত্যকাম ইহার দৃষ্টান্ত। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে শ্রেণীর বংশগত পদ্ধতি সম্পর্কে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। যজুর্ব্বেদে আর্য্যপুরুষ ও শূদ্রকন্যার অবৈধ প্রেম-বন্ধন এবং উহার বিপরীত ঘটনা, অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ ও আর্য্যকন্যার অবৈধ প্রণয়ও স্বীকৃত হইয়াছে (২২)। ইহা অসম্ভব নয় যে যদি অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, বৈধ সম্বন্ধও হইত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৪,১১,১৭) এবং ঋকবেদে ১,১২৫) দাসী উষিজের পুত্র কক্ষিবতের বিবাহ ব্যাপার বর্ণিত আছে। উপনিষদ পাঠে আরও এক সংবাদ অবগত হওয়া যায় যে উহাতে ক্ষত্রিয়গণের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্যা" যে রাজাদের মধ্যে ছিল তাহা উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রাহ্মণের চাইতে ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষতা বর্ণিত হইয়াছে (১,৪,১১)। ডয়সেন, গার্ব্বে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, "ব্রহ্মবিদ্যা" ক্ষত্রিয়দের (জনক, অজাতশত্রু, প্রবাহন, জৈবালী, সিলক সাটাবত্য, শয়কি টায়নদাল্‌ভ্য) দ্বারাই উদ্ভূত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শূদ্রদের মধ্যে আর্য্যজাতীয় লোক থাকা অসম্ভব নহে। শূদ্রের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা সঠিক বলা যায় না। সকল শূদ্রই যে দাস বা গোলাম ছিল তাহাও সম্ভব নয়; তবে ইহাদের একাংশ গ্রীক্ হেলট (Helot), একাংশ পেরিকয় (Perikoi) এবং একাংশ ইউরোপের মধ্যযুগের সার্ফ (Serf) শ্রেণীগুলির ন্যায় ছিল কি? ব্রাহ্মণদিগের লিখিত বর্ণনায় তাহারা নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের প্রথমযুগে ধনী শূদ্রদের কথা উল্লেখ দেখা যায় (মৈত্রায়নী সংহিতা

২২। বাজসনেয় সংহিতায় (২৩,৩১) এই প্রকার ব্যাপার স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শতপথ সংহিতাতে নিঃসন্দেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা অস্বীকার করা হইয়াছে (See Vedic Index Vol. I. on Sudra)।

৪,২,৭,১০ ; পঞ্চবিংশ সংহিতা (৬,৭,১)। কোন কোন রাজাদের মন্ত্রী শূদ্রও হইত (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫,৩,২২)। আইন সম্বন্ধীয় পুস্তকে শূদ্ররাজাদের কথা উল্লিখিত আছে (মনু ৪,৬১ ; বিষ্ণুসংহিতা ৭১,৬৪) (২৩)। শূদ্র ও আর্য্যের বিরুদ্ধে পাপের কথা (কথক সংহিতা ২৮,৫ ; তৈত্তিরীয় ১,৮,৩,১০ প্রভৃতি), শূদ্র এবং অন্যজাতি সমূহের গৌরবের জন্য প্রার্থনাও উল্লিখিত আছে (তৈত্তিরীয় ৫,৭,৬,৪ ; কথক ৬০,১৩ প্রভৃতি)। আর্য্যের ন্যায় শূদ্রও ম্যাজিক (তুকতাকরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে পারিত। শূদ্রেরও আর্য্যের নিকট প্রিয় হইবার ইচ্ছাও বেদে প্রকাশ করা হইয়াছে (অথর্ব্ব ১৯,৩১,৮,৬২,১)। বেদে শূদ্র ও আয়োগব রাজার কথা উল্লেখ আছে (ছান্দোগ্যপনিষদে রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র, শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩,৫,৪,৬) রাজা মরুও অভিক্ষিতকে আয়োগব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে)। এইসকল শ্লোক হইতে মনে হয় না যে তাহারা নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এইস্থলে আর একটি কথা উঠে—শূদ্র যদি 'দাস' ছিল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'স্তি' এবং 'উপস্তি' কোথায় গেল ? তাহারাও কি শূদ্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া যায় ?

ঋকবেদের পুরুষসূক্ত (২৪) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গৃহীত হইলে, যজুর্ব্বেদে 'শূদ্র' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় যুগের বহুপরে দক্ষিণাপথের পণ্ডিত বাদরায়ণ (২৫) ইহার অর্থ করিয়াছেন—"যে শোচনা করে সে শূদ্র"। ওয়েবার লুডভিগ, ফিক্ প্রভৃতি বলেন—এই শব্দটি প্রথমত আর্য্য অভিযানের বিপক্ষতাচরণকারী একটি বড় কৌমের নাম ছিল (২৬) ; পরাজিতেরা পরে

২৩। Die Koenigliche Gewalt—P. 8. Fick.—Die Sociale Gliderung P. 83

২৪। Max Muller—Sanskrit Literature, p. 570. Muir—Sanskrit Texts, I[2], 7-15. Weber—Indische Studien 9, 3. Colebrooks—"Essays", 1,309. Arnold—Vedic Metre, p. 167.

২৫। বেদান্তসূত্র ১১৩,৩৮ বাদরায়ণের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬। Weber—Ind. Stud. 18,85,255 ; Ludwig—Translation of the Rig Veda—3,212. Fick—Die Sociale Gliederung, p 201—202 দ্রষ্টব্য।

এই নামে পরিচিত হয়। ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে 'শূদ্র' শব্দটীর অর্থ এখনও অজ্ঞাত (অনির্দ্ধারিত) রহিয়াছে।

এইস্থলে বক্তব্য যে আমরা এখানে 'আর্য্য' অর্থে সংস্কৃত ভাষাভাষী বৈদিক কৌমগুলিকে বুঝিয়া থাকি। আদিম অধিবাসীগণ যে বিজিত হইয়া দাসত্ব (Serfdom) প্রাপ্ত হইয়া "শূদ্র" নাম ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আবার আর্য্যনামধারী কৌমগুলি যে একটা অমিশ্রিত জাতি ছিল সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মার্শাল বলিতেছেন—বিগত চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বৈদিক যুগেরও বহু পূর্ব্ব হইতেই পাঞ্জাবের অধিবাসীরা মিশ্রিত রক্তের লোক ছিল বলিয়া নরতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই মিশ্রণের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় মূলজাতীয় লোকের অস্তিত্ব আছে বলিয়া কোন কোন নরতত্ত্ববিৎ বলিতেছেন। আইকষ্টেডট পাঞ্জাবী শিখদিগকেও ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত বলেন। এই জাতি মলিন-শ্বেত বর্ণের অথবা Brown বর্ণের লোক। কেহ কেহ তথাকথিত আরমেনীয় ন্যায় (Armenoid) মূলজাতির লক্ষণবিশিষ্ট লোক পাঞ্জাবে আছে বলিয়া অনুমান করেন। ইহারাও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট জাতি। প্যান-জর্ম্মানিষ্টদের মতে খাঁটি আর্য্যজাতি নর্ডিক মূলজাতীয় লোক ; এই তথাকথিত জাতির কোন চিহ্ন মার্শাল সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন মধ্যে পান নাই। সেইজন্য তিনি বলেন—বৈদিকযুগে এই জাতি ভারতে আসিয়া পূর্ব্ব অধিবাসীদের জয় করিয়া তাহাদের (বিজিতদের) সভ্যতা ধ্বংস করে। যদি উজ্জ্বল-শ্বেত (blond) জাতীয় আর্য্যেরা আসিয়া মলিন-শ্বেত (dark-white) বর্ণের লোকদের জয় করিয়া তাহাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিয়া থাকে এবং পরে এই দাসেরাই 'শূদ্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে শূদ্রেরাও তথাকথিত ককেসীয় (Caucasian) মূলজাতীয় শ্বেতকায় জাতির লোক বলিয়া গণ্য হইবে। আর ইহারা যদি নর্ডিকজাতীয় লোকেদের নিকট হইতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া 'দাস' বা "শূদ্রে" পরিণত হয় (যেমন গ্রীসের পেরিকয় ও হেলট বা জার্ম্মানীর সার্ফ) তাহা হইলে এই শ্বেতকায় অধীনস্থ জাতিদের কটাক্ষ করিয়া কি প্রকারে "দাসবর্ণ" কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বেদে আখ্যাত হয় ? বেদের জনশ্রুতির সহিত এইস্থলে বিজ্ঞানের বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এইজন্যই আমরা বিভিন্ন জাতির বর্ণকে পেশাজনিত রূপক বলিয়া

অনুমান করি। সংস্কৃত সাহিত্যেও এবম্বিধ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে চারিবর্ণ হিসাবে ব্লুমেনব্যাখের চারি মূলজাতি বুঝা হয় নাই। হালে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, "বর্ণ" হয়ত প্রত্যেক শ্রেণীর পরিধেয় বস্ত্রের রং-এর বিভিন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে (২৭)। যদি অনিশ্চিত নরতাত্ত্বিক তর্ক বাদ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের 'চারিবর্ণ'কে আমরা রূপক বলিয়াই গ্রহণ করি (শুক্রনীতি ৪,৩১২-৩১৯) এবং সমাজে ধর্ম্মানুযায়ী শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ধার্য্য করি, তবে নিকৃষ্টপেশা অবলম্বনকারী লোকেরা শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইত এবং তাহারা উপরের স্তরের শ্রেণীসমূহ অপেক্ষা অনেক অধিক অধিকার ও সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইত।

আইনের বিচার

আইনের বিচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অথর্ব্ববেদে (১-৬) অগ্নি-পরীক্ষার (Fire-ordeal) কথা পাই। পাশ্চাত্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যেমন 'Wer-geld' প্রথা ছিল, ভারতেও বৈদিকযুগে তাহা প্রচলিত ছিল। বেদের সংহিতার শেষকালে এবং ব্রাহ্মণকালে "বৈর" ও "বৈরদেয়" প্রথার উল্লেখ আছে। ঋকবেদে ইহার মূল্য একশত গাভী বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। কারণ বৈরী হত্যার সাজার মূল্য "শত" (শতদেয়); ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৬,৭১) শুনঃশেপের সময় একশত গাভী "বৈরদেয়" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে আবার "শতদেয়" শব্দ পাওয়া যায়। একজন মানুষ খুন করার সাজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় সাধারণ জনমত ও রাজশক্তি বৈদিকযুগে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই "শতদেয়" প্রথায় কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন "বৈরদেয়" আইনপদ্ধতির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭। Vincent Smith—Ancient and Hindu India, p. 36.

ভাব, রস ও রূপ

১

মানুষের সম্পর্কে হৃদয় কথাটার ব্যবহার আমরা করে থাকি। এটা আমাদের সত্তার সেই অংশ যাকে আমরা সকল সময়ে নিজের মধ্যে সচল বা তরঙ্গিত অবস্থায় অনুভব করি, যেমন কবি বলেছেন "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে।" হর্ষ, ভয়, হিংসা, বিস্ময়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতি কোন না কোন প্রভাব সব সময় আমাদের আশ্রয় ক'রে থাকে, আর ভেবে দেখলেই মনে হবে যে সে সময়ে আমাদের অন্তরে বা হৃদয়ে যেন একটা গতিরোধ জন্মায়। যখন মনে হয় যে হৃদয় শান্ত, নিস্তরঙ্গ, কোন বিশেষ প্রভাবে উত্তেজিত নয়, তখনও একটা মৃদু উদ্বেলতা যেন থাকেই। অর্থাৎ আমরা দেখছি যে ক্ষীণ কিম্বা বেগবান কোন না কোন প্রভাব হৃদয়কে সকল সময়ে আন্দোলিত করে রাখে। হৃদয়ের এই সর্ব্বকালীন গতিচাঞ্চল্য বা বেগই তার মূলধর্ম্ম। কাব্যের প্রথম পরিচয় হ'ল ভাষার মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের এই মূলধর্ম্মকে প্রকাশ করা; অর্থাৎ তার সর্ব্বকালীন বেগবোধকে ভাষার সাহায্যে অপরের মধ্যে সঞ্চার করা। হৃদয়ের বেগবোধকে এক কথায় বলা হয়ে থাকে আবেগ বা ভাব। কাব্যকে তাই অন্য কথায় বর্ণনা করা যায় ভাষার মধ্যে আবেগ বা ভাবের প্রকাশ ব'লে।

কাব্য কিন্তু আবেগের একটা বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ। সে অবস্থাটা ঘটে আবেগকে ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টার ফলেই। ভাষায় প্রকাশের অর্থ হ'ল কাব্যের শ্রোতা বা পাঠক থাকবে। শ্রোতা কেন কবিতা শুনবে বা পাঠক কেন পড়বে? কবিতার অন্তর্গত আবেগ নিজের মধ্যে অনুভব করবে ব'লে। আয়াস ক'রে সে অপরের আবেগ কেন নিজের মধ্যে অনুভব করতে যাবে? হয় তার স্থূলজীবনের কোন প্রয়োজন সাধন করবে ব'লে, কিম্বা চিত্তবিনোদনের জন্যে। ভাষায় আবেগের সেই প্রকাশই কাব্য চিত্তকে যা বিনোদিত করে। বিনোদন করার অর্থ হ'ল প্রবল বা উচ্ছ্বসিত হর্ষের উত্তেজনা উৎপাদন করা,

কিম্বা মৃদু বা চাপা অবস্থায় হ'লে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সখ্য আর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে অন্তরকে তৃপ্ত করা; আলঙ্কারিক বা দার্শনিকের ভাষায় বলতে গেলে, আনন্দ দেওয়া। কাব্যের এই আনন্দ সম্পাদন করবার ক্ষমতা তার মূল পরিচয়। এই আনন্দধর্ম্ম ধারণ করাতেই কাব্যের আবেগ সেই প্রাথমিক আবেগ বা হৃদয়ের বেগবোধ থেকে ভিন্ন যেটা কবির মনে কাব্য রচনার উদ্দীপনা যুগিয়েছে। যেমন শোকের প্রভাবে যে হৃদয়চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সেটা যদি ভাষার মধ্যেও শোকভাবেই পাঠক বা শ্রোতাকে স্পর্শ করে তাহ'লে তার কষ্টই হবে। ট্র্যাজেডী কাব্য তাহ'লে লোকরঞ্জিনী হ'তে পারবে না। শোককাব্যকে কাব্য হ'তে হ'লে শোকের কাহিনী বহন ক'রেও তার অন্তঃস্থিত আবেগকে এমন হ'তে হবে যে তার স্পর্শে পাঠকের মন আনন্দলাভ করে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই আনন্দধর্ম্মের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে স্থূলজগতে আমরা আমাদের জীবনে হর্ষ, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল আবেগ বা ভাবের প্রভাব অনুভব করি, শিল্প জগতে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য আর রূপতৃষ্ণার জগতে, সেই সকল আবেগ বা ভাবের প্রতিরূপ আছে এই রকম ধারণা করা যায়, যাঁদের উৎপত্তি সংস্কার আর স্মৃতিতে। এই প্রতিরূপ বা ভাবের ধারণাগত প্রতিনিধিরা নিজস্ব লৌকিক ভাব বা আবেগরাজির সংস্পর্শ লাভ করলে একটা চঞ্চল অবস্থায় আবির্ভূত হয়ে একটা নিবৃত্তি বা শান্তি খোঁজে। এই নিবৃত্তি, শান্তি বা বিরামই (resolution) প্রকৃতপক্ষে আনন্দের অবস্থা বা খুসীর বোধ।

সংস্কার আর স্মৃতির ক্ষেত্রে লৌকিক জগতের ভাব আর আবেগরাজির ক্রিয়ায় যে বিরাম বা তৃপ্তিবাসনা ধরা থাকে সেটা হয়ত অন্তরের কোন একটা গূঢ় স্তরে। ক্রয়েডী বিশ্লেষণে নির্দ্দেশ পাওয়া যায় যে রূপজগতের তৃপ্তিবাসনার অবস্থান আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা আদিম গূঢ় অংশে যার ওপর কালের কোন প্রভাব নেই, সজ্ঞান বিচারবোধের যে আশ্রয় নেয় না, এবং প্রথম প্রথম স্থূল শারীরিক পদ্ধতিরাজি থেকেই যে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু পরে ক্রমশঃ ধারণালোকে সঞ্চারিত হয়ে সেইখানেই বিস্তার লাভ করেছে।

লৌকিক ভাব বা আবেগের সংস্পর্শে যখন অন্তরের প্রতিরূপ ভাব আর আবেগ-বাসনারাজি তৃপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ আনন্দের অবস্থার উৎপত্তি হয়,

তখন অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয়ে থাকে রসের সৃষ্টি হয়েছে। রসের সৃষ্টি বলা হ'ল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "রস" ব'লে কোন স্বতন্ত্র শিল্প-গুণের সঞ্চার হয়নি। ভাব বা আবেগের ক্রিয়ার অবস্থায় আমাদের অনুভূতি যে আস্বাদনের কাযটা করতে থাকে সেই আস্বাদনের অবস্থাটাই রসের অবস্থা। রসের সৃষ্টির চেয়ে রসের জাগরণ কথাটাই ঠিক। উপলব্ধি থেকেই বুঝবো যে রসের উপলব্ধি। রসের অবস্থার উদ্রেককারী আবেগ আর ভাবের প্রকারভেদ অনুযায়ী রসেরও প্রকারভেদ আছে। শোকাবেগ বা শোকভাব প্রসূত যে তৃপ্তি বা রস তার নাম করুণ রস; ক্রোধভাব প্রসূত রসের নাম রৌদ্ররস, উৎসাহের বীর, বিস্ময়ের অদ্ভুত প্রভৃতি। রস কথাটি ব্যবহার করলে কাব্যকে আরো সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় ভাষার মধ্যে রসের প্রকাশ ব'লে। সংস্কৃতে তাই কাব্যের এক পরিভাষা হ'ল "রসাত্মক বাক্য"।

ভাষার মধ্যে রসের প্রকাশ কথাটার আর একটু তাৎপর্য্য আছে যা থেকে কাব্যবিচারে "রূপ" কথাটির ব্যবহার বুঝতে পারা যায়। এ বিষয়ে কিছু বলবার পূর্ব্বে ভাষা সম্বন্ধে দুটো একটা কথা বলতে হবে।

নবজাত শিশু বা বানর অথবা বিড়ালকে আমরা দেখি যে তারা বিশেষ বিশেষ ধরণে শব্দ ক'রে সেই অবস্থাপ্রসূত ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করে। এই নানা অবস্থার মধ্যে বাড়তে বাড়তে আদিম মানবশিশু দৃশ্যজগতে বিভিন্ন বস্তু আর কাযের সঙ্গে পরিচিত হ'তে থাকে, আর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সকল ভাবধারার দৈনিক জীবনে পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে সেগুলিকে নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিরাজির সাহায্যে প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। এই ধ্বনির নির্ব্বাচন হয়ত ভাব, আয়তন, বর্ণ আর গতিসূচক নানা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আর আশ্লেষে হয়। ক্রমশঃ স্মৃতির সাহায্যে বস্তু আর কার্য্যের অবর্ত্তমানেও শুধু ভাবের নির্দ্দেশেই সেই ভাবপ্রকাশক ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহার চলে; অর্থাৎ শব্দবিশেষ প্রকাশিত ভাবের পিছনে বস্তুবিশেষ বা কার্য্যবিশেষের সংজ্ঞাতে পর্য্যবসিত হ'ল। এই রকমে নামকরণের মূলে তাহ'লে রইলো দুটো জিনিষ—বস্তু বা কার্য্য বিশেষের একটা দৃষ্টি-প্রতিগত চিত্রমূল্য আর তার একটা আবেগ-উদ্রেজক মূল্য। অর্থাৎ ভাষার পরিণতিতে শব্দরাজির একটা ইন্দ্রিয়গত (sensory) ভিত্তি রয়ে গেল। এমন কি যে সকল শব্দ তাদের প্রাথমিক অর্থ পরিবর্ত্তন ক'রে

নতুন অর্থ লাভ করলে তাদের মূলেও পুরাতন ভাব আর ছবির অংশ, ভগ্নাংশ থেকে গেল। কালধর্ম্মে আর সামাজিক বিবর্ত্তনে এই সকল মূল্য নির্দ্ধারণ ঘটলো। অতএব মানুষ যখন ভাষায় অর্থ প্রকাশ করল তখন সে অর্থের আর তার প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা ঐতিহাসিক আর সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি রইল। সে যখন চিন্তা করল তখন সেটা ভাষার আশ্রয়ে করল ব'লে (যেমন মানুষ ভাষাতে স্বপ্ন দেখে), সে চিন্তাধারার মূলেও তার স্বাধীন বিচারের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঐতিহ্যগত আর সামাজিক নিরূপণ রইল।

ভাষা সম্বন্ধে এই সকল তথ্য কাব্যবিচারে প্রয়োগ করা যাক। কাব্যকে তাহ'লে ভাষার মধ্যে ভাব বা আবেগের চিত্তরঞ্জিনী প্রকাশ বলার অর্থ হবে এই যে সে প্রকাশে এমন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যার বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ (অর্থাৎ কথাসমষ্টি) পূর্ব্বে থেকেই বিভিন্ন আবেগ আর চিত্রের সঙ্কেত বহন ক'রে আসছে। তাহ'লে কোন কবিতার অন্তর্গত মূলভাব বা আবেগের ব্যঞ্জনায় যখন কোন বিশেষ কথা-সমষ্টি ব্যবহার করা হবে তার তাৎপর্য্য হবে এই যে সে কথা-সমষ্টির মধ্যে যে ক্ষুদ্রতর, বিশৃঙ্খল, স্থানীয় ভাব আর চিত্রের সম্ভার আর ইঙ্গিত ধরা আছে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে। আর এমন ভাবে যুক্ত হবে যাতে পাশাপাশি অসম্বদ্ধ ভাবে না থেকে একটা অখণ্ড আবেগ-মূল্যে সমগ্রতা লাভ করে যেহেতু আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাবে যুক্ত হ'লে তার প্রভাব মনে একটা টানা-হেঁচড়া গোছের বিভ্রমই জাগাবে, তৃপ্তি দেবে না। বিভিন্ন আবেগ-প্রভাব আর চিত্রের আভাস এই ভাবে সমন্বিত হয়ে সংখ্যামূলক যোগফলের অতিরিক্ত একটা রস-প্রভাবে সমাপ্ত হ'লে সে অবস্থাকে বলি রসের রূপে পরিণতি। মনোবৈজ্ঞানিকের gestalt-এর সঙ্গে এ ধারণা মেলে। হয়ত এ তাই। কবি Eliot-এর একজন সমালোচক, Matthiessen, ভাল করেই বলেছেন যে "the centre of value in a work of art is in the work produced and not in the emotions or thoughts of the poet, that it is not the greatness, the intensity, of the emotions, the components but in the intensity of the artistic process, the pressure, so to speak under which the fusion takes place, that counts"। আর এক জায়গায় "only....by

experiencing the poem as a whole and thereby evaluating it from the inside, so to speak, by trusting the evidence of your senses for its effect, can you determine whether or not the poem is alive।" এই fusion বা সমন্বয় হ'ল একটা আঙ্গিক সংশ্লেষণ—একটা organisation, integration, বা synthesis ; একটা সম্বন্ধ-বন্ধন বা relation-এর সৃষ্টি। Vernon Blake তাঁর "Relation in Art"এ এই কথাটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন :—

"What I see, understand, remember of a Canvas by Monet is not colours but colour, none of the component parts ; none of the single brush marks or touches of coloured paint ; but a thing different from them ; a colour idea."

রঙের ধারণা ! আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এ রূপরচনার নিয়ামক বা রসের ধারণা-বন্ধনের প্রধান নির্দ্ধারক হ'ল ব্যক্তিগত ভাব আর চিন্তার গতি আর সামাজিক ভাব আর চিন্তার রেখাবন্ধন। বায়ুমণ্ডলে ক্রৌঞ্চের নিরালম্ব চীৎকারটুকু কোনমতেই কাব্য ছিল না। কাব্য হ'ল সমাজভুক্ত—আর সেই সঙ্গে আত্ম-সাধনাপরায়ণ—জীব বাল্মীকির দ্বারা তার ব্যবহারে।

কাব্যের রূপ-রচনায় কিন্তু শুধু ভাষাগত আবেগমূল্য আর চিত্রপর্য্যায়েরই নিয়োগ হ'ল না। যে ভাষা বা বাক্যধারা রচনায় প্রযুক্ত হ'ল তার একটা অর্থমূল্যও আছে। সে অর্থরাজির আবার কোনটি হবে ভাবের দিক ঘেঁসা, কোনটি চিন্তার, কোনটি তর্কপ্রধান, মোটের ওপর সবগুলিই মিশ্র। রসের রূপগ্রহণে অর্থাৎ কাব্যবীজ বা poetic idea-র জন্মে অবিমিশ্র আবেগ আর চিত্রনির্দ্দেশের সঙ্গে লৌকিক অর্থধারার এই নানা শাখা প্রশাখাও সমীকৃত হয়। অর্থ, ভাব আর চিত্র—এই তিনটি বিভাগের রসসংগঠনেই শেষ পর্য্যন্ত রূপের সৃষ্টি।

রস-রূপের সৃষ্টি পদ্ধতি সম্বন্ধে দুটি কথা আরো জানবার আছে।

হৃদয়কে প্রথমে আঘাত করে যে মূল প্রভাব, তার ক্রিয়া যে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের ওপর হয়, সেই মুহূর্ত্তই কাব্যরচনার মুহূর্ত্ত নয়। আর কবির সেই অবস্থা রচনার অবস্থা নয়। তখন সেটা চিত্তের উত্তেজিত অবস্থা। রচনার কাজ

শান্ত অবস্থায় না হ'লে হ'তে পারে না। শোক যখন আমাকে আশ্রয় করে তখন আমি শোকার্ত্ত। সে অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে একটা স্থির শান্ত অবস্থায় না এলে সে শোকভাবকে কাব্যরচনার উপাদান ক'রে ব্যবহার করতে পারি না। সেইজন্যে পাশ্চাত্য কবি Wordsworth-এর মতে কবিতা হ'ল emotions recollected in tranquillity। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র এই বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত।

এখন এই tranquillity সময়ের ব্যাপার, এতক্ষণ কিন্তু ভাব অবিমিশ্র ভাবরূপে অন্তরের মধ্যে ধরা থাকে না, তার প্রাথমিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। হৃদয়ে তার আলোড়নের ফলে চেতনরাজ্যে মন্থিত হয়ে উঠে আসে অনেক তুল্য আর আনুসঙ্গিক অনুভূতি, অনেক স্মৃতি, অনেক বিরোধী ভাবের আভাষ। এই মিশ্রিত ধারাকে আড় ভাবে প্রভাবিত করে অনেক চিন্তা, অনেক প্রশ্ন; ঘটে অনেক সুপ্ত কামনার জাগরণ। এইভাবে অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রথম ভাবাবেগ ক্রমশঃ অর্থপূর্ণ আর জটিল হ'তে থাকে। এই বিচিত্র সমৃদ্ধ মিশ্রণকেই ক্রমশঃ আমাদের বর্ণিত অখণ্ড একক আবেদনে সমাধান লাভ করতে হয়। এই অখণ্ড রসের ঐক্যসৃষ্টি হবার সঙ্গে রচনার কায সমাপ্ত হয়। কবিতা সম্পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় কথা, কবিচিত্তের যে স্বভাবদত্ত আহরণী, বন্ধনী আর সমীকরণ শক্তিতে ভাব আর অর্থের নানা ধারা অখণ্ড আবেগ-প্রভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে, বা রূপের ঐক্যে পর্য্যবসিত হয়, তারই নাম কবির সৃষ্টিশক্তি বা কল্পনা, সাধারণ ইংরাজীতে imagination, Jung প্রমুখ আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকদের ভাষায় active phantasy প্রভৃতি। মনে হয় ভাবের দোলার ফলেই এই কল্পনারও জাগরণ। এ হ'ল চেতনার একটা অসাধারণ স্ফূর্ত্তি, অনুভূতিলব্ধ একটা স্বচ্ছ, স্পষ্ট, অন্তর্দৃষ্টি, অতি সূক্ষ্ম, অতিমাত্রায় স্পর্শশীল। ভাবের দোলায় জাগরিত হয়ে সেই ভাবেরই অন্তঃস্থল যেন পরতে পরতে মুক্ত করতে থাকে, যেন Wordsworth-এর ভাষায় :—"With an eye made quiet by the deep power of joy we see into the life of things."।

কল্পনার কার্য্য আর তার ফলে আবেগ আর অর্থধারার রূপে সমাধান লাভ করার কথাটা উদাহরণ দিয়ে বিশদ করবার চেষ্টা করা যাক। মনে করা যাক

কোন ব্যক্তিবিশেষকে আমি বলতে চাই "অধীনে থাকতে চাই।" এ হ'ল একটি সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ বাক্যধারা। কথাটা শ্রোতা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল। কিন্তু কথাটাতে রূপ বলতে যা কিছু বুঝি তেমন কোন আভাস নেই। এখন এই অর্থধারার তিনটি মূল অঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম, "আমি," দ্বিতীয়, "তুমি," আর তৃতীয়, 'অধীনে থাকা"। "আমি" বলতে বক্তার মনে তার ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট ছবি বা অখণ্ড ধারণা জাগে। "তুমি" বলতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির। অধীনে থাকা বলতে বক্তার মনে জাগে, বা জাগতে পারে, দৃশ্য-জগতের যত কিছু গুরু লঘু, বৃহৎ ক্ষুদ্র, উপর নীচে, গাঢ় ফিকে, ধ্বনি নীরবতার বিরোধী সংস্থানের ধারণা। এই সকল চিত্রমূল্য ছাড়া "আমি", "তুমি," "অধীনতা," প্রভৃতি কথাগুলির বিভিন্ন আবেগ-মূল্যও থাকতে পারে। "আমি" বলতে নিজের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভালবাসার একটা আবেগ উদ্রেক হ'তে পারে। "তুমি" বলতে হয়ত জাগে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তার রূপ গুণের দরুণ বা নিজের থেকে বিভিন্নতার আকর্ষণ। অধীনতার ধারণা থেকে উৎসারিত হ'তে পারে স্নেহ বন্ধনের আর বশ্যতার নিরুদ্বেগ তৃপ্তির আস্বাদ। এখন তাহ'লে 'আমি তোমার অধীনে থাকতে চাই" কথাটিকে রসরূপ পেতে হ'লে এইসকল বিভিন্ন চিত্রকল্প আর আবেগ মূল্যকে একটি অখণ্ড প্রভাবে সংগঠিত হ'তে হবে। কবির কল্পনা বা আহরণী আর বন্ধনী শক্তি সে কায করবে। সে উদ্দেশ্যমুখী হয়ে থাকবে, (লতাবিশেষ যেমন কীটপতঙ্গ ধরবার জন্যে মুখ খুলে থাকে), আর তার কাছে হয়ত এসে ঠেকবে "বন্ধু" বা "বঁধু" কথাটি। এটা খুব স্বাভাবিক। কেননা "বন্ধু" বা "বঁধু" কথাটির অর্থের মধ্যে 'তুমি" নামক ব্যক্তিটির প্রতি বক্তার আকর্ষণটুকু ফুটলো, আর তার উচ্চারণের মধ্যে অধীনতার ধারণার মূলে যে 'বন্ধনের" ভাব আছে সেটা একটা ধ্বনিগত আশ্রয়ও পেল। "তুমি" নামক ব্যক্তি এইভাবে "আমি" জনের একটু নিকটবর্ত্তী হ'লেন। সংশ্লেষণের কায আরম্ভ হয়েছে। কাছে আসতে, অর্থাৎ 'তুমির" প্রতি "আমি"র আকর্ষণ প্রবলতর ভাবে অনুভূত হওয়ায়, কল্পনার দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছতর হয়। নিকটে আসতে নিজের থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা আরো সম্যক হয়; তখন যেন "বন্ধু" ব'লে মন ভরে না; তাকে আরো বড় ক'রে ভাবতে আর পেতে ইচ্ছা হয়। সেই

গভীরতা আর গাঢ়তা প্রকাশ করতে "নাথ" বা "প্রভু" ধরণের আরো স্পষ্ট আর জোরালো সম্বোধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু "বন্ধু"র স্থলে "নাথ" ব'লে অনুভব করাতে নিজের অসহায়তার বোধ আবার বেড়ে যায়, আরো স্থায়ী হয়ে ওঠে, আরো ব্যাপক হয়। তাই আরো মনে হয় যে নাথ তো বটেই তবে নিতান্ত ক্ষণিকের জন্যই নয়, চিরকালের জন্য; আংশিক ভাবে নয়, সম্পূর্ণ-ভাবে; শুধু সাহচর্য্যের জন্য নয়; রক্ষা, মঙ্গল, সন্তোষ আর আনন্দের জন্য; জীবনকে সার্থক করবার জন্য; প্রয়োজনের অনিবার্য্যতায়। সুতরাং শুধু "বঁধু" আর "নাথ" ব'লে ডাকলেই চলে না তাকে একথাও জানাতে ইচ্ছা করে যে কেন তাকে ও রকম ক'রে সম্বোধন করি। তাকে একথাও বলতে ভাল লাগে যে এভাবে না ডেকে উপায় নেই, এ ডাক চরম ডাক আর চিরকালের ডাক। অতএব অধীনতার বাসনাকে ভাবের সম্পূর্ণ গাঢ়তায় প্রকাশ করতে হ'লে আগে ভূমিকার মতন মুখ থেকে বা'র হ'য়ে আসে :—

"বঁধু কি আর কহিব আমি।"

এই ভূমিকার পর আসল কথা যে :—

"জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হয়ো তুমি।"

অধীনতার বাসনা সমৃদ্ধ রূপে, রসের লাবণ্যে, ধ্বনির রাজ্যে প্রকাশ লাভ করলে। কাব্য হ'ল। বোঝা গেল যে রূপের আঙ্গিকতার দিক থেকে "বঁধু কি আর কহিব আমি," এই ভূমিকা, আর "জীবনে মরণে জনমে জনমে," এই সর্ত, এইগুলিই হ'ল রসরচনার বন্ধনডোর। এর পর "প্রাণনাথ হয়ো তুমি" যেন সহজ কথা। দেখা যাচ্ছে যে গদ্যে যেটা ছিল প্রধান বক্তব্য কাব্যে সেটাই হয়ে গেল গৌণ, আর সাধারণে যে কথাগুলোকে বলতো অবান্তর আড়ম্বর বা কথা সাজানো, কবিতায় সেই অংশটাই হ'ল প্রাণস্বরূপ। গদ্যের প্রকাশে আর কাব্যের প্রকাশে এতটা প্রভেদ হওয়াই সম্ভব। এমন প্রায়ই হয় যে কবিতায় যে কথাগুলি অবান্তর ব'লে মনে হয় সেইখানেই সৃষ্টির মূল বা বীজ নিহিত থাকে। সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হয় কি ভাবে মূল আবেগের টানে ক্ষুদ্রতর ভাব আর চিত্রপ্রতীক আর নানা অর্থ আর

যুক্তিধারা সমন্বিত হয়েছে একটি ভাববাহী সঙ্গতিতে। উদ্ধৃত কবিতাটিতে যেমন আছে "তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি," কল্পনা আর উপাদানে তেমনি ফাঁসি লেগেই প্রেম বা আনন্দের সৃষ্টি হয়। এই গূঢ় empathy-র পরিণাম, এই রসের বন্ধন, এই ঐক্যের সৃষ্টি, এই কাব্য, এই শিল্পের রূপ।

রূপরচনায় কল্পনার কাযের একটি সহজ নিদর্শন দিই। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রথম কলি হ'ল :—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক' আর,
ভাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

এখানে শরতে বঙ্গপল্লীর শোভাদর্শন কবির একটি অভিজ্ঞতা হ'ল। তার পূর্ব্বে কবির চেতনায় মাতৃস্নেহের আস্বাদের স্মৃতি সঞ্চিত ছিল। পল্লী-দৃশ্যের কয়েকটি সমধর্ম্মী অংশ সত্বর সেই স্মৃতিকে জাগালে—"By landscape reminded once of his mother's figure" (W. H. Auden—The Orators-Prologue-line)। এই মাতৃস্মৃতির লক্ষণগুলি হ'ল নদীতে জলের উচ্ছল পরিপূর্ণতা, মাঠের ধানের প্রাচুর্য্য আর কাননে পাখীর গানের স্রোত। এরা যথাক্রমে উদ্রেক করলে মাতৃস্নেহের পূর্ণতা, সীমাহীনতা আর বাধা-হীনতার ভাব। এই সকল আভাসের সঙ্গে কবির কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তি এনে মেশাল মাতৃরূপ আর মাতৃত্বের ভাবসূচক অন্যান্য উপকরণ, যেমন পল্লীর শ্যামলতা, সবুজ ধান আর ঝরা শেফালীর সৌকুমার্য্য থেকে কোমলতা আর মাধুর্য্যের ভাব, আর শরতের কাঁচা রৌদ্রের স্বর্ণাভা আর শিশির বিন্দুর ঝলক

থেকে দেহের স্নিগ্ধ লাবণ্যের সঙ্কেত। এই ভাবে মূলভাব সমৃদ্ধতর হ'তে লাগলো, আর সকল সমৃদ্ধির লক্ষ্য বা গতি হ'ল ঐ মাতৃরূপেরই ঐক্য ফুটিয়ে তোলার প্রতি। এই রকম ক'রে কবির কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত ভাবকে বা অভিজ্ঞতা-উদ্রিক্ত হৃদয়াবেগকে নানা সমৃদ্ধির অলঙ্কৃত সংযোগে এক অভিনব অবস্থায় পরিণত করল যার নিজস্ব আবেদন কবিচিত্তের আনন্দ বাসনাকে তৃপ্ত করল। আবেগের এক ঐশ্বর্য্যময় বিন্যাস হ'ল। কাব্যরস রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

উপরোক্ত রূপায়নের রীতি থেকে আমরা একটা জিনিষ দেখতে পেয়েছি যে কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত "বাধাবন্ধহারা" অবিমিশ্র আবেগধারাই তার কাব্য-সৃষ্টির নিয়ামক হয়নি। যেমন পূর্ব্বে বলেছি ভাষার কৃপাপ্রার্থী ব'লে ভাবের দিক থেকে কবিকে স্বাধীনচিত্তের আদেশ ছাড়া ঐতিহ্য আর সামাজিক বিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ মানতে হয়েছে আর রচনার কালে সংস্কার আর স্মৃতিগত নানা আশ্লেষের ভীড়ের মধ্যে তাকে পথ ক'রে চলতে হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্ট রসরূপ বিচার বুদ্ধি রাজ্যের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে। এ কথাটা বিশদ করবার পূর্ব্বে বিচার বুদ্ধির রাজ্যে ভাব রসের ধারণারূপে পর্য্যবসিত হওয়া সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ফরাসী লেখক Marcel Proust-এর "Swann's Way" নামক পুস্তকের "Swann in Love" শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত করতে পারি :—

"Swann regarded musical motifs as actual ideas, of another world, of another order, ideas veiled in shadows, unknown, impenetrable by the human mind, which, none the less, were perfectly distinct one from another, unequal among themselves in value and significance. When after that first evening at the Verdurins', he had had the little phrase played over to him again, and had sought to disentangle from his confused impressions how it was that, like a perfume or a caress, it swept over and enveloped him, he had observed that it was to the closeness of the intervals between the five notes which composed it and to the constant repetition of them that was due that impression of a frigid, a contracted sweetness; but in reality he knew that he was basing this conclusion not upon the phrase itself, but merely upon certain

equivalents substituted (for his mind's convenience) for the mysterious entity of which he had become aware.....when for the first time he had heard the Sonata played.....In his little phrase, albeit it presented to the mind's eye a clouded surface, there was contained, one felt, a matter so consistent, so explicit to which the phrase gave so new, so original a force, that those who had once heard it preserved the memory of it in the treasure chamber of their minds.....Even when he was not thinking of the little phrase, it existed, latent in his mind, in the same way as certain other conceptions without material equivalent, such as our notions of light, of sound, of perspective, of bodily desire, the rich possessions wherewith our inner temple is diversified and adorned."

অর্থাৎ রসের ঐক্য নামক "mysterious entity" বিকাশবুদ্ধির পটে "mind's eye"-এর সামনে, ধারণা বা ধারণারাজি হয়ে, "actual ideas"-এর রূপে, "perfectly distinct one from another, unequl among themselves in value and significance;" তাতে consistent. explicit, matter-এর স্থূলত্ব আসে, একটা "conception"-এর মতন সেটা "mind"-এ অবস্থিতি করে যদিও সেটাকে এসকল কারণে জ্ঞানরাজ্যের অন্যান্য ধারণার মতন ক'রে দেখা চলে না—মূলতঃ সেটা poetic idea, রস ধারণা, সঙ্কেতময়, "of another world, of another order, ideas veiled in shadows, unknown, impenetrable by the human mind;" যারা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আচ্ছন্ন করে রাখে like a perfume or a caress, যাদের surface clouded, ধারণা হলেও যারা আলোকের, ধ্বনির, দৈহিক কামনা রাজির যে সকল ধারণা আমাদের আছে তার চেয়ে স্পষ্ট বা বাস্তব নয়, যাদের কোন material equivalents নেই, অনন্ত রহস্যের যারা মনগড়া equivalents বা প্রতীক।

মনোরাজ্যের স্তর থেকে দেখতে গেলে আসলে ব্যাপার যা ঘটে তা এই। রচনাকালে যখন সমগ্র কবিতাটির উপকরণরাজি—মূল এবং ক্ষুদ্রতর ভাব আর চিন্তাধারা, আশ্লেষ, আনুসঙ্গিক নানা প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা, কামনা প্রভৃতি—যার উল্লেখ পূর্ব্বে করেছি—কবির রসচেতনার ওপর এমন চেপে বসে যে তাঁকে তা' থেকে এক অখণ্ড রসপ্রভাবের সৃষ্টি করতে নিতান্ত সজাগ ভাবে নির্ব্বাচন

চালাতে হয়। তিনি অনেক কিছু বাদ দেন। চেষ্টা ক'রে, পরখ ক'রে নিজস্ব রসবোধের ওপর নির্ভর ক'রে, অনেক নতুন উপকরণ মেশান; অনেক জিনিষ অদল বদল ক'রে গ্রহণ করেন যাতে শেষ পর্য্যন্ত একটা ঐক্যবদ্ধ প্রভাব-বিন্যাসের অবতারণা করতে পারেন। রূপ আর ভাবাভাষের বিভিন্নতার মধ্যে মূল্যের সমতা স্থাপন করতে পারেন। Eliot-এর কথায় :—

"When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate expriences, the ordinary man's experience is chaotic, irregular, fragmentary. The latter falls in love or reads Spinoza, and these two experiences have nothing to do with each other or with the noise of the typewriter or the smell of cooking; in the mind of the poet these experiences are always forming new wholes."

বুঝছি যে প্রকৃত কবিতায় আবেগময় অভিজ্ঞতার ওপর স্বতঃস্ফূর্ত্ত কল্পনা-শক্তির কথা ছাড়া বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার, বহুদর্শিতার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় আর অলঙ্ঘনীয়ও বটে। জটিল ভাবরাজির সরল সমন্বয় করতে, ভাব আর চিন্তার পরিবর্ত্তনগুলিকে পরিণতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নানা বিরোধী আভাসের মধ্যে সমতা স্থাপন আর সামঞ্জস্য সাধন করতে কবিকে ক্রমাগত সজাগ মস্তিষ্কের চালনা করতে হয়; সংযত অভ্যাসের (discipline-এর) প্রয়োজন হয়; কল্পনাকে হ'তে হয় বিচারপ্রবণ। শেষ পর্য্যন্ত যেটা প্রকাশ পায় সেটা অবিমিশ্র ভাবাবেগ নয়, চিন্তা বিচারে অধিত ভাবের রূপ, চিন্তার ভাবপ্রতীক বা অনুভূত চিন্তাই। Eliot-সমালোচক Matthiessen যাকে "curve of meaning" বলেন বা Herbert Read যাকে বলেন "contour of ideas" তার এই অর্থই করি।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গ থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারবো আধুনিক কবিতার রূপের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবিরা বলেন এই কথা যে কবিতায় ভাবরাজির ঐক্যবদ্ধ রসপ্রভাবের উপলব্ধি হবে তখনই যখন ভাব ও চিন্তার বিভিন্ন ধারা-গুলি আর আনুষঙ্গিক আভাস ইঙ্গিত প্রভৃতি পারস্পরিক সম্বন্ধ-বন্ধনে নিজে হ'তেই একটা নক্সা বা ছকের মতন হয়ে বিন্যস্ত হবে। ভাষায় বা প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিকে আয়াস ক'রে এই নক্সাবিন্যাসে সাহায্য করতে হবে। কবি

বুঝবে যে ভাব আর চিন্তা মনের মধ্যে যে রকম ক্ষিপ্রভাবে, এলোমেলো ভাবে, নানা উত্থান পতনে আনাগোনা করে, যে রকম ক'রে নানা পার্শ্ববর্ত্তী ভাব, চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির বিরোধে বা সহায়তায় তাদের গতি বাধা পায় বা মুক্ত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বাসনা চরিতার্থতার দিকে একমুখী, বেগবতী, একাকার হয়ে অগ্রসর হয়, সেটার প্রতিরূপ ধরতে বাক্যধারা আর ছন্দের গতিতেও ক্ষিপ্রতা, মন্থরতা, ধ্বনির উত্থান পতনে বাধা, মুক্তি, আর চমকের ভাব, সমান তালে বা এলোমেলো চলনের ভঙ্গী প্রভৃতি আনতে হয়। তবেই ভাবধারণাগুলি আবেগের ইঙ্গিতে কবিতার পাঠকের মনে সঞ্চারিত হতে পারে। অবান্তর বা অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক কথা বাদ দিয়ে, ছন্দ আর ভাষাকে প্রয়োজন মত নমনীয় ক'রে, পুনরুল্লেখ, বিরোধ, ধ্বনি প্রতিধ্বনির ব্যবহারে রসপ্রভাবকে তার মোচড়ে মীড়ে সম্পূর্ণ রেখা-বঙ্কিমায় প্রকট করতে হয়। অনেক সিঁড়ি ধাপ বাদ দিয়ে, ঠাস, আঁটসাট, সঙ্কেত-সমৃদ্ধ, সার নিঙড়ানো বর্ণনীয় ভাবের বা আবেগের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রভাবকে ফোটাতে হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য আর বাঙ্গলা কবিতায় এই নক্সাবিন্যাসের টানাবোনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কবিভেদে এই বিন্যাসপদ্ধতি ব্যক্তিগত বা stylized হতেও বাধ্য। একই বিষয়ের ওপর কবিতায় দু'জন কবির মধ্যে অনেকটা প্রভেদ হয়ে যায়। কবিতার কোন আদর্শ বা standard রূপ থাকে না, এবং কবিতা কবির স্বকীয় চিন্তাধারা, মনোভাব আর ভাবানুষঙ্গে (বিশেষ ক'রে সাধারণ পাঠকের কাছে) কিছু পরিমাণে দুর্ব্বোধ্যও হয়ে ওঠে। কবি G. M. Hopkins বলেছেন: "it is the virtue of design, pattern, or what I call inscape, to be distinctive, and it is the vice of distinctiveness to become queer." অতএব কবিতার (queer কবিতার নয়) পূর্ণ রস গ্রহণ করতে হ'লে পাঠককে পঠনে, চিন্তায়, কবির অনেকটা সমকক্ষ হ'তে হয়। Eliot সেই জন্যে বলেন যে কবিতার পাঠকের পক্ষেও fundamental brainwork-এর প্রয়োজন।

দুটি আধুনিক কবিতা থেকে বিন্যাস পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত সহজ নিদর্শন এখানে দেখাই।

T. S. Eliot-এর "Rhapsody on a Windy Night" কবিতাটির

বিষয়বস্তু হ'ল রাত্রি দেড়টার সময় পথের ধারে একটি গণিকাকে তার মুক্ত গৃহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা :

And you see the corner of her eye
Twists like a crooked pin.

ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্না গণিকার স্বভাব বক্র। অতএব অনেকগুলি বক্র বস্তুর কথা মনে এসে পড়ে :—

The memory throws up high and dry
A crowd of twisted things ;
A twisted branch upon the beach
Eaten smooth, and polished
As if the world gave up
The secret of its skeleton,
Stiff and white.
A broken spring in a factory yard,
Rust that clings to the form that
the strength has left
Hard and curled and ready to

এছাড়া গণিকার কথা ভাবতে বিধ্বস্ততা আর ব্যর্থতার কথাও মনে আসে :—

The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices,
Smells of chestnuts in the streets,
And female smells in shuttered rooms
And cigarettes in corridors
And cocktail smells in bars.

এইভাবে নানা চিত্রকল্পের বিন্যাস ক্রমশঃ এগিয়ে চলে কবিতার ভাবকেন্দ্রের বিকাশের দিকে যেটা এই :—গণিকার জীবনের অনুরূপ ব্যর্থ জীবনধারা আজকের দিনে সর্ব্বক্ষণ মানুষকে ঘিরে বয়ে চলছে অথচ মানুষও দম্ভ ক'রে বলে চলেছে যে জীবনযুদ্ধে সে বীর যোদ্ধা, অসহায়ের সহায়, Knight Errant। ফলতঃ মনে হয় যে মানুষের এই মিথ্যা দম্ভ, এই কপটতাই সকল

বক্রতার চরম—গণিকার মুখের চেয়েও, অন্যান্য বর্ণিত বক্রতার চেয়েও—নির্ম্মম ছুরির শেষ আঘাতের মতন। সারারাত পথে পথে ঘুরে, ভোর বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করতে গিয়ে তাই কবি বলেন :—

Four O' clock,
Here is the number on the door.
Memory !
You have the key,
The little lamp spreads a
ring on the stair,
Mount.
The bed is open ; the tooth brush
hangs on the wall,
Put your shoes at the door, sleep,
prepare for life,
The last twist of the knife.

এই কবিরই, এই বিষয়েই, যন্ত্রণাকাতর আর এক বক্রমুখী সম্প্রদায় সম্বন্ধে অন্য একটি কবিতা উদ্ধৃত করি। বিন্যাসের আর একটি পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যাবে। কবিতার নাম "Morning at the Window"।

They are rattling breakfast plates
in basement kitchens,
And along the trampled edges of the
street
I am aware of the damp souls of
housemaids
Sprouting despondently at area gates.
The brown waves of fog toss up to me
Twisted faces from the bottom of the
street,
And tear from a passer-by with
muddy skirts
An aimless smile that hovers in
the air
And vanishes along the level of the
roofs.

—এখানে পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতাটির মতন ভাবরসের কেন্দ্র কবিতার একটি বিশিষ্ট স্থলে (অর্থাৎ মধ্যে বা শেষে) স্তূপীকৃত করা নেই। তাকে সমগ্র কবিতাটির মধ্যে প্রবাহিত—infiltrate—ক'রে দেওয়া আছে বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। পাঠককে তার মধ্যে থেকেই তাদের সঞ্চয় ক'রে তুলতে হবে—"damp souls", "sprouting despondently", "brown waves", "toss up to me", "twisted faces', এই সকল নির্দ্দেশ থেকে; আর সর্ব্বশেষে অসহায়তাসূচক ঐ কথাগুলি থেকে :—

An aimless smile that hovers in
the air
And vanishes along the level of
the roofs.

এই কবিতার রচনাপদ্ধতি Eliot-এরই কবিতার ভাষায় বর্ণনা করতে হ'লে হয়ত বলা যায় :—

I am moved by the fancies that
are curbed
Around these images, and cling :
The notion of some infinitely
gentle
Infinitely suffering thing.
Preludes—IV.

বাঙলায় বিষ্ণুদের "টপ্পা-ঠুংরী" নামক গন্ত-কবিতায় নক্সা-বিন্যাসের আর এক রকম বিকাশ বোধহয় লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যার ট্রেণে বন্ধু আসবেন খবর পেয়ে সারাদিনটা তাড়াতাড়ি কেটে গেল। গানের অলিতে গলিতে বাস গেল—"I am moved by fancies that are curbed around these images"। সন্ধ্যার সময় বাসে উঠে হাওড়া ষ্টেশনে চললুম। পথে বাস আটকে গেল। এদিকে আর পঁচিশ মিনিট। পাখা থাকলে উড়ে যাওয়া যেত—অতএব মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ছত্র—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।" Shakespeare এর কথাও মনে পড়তে পারতো—"A horse a horse,

a kingdom for my horse"। যাক্ কোন রকমে সময় থাকতে থাকতে ষ্টেশনে পৌঁছে :—

এল ট্রেণ
মথিত ক'রে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মর্মচৈতন্ত মথিত ক'রে,
দেখলুম তোমার ক্লোস-আপ্ মুখ জানলায়।
—একটা কুলী—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে। এইখানে কবিতার একটি পর্ব্ব শেষ হ'ল। অর্থাৎ এইখানে কবিতার অন্তর্গত উল্লাসের রসটুকু চরমে উঠলো। তারপর অবরোহনের পর্ব্ব আরম্ভ হ'ল। কেননা বন্ধু সত্যিই আসেন নি। অন্ত লোককে গাড়ীর মধ্যে দেখে ভুল হয়েছিল। তাই বাকী কবিতাটুকু চললো এই ভাবে :—

হায়রে, আশার ছলনে ভুলি,'
কোথায় তুমি! • •
• • •
ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেণের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন,
হায়রে।

রসের এই দ্বিতীয় ভাবকেন্দ্র—ভোরবেলাকার ভৈরবী অবসান হ'ল নৈরাশ্যের পূরবীতে। রসিক আর বিচারক্ষম পাঠকের কর্ত্তব্য হবে দেখা যে দুটি ভাবকেন্দ্রে মিলে রসপ্রভাবকে ঘনীভূত ক'রে তোলে কিনা।

রসের বিস্তারে যে নক্সার বিন্যাস তার ছন্দ আর ভাষার বিন্যাসে তার একটা

বাস্তিক প্রতিরূপও আধুনিক কবিতায় অনেক সময়ে দেখা যায়, যেমন Edward Thomas-এর "Words"-এ :—

Out of us all
That make rhymes,
Will you choose
Sometimes—
As the winds use
A crack in a wall
Or a drain,
Their joy or their pain
To whistle through—
Choose me,
You English words?

I know you:
You are light as dreams,
Tough as oak,
Precious as gold,
As poppies and corn
Or an old cloak:
Sweet as our birds
To the ear,
As the burnet rose
In the heat
Of midsummer:
Strange as the races
Of dead and unborn:
Strange and sweet
Equally,
And familiar to the eye,
As the dearest faces
That a man knows
And as the last homes are:
But though older far
Than oldest yew,—
As our hills are, old,—
Worn, new

Again and again:
Young as our streams
After rain:
And as dear
As the earth which you prove
That we love.
Make me content
With some sweetness
From Wales
Whose nightingales
Have no wings—
From Wiltshire and Kent
And Herefordshire
And the villages there,—
From the names, and the things
No less.
Let me sometimes dance
With you
Or climb
Or stand perchance
In ecstasy,
Fixed and free
In a rhyme
As poets do.

বাঙলায় ছন্দ আর ভাষা-বিন্যাসে নক্সা বুননের নমুনা বুদ্ধদেব বসুর "এখন বিকেল" থেকে :—

এইখানে আঁকা বাঁকা ছায়ার বুনোন
ভ'রে দিল মন।
চেয়ে ভাখো, স্মৃতির জানালা খোলা।
চেয়ে ভাখো, কত মেঘ মোমের মতন
জ্বলে' গেল,
মোমের মতন গলে' গেল
পশ্চিমের লালে।
দিগন্তের আম জাম নিম

যেখানে নিবিড়নীল, সেখানে পশ্চিম
লাল হ'লো
লাল মশালের মত।
লাল মশালের মত উদ্দাম রঙীন
জলন্ত পশ্চিম।
চেয়ে ভাখো, দিগন্তের নিবিড় স্থবির নীল
হঠাৎ উদ্দাম হ'লো রঙীন ছায়ায়।
ঝলোমলো ঝলোমলো
পশ্চিম চঞ্চল হ'লো
হৃদয় চঞ্চল হ'লো
তোমার আমার।

"হে কাল" নামক গম্ভীরতর সুরের গোড়াথেকে কতকটা :—

যাও রেখে যাও ধূসর লাঞ্ছন
হে কাল, হে মহাকাল!
যৌবনের ব্যাকুল বৈকাল
তারে স্তব্ধ করো, স্তব্ধ করো, ধরো ধরো
বাসনারে;
ঘনস্মৃতি মেঘভারে
আনো আনো স্তম্ভিত বিষণ্ণ ছায়া।
উচ্ছলিত হৃদয়-হ্রদের পরে উন্মথিত হোক
তার
সঞ্চিত সম্পদ, কর্দ্দমের স্নেহপঙ্কে
যত উপহার
রেখে গেছে হাজার জাহাজডুবি
উজল আলোর মত অলঙ্কার, রক্তের মত লাল প্রবাল
আর কত নিঃশব্দ কঙ্কাল
হে কাল, হে মহাকাল
করো করো উন্মাটিত, স্তব্ধকর যৌবনের উত্তাল বৈকাল

কবিতার স্বরূপ কি, কাব্যের প্রকৃতির ধারণা আজকের দিনে কোন পথে

পরিণতি আর প্রসার লাভ করে চলেছে তার একটা প্রাথমিক ধারণা এই প্রবন্ধে হয়ত কতকটা হ'ল। কবিতা শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিরাজ্যের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় মনে করেই Eliot বলতে পারেন যে "the enjoyment of poetry is a pure contemplation from which all the accidents of personal emotion are removed;" কিম্বা যেমন Richards বলেন যে এটা সম্পূর্ণ সম্ভব "to have full literary or poetic appreciation without sharing the beliefs of the poet।"

শ্রীনবেন্দু বসু

পথ

'তাড়াতাড়ি ফিরিস বাবা। আর এই ধর', আজিজের হাতে একটি টিনের কৌটো দিয়ে মা বললেন, 'ইয়ার মধ্যে চিড়া গুড় আর নাড়ু দিলাম, চৌধুরী-পুকুরের ওখানে যাইয়া একটু ঠাণ্ডা হয়্যা খায়্যা নিস।'

আজিজ কৌটোটি তার কোটের পকেটে রেখে যাবার জন্য পা বাড়ালে।

'আর, এই ছাখ', মা পেছনে আসতে আসতে বললেন, 'এইবার কিন্তুক বাবা জিগ্যাসা কর্যা আসিস কত দিনে তোরে খালাস দিবি এই দায় থাইকা। জিগ্যাসা করিস এ্যাঁ?'

বাড়ীর প্রান্ত সীমায় এসে গিয়েছিল তারা। গোয়ালের পাশের আম গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে আজিজ মা'র সাশ্রু ঘোলাটে চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'অত ব্যস্ত হ'য়ো না মা। কর্ত্তার মর্জ্জির ওপর তো কাজ? শুধু শুধু জিজ্ঞাসা ক'রে অপমান হ'য়ে লাভ কি!' ব'লে আজিজ ম্লানভাবে একটু হাসল।

মা'র চোখ আরো সজল হ'য়ে উঠল। এবং দেখতে দেখতে চোখের কোণ ছাপিয়ে কোঁচকানো গাল বেয়ে ঠোঁটের প্রান্ত পর্য্যন্ত দুটি ধারা নেমে এল। আজিজ ব্যথিত ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে একখানি হাত মার শীর্ণ কাঁধের ওপর রেখে বলল, 'কেঁদো না মা। কেঁদে কী লাভ?···আচ্ছা তুমি যখন বলছ, আমি জিজ্ঞাসা করব।···কেঁদো না, সোনা মা—' আজিজ নিজের কোঁচার খুঁটে মা'র চোখ মুছিয়ে দিল।

'আচ্ছা আয়। বেলা বাইড়া গ্যাল আবার!' অতি কষ্টে একটুখানি হাসি টেনে মা বললেন। (যাওয়ার সময় কাঁদতে নেই।)

আজিজ মা'র চোখের দিকে চেয়ে নীরবে শিশুর মত অকারণে একটু হেসে পথে নেমে পড়ল।

লোক্যাল বোর্ডের অপরিসর কাঁচা পথ। কখনো গ্রামের মধ্য দিয়ে কখনো নিচু মাঠের গা বেয়ে ধূসর সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে।

আজিজ সেই পথ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। এই পথের শেষ প্রান্তে তার গন্তব্য স্থল। গ্রাম্য মাইলের মাপে দূরত্ব তিন মাইল, কিন্তু ঘণ্টা চারেক লাগে হেঁটে যেতে। সুতরাং বাড়ী থেকে দেরী ক'রে বেরোবার জন্য একটু জোরে জোরেই হাঁটতে লাগল আজিজ। না হ'লে সেখানে গিয়ে আবার সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে কী ক'রে!

আজিজ হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এসে একবার পেছনে ফিরে তাকাল সে। মা তখনো আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন; পাশে গরুর-গাড়ীর একটা খোলা চাকা,। তারপর আরো কিছুটা অগ্রসর হ'য়ে একটা মোড় ফিরে আবার পেছনে তাকাল আজিজ, সামনের বেতের বোঝা আর শিরীষ গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছেন মা, কেবল সেই গরুর গাড়ীর চাকাটার একটা দিক দেখা যাচ্ছে তখনো; আর দেখা যাচ্ছে, তাদের শোবার ঘরের কানাস্তা টিনের কালো চালের ওপর সাদা সাদা গোটাকত কুমড়ো।—ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে আজিজ হাঁটতে লাগল আবার।

এ অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত নিচু। শোনা যায়, এই সেদিনো নাকি এখানে বিল ছিল, বর্ষার পলি পড়ে-পড়ে উঁচু হয়েছেএখন। অবশ্য চারদিকে একবার তাকালে কথাটা নেহাৎ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাঠের পর মাঠ; এদিকে, ওদিকে, সব দিকে। মাঝে মাঝে পুকুর-ডোবা কেটে মাঠ থেকে হাত দশেক উঁচুতে তৈরী কয়েকটি বাড়ীর সমষ্টি এক একটি গ্রাম; বর্ষাকালে সমস্ত মাঠ জলে ভেসে গেলে মনে হয় যেন এক একটি দ্বীপ।

মা যে কী সরল, বলা যায় না। আর এত ভীতু!—হাঁটতে হাঁটতে আজিজ ভাবতে লাগল।—বলে, জিজ্ঞাসা করিস। কী লাভ জিজ্ঞাসা ক'রে? তাদের কোনো ক্ষমতা আছে নাকি যে জবাব দেবে? আর তাছাড়া, জিজ্ঞাসাই বা করবে সে কোন্ মুখে? ইচ্ছে ক'রে আগুণের মুখে ঝাঁপ দেয় যে লোক তার পক্ষে পোড়াটা বড্ড বেশী হ'য়েছে, এ রকম অনুতাপ সাজে না। বরং পুড়ে যে কেন সে ছাই হ'য়ে গেল না, এই ভেবেই আশ্চর্য্য হওয়া উচিৎ তার।···আজিজ ইচ্ছে ক'রে আগুণে ঝাঁপিয়েছিল, দাহের জন্য অধীর হ'লে চলবে না।

কিন্তু, আজিজ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল মনকে, ইচ্ছেই করেই ঝাঁপিয়েছিল নাকি সে? ইচ্ছে ক'রে, নেহাৎ সখের জন্য—বাহাদুরীর প্রলোভনে? অনিবার্য্য কোনো কারণ ছিল না?—আগুনলাগা ঘরে ঘুমন্ত কোনো শিশুকে রক্ষা করবার যে তাগিদ আসে তার পরিজনের মনে সেই রকম একটা অব্যর্থ জৈব প্রেরণা?···

পেছনে দ্রুত শব্দ শুনে আজিজ চেয়ে দেখলে, একজন কাল্লো কোট গায়ে অশ্বারোহী ধূলিসমাচ্ছন্ন হ'য়ে এগিয়ে আসছেন এই দিকে: তাদের গ্রামের কেউ নয়। পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াল সে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ঘরে যে আগুন লেগেছে এ খবরটা নিজে জানত না আজিজ। সমুদ্র পার থেকে কে একজন জ্যোতিষী বই লিখে পাঠাল, আর তার কলকাতার কলেজের বন্ধু কাঙ্গালীচরণ বুঝিয়ে দিল সেই পুঁথির সাংকেতিক ভাষা, তবে সে বুঝতে পারল কী নিদারুণ দুর্বিপাক আরম্ভ হ'য়েছে তাদের সংসারে। আশ্চর্য্য।

'কী আজিজ ভাই, ক'নে যাতিছ?' সামনের এক বাড়ীর উঠান থেকে একটী ছেলে প্রশ্ন করল। এবং আজিজ মুখ তুলে তার দিকে চাইতেই জানাশোনা উত্তরের জন্য অযথা অপেক্ষা না ক'রে সে আবার বলল, 'আর যে আমাগ'র বাড়ীতে আসই না? দিদি তোমার কথা কত জিজ্ঞাসা করে আমায়।'

'তাই না কি?'

ছেলেটি একটু এগিয়ে গলার স্বর নিচু ক'রে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ। কাঁদেও মাঝে মাঝে।'

'ও।' আজিজ যেন কেমন আনমনা হ'য়ে গেল।

সাহস পেয়ে ছেলেটি আবার বলল, 'ঘরেই আছে ও। ডাকি?'

'না এখন থাক।' আজিজ একটু হেসে ক্ষতিপূরণের সুরে বলল, 'ফেরবার সময় দেখা ক'রে যাব। কেমন, এ্যাঁ?'

'আচ্ছা। আমি ক'বনি উয়ারে।'

আজিজ হাঁটতে লাগল আবার।

অথচ, একথা অস্বীকার করা যায় না, এদের ওপরও একটা কর্ত্তব্য

আছে।—এই তার মা, তারপর রুকিনা, এই সকলের ওপর আর কি। টাইফয়েডের রোগী যেমন ব'লে, পায়ে পড়ি, আমার মাথার ব্যথাটা আগে সারিয়ে দেও—টাইফয়েড সারিয়ে দেও, একথা সে ভুলেও বলে না,—বোঝে না যে, আসল রোগ না সারলে এই সব উপসর্গগুলো যেতে পারে না কখনো, মাথার ব্যথা কমলে হবে বেড-সোর।

রুকিনা তাকে ভালবাসে, আজিজ জানে। আরো জানে, ওর সাথে বিয়ে হয়, এই তার মার ইচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থায় কী ক'রে সে বিয়ে করতে পারে: এই অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়? রুকিনা ব'লেছিল বটে, 'তোমার জন্য আমি সকল কষ্টই সইবার পারি।' কিন্তু সে তো কেবল তরুণী হৃদয়ের স্পর্দ্ধিত প্রেমোচ্ছ্বাস। না হ'লে এই সামান্য কয়দিনের অদর্শনেই কাঁদে নাকি কেউ।

গ্রাম ছেড়ে মেঠো পথ ধরল আজিজ। সোজা একটানা পথ, যেন গোলকে আঁকা দ্রাঘিমা রেখা। দূরে, পেছনের ধূলোর ঝড় ভেদ ক'রে দেখা যায় সেই লাল ঘোড়ার ওপরে কালো কোট-গায়ে অশ্বারোহীর ঝাপসা মূর্ত্তি,—ক্রমাপসৃয়মান।

পৌষ মাস। হাওয়া ঠাণ্ডা থাকলেও রোদের তেজ কম নয়। কোটটি খুলে কাঁধের ওপর রাখল আজিজ। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে একটা বিড়ি ধরিয়ে, দেশলাইয়ের নীল-লাল খালি বাক্সটা পাশের ক্ষেতের সোনালী খড়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মার কথা মনে হ'লে সত্যিই কষ্ট হয় মাঝে মাঝে,—নিভে-যাওয়া অর্দ্ধ দগ্ধ বিড়িটি আলগোছে রাস্তায় ফেলে দিল আজিজ,—মা'র জন্য সত্যিই সে দুঃখিত। কেউ-ই যে নেই তাঁর। সে ছাড়া এ জগতে আর কেউই নেই তার বুড়ো মায়ের। সে চলে গেলে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে বই কি।

অবশ্য থেকেই বা কি করত, সেও অবশ্য ভাববার বিষয়। বড় জোর বিয়ে-থা ক'রে কতকগুলো নাতিনাতনী উপহার দিতে পারত, এই আর কি। সংসারের কাজে তো সাহায্য তাতে কিছুই হ'ত না, উপরন্তু রীতিমত অসুবিধেয় পড়তে হ'ত। তবু তার মা এ-ই চান: অসুবিধে হোক, তবু যেন ছেলে তাঁর স্বাভাবিক হয়।

অস্বাভাবিক,—আজিজের ঠোঁটে একটু হাসির রেখা ফুটল,—সাধারণ

সংসারের চোখে সত্যিই তারা অস্বাভাবিক। তাই বুঝি মা তাকে বেশী ক'রে স্নেহের বন্ধনে টানেন, চোখে চোখে রাখতে চান সব সময়ে! তাই বুঝি রুকিনার সেই স্পর্দ্ধিত প্রতিশ্রুতি! অস্বাভাবিকত্বের প্রবল বন্যায় ভেসে চলেছে সে, তাকে রক্ষা করাই এখন তাদের উদ্দেশ্য, যে রকমে হোক। মা তাই তাকে মৃগীরোগীর মত চোখে চোখে রাখেন: রুকিনা মুঠোয় মুঠোয় প্রেমের খাদ্য ছড়িয়ে উড়ে যাওয়া পায়রাকে খোপে ডাকে।

হঠাৎ দমকা বাতাসে এক ঝলক রৌদ্রদগ্ধ মদির গন্ধ ব'য়ে গেল। আজিজ সচেতন হ'য়ে পাশে চেয়ে দেখল, হলুদে হলুদে মাঠ যেন প্রাণের প্লাবন তুলেছে এইখানটায়। বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল হলুদ,—সর্ষের ফুল,—জ্বলন্ত উজ্জ্বল! আজিজ প্রাণ-ভ'রে জোরে নিশ্বাস নিল একবার।

একটা খালের জলে গোটাকয়েক কাদামাখা উলঙ্গ ছেলে অর্দ্ধমগ্ন একটা মহিষদেহের ওপর তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করেছে। আরেকটা মোষ ডাঙায় দাঁড়িয়ে; তার গা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। আজিজ জিজ্ঞাসা করল, 'এই, কি করছিস?'

ছেলেরা একবার তার দিকে চেয়ে নিরুত্তরে পুনরায় নৃত্য সুরু করল।

কৌতূহল হ'ল আজিজের মনে, পথ ছেড়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ছোঁড়ারা, লাফাচ্ছিস কেন?'

'ওঠে না যে!' বয়সে বড় ছেলেটা বিরক্ত ভাবে বলল।

শীতকালেও ওই জীবটির অস্বাভাবিক জলপ্রীতি দেখে আশ্চর্য্য হ'ল আজিজ। বলল, 'তা গায়ের ওপর নেচে কী হবে? ওঁতে তো আরাম পাচ্ছে আরো। লাঠি নেই?'

'ছিল, ওডাক তুলবার যাইয়া ভাঙ্গিছে।'

আজিজ হাসি চেপে আরো এগিয়ে গিয়ে ডাঙা থেকে হাত বাড়িয়ে মোষটার নাসারজ্জু ধ'রে টান্‌ল। ঠিক ব্যথায় অথবা বয়স্ক লোকের প্রতি সহজাত বশতঃ বোঝা গেল না, হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়ল মোষটা। পিঠের ছেলেগুলো পিছলে প'ড়ে গেল জলে, আর তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে আজিজের কাঁধে ঝোলানো কোটের পকেট থেকে চিঁড়ের কৌটোটি উল্টে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ল। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল, মায়ের এত যত্ন ক'রে দেওয়া

জিনিসগুলো নষ্ট হ'ল বুঝি! কিন্তু, না—কৌটো তুলে নিয়ে আজিজ দেখল,—মুখ আটকানো আছে ঠিক। মনে মনে আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল সে। আবার ফিরে এল সেই আজিজ, মায়ের জন্য দুঃখিত হ'য়ে সহানুভূতি জানায় যে,—অসাবধানে বেরিয়ে আসা বুক ছ্যাঁৎ-করা এই আজিজ মিশিয়ে গেল চকিতে।

'আসলে কি জানিস, প্রেম জিনিসটা অনেকটা ধোঁয়ার মত, শারীরিক দাহের থেকে তার জন্ম।' কাঞ্চালী একদিন সাহস দিয়েছিল তাকে, 'ওর জন্য অত ব্যস্ত হ'সনে। যতদিন তোর ভেতর সত্যিকার জীবনীশক্তি থাকবে, ততদিন এসব ব্যাপারে মন মাঝে মাঝে উতলা হবেই।'

'কিন্তু আমার যে কিছুই ভাল লাগে না ভাই। সব সময়েই কেবল তার কথা মনে পড়ে। এমন হ'লে কাজ করব কী ক'রে?'

'ভালবাসা যখন উল্টো দিকে টানে দ্বন্দ্ব তখন প্রখর হবেই। আচ্ছা, এক করতে পারিস না তুই? বরং রুকিনাকে সব বুঝিয়ে বল না একবার,—সে যদি তোর অবস্থাটা বুঝে সহানুভূতি বোধ করে তোর জন্য, তাহলে দেখিস অনেকটা প্রেরণা পাবি এই থেকে। তাই কর, গিয়ে সব বুঝিয়ে বল তাকে।'

আজিজ, সেদিনের সেই প্রেমকাতর আজিজ, বিষণ্ণ চোখ তুলে কাঞ্চালীর মুখের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে উত্তর দিয়েছিল মনে পড়ে,—'বলেছি ভাই। কিন্তু সে এসব কথা বোঝে না।'

সে আজ কতদিনের কথা। দেখতে দেখতে তারপর পাঁচটি বছর কেটে গেল,—পাঁচ বছরের পুরানো প্রেম কিন্তু আজো তেমনি নতুন। আজো তার সামনে সেই একই সমস্যা। নিজের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিপদের কথা বুঝিয়ে বললে রুকিনা সেই একই উত্তর আজো দেয়, 'তোমার জন্য আমি সকল কষ্টই সইবার পারি।'—কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মেয়ে রুকিনা; তার কোনো কথা বোঝে না সে।

হ্যাম্‌লেটও কি মূঢ় ওফেলিয়ার কাছে এম্‌নি বাধাই পেয়েছিল? রুকিনার মতই সদানির্ভরশীল মননহীন চোখ মেলে চেয়ে থাকত নাকি ওফেলিয়া,

হ্যাম্‌লেট যখন তার অতিমানবিক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলত ? অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে,—হ্যামলেটের ভঙ্গী ওফেলিয়ারের কাছে কত অস্বাভাবিক !—ওফেলিয়া কি রুকিনার মতই ভয় পেত নাকি !···রুকিনার কাছে সে অস্বাভাবিক !...তার মায়ের কাছেও— !···সকলের কাছেই হয়ত !···অন্যমনস্ক-ভাবে একটা বিড়ি মুখে ধরল আজিজ। তারপর পকেট খুঁজে দেশলাই না পেয়ে বিরক্ত মনে আদগ্ধ বিড়িটি ফেলে দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

এ এক মন্দ পেশা হয়নি,—হাঁটতে হাঁটতে নিজের ধূলি-মলিন জুতোর দিকে চেয়ে আজিজ মনে মনে বলল,—এই সপ্তাহে সপ্তাহে চার ঘণ্টার তিন মাইল হাঁটা। আহা কি দয়ার শরীর, ছেড়ে দিয়েছেন! এর চেয়ে আটকে রাখলেও তো পারতিস বাবা! এই ভিজে কম্বল গায়ে জড়িয়ে থাকার চেয়ে খালি গায়ে শীত ভোগ করা ঢের ভাল।

কিন্তু তা হবার উপায় নেই।—ছাড়া পেতে চাও তোমরা ? ছেড়ে দিয়েছি। দেখি কত সুখে থাক!

দয়ার ধারণা দেখে এক গল্প মনে পড়ল আজিজের।—কোনো এক গ্রাম্য জমিদারের কাছারীতে প্রজাদের বসবার ব্যবস্থা ছিল মাদুরে। জমিদার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী ইত্যাদি সকলে বসতেন ফরাসে—উঁচুতে। কালক্রমে প্রজাদের মধ্যে দুচারজন একটু বিদ্যার আলোক পেয়ে আবিষ্কার ক'রে ফেললে, প্রজাদের যে মাদুরে বসতে দেওয়া হয়, এর মূলে আছে ওপক্ষের ঘৃণা। সুতরাং তারাও উচ্চাসন না পেলে জমিদারের বাড়ীতে যাবে না। এখন, জমিদারবাবু ছিলেন সেয়ানা ভদ্রলোক। প্রজাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, তারা তাঁর সঙ্গে ফরাসেই বসতে চায় কিনা। তারা জানালো যে, উচ্চাসন হ'লেই তাদের চলবে, ফরাসে বসবার দাবী নেই তাদের। ব্যস, পরদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়ে ব্যবস্থা করলেন জমিদারবাবু—ইটের আকৃতির মাটী থেকে আধহাত উঁচু কয়েকটি টুল! প্রজারা হৈ হৈ করে তো এসে বসল। কিন্তু হায়, দশমিনিটের বেশী তাতে বসা যায় না—না যায় ওপরে পা তুলে ভালো ক'রে বসা, প্রস্থে কম,—না যায় মাটীর দিকে পা মেলে দেওয়া, দৈর্ঘ্য আধ হাত: মাঝখান থেকে কোমর যায় আর কি !···কিন্তু উপায় নেই,

ইতিমধ্যে জমিদারবাবু মাদুরগুলোও সরিয়ে ফেলেছেন,—মাটীতে বসতে হয় না হলে। এমনি দয়া!

সামনে একটি ছোট গ্রাম। কাপড় ঢাকা একটা গরুর গাড়ী বেরিয়ে এল তারি এক বাড়ী থেকে। কেউ মেয়েছেলে নিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়।—ধুলোর হাত এড়াবার জন্য আজিজ পথ থেকে সরে দাঁড়াল। করুণ মন্থর রব তুলে গাড়ী তাকে অতিক্রম ক'রে চলে গেল। আবার পথে নেমে হাঁটতে লাগল আজিজ।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর পেছনে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে ফিরে দেখলে একটা কুকুর সঙ্গ নিয়েছে তার। সে তাকাতে কুকুরটাও তার চোখের দিকে তাকাল। চিলের পাখার মত কটা রং, গরমে জিব বের ক'রে সশব্দে ধুঁকছে,—চেহারা দেখলে মনে হয় স্থায়ী কোনো আস্তানা নেই, ভবঘুরে। আজিজ চলতে আরম্ভ করলে সেও চলতে লাগল পিছু পিছু।

কতদূর যাবে এ কুকুরটা ?—আজিজ মনে মনে ভাবল।—যদিও ভাগ্য অনিশ্চিত, তবু আছে ভাল। কোনো হাঙ্গামা নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে!

কিন্তু বড্ড গরম। আজিজ কোঁচার কাপড়ে কপাল মুছল। তারপর এদিকে ওদিকে চেয়ে আর কোনো আশ্রয় না পেয়ে শেষে পথিপার্শ্বের এক বাবলা গাছের ঝির্-ঝিরে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কুকুরটাও এসে দাঁড়াল তার সঙ্গে সঙ্গে।

দূরে গোটাকত চাষী গরুর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাষ করছে নিশ্চয়ই। সমস্ত মাঠ—মাঝে মাঝে চষা ধূসর জমি, মাঝে মাঝে সোনালি খড়ে ছাওয়া—দুপুরের নিস্তব্ধ রৌদ্রে ধূ ধূ করছে যেন।

আরো ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হবে। তারপর আবার ফিরে আসা। দেরী ক'রে আর লাভ নেই: রাত হয়ে যাবে ঢের।—আজিজ কোটটা ভাল ক'রে কাঁধের ওপর রেখে হাঁটতে সুরু ক'রে দিল আবার।

অনেকটা এগিয়ে এসেছে তার বিশ্রামস্থল ছেড়ে, হঠাৎ আজিজের খেয়াল হ'ল সেই কুকুরটার কথা। পেছনে চেয়ে দেখল, ধুলোর ওপর তার নিজের জুতোর ছাপ ছাড়া আর কিছু নেই। মনটা অযথা কেমন তার খারাপ হয়ে

গেল যেন। একটু ভালো করে খুঁজে দেখবার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগল আজিজ। কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না,—সেই চিলের পাখার মত কটা রঙের ভবঘুরে কুকুরটা!

'এত কষ্ট কর্‌্যা তো মানুষ করিছি বাবা, সে কি ক্যাবল আরো কষ্ট পাবার লাগ্যাই?'—মা সজল চোখে প্রশ্ন করেছিলেন সেইদিন, যেদিন ওরা তার অবাধ বিচরণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল।

'আমার দোষ নিও না মা। সত্যি বলছি, তোমাকে কষ্ট দেবার আমার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। সত্যি বলছি। কেঁদো না। কেঁদো না মা, সোনা মা আমার—! কত কষ্টে যে সেদিন নিজের চোখের জল আটকে রেখেছিল আজিজ, বলা যায় না।

বাইরে ওদের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আর্তনাদরতা মা'র সমস্ত আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে তাদেরই একজন এসে তাগিদ দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। তারপর, এই পথ, এই ধূসর সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা পথে যাত্রা সুরু হল তার।

পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু মনে হয় যেন সেদিন! আরো কত বারই তো এই পথে গিয়েছে তারপর, কিন্তু সেইদিনের মত এত অসহ্য অনুভূতি আসেনি আর কোনো দিন তার মনে।

বোধ হয় এইটাই নিয়ম। প্রথম বিচ্ছেদটাই কষ্টকর, পরের গুলোতে তীব্রতা যায় ক'মে। প্রথম বার আত্মীয়-বিচ্ছেদের কষ্টের সাথে সাথে সংস্কারের বন্ধন ছেঁড়ার বেদনাও থাকে কি না! মায়ের জন্য কষ্ট হবার সাথে সাথে নিজের জন্যও কষ্ট হ'য়েছিল যে!

এখন আর ওসব নেই। চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে তার বর্ত্তমান অবস্থার সাথে। এখন এইটাকেই খুব স্বাভাবিক মনে হয় তার, আর সেই অবস্থাকে লাগে অস্বাভাবিক,—যেমন লাগত তার মা, আর রুকিনার কাছে সেই অবস্থাটাই খুব স্বাভাবিক, আর এইটাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক!···

বেলা দেখবার জন্য ওপরের দিকে চাইতে আজিজ দেখতে পেল, কয়েকটি

ধানের রঙের ফড়িং গোল হ'য়ে ঘুরছে তার মাথার ওপর। দুপুর গড়িয়ে যাবার যোগাড়। শীতকালের দিন, রৌদ্রের তেজ এসেছে ঢের কমে,—আদার মধ্যে হলুদের আভাস পাওয়া যায়। আজিজ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

চৌধুরী পুকুর দেখা যাচ্ছে। বছর পঞ্চাশ আগের কাটা ছোট একটা শানের ঘাট বাঁধানো পুকুর, পাড়ের ওপর প্রকাণ্ড বট গাছ আর তারই নিচে জমিদারদের তৈরী দুটি মুশাফিরখানা,—এই সেই বিখ্যাত স্থানটির সম্পত্তি। অন্য স্থানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হ'লেও একবার সমস্ত মাঠটা অতিক্রম ক'রে আসলে, সেই রকম অবস্থায়, পরিশ্রান্ত শরীরে স্থানটিকে সত্যই মনোরম, এবং তার চেয়েও যা সত্যকথা, প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়।—আজিজ ধুলোয় এবং ঘামে আচ্ছন্ন হ'য়ে বট গাছের নিচে এসে বসল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে কৌটো খুলে নাড়ুগুলো আগে শেষ করল আজিজ। তারপর খেজুরে গুড়ের সহযোগে চিঁড়ে চিবোতে লাগল। ক্ষিদের সময় এ-ই কী অপরূপ খাদ্য।

একদিন কাঙ্গালীচরণ তাকে এক আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিল।—খেতে খেতে আজিজ স্মরণ করল সেই দিনের কথা।—চার পাঁচটি যুবক নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা বলছিল। তাকে নতুন আগন্তুক দেখে থেমে গেল। কাঙ্গালী বলল, 'ইনি হ'চ্ছেন আজিজ মিঞা।'

যুবকগণ সসম্ভ্রমে সতরঞ্চির একটা দিক ছেড়ে দিল তার জন্য। একজন বলল, 'বসুন। আপনার কথা শুনেছি আমরা কাঙ্গালীর কাছে।'

তারপর সহজভাবে গল্প সুরু হ'ল আবার।

কাঙ্গালী বলল,' এঁর বাড়ী গ্রামে। সেখানকার সমস্ত ইতিহাস আর তথ্য এঁর কাছে তোমরা পাবে।'

'খুবই ভাল কথা, খর্ব্বাকৃতির একজন যুবক বলল, 'কেবল তথ্য আর আর ইতিহাস সংগ্রহ নয়, গ্রামে কাজ করবারও একজন লোক পাওয়া গেল।'

আরেকজন, অল্প বয়সেই টাক পড়েছে তার মাথায়, বলল, 'সেইটেই আসলে সত্যিকার উপকার হ'লো।···অবশ্য উনি যদি রাজি হন।'

'কী, তোমার মত কী আজিজ? যাবে?' কাঙ্গালী জিজ্ঞাসা করল।

এ কাজে যে বিপদ অনেক তা অবশ্য আজিজ খুবই জানত। কিন্তু অবস্থা

বিপাকে স্বীকার করা ছাড়া তখন আর তার গত্যন্তর ছিল না। বলল, 'আপনাদের মতেই আমার মত। যদি কিছু কাজ হবে তাতে মনে করেন, আমি নিশ্চয়ই তা'হলে যাব।'

সকলেই বিস্মিত হয়েছিল তার নির্ভীক উত্তরে। আজিজের সেদিন মনে হ'য়েছিল সে যেন এদের মধ্যে একজন সহীর,—'মার্টার'।

কয়দিন পরেই গ্রামে চলে এল সে। তারপর নাইট স্কুল, ছোট ছোট দল গ'ড়ে আলোচনা, এবং পরিশেষে তার অবাধ বিচরণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।—এই পথ, এই ধূসর সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা পথে তার সেই প্রথম দিনের যাত্রা।

শূন্য কৌটোটি কোটের পকেটে রাখল আজিজ; আরো কতদিন প্রয়োজনে লাগবে। তারপর ঘাটে নেমে অঞ্জলি বেঁধে খানিকটা জল খেয়ে এসে কোটটা গায়ে প'রে নিল। এবং পকেটে হাত দিয়ে এই দ্বিতীয়বার অনুভব করল সঙ্গে দেশলাই নেই। কয়েকটা বটের পাতা কুড়িয়ে তাই দিয়ে জুতোর ধুলোগুলো মুছে আজিজ সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

আর আধ ঘণ্টার পথ।

রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ পাশে চেয়ে দেখল আজিজ, সেই কুকুর। পায়ে আর মুখে কাদার দাগ। কোথাও ভিজে ক্ষেতে কাঁকড়া ধরবার চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। মনে মনে খুশি হ'য়ে চকিতে চারদিক চেয়ে নিয়ে আজিজ তার গায়ে জুতো দিয়ে একটু সুড়সুড়ি দিল। কুকুরটা লেজ নেড়ে সদিচ্ছার প্রতিক্রিয়া জানালো।...

ভাগ্যিস মানুষ নয়! আজিজ চলতে চলতে মনকে বলল, মানুষ হ'লে বুঝতে এতক্ষণ মজাটা। তুমি নেহাৎ তারি আনন্দের বা উপকারের জন্য কিছু করছ এ'তো বিশ্বাস করতই না,—উপরন্তু কামড়ে দিতেও লজ্জা করত না। কুকুরের গায়ে কল্যাণকামনা নিয়ে পা দিলে সেও কামড়াতে লজ্জা পায়, কিন্তু মানুষ পায় না। অবশ্য কারণও অতি সাধারণ।—কুকুর পশু, অত্যন্ত নিকট বর্তমানকেই সে সরলভাবে গ্রহণ করে; কিন্তু মানুষ মানুষই, সে পশু নয়, সুতরাং সমস্ত অবস্থাতেই সারল্যকে সে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে। এবং সেই কারণেই দৃষ্টতঃ তোমার ক্রিয়াকলাপে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হ'চ্ছে

না বুঝে অদৃশ্যভাবে তার কি কি ক্ষতি সম্ভব তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে। দৃষ্টান্ত চাই? তাদের গ্রামের রজবালী খাঁ, কানাই সামন্ত, রহিম খন্দকার—ইত্যাদি। সে যখন নাইট স্কুল খুলে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করল, তখন, যদিও বুঝতে পারল এর দ্বারা কোনো সমূহ সর্ব্বনাশ হবে না তাদের, তবু নিজেরা তো এলই না, উপরন্তু অন্য সকলের কাছে নানারকম রটনা ক'রে বেড়াতে লাগল। এবং শেষ পর্য্যন্ত তাতেও যখন মনের মত ফল পেল না, একেবারে ওপরওয়ালার কানে গিয়ে মধু বর্ষণ করতে লাগল তখন।...এ রকম দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র,—কি সহরে, কি গ্রামে! এত সন্দিগ্ধ, হীন মানুষের মন!

অবশ্য এসব বাধার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই কাজে নামতে হয় তা আজিজ জানে। আরো জানে যে, এরা ছাড়া আরো একদল মানুষ সংসারে সর্ব্বত্রই থাকে যারা উদার, অনাগতকে গ্রহণ করবার মত যথেষ্ট সাহস আর সজীবতা আছে যাদের মনে। তারাই হ'চ্ছে প্রেরণার উৎস, তাদেরই মুখ চেয়ে নেতারা শত দুঃখের ভেতরও সান্ত্বনা এবং সার্থকতা খুঁজে পান। আজিজও পেয়েছে এই রকম কয়টি লোকের সাহচর্য্য। এই ধূসর সরীসৃপের মত পথে আনাগোনা করতে করতে শক্তি, উৎসাহ এমন কি জীবনও শেষ হয়, তবু তার চিন্তার বীজ ছড়িয়ে থাকবে অনেক জায়গায়,—সমুদ্র পারের সেই জ্যোতিষীর গণনা সার্থক হবে একদিন।...

সামনে একটা সরু নালার ওপরে খেজুরগুঁড়ির পুল। আজিজ জুতো খুলে সাবধানে পার হ'ল সেটা। কুকুরটাও এল তার পিছু পিছু।

ওখানে পৌঁছে বেচারাকে কিছু খেতে দিতে হবে। আজিজ মনে মনে স্থির করল। তারপর কিনতে হবে একটি দেশলাই। বিড়ি না খেয়ে পেট ফেঁপে ওঠবার উপক্রম হয়েছে যেন!

'অত বিড়ি খাইয়ো না। যক্ষা হবি।' প্রেমের দাবিতে অনুরোধ জানিয়েছিল একদিন রুকিনা।

'ভালই তো হয় তাহ'লে। নিশ্চিন্ত হ'তে পার তোমরা।' আজিজ হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল।

'অঃ', রুকিনা ভুরু কুঁচকে হাত তুলেছিল তার দিকে, 'মুখের আটক নাই।

যা' তা-ই যে কও।'—সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিল তার দুই চোখে জলের ধারা।

সে কী অপ্রস্তুত,—।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে আজিজের।

ভাইয়ের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল রুকিনা। মধ্য পথে রজবালী সেটা হস্তগত করে। তারপর সেই চিঠি নিয়ে সে রুকিনার কাছে হাজির হ'ল। এবং কাগজখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী লিখেছিস ইয়ার মধ্যে ?'

'কিছুই না।'

রজবালী নিজে লেখাপড়া জানে না। সুতরাং এই রকম জবাবে মনে মনে সে অপমানিত মনে করল। শ্লেষের হাসি হেসে বলল, 'কিছুই না ? আচ্ছা, চাচারে দেখাই তা'লে !'

'দেখাও না ক্যান্। সে কি করবি আমাক ?' রুকিনা ঝাঁঝালো উত্তর দিল।

আসলে রুকিনার পিতা যে এর বিশেষ কিছু প্রতিকার করবেন না, এ রকম একটা সন্দেহ রজবালীর নিজের মনেও ছিল। সে চেয়েছিল, ভয় দেখিয়ে যদি কথা আদায় করা যায়। কিন্তু তাতে যখন কার্য্য উদ্ধার হ'ল না তখন আক্রোশটা আর সে গোপন রাখতে পারল না। কর্কশভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'তা আর করবি ক্যা ? রোজগারের পথ মারা যায় যে তা'লে !'

ইতিমধ্যে শূন্যহাতে ছেলেটি গিয়ে আজিজকে খবর দিয়েছিল। অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে আজিজ তাড়াতাড়ি চলে এল ওদের বাড়ীতে। বাহিরের উঠান দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেল সে, রুকিনা বলছে, 'চরিত্তির তুল্যা কথা কও তুমি, এমন আস্পর্দ্ধা ? তার মতন চরিত্তির পাইলে ধন্যি হয়্যা যাইতা তুমি। সে তোমাদের মতন কুত্তা না, বুঝল্যা ? সে মানুষ !'

এই অভাবনীয় স্বীকৃতির মাঝখানে আজিজ এসে দাঁড়াল। রুকিনার পিতা বাগানে কাজ করছিলেন, তিনি উঠে এলেন। আশে পাশের বাড়ী থেকেও ছুটে এল কয়জন।—এক দল কৌতূহলী জনতার সম্মুখে সে আর রুকিনা মুখোমুখী নিষ্পলক।

সেই আর একটা বিচিত্র অনুভূতি।···

রাস্তার ওপর দিয়ে এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে একটি বেজী চলে গেল সর্-সর্ ক'রে, কুকুরটা ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা ঢুকে তা'র অন্বেষণ করবার চেষ্টা করল। তারপর ফিরে এসে আজিজের চোখের দিকে লজ্জিত ভাবে চেয়ে নজের ব্যর্থতা জানালো। হাসতে যেয়ে গম্ভীর হ'য়ে আজিজ তার গায়ে জুতো বুলিয়ে সান্ত্বনা জানালো।

মা'র ইচ্ছে রুকিনার সাথে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবেন তাঁর ছেলেকে। তার জন্য কত কষ্টই না করেছেন তিনি, এই সামান্য ইচ্ছেটুকু পূরণ করবার মত দাবী তিনি করতে পারেন বই কি। কিন্তু হায়, এ অবস্থায় কী ক'রে সে তাঁর ইচ্ছাপূরণ করতে সাহসী হয় ?—এই অগ্নি-প্রজ্জলিত অবস্থায় ?

বরং সে বিপদের চেয়ে এই আছে ঢের ভাল। একটু কষ্ট হবে, তার আর কী করা যাবে। সামান্য এই ব্যক্তিগত কষ্টের বিনিময়ে যদি ভবিষ্যতে জাতিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে পাওয়া সহজ হবে মনে হয়, তবে সেই পথেই চলা ভালো। কষ্ট একটু যদি হয়, হোক উপায় নেই।

পথ ফুরিয়ে এসেছে। সামনের একটি দোকান থেকে দেশলাই কিনে নিয়ে অনেকক্ষণ পর একটা বিড়ি ধরালো আজিজ। আঃ, কি আরাম,—একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য আরাম করে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পশ্চাৎগামী কুকুরের কাছে সেই প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে আপন গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হ'ল।

একটু কষ্ট হবে, তা হোক,—বিড়িতে আবার টান দিল সে,—উপায় নেই। স্বাধীন দেশের ছেলে হ'লে যুদ্ধ করতেও তো যেতে হ'তো। তখন ঠেকাতো কে ?

বাজারের মধ্য দিয়ে পথ, কিন্তু এখন বিকেল ব'লে জনবিরল। বারোয়ারী কালীবাড়ীর আটচালার মধ্যে একটা তন্দ্রালু ঘোড়া লেজ নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে। পোষ্ট-আফিসের পাকা বারান্দায় কয়জন প্রচুর হট্টগোল ক'রে তাস খেলছে। বটগাছের নিচে টিউবওয়েলে গা ধুতে এসেছে একদল নিঃসঙ্কোচ স্ত্রীলোক।···

স্বাধীন দেশ হ'লে তার কর্ত্তব্য এর চেয়ে অনেক গুরুভার হত।—বিড়িতে শেষ টান দিয়ে আজিজ ভাবল,—তখন কী করতে পারতে ?···জীবনে দুর্ঘটনা আসা খুব একটা আশ্চর্য্য কিছু নয়। আমরা পরাধীন বলেই কি তাই নিয়ে বেশী আর্ত্তনাদ করব ?

না, তা চলবে না। তুমি যদি মানুষের মত বাঁচতে চাও সে বাঁচার মূল্যও তোমাকে দিতে হবে। কষ্ট হবে, বাধা আসবে,—কিন্তু তাই ব'লে হাল ছাড়লে চলবে না। এই দীর্ঘ ধূসর সরীসৃপের মত পথে আনাগোনা করতে করতে যদি তার জীবনও শেষ হয়ে যায়, তবু আদর্শভ্রষ্ট হ'তে পারবে না আজিজ।

স্বাধীন দেশের ছেলে হলে যুদ্ধেও তো যেতে হ'তো! তখন ? তখন ঠেকাত কে ?—পরাধীন বলেই কি এত আর্ত্তনাদ ?—তুমি যদি মানুষের মত বাঁচতে চাও, সে বাঁচার মূল্যও তোমাকে দিতে হবে। কষ্ট ?—আছেই!

মোড় ফিরতেই সামনে থানার লাল দালান। ঐখানে তাকে হাজিরে দিতে হবে। এই ধূসর সরীসৃপের মত পথটারও শেষ ঐখানে। আজিজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ভেতরে।

* * *

গেটের বাইরে সেই চিলের পাথার মত কটা রঙের ভবঘুরে কুকুরটা উত্তেজনায় জিব বের ক'রে সশব্দে ধুঁকছে।···

আজিজ ফিরবে কখন ?

মণীন্দ্র রায়

রসায়ন

সোনালি গোধূলি এল, তবু এই শূন্য চিদাম্বরে
মধ্যাহ্ন পিঙ্গল রুক্ষ। নীলে নীল হৃদয় আমার!
পাণ্ডুর বিহ্বল হল প্রাণদৃপ্ত ক্ষেত ও খামার
আকাঙ্ক্ষায় আসক্তিতে, তবু চিত্ত বিড়ম্বিত মরে।

সজ্জিত মদির প্রেমে পাল তুলি, দগ্ধ বিগলিত
দেহ তবু, বৈতরণী জলহীন, গোষ্পদেরও জল!
হে গ্রাম্য রাখাল, রেললাইনের কুলি! জীবনে চঞ্চল
করো সরস বস্ত্রায়, করো সাধারণ্যে প্রচলিত।

দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের—
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু কোনো বৃক্ষ হোক্, মেঘেরৌদ্রে ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত। ঢেলে দিক টাইমনেরা পলাতক ঋণ,
হেগেলের আত্মঘাতী ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে,
মাতিসের আলপনায়, সঙ্কীর্তনে মালার্মে-শিষ্যের॥

বিষ্ণু দে

ভ্রমণ

চলো প্রিয়া যাই আজ আকাশ ভ্রমণে।
আমাদের যুক্তবক্ষে সঞ্চারিত হোক সেই বেগ
পারে যা কাটায়ে যেতে পৃথিবীর আন্তরিক টান।
অন্তরীক্ষে প্রবেশিয়া হেরি
এ কি রুদ্র রূপ চারিপাশে।
নাহি আর ধরণীর বায়ুময় পরিবেশ
সাতরঙা তুলি লয়ে ফলাইতে ইন্দ্রধনু-ছটা
সাদা আর কালো,
অন্ধকরা সাদা আর অন্ধ ক্রূর কালো,
দ্বিখণ্ড করেছে দেশ, ধনতন্ত্রী সমাজের মতো।
দূরে চলে সৌরলোক ;
দশটি সন্তান লয়ে যৌথ পরিবারে
পৌত্রোপম উপগ্রহ
ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড সাঙ্গোপাঙ্গ সহ
বিরাজিছে সূর্য্য,
ইতিহাস-পূর্ব্বেকার গৌরবিনী গোষ্ঠীমাতা যেন।
মনে পড়ে কোন এক লুব্ধদৃষ্টি নক্ষত্র-তাড়নে
জাগিল তাহার অঙ্গে ভাবের জোয়ার।
গৃহশূন্য সে শিকারী,
তাহার স্বভাব নয় আকর্ষণ-ফাঁসে ধরা পড়া
নৃত্যপর তারাযুগ্ম-সম।
উধাও তাহার গতি আপন খেয়ালে
জ্যোতিষ্কের বনে।
ক্ষণিকের বাসনা জাগায়ে

আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্যের বিলাস-লীলায়
বিচলিত করি দিয়া তপনের অগ্নিময় প্রাণ
লুকাইল মহারণ্যে, মুছি নিজ নাম,
ফেলিয়া পশ্চাতে তার কীর্ত্তি আপনার—
সবিতার দেহোৎক্ষিপ্ত সৌর পরিবার।
ছায়াপথ-বলয়িত বিস্তীর্ণ এ ব্যোম
হেলায়-ছড়ানো অসংখ্য স্ফুলিঙ্গে ভরা।
অতিকায় দেহ কারো, রক্তবর্ণ দ্যুতি ;
আকারে বামন কেহ, জ্যোতি শুভ্রনিভ ;
আর সব আয়তনে সাধারণ, দীপ্তিতে অসম।
বিশ্ব কি একা-র মেলা ?
যতদূরে চাই,
পরস্পর-মুখ-চাওয়া এতগুলি বিভিন্নের সংহত জীবন
আর কোথা চোখে পড়ে না ত।
দূরে দেখি খণ্ড খণ্ড নীহারিকা
সাগরে দ্বীপের ন্যায় ভাসে হেথা-হোথা।
আরো দূরে আছে কিছু,
শূন্যের কি আছে কোনো শেষ ?
পরিধি ইহার যেন বাড়িয়া চলেছে
পলকে পলকে
প্রতিক্ষণে বহু লক্ষ রশ্মি-বর্ষ বেগে।
তবুও জেনেছি
জগৎ অনন্ত নয়, বর্ত্তুল মণ্ডল—বিবর্দ্ধায়মান
ফেনকের বুদ্‌বুদের প্রায়।

তাই, পূর্ণ করি পরিক্রমা
আবার আসিনু ফিরে একমাত্র জীবধাত্রী শ্যামলাঙ্গী
ধরিত্রীর ক্রোড়ে

আমাদের প্রেম যেথা রচিয়াছে নীড়
ঐ জগতের মতো সান্ত সীমাহীন,—
মরণ অন্তিমে যার, জীবন নির্ব্বাধ।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

গণ-সাহিত্য, শ্রেণী-সাহিত্য ও নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য

এবারকার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের অভিভাষণটী অপূর্ব্ব হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে অন্নদা-বাবুর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। যে ক'জন আই-সি-এস্ সাহিত্যিক আছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে অন্নদাবাবুর স্থান সকলের পুরোভাগে।

গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী কবিতা—সবক্ষেত্রেই অন্নদাবাবু মৌলিকত্বের দাবী করতে পারেন। তাঁর প্রবন্ধের বই 'তারুণ্য'—পরে যার নামকরণ হয়েছে 'আমরা'—কি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, কি ভাষার অভিনবত্বে অপূর্ব্ব। অন্নদা-বাবুর 'পথে-প্রবাসে' বাংলা ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে অতুলনীয়: ওতে আছে তারুণ্যের স্বপ্ন, যৌবনের দীপ্তি। ঔপন্যাসিক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। তাঁর 'এপিক-নভেল' বাংলা সাহিত্যামোদী সকলেই পড়ে থাকবেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

নতুনত্বের দিক দিয়ে, অভিভাষণটী অপূর্ব্ব হলেও মতামতের দিক থেকে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। 'আধুনিকদের কাছে, অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে।' অত্যাধুনিক কথাটা বরাবরই লঘু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অত্যাধুনিক শব্দটা শুনলেই যেন আমাদের মনে অন্য রকম ভাবের সৃষ্টি হয়। তবু আধুনিকের পরেও অত্যাধুনিক আছে এ-কথা অনস্বীকার্য্য।

'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' কথাটা এত বেশী আলোচিত সুতরাং জলো হয়ে গেছে যে ও নিয়ে নতুন করে আলোচনা না করলেও চলে। সাহিত্যের একটা সামাজিক সার্থকতা আছে। এ-কথা যদি অন্নদাবাবু স্বীকার করেন, তবে All art is entirely didactic এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন না তিনি।

Struggle for expression—ভাব প্রকাশের সংগ্রাম, এ-সব কথা আর্টিষ্টের বেলা খুবই সত্যি। আর্টের চরমতম উৎকর্ষসাধন আর্টিষ্টের লক্ষ্য। টাকা নয়। তবু বেঁচে থাকার জন্য টাকার দরকার। আর্ট পরে, জীবন আগে।

অতএব আর্টিষ্টকে বেঁচে থাকার জন্য আর্ট ছেড়ে অন্য একটা কিছু করতে হয়—ধরুণ বাজার সরকারী : যা তার কলা-সাধনার পক্ষে মারাত্মক। এর জন্য মূলত বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থাই দায়ী, অন্নদাবাবুও এ-কথা স্বীকার করেন। আর্টিষ্টও সামাজিক জীব। সমাজের বাইরে মাটীর উর্দ্ধে শূন্যে ঝোলা মেঘের দেশে তার ঘর নয়। কিম্বা পর্ব্বতকন্দরে কি গহন-অরণ্যে তার বসবাস নয়। যে আবেষ্টনী, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বর্দ্ধিত—সেখানকারই প্রতিনিধি সে। সেই জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখদুঃখ, মধ্যবিত্ত লেখকের কলমেই ধ্বনিত হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে মুচির ছেলে গর্কীই জনগণের,-আর্ত্ত জনগণের সুখদুঃখবেদনা ভাষায় রূপ দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। বিনু মথুরায় কিম্বা বৃন্দাবনে যাক্—বিনু প্রেমে পড়ে হাবু-ডুবু খেতে সুরু করুক, আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু সাহিত্যিক হতে হলে তাকে সাহিত্য করতে হবে। কাদের?—জনগণের, সমাজের, অন্তত যে-সমাজে যে-শ্রেণীতে সে বর্দ্ধিত সেখানকার। কারণ সে সামাজিক জীব।

সাহিত্য কিসের জন্য এবং কাদের জন্য? অন্নদাবাবু এ-কথার কিছু স্পষ্ট জবাব দেননি। বোধ করি দেওয়া সম্ভবপরও নয়। আমরা এ-কথা বহুবার বহু মনীষীর মুখে শুনেছি, আর্টিষ্টের কাছে, 'আর্টাৎ পরতরং নহি।' 'সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কি করে তা হয়, সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক।' এ-সব খুবই সত্যি।

সাহিত্য সৌখিন 'হবি'ও নয়। আবার পেশাদার হতেও অন্নদাবাবুর সখ নেই। আমাদের মনে হয়, 'হবি' এবং পেশার মাঝামাঝি আপোষের কোন স্থান নেই। সাহিত্যকে যদি সৌখিন হবি হিসাবে নেওয়া যায়, তবে তার সামাজিক মূল্য থাকে না। 'হবি' শব্দটার সঙ্গে 'আর্থিক সঙ্গতির' কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বড়লোকের হবি অনেক রকম থাকে। আমার খুসী আমি লিখব—আমার যা খুসী আমি লিখব। এ-কথার উত্তরে কিছু বলার নেই, এ-সব কথার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমার খোশখেয়াল মেটাবার জন্য আমি লিখি। এ-ধরণের সাহিত্য এবং সাহিত্যিক বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না।

আমরা যা বুঝি, লেখাটাও একটা পেশা, তবে মুদী কিম্বা ব্রোকার কিম্বা

আই-সি-এস-এর নয়, লেখকের। লেখাটা লেখকেরই পেশা। লেখক, আর্টিষ্ট সামাজিক জীব। তার খাওয়া-পরা আছে, তার ঘর সংসার আছে। হাওয়া খেয়ে, ফুটপাথে শুয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু সে-অবস্থায় তার সৃজনীশক্তি বেঁচে থাকতে পারে না। আর্ট আর্টিষ্টের পেশা, লেখাটা লেখকের পেশা—এ-কথা যতদিন আমরা স্বীকার না করছি, ততদিনে আর্টের সামাজিক সার্থকতা থাকে না। সমাজচেতনা বাদে আর্ট, ফুটবল খেলার মত, কি সখের নাটক করার মত, একটা সাধারণ 'হবি' মাত্র।

'ভালবাসা'। বড় লেখক মাত্রেই বিশ্ব-প্রেমিক। দরদী, মরমী। জনগণকে যে ভালবাসে সেই সত্যিকার গণ-সাহিত্যিক হতে পারে। মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের চিন্তাধারার জন্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মুখ্যত দায়ী। যে খেতে পায় না, সে আর্টাৎ পরতরং নহি ব'লে প্রচার করতে পারে না। আর্টই যে আর্টিষ্টের সর্ব্বস্ব, সম্ভবত সে 'গজদন্তের গম্বুজে থেকেই বেহালা বাজায়।'

আশ্চর্য্য! চারদিকে ঝড়ের কালমেঘ ঘনিয়ে এসেছে। সঙ্কেতসূচক সাইরেন তীব্র আর্ত্তনাদে বার বার সাবধান করে দিচ্ছে। সাইক্লোন এল বলে। আর্টিষ্ট তখন তার স্বনির্ম্মিত 'গজদন্তের গম্বুজ' থেকে 'বেহালা বাজাচ্ছে' আর্টাৎ পরতরং নহি!

বাস্তবে নেমে আসা যাক। ধূলাধূসরিত রাজপথে। জনারণ্যে। আর্টিষ্ট খেতে পাচ্ছে না। ভাঙ্গনধরা সমাজ তার আর্টের উৎকর্ষ দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এই 'অপরূপ' সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দায়ীত্ব কি অংশত আর্টিষ্টের নয়? 'দোষটা বিনু নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছে।' এ-কথা ব'লেই কি আর্টিষ্টের কর্ত্তব্য পালিত হয়ে গেল।

আর্টিষ্ট যতই বলুক, আর্ট আগে সমাজ পরে—social conscience দাবী করে, সমাজ আগে আর্ট পিছে। কারণ সে ত সমাজেরই মুখপাত্র। বড় আর্টিষ্টের লেখনীতে আমরা সমসাময়িক সমাজের চিত্র পাই, আর পাই ভবিষ্যৎ-বাণী।

এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে শ্রেষ্ঠ আর্ট শ্রেণীবহির্ভূত, চিরকালের।

অবিনশ্বর সাধারণ সম্পত্তি বিশেষ। কিন্তু তেমন সৃষ্টির জন্য বড় প্রতিভার দরকার—দরকার একটা বিশিষ্ট সময়ের। আমরা স্বীকার করি 'স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু সাহিত্য অপেক্ষা করতে পারে না।' কিন্তু সে-সাহিত্য বিলাসীর খেয়াল মেটাবার সাহিত্য নয়। সে-দিনের সাহিত্য দুঃখের, অন্ধকারের— দুর্গম পথের। জাতিকে সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ভবিষ্যতজ্ঞ। স্বরাজের সঙ্গেও সাহিত্যের সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

'এমন একটা রস সে দিয়ে যাবে যা, সমাজবিপ্লবের আগে, রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না।' কথাটা অর্থহীন, বলা উচিত ছিল, 'এমন একটা রস সে দিয়ে যাবে যা সমাজবিপ্লবের পরে (আগে নয়), রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফুরিয়ে যাবে না।

জমিদারের অত্যাচার, কলওয়ালার স্বেচ্ছাচারের সুলভ কাহিনী লিখে অবশ্য নাম করা, সস্তা হাততালি পাওয়া সহজ। 'কিছু গরম মশলার সঙ্গে মার্কস বাটা মিশিয়ে ওকে স্বাদু করা সহজ।' কিন্তু কৃষাণ-মজদুর নিয়ে লিখলেই তা 'নিম্নশ্রেণীর' সাহিত্য হবে এ-কথা আমরা স্বীকার করিনে। কৃষাণ-মজদুরও সামাজিক জীব।

কৃষাণ-মজদুরের সাহিত্য যদি শ্রেণীসাহিত্য হয়, দু'চারখানি শ্রেষ্ঠ বই ছাড়া পৃথিবীর সব সাহিত্যই শ্রেণীসাহিত্য। কেন না, আগেই বলেছি, সাহিত্যিক সামাজিক জীব। কোন এক বিশেষ আবেষ্টনী, পারিপার্শ্বিক ও সমাজকেই সে চিত্রিত করে। এক কথায় সমাজের কোন এক শ্রেণীকে। কেউ লেখে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে, কেউ উচ্চ মধ্যবিত্ত—কেউ বা বুর্জোয়াদের চিত্র আঁকে।

অন্নদাবাবু 'শ্রেণী-সাহিত্য' কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী-সাহিত্য মানে 'নিম্ন-শ্রেণীর সাহিত্য।' আমরা স্বীকার করতে পারি না। শ্রেণীসাহিত্য যদি নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য হয় ত সব সাহিত্যই নিম্ন শ্রেণীর সাহিত্য। সেই অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্রও দায়ী। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এক শ্রেণীর লোক নিয়েই লিখেছেন। শরৎচন্দ্রও দায়ী। কারণ শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্র এঁকেছেন। আসল কথা সাহিত্য, সাহিত্য হয়েছে

কি না, সেটা দেখতে হবে। যে-কোন শ্রেণীকে নিয়েই সাহিত্যিক লিখুন, লেখাটা সাহিত্য পদ-বাচ্য হওয়া সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। আর্ট কর্ম। আর্ট কর্ম সব কিছুর উপরে।

শ্রেণীসাহিত্য, গণসাহিত্য এবং নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। গণ-সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি সেই সাহিত্য, যা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জনগণ এখানে বৃহত্তর সমাজকেই বুঝাচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা-ই শ্রেণীসাহিত্য। এ-যুগের সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কল্পনাতীত। ব্যক্তি কি মুষ্টিমেয়ের অবসর বিনোদের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাই শ্রেণী সাহিত্য। সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হোক কি উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী হোক কিম্বা অন্য কিছু হোক।

এ-যুগের সাহিত্যে জনগণের বাণী, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিফলিত প্রতিধ্বনিত। তাই বলা হয় একে গণসাহিত্য। আসলে গণসাহিত্য ভুঁই-ফোড় একটা কিছু নয়। কৃষাণ মজদুর নিয়ে, মার্কস বাটা মিশিয়ে যদি কেউ 'সাহিত্য' সৃষ্টি করতে পারে, তাকে 'নিম্নশ্রেণীর' সাহিত্য ব'লে অবহেলা করা অমানবীয়, অহেতুক ত বটেই। কিন্তু মার্কসীয় সাহিত্যও সাহিত্যপদবাচ্য হওয়া চাই, সর্ব্বাগ্রে।

'সে ভীরু, ভীরু, ভয়ানক ভীরু।' কিন্তু ভীরু হওয়াটা তার একটা গুণ নয় যে এ নিয়ে প্রচার করা চলে। অন্নদাবাবু যতই না-করুন, আমরা বলব, ভীরু হওয়াটা কাপুরুষেরই লক্ষণ। এ যুগের সাহিত্যিক আর ভীরু নয়। সে সৈনিক। সে মসিজীবী বটে, কিন্তু অসি ধরতেও জানে। এরা writers in arms. 'জন সাগরে' অমৃতের সন্ধান করতে হলে, নির্ভীক পুরুষসিংহের মত তাকে জনগণের মাঝখানে নেমে আসতে হবে। চেকভ একটা বিশিষ্ট সময়ে লিখতেন বটে। কিন্তু তারপরেও অন্য লেখকেরা লিখেছেন এবং লিখছেন। সাহিত্যিকের কাছে চেকভই ষ্ট্যাণ্ডার্ড নয়। টলষ্টয় ব্যর্থ হয়েছেন ব'লে, (যদি সত্যিই হয়ে থাকেন) টলষ্টয়ের মত সার্ব্বভৌম সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস নিরুৎসাহিত হওয়া অবাঞ্ছনীয়। টলষ্টয়কে বড় করতে হলে, গর্কিকে ছোট করার দরকার হয় না। নিরপেক্ষ সাহিত্যস্রষ্টার কাছে টলষ্টয়ও সত্যি,

গর্কিও সত্যি। সর্ব্বহারাদের নিয়ে লিখতেন ব'লে গর্কি 'নিম্নশ্রেণীর' সাহিত্যিক আমরা এ-কথা ভাবতেও পারি না।

আমাদের বিশ্বাস, শ্রেণীহীন সমাজে সংবেদনশীল মনের যত স্বাভাবিক স্ফুরণ হয়, ধনতান্ত্রিক সমাজে তত হয় না। 'সত্যিকার সৃষ্টির ব্যর্থতা নাই'। সে গণ-সাহিত্য হোক কিম্বা শ্রেণী-সাহিত্য হোক। সোলকবের বই যাঁরা প'ড়েছেন তাঁরা আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন, গণ-সাহিত্যও আর্টের মাপকাটিতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের দাবী করতে পারে। And Quiet Flows the Dawn ও তৎপরবর্ত্তী সিরিজগুলো পড়ুন।

বীরেন দাশ

পুস্তক-পরিচয়

DUTCH VET—by A. Roothaert. (George Routledge & Sons Ltd). 9s. 6d.

রাউটলেজ প্রকাশক-সঙ্ঘ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রণীত উৎকৃষ্ট উপন্যাস-গুলিকে ইংরাজিতে অনূদিত করিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করে আসছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি হচ্ছে তাঁদের শুভ প্রচেষ্টার বিশিষ্ট নিদর্শন। এখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ডাচ ভাষায় 'ডক্টর ফ্লিমেন্' নামে। হল্যাণ্ড-এর এক নগণ্য নগরীর অন্তরঙ্গ কাহিনী এখানি। ফ্লিমেন হচ্ছেন জনৈক বিচক্ষণ পশু চিকিৎসক কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিতে নিতান্ত অপরিপক্ক এবং দুরদৃষ্ট—নির্যাতিত। পাঠক সে বেচারির ভাগ্যবিড়ম্বনায় যুগপৎ সহানুভূতি ও কৌতুক বোধ করে কিন্তু গ্রন্থখানির প্রকৃত সম্পদ নায়কের চরিত্রচিত্রণে প্রকাশ পায় নি—পেয়েছে ওলন্দাজ নাগরিক জীবনের চিত্রল অভিব্যক্তিতে আর জীব জানোয়ারের পীড়ার বিবরণে। পীড়াগ্রস্ত পশুর মেদ ও মাংসের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা বীভৎস না হয়ে অদ্ভুত ভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে রচনার নৈপুণ্যে।

ওলন্দাজ জাতি পশুপোষণে পারদর্শী ব'লে বিখ্যাত। দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংসের রপ্তানি হতে বহু অর্থ উপার্জ্জন হয় সে দেশে এবং পৌরনায়কেরা পশুপালন ও দুগ্ধ মাংস সরবরাহের যে সুব্যবস্থা করে থাকেন তা আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে কল্পনাতীত, তথাপি অজ্ঞ, অর্দ্ধ-শিক্ষিত চাষীর অভাব নাই সেখানেও এবং কুসংস্কারের প্রতিপক্ষে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা যে ভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে এই গ্রন্থখানিতে, তা এ দেশে ব্যাপক ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ডোমবের্গ সহরটি ছোট এবং সেইজন্য তার মোটামুটি সর্ব্বাঙ্গীন রূপ প্রকাশ করা সহজ হয়েছে। ছোট ছোট পৌরকর্ত্তা ও ধর্ম্মযাজকদের কুটিলতা এবং প্রৌঢ়া কুমারীদের পরচর্চ্চাস্পৃহার প্রতি বিদ্রূপ প্রকট হলেও গ্রন্থখানি আগাগোড়া কৌতুকাবহ ও হাল্কা।

নায়ক ফ্লিমেন-এর ব্যক্তিগত জীবনটি দুর্ভাগ্যমণ্ডিত। বেচারি বিবাহ

করেছিলেন যৌবনের প্রথমে এক শুচিবাইগ্রস্ত রমণীকে এবং তার শুচিতার প্রাবল্যে সহবাস পর্য্যন্ত অদৃষ্টে ঘটে ওঠেনি। তারপর দ্বাদশ বৎসর ধ'রে বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় ক'রেও পোপের নিকট হতে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি সংগ্রহ করতে পারেন নি। ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থার কাছাকাছি এসে যখন দ্বিতীয় বিবাহের সুখস্বপ্ন পরিহার করেছেন তখন তাঁর কিশোরী পরিচারিকা তার দুষ্ট পিতার প্ররোচনায় নিজের পুত্র সম্ভাবনার দায়ে অভিযুক্ত করে তাঁকে। গোঁড়া ক্যাথলিক নগরীতে ফ্লিমেন-এর মুখ দেখানো হয়ে উঠলো কঠিন। অবশেষে বন্ধুবর ডাকের, কনিষ্ঠ ভগ্নী হিল্‌ডা ব্যারণ, অল্ডারম্যান ফ্যানি-ডেয়-কান্ডও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় প্রকৃত দোষী অপরাধ স্বীকার করলো বটে কিন্তু ফ্লিমেন-এর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন না।

গৃহকর্ত্রী হিল্‌ডা বিবাহ করে সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকায় স্বামী গৃহে চলে গেল। বারবনিতাদের কাছে অর্থ বিনিময়ে প্রেম ক্রয় করা ছাড়া বেচারির উপায়ান্তর রইলো না।

এই শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্লিমেন-এর কর্ম্মজীবনের অধ্যবসায় ও পারদর্শিতা তাকে মহত্বের কোঠায় তুলেছে এবং আখ্যায়িকার রহস্য বিচারালয়ে দোষক্ষালন পর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সঙ্গিন হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থখানির সর্ব্বাঙ্গীণ গুণ ভাষান্তরে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি তা সহজেই বোঝা যায়। কথোপকথনের মধ্যে বাক্যক্রীড়া স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু হয়েছে তথাপি প্রকাশকের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক বিক্ষোভের মধ্যে শাসনযন্ত্রচালিত মিথ্যা সাহিত্য যখন প্রাধান্য লাভ করেছে তখন এই জাতীয় গ্রন্থ অলক্ষে থেকে প্রভূত ভাবে উপকার সাধন করে।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত; ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা হইতে এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'মুক্তি' শব্দটী এখানে সুপরিচিত আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বইটীর আর একটি নাম দিয়াছেন—"ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত"। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, ললিতকলায় তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহারই একটা objective বা ঘটনা-মূলক বিবরণ প্রদান করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের পার্থক্যের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জাতীয় ঐক্যের ও স্বাধীনতায় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল তাহা ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য ঘটনা। এই বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ ঘটনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ জানা শিক্ষার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সেই শিক্ষার বনিয়াদ যে পাকা হইবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থকার বহুদিন হইতে প্রাক্-কংগ্রেস যুগের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। প্রদত্ত বিবরণের সমর্থনকল্পে সর্ব্বত্র প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ না করিলেও যুগ সম্বন্ধে তাঁহার লেখাকে আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বইখানি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লেখা। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও লিখনভঙ্গী কৌতূহলোদ্দীপক। একই গ্রন্থে ভারতের রাষ্ট্রীয় মতবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও শাসন-সংস্কারের ইতিহাস এমন সুষ্ঠুরূপে অন্য কোথায় আলোচিত হইতে দেখি নাই।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মারাঠা জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব-রবি পশ্চিমাকাশে যেমন অস্ত গেল, তেমনি হিন্দুকলেজ স্থাপনার মধ্যে পূর্ব্ব গগনে যেন নবারুণের আলোকচ্ছটা দেখা দিল। বাংলাদেশেই ভারতের নব-জাগরণের সূত্রপাত হইল। বাগল মহাশয় গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাক্-কংগ্রেস যুগের রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধনের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ বাংলা-

দেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ঐতিহাসিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে বাঙ্গালীরা যে যে কারণে ভারতের নেতৃত্বপদ হইতে অপসারিত হইয়াছে তাহার কারণও তিনি বিশ্লেষণ করিবেন। তাঁহার গ্রন্থ মুখ্যতঃ বিবরণ-মূলক হওয়ায় আমাদের এ আশা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এখন কঠোর আত্ম-বিশ্লেষণের সময় আসিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের পক্ষে উন্নতিলাভ করা অসম্ভব; অথচ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে কতকটা আমাদের superiority-complex-এর জন্য এবং কতকটা দলাদলি ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের জীবনস্রোতে নিজদিগকে মিলাইয়া দিতে পারিতেছি না। ভারতে নব জাগরণ ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু কি কারণে আমরা আয়ারল্যাণ্ড, মিশর, চীন ও জাপানের বহু পূর্ব্ব হইতে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেও ঐ সব দেশ হইতে অনেক পিছাইয়া আছি তাহাও ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্তকারের অনুসন্ধানের বিষয়। যতটা অগ্রসর হইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যাহাতে দ্রুততর বেগে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি তাহারও উপায় বাহির করিতে হইবে। ঐতিহাসিক তাঁহার কার্য্য-কারণের সম্যক্ জ্ঞান লইয়া সেই পথের নির্দ্দেশ দিতে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত তথাকথিত নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা কম উপযুক্ত নহেন। বাগল মহাশয়ের আর একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি লইয়াই গঠিত নহে; ভারতীয় রাজ্যগুলিও তাহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সমস্ত রাজ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ কতটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাধনায় ইতালীর পিড্‌মাণ্ট সার্ডিনিয়া বা জার্ম্মাণীর প্রুশিয়ার মত হায়দ্রাবাদ মহীশূর বা বরোদা নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে কেন ও কতটা অক্ষম সেই সমস্যা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিবৃত করিলে বইখানি অধিকতর উপযোগী হইতে পারিত।

কিন্তু লেখক যাহা লিখিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা লইয়া আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। তিনি যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা যে নির্ভুল ও চিত্তাকর্ষক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। স্থানে স্থানে

তিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। যেমন, সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের রচনার যোগাযোগ (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা); ইংরাজদের এদেশে স্থায়ী বসবাস স্থাপন না করার কারণ বাষ্পীয় জলযানের প্রচলন (পৃঃ ৩); সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের উগ্র রাজনৈতিক মতবাদহেতু কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তাঁহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা (পৃঃ ১৭৩)। বাগল মহাশয়ের মতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যে "বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা সভা" স্থাপিত হইয়া অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিল, তাহাই, ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।"

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

আলালের ঘরে দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। মূল্য দেড় টাকা।

প্যারীচাঁদ মিত্র-লিখিত 'আলালের ঘরে দুলাল'-এর নাম জানেন না সাহিত্যানুরাগী এমন বাঙ্গালী কেউ আছেন কিনা জানি না, অথচ এই বই পড়িয়াছেন এমন লোকও কম। তাহার এক কারণ, এই জাতীয় পুরাতন পুস্তক, যাহাদের নাম হয়তো বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সহজে আমরা পাই না। তাই সাহিত্য পরিষদের এই পুনর্মুদ্রণ বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু 'আলালের ঘরে দুলাল' শুধু পুনর্মুদ্রিত হইয়া পাঠকের হস্তে পৌঁছায় নাই, তৎসঙ্গে বিস্তৃত ভূমিকায় এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক পটভূমিও প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" নামক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদির তালিকাও এই ভূমিকার অন্তর্গত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ।

} শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

উক্ত পুস্তিকাগুলি যথাক্রমে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। "সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।" এই সাধকদের মধ্যে অনেকেরই নাম আজ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগ ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যবসায়ের ফলে যদি তাহা না হয় তাহা হইলে দেশের যথার্থ উপকার হইবে। কেন না ইহারা শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, বাঙলা-দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসেও ইহাদের দান স্মরণীয়। সংক্ষিপ্ত আকারে ইঁহাদের জীবনী প্রকাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও এত অল্প আকারে ও এত অল্প মূল্যে এতখানি প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ অমূল্য। এই পুস্তিকাগুলির প্রত্যেকটির শেষে যাঁহার সম্বন্ধে পুস্তিকাটি লিখিত তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার ও তাঁহার রচনাবলীর তারিখ-সহ একটি তালিকা থাকিলে ভাল হইত।

শ্রীঅন্নদাচরণ রক্ষিত

সানাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৷৷০।
রোগশয্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৲ ও ৪৲।
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-কাব্যের পরিণত আঙ্গিকের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 'সানাই'র

বিভিন্ন ছাঁদের বিভিন্ন মেজাজের কবিতাগুলিতে। এর মধ্যে কতকগুলি লেখা 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দে। যথা :—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপজ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

কিম্বা

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখিনি,
তুমি ছিলে যেন সূক্ষ্মরেখিনী
ছবির মতো ;—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতরদিকের সন্ধানটুকু পাইনে।

অবশ্য এই পংক্তিগুলি 'পলাতকা'র চেয়ে 'মহুয়া'র কথাই বেশি মনে করিয়ে দেয়। এর অ-মিল সংস্করণও 'সানাই'-তে পাই। যেমন :—

বয়স ছিল কাঁচা
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই-এ-র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

এগুলি সবই হ'ল বিশুদ্ধ কবিতার নিদর্শন। কিন্তু 'সানাই'-তে এমন কতকগুলি রচনা আছে যেগুলি কবিতা হিসাবে সম্পূর্ণ হলেও যাদের মধ্যে গানের সুর প্রচ্ছন্ন আছে।

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
* * * *
ফেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা,
মনে মনে॥
সূর্য যখন অস্ত পড়ে ঢুলি,
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা,
মনে মনে॥

মনে হয় কবির কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন জড়িত রয়েছে এর ছন্দে।

'রোগশয্যায়' লেখা হয়েছে কবির ক'মাস আগেকার গুরুতর অসুখের পর, রোগীর ঘরের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে। শারীরিক অসুস্থতার কথা এর একাধিকা কবিতার মধ্যে আছে:

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।

কিন্তু এই অবরোধের গ্লানি কবির অন্তরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করেনি:

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে

নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক…

মৃত্যু যে নিরর্থক নয় তার প্রমাণ পাই ক্ষুদ্র এই কবিতাটিতে:

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখন দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে॥

বোধ হয় রোগশয্যায় শায়িত কবির সঙ্গে বহির্জগতের আদানপ্রদান বন্ধ ব'লেই তাঁর অনুভূতি হয়েছে আরো নিবিড়, তাই আশ্চর্য্য সংহতি লাভ করেছে এই কবিতাগুলি। এই সংহতির চরম দৃষ্টান্ত নিচের এই কবিতা:

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্য ছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান॥

রণেন্দ্রনাথ মজুমদার

পাঠক-গোষ্ঠী

"বাঙ্গালীর রাজনীতি"

'পরিচয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত শ্রীশচীন সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালীর রাজনীতি' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখক একটি কথা বার বার বলেছেন: 'বাঙলাদেশে কল্যাণ সৃষ্টির পথে বিশেষ বাধা আছে কারণ আমাদের পার্টি প্রথা সম্প্রদায়ের স্বার্থের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।' 'বাঙলাদেশে যে-পার্টি আছে, তা সাম্প্রদায়িক বিষে দুষ্ট হতে বাধ্য।' 'আমাদের দেশে পার্টি আছে—প্রোগ্রাম নেই।' 'রাষ্ট্রশক্তি থেকে যাঁরা বঞ্চিত, দেশে সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ থেকে যাঁরা প্রতারিত, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে কলহ না করলে পার্টিকে সজাগ রাখতে পারেন না। এবং পার্টিকে বাদ দিলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসন পেতে নেওয়া অসম্ভব। বাঙলা দেশে যত পার্টিই আছে—তাদের দেশসেবার সুযোগ সীমাবদ্ধ ব'লে নিজেদের ভিতর কলহ চলে। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও অকংগ্রেস—তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা চান।'

তাঁর মতে এই সমস্যা সমাধানের উপায় হ'ত 'যদি মুসলমান ও হিন্দুর শাসনযন্ত্র অধিকার করবার সমান অধিকার থাকত। অর্থাৎ আইন সভায় যদি সদস্যবর্গ বাঙালী বলে গৃহীত হ'তেন এবং ধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন মতের আশ্রয়ে পার্টি গড়ে উঠবার সুযোগ থাকত। আজ আমাদের সে-সুযোগ নেই; আজ আমাদের দেশের অপচয়কে বন্ধ করবার শক্তি নেই।' যেহেতু সমস্যা সমাধানের সুযোগ নেই সেহেতু তিনি প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত করছেন: 'বর্তমান ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নেই। এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের রাজনৈতিক পার্টিসমূহের খণ্ডদৃষ্টি অপসারিত না হ'লে দেশের কল্যাণ নেই। তাই বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা খিন্ন এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবসন্ন।'

এই নিরাশার সুর শুধু শচীনবাবুরই নয়। পরাধীন দেশে যে নীতি উপস্থিত ব্যবস্থাকে কায়েম থাকতে সাহায্য করে জনসাধারণের কাছে তা রাজনীতি নয়। পরাধীন দেশে যে নীতি স্বাধীনতা আনতে সাহায্য করে জনসাধারণের কাছে তাই রাজনীতি। বাঙলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই এই রাজনীতিতে অগ্রণী ছিলেন; প্রধানতঃ তাঁদের মধ্যে থেকেই আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী সংগৃহীত

হয়েছে; বিভিন্ন পার্টিও তাঁদের থেকেই গঠিত হয়েছে। আজ এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অনেক জায়গায় শচীন বাবুর মত নিরাশার সুর উঠছে। এবং এর ফলে হয় তাঁরা সাম্প্রদায়িক ডেমাগগির কবলে পড়ছেন আর নয়তো 'বর্ত্তমান ব্যবস্থায় খিন্ন এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবসন্ন' হ'য়ে রাজনীতিই ছেড়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশে ঢুকেছে সত্য। কিন্তু শুধু কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড থেকেই তার আমদানী হয়নি, সেটা তাকে সাহায্য করছে মাত্র। সাম্প্রদায়িকতা কেন এল এবং কেন বাড়ছে সেই মূল কারণগুলো যদি আমরা বার করতে পারি এবং কোনো পার্টির প্রোগ্রাম যদি সেই মূল কারণ দূর করতে সচেষ্ট হয়—তাহ'লে সমস্যারও সমাধান হয়।

বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুদিন আগেও হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের ভেদাভেদ তেমন মারাত্মক ছিল না, অথচ সেটা এখন ক্রমশঃই বাড়ছে। কেন? শুধু বাঙলাদেশ নয় সমস্ত ভারতবর্ষেই কর্ত্তৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা দেশের ওপর কর্ত্তৃত্বই করেন; কাজেই হিন্দু-মুসলমান দু শ্রেণীর জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গেই তাঁদের স্বার্থের বিভিন্নতা। আর সেইজন্যে দু শ্রেণীর জনসাধারণের তরফ থেকেই নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করার অর্থাৎ রাজনীতি করার চেষ্টা স্বাভাবিক! সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষও জনসাধারণের কিছু অংশকে অন্ততঃ নিজের তরফে টানবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়—অবশ্য যদি তার জন্যে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার না ক'রে জনসাধারণেরই অন্য অংশের খরচায় তা করা যায়। কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের সৃষ্টি এইজন্যেই। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অনেক পরে তৈরী হয়েছে—কারণ নবাবীর নেশা তাদের চোখে বেশীদিন লেগেছিল, নিরালম্ব হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মত অত তাড়াতাড়ি গোলামিতে ভিড়ে যাবার বুদ্ধি তারা ক'রে উঠতে পারেনি। এই নতুন মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়ে দেখল যে গোলামির অন্ধ্র রন্ধ্র হিন্দুরা দখল ক'রে বসে আছে, তাদের জন্যে আর জায়গা নেই। তাদের এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রিত কতকজন লোক নেতা হ'ল—তারা কর্ত্তৃপক্ষের ভিত দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করতে লাগল এই সাম্প্রদায়িকতার অজুহাত নিয়ে।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তো কর্ত্তৃত্ব রাখতে চান, তাঁরা তো এ রকম করবেনই। যাঁরা নতুন কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জনের রাজনীতি করতে চান তাঁদের কাছে 'এরকম না হ'লে আমরা রাজনীতি করতে পারতাম'—এটা কোনো কথা হ'ল না। এ রকম হবেই—একে আমরা কেমন ক'রে পরাজিত করব, এ সত্বেও কেমন ক'রে আমরা কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করব—এই হ'ল পরাধীন দেশের রাজনীতিকের কথা। বুদ্ধিজীবীরা বাঙলা দেশের জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশ। মোটের উপরে বাঙলা দেশের বেশীর ভাগ জনসংখ্যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি কি? চাষী

থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধিজীবী পর্য্যন্ত বেশীর ভাগের উপজীবিকা জমি ও চাষবাসের ব্যবস্থা ও সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে,—অবশ্য শহরের মুষ্টিমেয় চাকুরে বুদ্ধিজীবী ছাড়া।

চাষীর জমি ও উৎপাদন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শিকল দিয়ে বাঁধা। যার ফলে চাষীর জমি, উৎপাদন ও সমৃদ্ধি তো বাড়ছেই না, বরং চাষী দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে, তার ঋণের বোঝা বাড়ছে, জমি তার হাতছাড়া হচ্ছে। গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, যারা সাধারণতঃ উকিল, নায়েব, ছোট তালুকদার, জোতদার ইত্যাদিরূপে জমিদার ও চাষীর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম রাখার কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রে এসেছে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ক্ষয় হচ্ছে। চাষীর অর্থনীতিক নিঃস্বতার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও অর্থনীতিক ভিত্তি নড়ে উঠেছে। কি হিন্দু কি মুসলমান কেউই বাদ পড়ছে না।

হিন্দু নিম্নমধ্যবিত্ত প্রথম দিকে এর থেকে খানিকটা রেহাই পাচ্ছিল শহরে চাকরী ক'রে। কিন্তু দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভাবে বিস্তার করা কর্ত্তৃপক্ষের রাজনীতি নয়, কারণ তাহ'লে হোম কান্ট্রির মাল উপনিবেশে চলবে কেন? কাজেই সে পথও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ক্রম-বর্দ্ধমান দুর্দ্দশা থেকেই অসন্তোষ তীব্র হয়, আর সেই জন্যেই বাঙলা দেশের হিন্দু নিম্নমধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই অসন্তোষকে বার বার প্রকাশিত করেছে কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ রাজনীতিতে অগ্রণী অংশ গ্রহণ ক'রে।

কিন্তু সেই রাজনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় 'আমরা খিন্ন এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবসন্ন' কেন? বাঙলা দেশে এই রাজনীতিক মনোভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আজ রাজনীতিক দলের চেয়ে হিন্দু মহাসভার পুষ্টি বেশী পরিমাণে হচ্ছে কেন?

কারণ এই অসন্তোষ কর্ত্তৃপক্ষ-বিরোধী একটা অনির্দ্দিষ্ট সংগ্রামশীলতায়ই পর্য্যবসিত হয়েছে—অসন্তোষের পিছনে যে অর্থনীতিক ভিত্তি রয়েছে তাকে বাঙলাদেশের রাজনীতিকরা দেখেননি বা স্বীকার করেননি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শৃঙ্খল থেকে চাষী ও চাষীর জমিকে মুক্ত করবার সংগ্রামই যে বর্ত্তমান যুগে বাঙলা দেশের রাজনীতিক সংগ্রামের গোড়ার কথা তা আমাদের রাজনীতিকরা দেখেননি।

শচীন বাবুর কথা ঠিকই যে প্রোগ্রাম থেকেই পার্টি হয়। কিন্তু প্রত্যেক পার্টির প্রোগ্রামই আবার মোটের উপর একটা না একটা শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। আমাদের বাঙলা দেশে কংগ্রেসের মধ্যে যতগুলো দল আছে তাদের প্রোগ্রাম নেই একথা বলা ভুল। তাদের প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু তার প্রায় সবগুলিই দেশী ধনিকশ্রেণী তথা জমিদারশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রোগ্রাম। বাঙলাদেশের মরচে ধরা অর্থনীতিক ভিত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নষ্ট ক'রে বাঙলার অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে সত্যিকারের বিপ্লব নিয়ে আসবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং বাঙলা দেশের বেশীর ভাগ লোক অর্থাৎ কৃষকশ্রেণীকে এই

কার্য্যকরী প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সংগ্রামে টেনে আনবার আগ্রহ তাঁদের নেই। ধনিক-শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজি যা বলছেন তারি রকমফের করে এই সব পার্টির প্রোগ্রাম, তাঁর সত্যাগ্রহ পদ্ধতিরই ঝাঁজ বাড়িয়ে বা কমিয়ে এই সব পার্টির 'সংগ্রাম'।

বাঙলা দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক কর্ম্মীরা সংগ্রামশীলতার ঝোঁকে এই সব পার্টিতে আসেন, কিন্তু বোঝেন না যে ভূমি-বিপ্লব তথা কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে এক স্বার্থ হয়ে সংগ্রাম করাই বাঙলার প্রকৃত রাজনীতি। কাজেই গান্ধী-রাজনীতি যেমন ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই সব রাজনীতিও তেমনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে থাকে; এই সব দলের মধ্যে নিজেদের অর্থনীতিক অপচয়ের কোনো সমাধান না পেয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত রাজনীতিক তখন সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়েন; নয়তো 'ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় অবসন্ন' হয়ে রাজনীতিক চিন্তা থেকে অবসর নেন।

চাষী প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ধর্ম্মের গোঁড়ামির প্রতি যে দুর্ব্বলতা মানুষের মনের মধ্যে শত শত বছরের অতুলনীয় প্রপ্যাগণ্ডায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকেই যখন আবার কিছুটা অর্থনীতিক রংচং দিয়ে লোকের কাছে ধরা হয় তখন তাকে রোখা খুব শক্ত। যদি তখন আমাদের কংগ্রেসী রাজনীতিকরা তাদের মূল অর্থনীতিক সংগ্রামের দাবীর ওপরে সংগ্রাম করবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা তাদের চোখের সামনে উপস্থিত করতেন তাহলে সাম্প্রদায়িকতা রোখা যেত। কিন্তু তাঁরা তা না করে বরং অনেক সময়ে তাদের স্বার্থের বিরোধিতাই করেন। কাজেই জনসাধারণের মধ্যেও মুসলমান ও হিন্দু দুরকম সাম্প্রদায়িকতাই বিস্তৃত হয়।

'বাঙলা দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নেই' নয়—যথেষ্ট আছে। হিন্দু নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী আজও বাঙলার রাজনীতিক আন্দোলনে কর্ম্মী যোগাবার প্রধান উৎস। এঁরা যদি আজ 'বর্তমান ব্যবস্থায় খিন্ন ও ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবসন্ন' না হয়ে সাহসের সঙ্গে বাঙলা দেশের রাজনীতির এই মূল ভূমি-সংক্রান্ত দাবীকে স্বীকার করেন, চাষীর স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে বাঙলার বহু জায়গায় চাষীরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাতে যোগ দেন, তাহ'লে সাম্প্রদায়িকতার বাধা দুদিনে দূর হয়ে যাবে; দেশের মধ্যে সত্যিকারের বলশালী রাজনীতি ও আন্দোলন গড়ে উঠবে। অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা যতটা উগ্র হয়েছে তাকে কমাবার জন্যে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক adjustment-ও করতে হবে—কিন্তু সেটা আসল কথা নয়।

'আইন সভায় যদি সদস্যবর্গ বাঙালী ব'লে গৃহীত হতেন এবং ধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন স্বাধীন মতের আশ্রয়ে পার্টি গড়ে উঠত'—তাহ'লেই আমাদের রাজনীতি বা পার্টি সম্পূর্ণ হ'ত না। শাসনতন্ত্রে আমাদের অধিকার সীমাবদ্ধ। নতুন কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়। এবং নতুন কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করতে হলে আমাদের

রাজনীতি এমন হওয়া চাই যা বেশীর ভাগ জনসংখ্যাকে সংগ্রামে টেনে আনে। যে পার্টির প্রোগ্রাম এমন হবে এবং যে সক্রিয়ভাবে এর জন্যে চেষ্টা করবে সাম্প্রদায়িকতার বাধাকে সে দূর করতে তো পারবেই, নতুন কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করে তুলতেও পারবে।

এ রকম পার্টির ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশে নিশ্চয়ই রয়েছে। অবশ্য রাতারাতি ফল পাওয়া যায় না। শচীনবাবুর মত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোক যখন এরকম প্রোগ্রাম ও পার্টির প্রয়োজন অনুভব করবেন এবং সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন তখন তাঁদের আর খিন্ন বা অবসন্ন হতে হবে না, বাঙলা দেশের রাজনীতিও তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ্যায়ে গিয়ে পড়বে। ইতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ নাগ

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৪৭

পরিচয়

বিদেহ-কৈবল্য

যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, যিনি জীবন্মুক্ত—পূর্ব প্রবন্ধে আমরা তাঁহার স্বারাজ্য-সিদ্ধির ও নির্মাণমুক্তির কথা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ পথে না গিয়া দেহপাতে বিদেহ-কৈবল্য লাভ করিতে পারেন। এ মুক্তিতে মুক্ত পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—কোন দেহই থাকে না—এমন কি উপনিষদ্ যাহাকে 'দহর কোশ' বলেন—থিয়সফির 'Auric Body'—সেই অন্তরতম হৃদাকাশময় কোশং—যদ্দ্বারা চিন্মাত্র বা Monad-এর চিদাকাশ হইতে ঔপাধিক ভেদ সিদ্ধ হয়—কৈবল্যমুক্ত সেই চরম উপাধিরও বিলয় ঘটাইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে নিঃশেষে নিমজ্জিত হন। সে জন্য এ মুক্তির সার্থক নাম 'বি-দেহ' মুক্তি। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ এই বিষয়কে 'নিধন' বলিয়াছেন—

অশব্দে নিধনম্ এতি—অথ হৈষা গতিঃ।
এতদ্ অমৃতম্ এতৎ সাযুজ্যত্বং নির্বৃতত্বম্।
—মৈত্রায়ণী, ৬।২২

'সেই অশব্দে (পরব্রহ্মে) 'নিধন' প্রাপ্ত হন—নষ্ট ইব সমুদ্রে লয়ম্ এতি—ইহাই পরমা গতি, ইহাই অমৃতত্ব, সাযুজ্যত্ব, নির্বৃতত্ব (Summum Bonum)।'

ইহাই ব্রহ্মে 'অপ্যয়'—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রেতি—কৌষী, ১।৪

অথ যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি, ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন একীভাব—

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'সে অবস্থায় এই বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয় পরমাত্মায় একীভূত হন।'

এ কেবল মিলন নয়—মিশ্রণ, কেবল union নয়—unification,—কেবল unity নয়—identity.

তথা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

'তখন পুণ্যপাপপ্রহীন নিরঞ্জন মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের পরম সাম্য লাভ করেন।'

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্—মুণ্ডক, ৩।২।৮

ব্রহ্মবিজ্ঞানী নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

নদী যেমন করিয়া নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়

—বিদেহমুক্তি সেইরূপ মিশ্রণ।

তখন নদী আর নদী থাকে না সমুদ্র হইয়া যায়—বিদেহ-কৈবল্যেও জীব জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

যথা ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫

'যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শ কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হয়; তখন তাহাদের নাম বা রূপ, কিছুই থাকে না। তাহাদিগকে পুরুষ—এই রূপই বলা হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী অকল অমৃত হন।'

অন্যত্র এ অবস্থাকে ব্রহ্মে 'প্রবেশ' বলা হইয়াছে—খৃষ্টান মিষ্টিক্ যাহাকে 'Amalgamation with God', 'Immersion in the Absolute' বলেন।

যস্ত বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে।'

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি—কৈবল্য, ৩

'সেই গুহাহিত ব্রহ্ম, যিনি পরব্যোমে জ্যোতিষ্মান্, যতিরা তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'

সেই গীতার কথা—

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!
—গীতা, ১১।৫৪

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্
—গীতা, ১৮।৫৫

'অনন্যা ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়—দেখা যায়, এবং তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়।'

'(মুক্ত পুরুষ) ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'*

বৃহদারণ্যক এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি
—বৃহ, ৪।৩।৩২

এই সলিলের সহিত উপমা সার্থক—'the dew-drop slips into the shoreless sea'—এ অবস্থায় জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি
—কঠ, ৪।১৫

—যেমন শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু—জীবেরও তখন সেই দশা হয়।

বাদরায়ণ ইহাকে ব্রহ্মের সহিত 'অবিভাগ' বলিয়াছেন—

---

* ইহার সহিত সেণ্ট অগাষ্টাইনের নিম্নোক্তি তুলনীয়—

By faith to love Him, by faith to be devoted to Him, by faith to *enter* into Him—to be incorporated in His members.

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ * *' একমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি—নদীসমুদ্রাদি-নিদর্শনানি চ।—শঙ্করভাষ্য

'মুক্ত-স্বরূপের নির্ণয়কারী শ্রুতিবাক্য অবিভাগের কথাই বলিয়াছেন—নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্তেও ঐ কথা বলা হইয়াছে।'

অবিভাগ অর্থে একাকার দশা—'a state of indiscrimination' 'non-duality'—অর্থাৎ দ্বৈত নয়—অদ্বৈত—খৃষ্টানেরা যাহাকে At-one-ment বলেন—Becoming *one* with God.

পুনশ্চ—অবিভাগো বচনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

'বিদেহমুক্তিতে মুক্তের যে 'কলা-প্রলয়' হয়, তাহা কি সাবশেষ না নিরবশেষ? সাবশেষ নয়—নিরবশেষ। এইজন্য 'অবিভাগ' বলা হয়।'

স পুনর্বিদ্বঃ কলাপ্রলয়ঃ কিম্ ইতরেষামিব সাবশেষো ভবতি আহোস্বিৎ নিরবশেষ ইতি। তত্র প্রলয়সামান্যাৎ শক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিরেবেতি।

—শঙ্করভাষ্য।

বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্বাণ ও পরিনির্বাণের যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ভেদও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞার পরিপাকে অর্হতের সম্বোধি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন এখানেই (দেহ-সত্ত্বেই) তিনি নির্বাণ লাভ করেন, কিন্তু সে নির্বাণ 'সোপাধিশেষ' নির্বাণ। দেহান্তে ঐ অর্হতের যখন পরিনির্বাণ লাভ হয়, তখন সে নির্বাণ 'অনুপাধি-শেষ' নির্বাণ অর্থাৎ, নির্বাণ 'without any remnant of accessories'। * এই পরিনির্বাণই—বিদেহমুক্তি।

আমরা বেদান্তের ভাষায় যাহাকে অদ্বৈতসিদ্ধি বলিলাম, সেই বিদেহ-মুক্তি খৃষ্টান মিষ্টিক্‌দিগের অপরিচিত ছিল না—কারণ, নিপট দ্বৈতী হইলেও তাঁহারা

* The perfected Holy ones having rid themselves of all *upadhis* are submerged in the Deathless (অমৃত)—সুত্তনিপাত V.

ইহা পরিনির্বাণের অবস্থা। কারণ, দেহসত্ত্বে (নির্বাণের অবস্থায়) 'sensations are still felt. * * We are not indeed yet free *from* them but stand towards them as *free* men.'—The Doctrine of the Buddha, p 325.

স্বীয় অনুভূতির, অর্থাৎ স্ব স্ব 'temperamental reaction to the vision of Reality'-র অপলাপ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহাদের মুখে 'Self-loss in the All', 'Absorption in the Divine Dark', 'Annihilation of Selfhood in the nudity of Pure Being' প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের কয়েকটি উক্তির প্রতি কর্ণপাত করুন।

If I am to know God directly, I must become completely He and He I: So that this He and this I become and are *one* I.—Meister Eckhart.

Perfect love makes God and the soul to be as if they both together were but *one* thing.—Hilton's Scale of Perfection.

He disappears and loses himself in God—Suso.
My 'me' is God nor do I know my selfhood, except in God.
—St Catherine of Genoa.

In this embrace and essential unity with God, all devout and inward spirits are one with God, by living immersion and melting away into Him... In this highest stage, the soul is united to God without means; it sinks into the vast darkness of the God-head.—Ruysbroeck.

কোন কোন খৃষ্টান মিষ্টিক্ ইহারও উর্ধ্বে উঠিয়া মহামিলনের একাকারতায় অভিভূত হইয়া শূন্যতা-সিদ্ধির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

Some even go a step further and speak of the "fathomless sinking of the soul into a fathomless Nothing" (Tauler), 'of the soul being rapt into the nakedness of Nothing' (Henry Suso), 'of the self being annihilated in some mighty Life, that overpasses his own' (Underhill).

Hear Rusybroeck: "Having obtained the immediate contact of the Divine, we are immersed in *Nothingness*."

ইহাই উপনিষদের 'অশব্দে নিধনম্ এতি'।

বিদেহ-মুক্তের যখন প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—তখন 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি—এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত কোথায় গমন করিবেন'—এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞানী দেহসত্ত্বেই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন—সেই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য, যে ব্রহ্মের পূর্ব দিক্ পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, সর্ব দিক্ সর্ব প্রাণ—যিনি নেতি নেতি আত্মা।

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃপ্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃপ্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃপ্রাণাঃ, সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ—স এষ নেতি নেতি আত্মা।—বৃহ, ৪।২।৪

কিন্তু তথাপি আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মবিজ্ঞানীর পক্ষেও দেহপাতের পর তবে ব্রহ্মে অপ্যয়ের কথা বলিয়াছেন—

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে

—কঠ, ৫।১

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যতি—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ দিবঃ জ্যায়ান্ আকাশাৎ)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতদ্ ব্রহ্ম।

এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি

—কেন, ২।৫

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্যের উপদেশ এই :—

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সংপৎস্যে—ছা, ৬।১৪।২

ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

তস্য মুক্তাবিদ্যাভিনহনস্য তাবৎ এব তাবান্ এব কালঃ চিরংক্ষেপঃ সদাত্মস্বরূপ-সংপত্তেঃ। * * কিয়ান্ কালশ্চিরম্ ইত্যুচ্যতে—যাবান্ ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে * * যেন কর্মণা শরীরম্ আরব্ধং তস্য উপভোগেন ক্ষয়াৎ দেহপাতো যাবৎ ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, যাঁহার অবিদ্যারূপ মোহপট (bandage) তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ-সংপত্তির সেইমাত্র কাল ব্যাজ—যে পর্যন্ত না উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ের ফলে দেহপাত হয়।

ন হি দেহমোক্ষস্য সংপত্তেশ্চ কালভেদঃ অস্তি যেন 'অথ'-শব্দ আনন্তর্যার্থঃ স্যাৎ

'দেহপাত ও ব্রহ্মসংপত্তি অর্থাৎ বিদেহকৈবল্যের মধ্যে যখন কোনই অন্তরাল (interval) থাকে না, তখন মূলের 'অথ'-শব্দ 'অনন্তর'-অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে।'

এই সকল উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কি ? প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, জীবন্মুক্তের সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য ঘটে বটে, কিন্তু ব্যুত্থান-দশায় শরীর-ধর্মে প্রারব্ধ বশে পুনশ্চ তাঁহার সংসারের ভাণ হয়। কিন্তু জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে যখন বিদেহ-কৈবল্য সিদ্ধ হয়, তখন আর সে সম্ভাবনা থাকে না—তখন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয়।

বলা বাহুল্য, কৈবল্য-অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হয়, ত্রিপুটী তিরোহিত হয়, বিষয়-বিষয়ী অন্তর্হিত হয়, জীবভাবের অভাব হয়—এক কথায় ব্যক্তিত্বের বিলোপ হয়। এ সম্পর্কে সুফি কবি আত্তর তাঁহার 'Colloquy of Birds'-এ এইরূপ লিখিয়াছেন—

'The questing soul ultimately, reaches the 'valley of *Annihilation of self*' where the theopathetic state is attained, in which the self is utterly merged, 'like a fish in the sea' in the ocean of Divine Love.'

'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence)-এর গ্রন্থকর্ত্রীর বর্ণনা শ্রবণ করুন—

Where is thy individuality, lanoo ? Where the lanoo himself ?

It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the Eternal Radiance.

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া একজন প্রগাঢ় পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিয়াছেন—

For the Indian thinker ('thinker' না বলিয়া 'experiencer' বলিলে ভাল হয়—কারণ, ইহা মননের কথা নয়, অনুভূতির কথা), the religious ascent of the soul is towards a complete mystic *identity with the All*, in which *all separate individuality is lost*. At the highest point of consummation, the soul swoons, as it were, into the One, alone with the Alone ; it yet there knows itself as one with all the things, which on a lower plane of consciousness, it had distinguished from itself as other and foreign and hostile.—Prof. R. A. F. Hoernle of the Rand University, Transval.

এই ব্যক্তিত্বের বিলোপ লইয়া এত বিবাদ আছে, যে কথাটা একটু বিশদ করিতে চাই।

জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্

—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ, সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়।

সুতরাং তখন 'ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ' সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। তত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন

—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অনুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is * * from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one. —Deussen, p. 142.

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার-ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষি স্বয়ং ভাববর্জিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যং ইত্যাচক্ষতে—সর্ব্বসার উপনিষদ্

অর্থাৎ, 'The spiritual then subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things.'

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বাভাবিক—কিন্তু এই সমাধি যোগজ—সুদীর্ঘ-সাধন-সাপেক্ষ।

ঐ অবস্থা কিরূপ ?

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the Universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. * * In it there is no duality, no subject-

and object and consequently no consciousness in an empirical sense.'* কারণ, 'to be conscious means : there are objects for me' (Schopenhauer).

এই সমাধি সম্পর্কে অধ্যাপক হর্ণলি বলিতেছেন :—

'When the thinker has withdrawn into his innermost self—behold ! all barriers melt away and the self mingles with the boundless All, with which from the first it was one.

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক আর তুরীয়ই হ'ক—সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপ-অবস্থান অস্থায়ী (a transcient union) ঐ যোগ 'প্রভবাপ্যয়ৌ'—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য বৃহদারণ্যকে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীয়ের মহিমা কীর্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীয়ের উপরে যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition),—যাহাতে ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্—বৃহ, ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী † sole Subject without Objects) এবং অদ্বৈত (One without a second) ! হে সম্রাট্ ! ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—এখানে ব্রহ্মলোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ

—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমা গতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

* Deussen's Philosophy of the Upanisads.

† He (মুক্তপুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality.—The Doctrine of the Buddha, p. 336.

বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর, আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তান্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—বৃহ, ৪।৫।১৩

যেমন সৈন্ধবঘন (lump of salt) অনন্তর-অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্বত্র রসঘন,—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর-অবাহ্য, কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ 'নূর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায়-ভূত হ তে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য), অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যে তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন,—'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন। আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছু বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা'—অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪)—আত্মার উচ্ছেদ নাই বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষ-দশার কথা বলিলাম,—সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject-এ object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-রূপে (as the pure objectless knowing Subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তি, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ

করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে (বিদেহ-কৈবল্যের) অবস্থায় সমস্তই একাকার আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?'

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়,—'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয়—তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? অতএব 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'। অর্থাৎ, বিদেহ কৈবল্য-অবস্থায় 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা' আত্মা (the imperishable, indestructible ধ্রুব আত্মা) 'has no further consciousness of object, because as knowing subject he has everything in himself, nothing outside of himself *—তখন তিনি 'সোহং আপে আপ'।

আজ এই পর্যন্ত—বিদেহ-কৈবল্যের অবশিষ্ট কথা আগামীতে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp 349-50.

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কে দ'রসে থেকে জাঁ ফিরছে একদিন বিকালে, এমন সময় রু রোয়াইয়াল কোণ থেকে কে যেন ডাকল তার নাম ধরে। চমৎকার দিন সেদিন—কাফের বাইরে রাস্তার একাংশ অধিকার ক'রে যত ফ্যাশানেবল্ লোকের ভিড় জমেছে। সেই চমৎকার সন্ধ্যার মুখে সবাই বসে গেছে চেয়ার টেনে, পানপাত্র হাতে চারিদিক গুলজার ক'রে রাস্তার মোড়েই।

'সুন্দর যুবক, বসো তুমি এইখানে। কিছু পান করো। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয় আমার।'

দুই বিরাট বাহু বিস্তৃত হ'য়ে যেন তা'কে কোণ-ঠাসা করে। কাফে নিজের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে রাস্তার সম্মুখাংশ গ্রাস করেছে—তিন সার টেবিল পড়ে গেছে পরপর—তারই মধ্যবর্ত্তী একটা আসনে, বাধ্য হয়েই বসতে হয় জাঁকে। চারিধারের জনতার মৃদুগুঞ্জনে কুদালের নাম মুখরিত হয়ে ওঠে। গোস্যাঁ গর্ব্বিত বোধ করে নিজেকে।

প্রকাণ্ড পানপাত্র হাতে কুদাল বসেছেন মাঝখানেই—তাঁর সামরিক গোছের চেহারার বিপুলতার সঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে মানিয়েছেও চমৎকার। তাঁর পাশেই দ'শেলেৎ, ইঞ্জিনীয়ার ও অর্থশালী। এবং কাছাকাছি আরো হয়ত গুণী ও শিল্পী অনেক—গোস্যাঁ তাদের নাম জানে না।

জাঁ আসন গ্রহণ করা মাত্র কুদাল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন: 'কী? খুব সুন্দর নয় দেখতে—ঐ যে সামনের ছেলেটি? এক সময়ে আমিও ছিলাম ওর বয়সে, তখন আমারো চুল ছিল অমনি কালো আর কোঁকড়ানো। যৌবন—হায়রে যৌবন!'

'এখনো সেই এক কথা?' দ'শেলেৎ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'এখনো সেই আগের মতই হারানো যৌবনের জন্য হাহুতাশ?'

'ঠাট্টা করো না, বন্ধু! যা কিছু আমার আছে, মেডেল, পদক, সনদ,

ইনষ্টিটিউটের সদস্যপদ, এ্যাকাডেমির সম্মান, যা কিছু আমি, আমার কারিকুরি সব আমি এই মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারি যদি কেউ আমায় ঐ বয়েস আর অমন চমৎকার একখানা মুখ এনে দিতে পারে।'

তারপর গোস্যাঁর দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করেন কুদাল:

'তারপর সাফো,—সাফোর কথা বলো! তাকে নিয়ে কি করেছ তুমি? আজকাল কেউ আর দেখতে পায় না তাকে!'

জাঁ চোখ বড় বড় ক'রে তাকায়—বুঝতে পারে না।

'আর কি তার সঙ্গে নেই তুমি?' এবং তার বিস্ময় দেখে, কুদাল অধীর ভাবে যোগ করেন: 'সাফো, আহা—ফানি লর্গ্রা—ভিল্ দা'ব্রে-র!

'ও! সে অনেক দিন আগে চুকে গেছে!'

কী ক'রে যে মিথ্যা বলতে পারলে গোস্যাঁ! কেমন যেন লজ্জা বোধ হ'ল তার; তার নায়িকাকে সাফো-নাম দেওয়ায় কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল যে সত্যকথা প্রকাশে তার বাধা হ'ল। তাছাড়া, অন্য সকলের সঙ্গে, তার প্রিয়ার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতেও বাধল তার রুচিতে।

'বল কি! সাফো! এখনো সে তেমনি কাটাচ্ছে?' অবহেলাভরে জিজ্ঞাসা করেন দ'শেলেৎ।

'কেন, গত বছরে তোমার বাড়ির বল্‌নাচের আসরে তাকে মনে পড়ে না তোমার? মিশর-দেশীয় কৃষক মেয়ের পোষাকে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে! তারপর, এক হৈমন্তিক প্রভাতে, লেকের ধারে তাকে আমি এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে প্রাতরাশ করতে দেখেছি—তখন যদি তুমি তাকে দেখতে মনে করতে পনেরো দিনের নববধূটি যেন!'

দ'শেলাৎ বলেন: 'কত বয়স তার এখন তবে? অবশ্য, যখন থেকে আমরা জানি ওকে?'—

কুদাল অনুমান করতে সুরু করেন: 'কত? কত বয়েস? হিসাব ক'রে দেখা যাক,—৫৩ সালে ছিল সতের, যখন তার সাফোর মর্ম্মরমূর্ত্তি খুদেছি আমি আর এখন হচ্ছে ৭৩ সাল। অতএব নিজেই গুণে নাও।'

সঙ্গে সঙ্গে কুদালের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে: 'আহা! কুড়ি বছর আগে তুমি যদি দেখতে তাকে—দীর্ঘায়ত তনু, তন্বী, টুকটুকে ঠোঁট—ঝকঝকে

ললাট। এমন সুন্দর বাহুলতা—এমন বুক—সাফোর মডেল হওয়ার যোগ্যতা তারই ছিল কেবল! আর, এমন একটি মেয়েকে, নায়িকার মত পাওয়া। কী আনন্দের ঝর্ণাই না সর্ব্বাঙ্গে—কী আলোর দীপ্তিই না ছু'চোখে! সব সময়েই কোন-না-কোন সুর বাজছেই তার মধ্যে! 'সপ্তস্বরার ঝঙ্কার যেন তনুর-তনিমা ঘিরে!'—লা গুর্‌নেরি যা বলত!'

মড়ার মত বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করে জঁ।—'তিনিও কি তার প্রেমিকদের মধ্যে একজন?'

'লা গুর্‌নেরি? আমার ত' মনে হয়। ওঃ, কী কষ্টই না দিয়েছে আমায় লা গুর্‌নেরি! বছরের পর বছর আমরা একসঙ্গে বাস করেছি স্বামী-স্ত্রীর মত, চার বছর ত' গেছে তাকে মানুষ ক'রে তুলতেই আমার! গানের মাষ্টার, বাজনার মাষ্টার, সাহিত্যের মাষ্টার—কত কিছুর না মাষ্টার! এবং যখন আমি তাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে এমনি ক'রে হীরের টুক্‌রোর মত পালিশ ক'রে এনেছি—যাকে আমিই একদিন রাস্তার আবর্জ্জনার ভেতর থেকে কুড়িয়ে তুলে এনেছিলাম! লা গুর্‌নেরি—সেই পদ্য-মেলানো পাজিটা করল কিনা, এক সন্ধ্যায়, এক রেঁস্তোরায় খেতে খেতে, আমার চোখের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল তাকে!'

কুদাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—নিশ্বাস নিতেও যেন তার কষ্ট হ'তে থাকে। পুরানো প্রেমের ক্ষত যেন জেগে ওঠে তাঁর। অবশেষে, আবেগকম্পিত স্বরে আবার তিনি আরম্ভ করেন, অনেকটা শান্ত হয়েই এবার:

'কিন্তু এই পেজোমির ফলে তার লাভ হয় নি কিছুই। তিন বছর তারা ছিল এক সঙ্গে—কিন্তু নরক-বাসের মত হয়েছিল সে-জীবন। কবিটির ব্যবহার ছিল বর্ব্বরের মত, পাগলের মত—ছু'জনের দিনরাত এমন ঝটাপটি আর কামড়া-কামড়ি লেগে থাকত যদি দেখতে! তাদের বাড়ি গেলে প্রায়ই দেখা যেত, সাফোর চোখের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আর মুখে আঁচড়ের-কামড়ের চিহ্ন! কিন্তু এমনি মজা, লা গুর্‌নেরি যখন তাকে একেবারে ছেড়ে দিতে চাইল, তখন সে তার সঙ্গে লেগে রইল ঠিক জোঁকের মত। দিনরাত ছায়ার মত লেগে থাকে তার পেছনে, তার দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারে, দরজার বাইরে পাপোষের উপর বসে থাকে তার বেরুবার প্রতীক্ষায়। এক দুর্দ্ধর্ষ শীতের

রাত্রে ত' পাঁচ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়েই রহিল এক রেঁস্তোরার বাইরে—সেই রেঁস্তোরায়, লা গুরনেরি আর তাদের সবাই সমবেত হয়েছিল বিরাট নৈশ-ভোজে। কী দুঃখের কাহিনী! কিন্তু কবিবর অটল থাকলেন শেষ পর্য্যন্ত,—শেষে কিনা সাফোর হাত থেকে উদ্ধার পেতে পুলিশের শরণ নিলেন তিনি! কী খাশা ভদ্রলোক, আহা! অবশেষে, যেন এই সুন্দরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যই, তিনি বার করলেন তার শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রেমের কাব্য'—তা আর কিছু না, কেবল এই মেয়েটিকে অভিশাপ, গালাগালি আর হাহুতাশ! যে-মেয়েটি তার যৌবনের শ্রেষ্ঠকাল নিবেদন করেছিল তাকে, নিজের দেহ, নিজের সেবা, নিজের স্নেহের এক কণাও অবশিষ্ট রাখে নি—তার সেই দানের উপযুক্ত উপসংহারই বটে!'

পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে গোসঁ্যার পিঠ—স্তম্ভিত হয়ে সে সমস্ত শুনে যায়। পানীয় যেন গলে না তার গলা দিয়ে। নিশ্চয়ই তারা কোনো বিষ দিয়েছে তার পানীয়ে, তার গলা, বুক, পেট যেন বরফের মত শীতল হয়ে আসছে। এই চমৎকার আবহাওয়াতেই, শরীর তার শির্‌শির করে—সে কাঁপতে থাকে; অস্পষ্ট কী সব ছায়া ভেসে চলে তার চোখের সামনে।

এবার দ'শেলেৎ তার বিষোদ্গার সুরু করে:

'বাস্তবিক এই সব বিচ্ছেদ-ব্যাপার কী ভয়াবহ! ছু'জনে বছরের পর বছর থাকল একসঙ্গে; একসঙ্গে খেল, শুল, ঘুমোল; ছু'জনের স্বপ্ন আর ভাবনা মিলিত হ'ল এক মোহানায়। ছু'জনের কাছ থেকে ছু'জনের আলাদা কোন সত্তা নেই, সত্য নেই, গোপন করবার মত কোন রহস্য নেই। জীবন-যাপনের অনুরূপ অভ্যাস হয়ে গেল পরস্পরের—এমন কি, ছু'জনের কথাবার্ত্তা, কথা বলার কায়দা, আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত হয়ে গেল একরকম। ছু'জনে একসঙ্গে বাঁধা—যেন পরস্পরের অঙ্গীভূত—মিলে মিশে ছু'জনে এক। তারপরে হঠাৎ ছু'জনের হয়ে গেল ছাড়াছাড়ি—যেন ছিঁড়ে ছু'জনকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল আলাদা করে? অদ্ভুত না? কী করে হয় যে এ-রকম? সাহসই বা পায় কোত্থেকে? যদি আমার কথা বলো, আমি ত' করতে পারি না—এ রকম করব ভাবতেই পারি না আমি। হ্যাঁ, ধরা যাক্, মেয়েটি আমাকে ঠকিয়েছে, বঞ্চনা করেছে, বোকা বানিয়েছে, ওর জন্য উপহাসিত হয়েছি লোক সমাজে,

অনেক বদনাম সইতে হয়েছে আমায়, তবু সে যদি এসে চোখের জল ফেলে আমার কাছে, বলে, 'যেয়ো না'—তাহ'লে আমি ত' ছেড়ে যাই না কখনো। এবং এই কারণেই, আমার প্রেম হচ্ছে নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। প্রবাদ বাক্য আছে না সেই ?—নো' মরো অর্ এল্‌স্ ম্যারেজ। আমার ভালোবাসায় কালকের রাত নেই, থাকলেই, বিবাহ। এই দস্তুর হওয়া উচিত—এই হওয়া উচিত পুরুষের উপযুক্ত কাজ।'

'কালকের রাত নেই, কালকের রাত নেই—তোমার পক্ষে বলা সহজ বটে। কিন্তু এমন মেয়েও আছে যাকে একদিনের জন্য পেয়ে আশ মেটে না—একদিন দূরে থাক, একমাস, এক বছর, একযুগেও না। যেমন ঐ সাফো—ঐ মেয়েটি।'

'আমি ত' এক মুহূর্ত্তের বেশি প্রাধান্য দিই নি ওকে।' দ'শেলেৎ নির্ব্বিকার হাস্যে বলে: 'একদিনের বেশি ওকে আকাঙ্ক্ষা করবার মত কী আছে ওর মধ্যে ?'

'তাহ'লে তার কারণ হচ্ছে এই যে তোমাকে তার পছন্দ হয় নি। তা না হ'লে—সে তেমন মেয়েই নয়। সে যাকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে যেন আঠার মত লেগে থাকে, কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ে না। এবং যখন যার কাছে থাকে তখন তার প্রতি সে একনিষ্ঠ,—এ-বিষয়ে তার রুচি ঠিক গৃহস্থ বধূর মতই।'—

কুদাল বলতে থাকে:

'লা গুরনেরির পর সে গেলো দ'জোয়ার কাছে—ঔপন্যাসিক দ'জোয়া মারা গেল বেচারা। তারপর সে গেলো এজানোর হাতে, এজানো বিয়ে করল তাকে। তারপর রঙ্গমঞ্চে উপনীত হ'ল সুপুরুষ ফ্লামাঁ। সেই ফ্লামাঁ—খোদাইকার—যে আগে ছিল এক আর্টিষ্টের মডেল। চিরদিনই সাফোর ঝোঁক সুন্দরের আর প্রতিভাবানের প্রতি—। ফ্লামাঁর ভীতিবহ গল্প তুমি জানো বোধ হয় ?'

'কী গল্প ?' গোস্যাঁ জিজ্ঞাসা করে অবরুদ্ধ কণ্ঠে।

কুদাল আবার দম নিয়ে আরম্ভ করে সেই প্রেমের কাহিনী—কয়েকবছর আগে সারা প্যারিস যা তোলপাড় করে তুলেছিল।

—'খোদাইকার ছিল গরীব—পাগলের মত ভালোবাসত এই মেয়েটিকে। পাছে মেয়েটি তাকে ছেড়ে দেয়, এই ভয়ে, আর ওকে সুখে রাখবার জন্যে ব্যাঙ্কনোট জাল করে বেচারা। করতে-না-করতেই ধরা পড়ে যায়—ও আর ওর নায়িকা দু'জনেই। ওর হ'ল দশ বছরের কারাদণ্ড; মেয়েটি ছ'মাস সেন্ট্ ল্যাজারের হাজত বাস ক'রে, তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হ'লে—বেকসুর খালাস পায়।'

তারপর কুদাল, দ'শেলেৎকে মনে করিয়ে দেয় (দ'শেলেৎও উপস্থিত ছিল আদালতে এই বিচারকালে), জেলখানার টুপি-মাথায় কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল সাফোকে! কী রকম তার উদ্ধতভাব—ভয়ের বা বশ্যতার চিহ্নমাত্রও নেই—তার প্রণয়ীর প্রতি, শেষ পর্য্যন্ত, তার কী একনিষ্ঠ অনুরক্তি! আর প্যাঁচার মত জজসাহেবের মুখের উপর কী রকম সব তার চোটপাট জবাব! আর সর্ব্বশেষে, সেই যে সে তার চুমু ছেড়ে দিল, পাহারাওয়ালাদের মাথার উপর দিয়ে, ফ্লামাঁর দিকে—সেই তার কণ্ঠের ডাক যা পাথরকেও গলিয়ে দেয়—ভয় খেয়ো না, প্রিয়তম! আবার আসবে আমাদের সুখের দিন—আবার আমরা ভালোবাসব পরস্পরকে।

কুদাল বলেই চলে:

'তারপর থেকে, সে প্রণয়ীদের আর বাছবিচার করেনি—প্রত্যেক মাসে, এমন কি প্রত্যেক সপ্তাহেই প্রণয়ী বদ্‌লেছে। ওঃ! আর্টিষ্ট! কেবল আর্টিষ্টদের সে বয়কট করেছে তারপর থেকে—আর কোন আর্টিষ্টের প্রেমে পড়েনি! আর্টিষ্টের সম্বন্ধে ভয়ই হয়ে গেছে তার। কেবল আমিই বোধ হয় একমাত্র, আমার বিশ্বাস, যাকে সে সেদিনও মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে গেছে। আমার ষ্টুডিয়োয় এসে এক আধবার সিগারেট টেনেছে এক আধ দিন। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে আর তার খবর পাই না, অবশেষে একদিন তাকে আমি দেখলাম এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে, গত হেমন্তকালে এক সুপ্রভাতে এর মুখ থেকে মুখ দিয়ে আঙুর তুলে খেতে। তখন আমি বলেছি মনে মনে—সাফো আবার ছোবল্ খেয়েছে! প্রেমে পড়েছে আবার।'

এর বেশি আর শুনতে পারে না জাঁ। তার মনে হয় এর বিষ যেন ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে—শেষ মুহূর্ত্তের আর দেরি নেই। কিছুক্ষণ আগে

বরফ-শীতল হয়ে এসেছিল তার হাড়-পাঁজরা—কিন্তু এখন যেন তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের শিখা গিয়ে ঠেকেছে তার মাথায়; এই ক্ষণেই যেন ধাতুপাত্রের মত ফেটে টুক্‌রো-টুকরো হয়ে যাবে সে।

টলতে টলতে সে উঠে পড়ে—রাস্তা পার হয়ে চলে, গায়ের কাছ ঘেঁসে কোচগাড়ি ছুটে যায়—সে দেখতেও পায় না। কোচম্যানেরা চেঁচিয়ে ওঠে—'আহাম্মক!'—কে আহাম্মক? কার প্রতি চেঁচাচ্ছে ওরা?

(৭)

ম্যাড্‌লিন মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হেলিয়োট্রোপের গন্ধ এসে লাগে তার নাকে—এমন খারাপ লাগে তার! হেলিয়োট্রোপ—ফানির পছন্দসই সেন্ট্! এই সুগন্ধির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাড়াতাড়ি সে পা চালায়।

তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে—সমস্ত মন, আঘাতে-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত! প্রিয়াই বটে! সাফো, সাফো! এই রকম একটা মেয়ের সঙ্গে আমি এক বছর কাটিয়েছি ভাবলে'—

সাফো! সাফো! বারবার সে এই নামোচ্চারণ করে রাগান্ধ হয়ে। তার মনে পড়ে, কত সাধারণ বারাঙ্গনার ছবির তলায় এই নাম সে মুদ্রিত দেখেছে—এই নাম এবং এই ধরণের সব নাম: কোরা, কারো, ফির্ণেল ফোক্—!

এই ঘৃণিত নামের জ্বলন্ত অক্ষরগুলি যেন কেটে কেটে বসতে থাকে তার মস্তিষ্কে, সে যেন মনশ্চক্ষে ধারাবাহিক ভাবে দেখতে থাকে এই নারীর জঘন্য জীবন। কুদালের ষ্টুডিও থেকে সুরু, লা গুর্‌নেরির সঙ্গে সেই সব দৃশ্য, সেই রেঁস্তোরার বাহিরে প্রতীক্ষা—কিম্বা কবির দরজার বাহিরে পাপোষের উপর। তারপর সেই সুপুরুষ খোদাইকার, নোটজাল, পুলিশকোর্ট, এবং সেই কয়েদীর টুপি যা তাকে চমৎকার মানিয়েছিল এবং সেই জালিয়াতের উদ্দেশে উৎক্ষিপ্ত তার চুম্বন—'ভাবনা করো না, প্রিয়তম, আবার আমরা মিলিত হব, আবার ভালোবাসব আমরা!'—

প্রিয়তম! এই একই সম্বোধন, একই আদর—সে উপহার দিয়েছে

তাকেও। কী লাঞ্ছনা! এ-জঞ্জাল আজই সে ঝেঁটিয়ে দূর করবে। যতদূর সে যায়—হেলিয়োট্রোপের গন্ধও যেন তাড়া ক'রে চলে তাকে।

হঠাৎ সে আবিষ্কার করে এতক্ষণ মার্কেটের চারধার প্রদক্ষিণ করেই সে ঘুরছিল। শেষে নিজের রাস্তা ধরে, এক নিশ্বাসে পৌঁছায় বাড়ি এসে। পথেই সে সঙ্কল্প ঠিক ক'রে ফেলেছে যে পৌঁছেই সে বাড়ি থেকে তাড়াবে এই স্ত্রীলোককে, গালাগালি দিয়ে তাড়াবে, সটান ছুঁড়ে ফেলে দেবে সিঁড়ির বাইরে, কোন কৈফিয়ৎ না দিয়েই। সদর দরজার কাছে পৌঁছে সে ইতস্ততঃ করে, চিন্তা করে খানিকক্ষণ, কয়েক পা অগ্রসর হয়। নিশ্চয়ই ফানি চীৎকার করবে, কান্নাকাটি লাগাবে, রু দেল'আরকেদের সেই দিন সকালবেলার মত হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে—বস্তি-সুলভ অকথ্য কথার কলরব জাগিয়ে তুলবে পাড়ায়।

চিঠি? হ্যাঁ, লিখে জানানোই ভালো; কয়েকটা কঠোর বাক্যে সমস্ত ব্যাপারটা সহজেই চুকিয়ে দেওয়া যায় চিঠিতে। সাধারণ ইংরেজদের সস্তা-দরের একটা রেঁস্তোরায় সে ঢুকে পড়ে চিঠি লেখার উদ্দেশ্যে। রেঁস্তোরার ভেতর প্রায় শূন্য, একটা মিট্‌মিটে গ্যাসের বাতি জ্বলছে—একটা নড়বোড়ে কাঠের টেবিলের সামনে সে বসে। তার কাছাকাছি, একটি মেয়ে একমাত্র খদ্দের মড়ার মত বিবর্ণ হাতে, স্যালমন-ভাজা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করছে। এক বোতল মদের হুকুম দেয় জঁা। মদের বোতল ও গেলাস তার সামনে রাখা হয়, কিন্তু সে স্পর্শও করে না—তার চিঠি লেখা সুরু করে। কিন্তু অসংখ্য কথা তার মাথায় ভিড় করে এসেছে যেন—সকলেই ঠিক বেরুতে চায় এক সঙ্গে, অথচ দোকানের জংধরা দোয়াতের জমাট বেঁধে-যাওয়া বিকৃত কালিতে ভোঁতা কলম এগিয়ে চলে অতি ধীরে।

দু'বার তিনবার সে সুরু করে—তার মনের মত হয় নি, ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর সে চিঠি না লিখেই উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবার জন্য।

তার সন্নিকট থেকে, ভীরু কণ্ঠের একটা জিজ্ঞাসা আসে: 'আপনি ত পান করলেন না, আমি করতে পারি?'

গোস্যাঁ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

মেয়েটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, মদের বোতলের উপর। গেলাসে না-ঢেলেই, কোন সমারোহ না করেই, এক নিশ্বাসে পুরো বোতল খালি ক'রে আনে।

মেয়েটির দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা স্পষ্ট হয় গোস্যাঁর কাছে। কেবল এক টুক্‌রো স্যালমনেরই কয়েকটা পয়সা ছিল মেয়েটির—এক ঢোঁক বিয়ারে সে গলা ভেজাবে তার এমন সামর্থ্য ছিল না। বিগলিত করুণার ভাব জাগে জাঁর মনে—ওর উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হয়ে আসে সহানুভূতিতে। নারীর জীবন যে কতখানি দুঃখময়, অকস্মাৎ যেন প্রতিভাত হয় তার সামনে। সে বিচার করতে সুরু করে, এবার মানুষের হৃদয় দিয়ে,—নিজের নিরানন্দের সঙ্গে বোঝা-পড়া আরম্ভ হয় তার।

আর যাই হোক ফানি তার সঙ্গে ত' কোন মিথ্যাচরণ করে নি—সে কোন মিথ্যা কথা বলে নি তাকে। জাঁ যে তার জীবন-কাহিনীর কিছুই জানে না, তার কারণ সে নিজেই সে-সম্বন্ধে কোন দিন জানতে চায়নি, জানার প্রয়োজন বোধ করে নি। এখন ফানিকে দোষ দেবার, দায়ী করবার হেতু কী? সেণ্ট্ লেজারের হাজত-বাস? কিন্তু সে যখন বেকসুর খালাস পেয়েছে, সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে সেখান থেকে—তখন আর কি আছে বলবার? তার নিজের আগে অন্যান্য পুরুষ এসেছে ফানির জীবনে—সেই জন্যই? কিন্তু এ-রকম আসা যে সম্ভব তা-কি একেবারেই তার কল্পনার বাহিরে ছিল এতদিন? তা ত' নয়! তবে?

ফানির বিরুদ্ধে তার রাগের, তার অভিযোগের কি এই তবে কারণ যে ফানির প্রেমিকেরা সব নামজাদা লোক, সকলের সুপরিচিত, সুবিখ্যাত,—এই; কি হেতু যে সে ইচ্ছা করলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, কথা বলতে পারে, দোকানের জানালা-সজ্জায় দেখতে পারে তাদের ফটো? যে হেতু ফানি অখ্যাতনামাদের বদলে এদের পছন্দ করেছে—এই কি তার অপরাধ?

ক্রমশঃ তার অন্তরের তলদেশে, আপনা থেকেই জেগে উঠতে থাকে একটা গর্ব্ব—অসঙ্গত ও অনির্ব্বচনীয় এক গর্ব্ব! এই সব শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের সঙ্গে, সেও ফানির অংশ পেয়েছে—এদেরই সে অংশীদার, আর এরা সবাই তার ফানিকে এমনই মোহিনী দেখেছিল, প্রার্থনীয় মনে করেছিল, সুন্দর বলেই ভালোবেসেছিল তাকে। তারও ফানিকে সুন্দর মনে হয়েছে—ভালোবাসার মত মনে হয়েছে এবং ফানির স্বপক্ষে এই সব সুবিখ্যাতদের, সুরুচিশালীদের স্বীকারোক্তি তার নিজের নির্ব্বাচন ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাসের অটলতা দান করে।

তার হচ্ছে সেই তরুণ বয়েস, যে বয়সে লোক প্রেমে পড়ে, কেবল নারীর জন্যই, প্রেমে-পড়িবার জন্যই—সেই বয়েস, যে-বয়সে তার প্রেয়সী সুন্দরী বা প্রার্থনীয়া কি না কিছুই সে স্থির জানে না, বন্ধুদের প্রিয়ার ছবি দেখিয়ে তাদের প্রশংসিত দৃষ্টির প্রতীক্ষা করে কৃতনিশ্চয় হবার জন্য। কিন্তু সাফোর সম্বন্ধে ত' আর ভুল নেই কোন, কেননা স্বয়ং কুদার গড়েছে তার মর্ম্মরমূর্ত্তি আর লা গুর্নেরি গেয়েছে তার বন্দনা-গান! একটা মহিমার জ্যোতিশ্ছটায় যেন আত্ম-প্রকাশ করে ফানি!

কিন্তু তবু মনে মনে তার রাগ হতে থাকে এমন—বিজাতীয় এক রাগ! সাফো—সাফো! একটা সাধারণ গণিকা মাত্র তার প্রিয়া! এই ভাবে সে পথ চলতে থাকে, কখনও উত্তেজিত, কখনো বা শান্ত—চিন্তায়, আবেগে সমাচ্ছন্ন হয়ে—যখন সে বাড়ি ফেরে তখন রাত অনেক।

ক্লান্ত মন—পরিশ্রান্ত শরীর! এখন রাত কত? দুর্দ্দান্ত ড্রিলের পর নতুন সৈনিক যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি তখন তার দেহ ও মনের অবস্থা! তার দুঃখ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তখন। এখন সে সোজা বিছানায় যাবে, ঘুমোবে, তারপরে কাল সকালে ঘুম ভাঙলে,—রাগের বা বিরাগের বশে নয়, সোজা-সুজিই সে বলবে এই নারীকে: 'তুমি যে কী তা আমি জেনেছি। যাক, এ তোমারও দোষ নয়, আমারও দোষ নয়, কিন্তু আর আমরা থাকতে পারি না একসঙ্গে। আলাদা হওয়াই ভালো আমাদের।' এবং এই মেয়েটির কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে, একেবারে এর খর্পরের বাইরে যাবার জন্য, সে সোজা দেশে চলে যাবে, তার মার কাছে, ছোট বোনদের কাছে; তাদের স্নেহের সুশীতল ছায়ায়—প্যারিসের এই দুঃস্বপ্ন ভোলবার চেষ্টা করবে সে।

ফানি তখন বিছানায়, অনেক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। প্রজ্জ্বলিত বাতির আলোয়, একটা খোলা বই পড়ে আছে তার পাশে; এই বইটা পড়তে পড়তেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোস্যাঁ দাঁড়ায় গিয়ে বিছানার পাশে, তাকায় এই নারীর দিকে—কৌতূহলের দৃষ্টি তার চোখে: যেন এক আলাদা মেয়ে এ, তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, হঠাৎ তাকে দেখছে এই জায়গায়।

সুন্দর, ওঃ, কী সুন্দর! ঐ বাহুলতা, ঐ গ্রীবা, ঐ বক্ষস্থল—কোথাও একটু

দাগ বা বিবর্ণতার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে যে এই নারীর জীবনের উপর দিয়ে দারুণ ঝড় বয়ে গেছে—দুঃখের আর অস্বাচ্ছন্দ্যের, প্রতীক্ষার আর প্রেমের, উচ্ছ্বাস আর আবেগের, ভীতির আর অশ্রুজলের—উত্তেজনা ও আনন্দের।

অকস্মাৎ যেন কাঁদবার ইচ্ছা হয় গোর্স্যার—ভয়ানক একটা কান্নায় নিজেকে মুক্ত করার, ভাসিয়ে দেবার। একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা জেগে ওঠে তার মনে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

সপ্তম শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা সর্বত ইছতি সবে পাসংডা বসেয়ু।

(খ) সবে তে সয়মং চ ভাব-সুধিং চ ইছতি।

(গ) জনো তু উচাবচ-ছংদো উচাবচ-রাগো।

(ঘ) তে সর্বং ব কাসং তি একদেসং ব কাসং তি।

(ঙ) বিপুলে তু পি দানে যস নাস্তি সয়মে ভাবসুধিতা ব কতংঞতা ব দঢ-ভতিতা চ নিচা বাঢং।

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন যে সব সম্প্রদায়ের লোক যেন সর্বত্র বাস করিতে পারে।

(খ) (কারণ) ইহারা সকলেই সংযম ও ভাব (চিত্ত)-শুদ্ধি কামনা করে।

(গ) কিন্তু লোকে বিভিন্ন ছন্দের (ইচ্ছার) ও বিভিন্ন রাগের (বাসনার) হয়।

(ঘ) তাহারা (তাহাদের কর্ত্তব্যের) হয় সম্পূর্ণ না হয় একাংশ পালন করে।

(ঙ) কিন্তু বিপুল দান থাকিলেও (যদিও সে বহু দানশীল হয় তথাপি) যাহার সংযম, চিত্তশুদ্ধি, বা কৃতজ্ঞতা বা দৃঢ়ভক্তি নাই, সে বাস্তবিকই নীচ।

টিপ্পনী

(গ) উচাবচ=উচ্চাবচ=উঁচু ও নীচু=বিভিন্ন।

(ঙ) সয়মে—১মার ১ বচনে এখানে সয়মো হওয়া উচিত ছিল। ভাবসুধিতা ও দঢ-ভতিতা—'শুদ্ধিতা ও 'ভক্তিতা, এইখানে দুইবার বিশেষ্য-প্রত্যয় হইয়াছে।

নিচা = বৈদিক ক্রিয়া-বিশেষণ নীচা, এখানে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ক) হইতে (ঘ) বাক্যে অশোকের সর্ব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের প্রতি সমদৃষ্টি ও উদারতা প্রকাশ হইয়াছে।

অষ্টম শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) অতিকাতং অংতরং রাজানো বিহার-যাতাং ঞায়ংসু।

(খ) এত মগব্যা অঞানি চ এতারিসানি অভীরমকানি অহংসু।

(গ) সো দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা দস-বসাভিসিতো সংতো অযায় সংবোধিং।

(ঘ) তেনেসা ধংম-যাতা।

(ঙ) এতয়ং হোতি—বাম্হণ-সমণানং দসণে চ দানে চ, থইরানং দসনে চ হিরংণ পটিবিধানো চ, জানপদস চ জনস দর্সনং ধংমানুসসটি চ ধম-পরিপুছা চ তদোপয়া।

(চ) এসা ভুয়া রতি ভবতি দেবানংপিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ভাগে অংঞে।

অনুবাদ

(ক) অতীত কালে রাজারা বিহার-যাত্রায় (pleasure-tours) বাহির হইতেন।

(খ) ইহাতে (এই বিহার যাত্রায়) মৃগয়া ও তদ্রূপ অন্যান্য আমোদ (উপভোগ করা) হইত।

(গ) কিন্তু দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (তাঁহার) অভিষেকের—দশ বৎসর পরে সম্বোধিতে গিয়াছিলেন।

(ঘ) সেই জন্য এই ধর্ম্মযাত্রা (গুলি আরম্ভ হইল)।

(ঙ) ইহাতে (এই ধর্ম্মযাত্রায়) এইরূপ হইত—(যথা) ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ-দিগকে দর্শন করা ও দান করা, স্থবির (বয়োবৃদ্ধ) দিগকে দর্শন করা ও স্বর্ণ (দানে) পরিপোষণ করা, গ্রামের লোকেদের দর্শন করা এবং

তাহাদের যথাযোগ্য ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া ও ধর্ম্ম (বিষয়ে) প্রশ্ন করান।

(চ) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর (রাজত্বের এই) দ্বিতীয় ভাগ (তাঁহার কাছে) অধিকতর আনন্দ (দায়ক) হইয়াছে।

টিপ্পনী

অন্য রাজারা বিহার-যাত্রায় বাহির হন, অশোকও প্রথম জীবনে তাহাই করিতেন। পরে তিনি বিহার-যাত্রায় বাহির না হইয়া ধর্ম্মযাত্রায় বাহির হইতেন। ধর্ম্মযাত্রার অর্থ, বিহারযাত্রা ও ধর্ম্মযাত্রার মধ্যে পার্থক্য, এবং বিহারযাত্রার চেয়ে ধর্ম্মযাত্রাই যে তাঁহার পক্ষে সুখতর হইয়াছে, এই কথাই অশোক এই অনুশাসনটিতে বলিয়াছেন।

(ক) রাজানো—তিনটি অনুত্রের লিপিতে এই কথাটির স্থানে দেবানংপ্রিয় কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে 'দেবতাদের প্রিয়' কথাটি রাজাকে বা রাজার সাধারণ উপাধিকে বুঝাইত, যেমন His Majesty.

ঞায়ংসু < (আনুমানিক) ন্যয়াংসুঃ = নিরয়াংসুঃ = বাহির হইতেন।

(গ) অযায় সংবোধিং—ইহাতে বোধ হয় অশোকের বোধিক্রম দর্শনে যাত্রা বুঝাইতেছে। দিব্যাবদানে (ed. Cowell), পৃঃ ৩৯৩, অশোকের বোধিক্রম দর্শনের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ঙ) স্বয়ং সম্রাট বাহির হইয়া লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন, বহু দান করিতেছেন, আবার ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন এবং তারপর ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের দিয়া জিজ্ঞাসুর মত প্রশ্নও করাইতেছেন, এসব ব্যাপারে লোকে অশোককে নিশ্চয়ই খুব exploit করিত, তিনি যেমন চাহেন সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা শুনিবার ও পরে সে বিষয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করিবার ভান করিত, ভণ্ডামির দ্বারা সরল বিশ্বাসী ও অতি-আগ্রহবান সম্রাটকে প্রতারিত করিয়া অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা করিয়া লইত—এবং পরে বোধ হয় মুচ্‌কিয়া হাসিত ও সম্রাটকে অসাক্ষাতে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত।

পরিপুছা < পরিপৃচ্ছা = শুনিবার পর শ্রোতার (বক্তার নহে) প্রশ্ন।

তদোপয়া—২য় শিলানুশাসন, খ দ্রষ্টব্য।

(চ) ভাগে অংঞে = অন্য ভাগ = অপর (দ্বিতীয়) অংশ।

নবম শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা এব আহ—

(খ) অস্তি জনো উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহ-বিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসংহি বা; এতংহি চ অঞমহি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে।

(গ) এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে।

(ঘ) ত কতব্যমেব তু মংগলং।

(ঙ) অপ-ফলং তু খো এতারিসং মংগলং।

(চ) অয়ং তু মহা-ফলে মংগলে য ধংম-মংগলে।

(ছ) তংতে—দাস-ভতকমহি সম্য-প্রতিপতী, গুরূনং অপচিতি সাধু, পাণেসু সয়মো সাধ, বমহণ-সমণানং সাধু দানং; এত চ অঞ চ এতারিসং ধংম-মংগল নাম।

(জ) ত বতব্যং পিতা ব পুতেন বা ভাত্র বা স্বামিকেন বা—'ইদং সাধু ইদং কতব্য মংগলং আব তস অথস নিস্টানায়।'

(ঝ) অস্তি চ পি বুতং সাধু দান ইতি।

(ঞ) ন তু এতারিসং অস্তি দানং ব অনুগহো ব যারিসং ধংম-দানং ব ধমনুগহো ব।

(ট) ত তু খো মিত্রেন ব সুহৃদয়েন বা ঞাতিকেন ব সহায়েন ব ওবাদিতব্যং তমহি তমহি পকরণে—'ইদং কচং, ইদং সাধু ইতি; ইমিনা সক স্বগং আরাধেতু ইতি।'

(ঠ) কি চ ইমিনা কতব্যতরং যথা স্বগারধী?

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিতেছেন—

(খ) লোকে পীড়ার সময়, বা পুত্রকন্যার বিবাহের সময়, বা পুত্র জন্মের সময়, বা প্রবাসে (যাত্রা করিবার) সময় নানারূপ মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিয়া থাকে; এইসব এবং অন্যান্য (ব্যাপারেও) লোকে নানারূপ মাঙ্গলিক কর্ম্ম করে।

(গ) কিন্তু এই সব (ব্যাপারে) মহিলারা (স্ত্রীলোকেরা) বহুসংখ্যক ও বহুবিধ ক্ষুদ্র (তুচ্ছ) ও নিরর্থক মাঙ্গলিক করে।

(ঘ) মাঙ্গলিক কর্ম্ম করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

(ঙ) কিন্তু এতাদৃশ মাঙ্গলিকে অল্পই ফল হয়।

(চ) কিন্তু যে মাঙ্গলিকে বহু ফল হয় তাহা হইতেছে ধর্ম্ম-মাঙ্গলিক।

(ছ) তাহা (ধর্ম্ম-মাঙ্গলিক) এই—দাস ও ভৃত্যদের সম্যক সম্মান করা, গুরুজনকে মান্য করা, জীবদের প্রতি মৃদুতা এবং ব্রাহ্মণ শ্রমণদিগকে দান করা; এইগুলি এবং এইরূপ অন্য (কাজই) হইতেছে ধর্ম্ম-মাঙ্গলিক।

(জ) অতএব পিতার বা পুত্রের বা ভ্রাতার বা প্রভুর এইরূপ বলা উচিত—'ইহা সাধু, যাবৎ উদ্দিষ্ট ফল লাভ না হয় (তাবৎ) এইরূপ মাঙ্গলিকই কর্ত্তব্য।'

(ঝ) এবং ইহাও কথিত আছে যে দান করা সাধু।

(ঞ) কিন্তু এরূপ দান বা অনুগ্রহ (উপকার) নাই যেমন ধর্ম্মদান বা ধর্ম্মানুগ্রহ।

(ট) অতএব সেই সেই ব্যাপারে মিত্রের বা সুহৃদের বা জ্ঞাতিদের বা সঙ্গীর অবশ্য উচিত (অন্যদের) এইরূপ শিক্ষা দেওয়া—'ইহা কৃত্য (করা উচিত), ইহা সাধু; ইহার দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি শক্য (সম্ভব) হয়।'

(ঠ) এবং স্বর্গপ্রাপ্তির চেয়ে কর্ত্তব্যতর আর কি আছে?

টিপ্পনী

(ছ) অপচিতি, সয়মো, এবং সমণানং এই তিনটি কথার পর যে সাধু শব্দটি তিনবার এই বাক্যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অন্য স্থানের এই অনুশাসনটিতে নাই এবং শব্দটির এখানে কোন অর্থও হয় না। লিপিকার বোধ হয় তৃতীয় শিলানুশাসনের ঘ-বাক্যের স্মৃতিতে এখানে সাধু কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

(জ) 'পিতার···বা প্রভুর' ইহার পর তিনটি অন্য স্থানের লিপিতে যোগ করা হইয়াছে 'বা বন্ধুর, বা আলাপীর এমন কি প্রতিবেশীরও' (এইরূপ বলা উচিত)।

(ঝ) হইতে (ঠ) পর্য্যন্ত বাক্যগুলি কাল্‌সী, শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ রাতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ দেখা যায়। সেখানকার বাক্যগুলি এইরূপ—ঝ—কারণ অন্য মাঙ্গলিকের ফল সন্দেহময়; ঞ—তাহাতে ফলপ্রাপ্তি হইতেও পারে, নাও হইতে পারে; ট—এবং তাহা শুধু এই জগতেই (ফল দেয়); ঠ—কিন্তু ধর্ম্ম-মাঙ্গলিক কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; ড—ইহার দ্বারা যদি এই জগতে ফল নাও পাওয়া যায়, তথাপি পরজগতে অসীম পুণ্য লাভ হয়; ঢ—কিন্তু যদি ইহার দ্বারা এই জগতে ফল লাভ হয় তবে তাহাতে দুইই লাভ হয়, (অর্থাৎ) এই জগতে অভীষ্ট ফল লাভ হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পর জগতে অসীম পুণ্য লাভ হয়।

(ঠ) স্বগারধী < স্বগ + আরধী < আরধ্‌ধী < (আনুমানিক) রধ্‌ ধাতু = রাধ্‌ ধাতু, যেমন আরাধনা শব্দে।

দশম শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা যসো ব কীতি ব ন মহাথাবহা মঞতে অঞত তদাংপনে দিঘায় চ মে জনো ধংম-সুস্রূংসা সুস্রূসতা ধংম-বুতং চ অনুবিধিয়তাং।

(খ) এতকায় দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা যসো ব কিতি ব ইচ্ছতি।

(গ) যং তু কিচি পরাকমতে দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা ত সবং পারত্রিকায়, কিংতি সকলে অপ-পরিস্রবে অস।

(ঘ) এস তু পরিসবে য অপুংঞং

(ঙ) দুকরং তু খো এতং দুদকেন ব জনেন উসটেন ব অঞত্র অগেন পরাক্রমেন সবং পরিচজিৎপা।

(চ) এত তু খো উসটেন দুকরং।

অনুবাদ

(ক) বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে লোকে আমার দ্বারা ধর্ম্মপালনে প্রণোদিত হউক এবং ধর্ম্ম-শিক্ষা অনুসরণ করুক (এই উদ্দেশ্য) ছাড়া দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী যশ বা কীর্ত্তিকে খুব বেশী দামী মনে করেন না।

(খ) এইজন্য দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী যশ বা কীর্ত্তি ইচ্ছা করেন।

(গ) যাহা কিছু প্রচেষ্টা দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী করিতেছেন তাহা সবই পরলোকের (পুণ্যের) জন্য, এবং যাহাতে সকলের অল্প বিপদ হয়।

(ঘ) সেই বিপদ হইতেছে—অপুণ্য (পাপ)।

(ঙ) কিন্তু ক্ষুদ্র (নীচ) ব্যক্তির দ্বারাই হউক বা উচ্চ ব্যক্তির দ্বারাই হউক, পরিত্যাগ করিয়া বিপুল প্রচেষ্টা না করিলে ইহা করা বাস্তবিকই দুষ্কর।

(চ) ইহা আবার উচ্চ ব্যক্তির পক্ষে (আরও) দুষ্কর।

টিপ্পনী

(ক) মহাথাবহা = মহা + অর্থ + আবহা।
তদাংপনে < তদাত্তন < সং তদা + ত্ব = সেই সময় = বর্ত্তমান কাল।
দিঘায় < দীর্ঘ (কাল) = ভবিষ্যৎ।
"তদাংপনে দিঘায় চ" এই কথাগুলির স্থানে জউগড়-লিপিতে আছে "তদত্থায়ে আয়তিয়ে চ", তু· কৌটিল্য ২৪৮পৃঃ "তদাত্বে চ আয়ত্যাং চ"

(ঙ) উসট < সং উচ্ছ্রিত।

একাদশ শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ—

(খ) নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংম-দানং, ধংম-সংস্তবো বা, ধংম-সংবিভাগো বা, ধংম-সংবংধো ব।

(গ) তত ইদং ভবতি দাস-ভতকম্হি সম্য-প্রতিপত্তী, মাতরি পিতরি সাধু সুস্রুসা, মিত-সংস্তত-ঞাতিকানং বাম্হণ-স্রমণানং সাধু দানং, প্রাণানং অনারম্ভো সাধু।

(ঘ) এত বতব্যং পিতা ব পুত্রেন ব ভাতা ব মিত—সংস্তত—ঞাতিকেন ব আব পটীবেসিয়েহি 'ইদ সাধু, ইদ কতব্যং'।

(ঙ) 'সা তথা' করুং ইলোকচস আরধো হোতি, পরত চ অনংতং পুইঞং ভবতি তেন ধংম-দানেন।

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এরূপ বলিয়াছেন—

(খ) এরূপ দান (আর) নাই যেমন ধর্ম্মদান, বা ধর্ম্মের (মধ্য দিয়া লোকের সঙ্গে) পরিচয়, বা ধর্ম্মবিভাগ বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধ।

(গ) তাহাতে (অর্থাৎ ধর্ম্মদান, ধর্ম্মবিভাগ বা ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে) এই হয় (=বুঝায়)—(যথা) দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সম্যক সম্মান দেখান, মাতা ও পিতার আজ্ঞাপালন, মিত্র-পরিচিত ব্যক্তি-জ্ঞাতিদিগকে ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণদিগকে দান, এবং প্রাণীদিগকে কষ্ট না দেওয়া।

(ঘ) এই বিষয়ে পিতার বা পুত্রের বা ভ্রাতার বা মিত্র-পরিচিত ব্যক্তি-জ্ঞাতিদের এমন কি (সামান্য) প্রতিবেশীর পর্য্যন্ত এইরূপ বলা উচিত—"ইহা সাধু, ইহা কর্ত্তব্য।"

(ঙ) সে (=লোকে) এইরূপ করিলে ইহলোকেও (সুখ) লাভ হয়, পরলোকেও সেই ধর্ম্মদানের দ্বারা অনন্ত পুণ্য প্রসূত হয়।

টিপ্পনী

(গ) এই বাক্যের 'সাধু'-শব্দগুলি অন্য লিপিতে দেখা যায় না, ৯ম শিলানুশাসন, গিরণার, ছ-বাক্যের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(ঘ) তু. ৯ম শিলানু, জ ও ট বাক্য।

(ঙ) করুং—বাস্তবিকপক্ষে = সং কুর্বন্, কিন্তু এখানে পরবর্ত্তী বাক্যগুলির কর্ত্তৃপদ বিভিন্ন হওয়ায় 'করুং' nominative absolute রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইলোকচস < আত্মমানিক ইহলোকত্যস্ত ; "ইলোক"-এর আন্ত ই = ইতর, ইতঃ, ইহ প্রভৃতি শব্দের আন্ত ই।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

কালীপূজা

রাত্রি অমাবস্যা—
কী ঘুটঘুট্টি অন্ধকারটা ! তাইতে, কী সমস্যা !
এই গেল এক উৎসব,
দুর্গা গেলেন, এলেন কালী ;—ব্যবস্থা অদ্ভুত সব !
বিপদ লোকের পক্ষে,—
বাপদাদাদের ক্রিয়াকাণ্ড, না ক'রে নেই রক্ষে !
নিজের শরীর জীর্ণ
বহু আগেই বয়েসটা যে ষাট হোলো উত্তীর্ণ !
নাড়বে কে আর ঘণ্টা !
কালীপূজার আসর ফাঁকা,—কর্তার উৎকণ্ঠা !
বাড়ির যারা চাক্‌রে
সন্ধ্যে হোতেই ঘরে যে-যার শয্যা আছে আঁকড়ে !
ঘুমোয় ছেলে-ছোক্‌রা,—
এসেই ফিরে নিমন্ত্রিত পাশের বাড়ির লোক্‌রা !
অন্দরে দ্বার বন্ধ ;
ঘরের ছায়া সন্দ ধরায় নাচছে বা কবন্ধ !
গা লাগে ভার-ভার যে !
বাঘ আছে-বা থাবা পেতে কাছেই, শিকারকার্যে !
উঠল-বা হৈ-হল্লা
ডাকাত বুঝি চড়াও হোলো, করছে কোথায় সল্লা !
নেই বুঝি আজ উদ্ধার,—
কোন্‌খানে কে ছুরি শানায়, খুন ক'রে ধায় দুদ্দাড় !
পুরুত পূজা দিচ্ছে,—
কর্তা বলেন মাঝে মাঝে—"মা তারা, তোর ইচ্ছে !"

বংশে বটে শাক্ত,
কুমড়ো বলিই বিধান, মনটা অহিংসা-রসাক্ত।
আগ্রহে হয় যজ্ঞ,—
তার পরে-বা মা'র প্রসাদে মিলবে চতুর্বর্গ।
ব'সে আছেন কর্তা,—
পূজোর পরে যা প'ড়ে রয় নিতে হবে ঘর তা'।
নাতিনাৎনির ঘর তো।—
বাঁটোয়ারায় নৈবিদ্যি দেবার আছে সর্ত।
চাকরটা খায় মূর্তি ;—

কালের বুকে নাচছে কালীর যুদ্ধরত মূর্তি॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পটভূমি

আবার প্রলাপ বকে রুগ্ন দিন অপস্রিয়মাণ।
ভগ্নস্বাস্থ্য আজো অফুরাণ—
বজ্রাহত নভস্তলে নবতম বিবাহ-বাসরে
ঈগলের পক্ষচ্ছায়া নড়ে,
উত্তেজিত পদক্ষেপে মাঠে জড়ো শ্রমিক, কৃষাণ।

কবে যে ক্লান্তির শেষ এ জীবনে পাবো না-কি টের ?
সাম্রাজ্য-ভস্মের জের
ব্যাকুল মাধবীশাখে, আর রিক্ত উন্মনা হাওয়ায়,
দিগন্তে বিষণ্ণ চাঁদ সন্ধ্যা হ'লে যন্ত্রণায় কাকুতি জানায়।

স্থাণুবৎ বসে' থেকে চিত্তদৈন্য বেড়েছে কেবলি,
এর চেয়ে ঢের ভালো যোগ দেয়া সত্যাগ্রহী-দলে।
আমার সীমানা আঁকে জীর্ণ ঘর এই সরু গলি,
বিনোবা ভাবের নাম ইতিমধ্যে জেনেছ সকলে।

এখানে আকাশ-ভালে ফ্যাক্টরীর লৌহরেখা জ্বলে,
দীর্ঘকাল নিপীড়নে মানুষেরো হৃদয় ইস্পাত।
কী যেন আশায় ফের পীড়িতের হৃৎপিণ্ড দোলে,
কী যেন কী জিন্দাবাদে রাজপথ ভরে অকস্মাৎ।

আড়ালে উদ্যত থাকে মালিকের ডিক্টেটরী নীতি।
পদত্যাগ-পত্র দেন অতএব বিজ্ঞ সম্পাদক।
যদিও উভয় পক্ষে বহুকাল আছিল সম্প্রীতি—
অনিবার্য্য মতান্তরে সর্ব্বস্মৃতি এখন কণ্টক।

আবার ফাল্গুন আসে অরণ্যের আদিম গহ্বরে,
বিহ্বল বাতাস লেগে মদগন্ধ ঝরাপাতা ঝরে।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি আর কিসের আহ্বান ?
বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ, ভীতিপ্রদ ছায়া অফুরাণ।

গোয়েন্দারা হ'য়েছে তৎপর,
অগণিত জনসমাগমে ক্রমে ভরেছে প্রান্তর
বিপ্লব আসন্ন ভেবে মৃত্যু-ভয়ে বণিকের শুকালো অধর—
কে যেন নেপথ্যে হাঁকে : আর দূরে নয় যুগান্তর।

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ফাল্গুনী

স্বপ্নে তব গান ভেসে এলো—
ভেসে এলো শীতশীর্ণ শ্লথস্রোত বালুকাব্যাহত
ভুলে-যাওয়া যৌবনের খাতে
প্রাচীনপ্রণয়স্মৃতিশৈবালশ্যামল।.....

স্বপ্ন দেখেছিল একদিন :
দূর কোন্ অর্ণবের মিলনসঙ্গমে
নিজের নিরিক্ত সর্বনাশে
লভিবে সে পূর্ণিম মহিমা ;
কান পেতে শুনেছিল গান—
আপাত-প্রশান্ত সেই উদধির বিমগ্নমানসে
ঝিমি ঝিমি হিয়ার হিন্দোল।
বিস্মৃত স্বপ্নের গান—
তব গান ভেসে এলো
স্বপ্নে ভেসে এলো।

স্বপ্নে তব স্থর ভেসে এলো :
উদাত্ত সে-ধ্রুবপদ
শিলীভূত চেতনায় হানে অভিঘাত—
বিঘূর্ণিত স্থাবর-জঙ্গম,
বিকীর্ণ স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে
ভরি' দিলো প্রাক্‌সৃষ্টি আদিম তমসা
নব নব তারকার সৃজন-আভাসে।
নভস্পর্শী প্রদীপ্ত পাবক
বহুধা বর্ণের ছন্দে হিল্লোলিত শূন্য শূন্যতায়—
ঊর্দ্ধায়িত লোকাতীত লোকে
অতিমৃত্যু সঞ্জীবনী খোঁজে—
ছোঁওয়া যায় ছোঁওয়া নাহি যায়
রহিল যা পাওয়ার আড়ালে।

সেই তাল সমে ফিরে আসে—
বৈরাগিনী ভৈরবীর স্থগম্ভীর খাদে
অন্তর্লীন বিষাদের উদাস বিস্তারে।
সে-অব্যক্ত বেদন-গুঞ্জর
যোগীয়ার মীড় টানে মরমের অলখ বীণায়।
ঝঙ্কারের পটভূমি রচে
রন্ধ্রহীন ধ্বনি-অন্ধকার
লক্ষ লক্ষ মধুপ মক্ষিকা—
বীতপর্ণ অটবীকঙ্কালে
মধুচক্র রচিবারে ধায়।......

পথবাঁকে বসন্ত দাঁড়ায়ে।
আসন্ন ফাল্গুন॥

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

বৈদিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'বিশ' ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বরূপ ; এবং এই বিশই ছিল জনসাধারণ। প্রথমতঃ তাহাদিগকে আর্য্য বলা হইত (মহীধরের মতে আর্য্য-বৈশ্য-স্বামী এক অর্থ)। এই বিশগুলিকে একত্রিত করিয়া "জন" সংগঠিত হইত। একটি জনই একটি কোম (tribe) ছিল। এই 'জন' মধ্যে সকলেই আর্য্য ছিল ; অবশেষে 'আর্য্য' অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইত। আর্য্যদের বাহিরের লোকেরা—যেমন প্রাচীনকালের 'দস্যু' ও 'দাস' এবং ব্রাহ্মণযুগের 'শূদ্র', 'বর্ণ-সঙ্কর' ও 'ব্রাত্যে'রা আর্য্য সমাজে—তজ্জন্য আর্য্য-রাষ্ট্রে কোন অধিকার ভোগ দখল করিতে পারিত না। এতদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে প্রথমে 'বিশ' বা 'বশ্য'ই জনসাধারণ (Publicum) সংগঠন করে। এই জনসাধারণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী উদ্ভূত হইয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরূঢ় হয় এবং নিজেদের পূর্ব্বজ্ঞাতি বিশকে পদদলিত ও শোষণ করে। সহজ কথায় এই বলা যায় যে, একটি কৃষকদল হইতে শ্রেণীসংঘর্ষের দ্বারা দুইটি শ্রেণী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যাহারা অর্থনীতিক কারণ বশতঃ নিম্নে পড়িয়া রহিল তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়াছে। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় উচ্চস্তরের লোকেরা ভিন্ন মূলজাতির (race) লোক নহে—সকলেই এক জাতির লোক। বেদের উক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে সকলেই এক জাতির লোক। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণে দ্বি-নবতিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে—

'পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।

* * * *

এতস্য (শৌনকস্য) বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥" (৪-৫)

অর্থাৎ বৈদিক ঋষি গৃৎসমদের পৌত্র শৌনকের পুত্রগণই কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র —এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

বায়ু পুরাণের চতুর্থ অংশে অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—'ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ ইত্যেতে···'। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব নরপতি ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি; ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণেরই পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার বায়ুপুরাণের উত্তর খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—

'শ্রুয়ন্তেহি তপাঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ কেবলং গুণসম্পদা।' ১১১

শোনা যায়, তপসিদ্ধ ক্ষত্রোপেত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণত্ব) তাঁহারা গুণসম্পদ দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই পুরাণে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে :—

বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রাঃ ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তুতে॥ বায়ুপুরাণ, ৬০

অর্থাৎ ত্রেতা যুগেই ব্রাহ্মণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণচতুষ্টয়ের বিধান এবং সংহিতামন্ত্র প্রভৃতি প্রকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এইসকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্ণভেদ মূলজাতিগত পার্থক্যের (Race Difference) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—কর্ম্মবিভেদের উপরই স্থাপিত এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের লোকেরা একই রক্তসম্ভূত।

এতদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় সে এই শ্লোকটি ঋকবেদের পুরুষ-সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে খণ্ডন করিতেছে। পুরুষসূক্তের মতে বিরাট পুরুষ তাঁর দেহ হইতে চারিবর্ণের লোক সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মানব সৃষ্টি সেই সময় হইতেই হইল। কিন্তু বায়ুপুরাণ বলে—ত্রেতাযুগেই ব্রাহ্মণ-

ঋষিরাই এই চতুর্ব্বর্ণের সমাজবিধান প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিব যে 'বর্ণ' সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি নিছক কাল্পনিক মাত্র। যেমন প্রাচীন রোমে (Rome) কৃষক Patres বা Patricians-রা কেবল Publicum গঠন করিয়া রাষ্ট্রে অধিকার সমূহ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া দিত, তদ্রূপ বৈদিকভারতে প্রথমত 'বিশ-আর্য্য' সম্ভূত না হইলে কেহ নাগরিক অধিকার পাইত না। যেমন রোমীয় Patrician-Publicum গণ্ডীর বাহিরের Clients ও Plebs-রা রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত হইয়া সমাজে হেয় ও একঘরে হইয়া থাকিত, সেইরূপ বৈদিক ভারতের 'ক্ষি', 'উপক্ষি', 'শূদ্র', 'ব্রাত্য' প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রীয় অধিকারের অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া একঘরে থাকিয়া সমাজে ঘৃণ্য বিবেচিত হইত। ইহাদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না; তজ্জন্য সমাজেও কোন ক্ষমতা ছিল না। এই কারণেই দাস এবং শূদ্রের দুরবস্থা হইয়াছিল। ইহা ব্রাহ্মণদের খান-খেয়াল প্রসূত নয়। তাহাদের দুর্দ্দশার মূলে ছিল শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম। ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—শূদ্র রাজা হইয়াছে, মন্ত্রীর পদও পাইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণের স্তুতিভাজনও হইয়াছে (১)। রোমে যেমন একদল ধনী প্লেব (Plebs) ধনের জোরে Patrician সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য সমগ্র প্লেব-শ্রেণী সমানাধিকার পায় নাই এবং ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে যেরূপ একদল ধনী বুর্জ্জোয়া টাকার জোরে অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিতে পারিয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য সমগ্র বুর্জ্জোয়াশ্রেণী 'জাতি' পায় নাই, সেইরূপ প্রাচীন ভারতে ধনী শূদ্রেরা উপরের স্তরের লোকদের সহিত দহরম মহরম করিত। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শূদ্রশ্রেণী আর্য্য বা দ্বিজের অধিকার পায় নাই। বোধ হয় 'সংশূদ্র ও পতিত' বা 'অ-সৎ' শূদ্রশ্রেণীর প্রভেদ এইভাবে অর্থনৈতিক তারতম্য অনুসারেই সৃষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এই সকল দৃষ্টান্ত বৈদিক যুগের কোন শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আজ নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আর্য্যাবর্ত্তের গণ্ডীর ভিতর

১। ব্রাত্যদের পতন মূল জাতিগত পার্থক্য নহে—সমাজ-পদ্ধতির (Social Polity) পার্থক্য বশতই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের বুদ্ধের শিষ্য বলা হইয়াছে)। আবার রথকার, কর্ম্মকার প্রভৃতির শূদ্রত্ব অর্থনৈতিক কারণেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত শ্রেণী-স্বার্থের এবং তজ্জন্য শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিচয়ই প্রদান করে।

দাসবর্ণের লোকদের প্রবেশ লাভ নিশ্চয়ই একদিনে সংঘটিত হয় নাই। ইহার পশ্চাতে অনেক জাতিগত ও শ্রেণীগত সংগ্রাম নিশ্চয়ই ছিল। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার নিয়মানুযায়ী ইহা সংসাধিত হইয়াছিল। এই সংগ্রামের ফলেই আমরা বেদে শূদ্র রাজা, মন্ত্রী ও ধনীর কথা শুনিতে পাই, আর শুনিতে পাই উভয় বর্ণের মধ্যে বিবাহ! কিন্তু রোমীয় সমাজে যে কারণে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল সেই প্রকার কারণ বেদে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা পরবর্ত্তী যুগে আইসে।

আর্য্য-কৃষকদের রাষ্ট্রে একজন রাজা থাকিত। 'রাজন' শব্দটির অর্থ প্রথমত কতকটা গ্রীক Basileus, লাটিন Rex, ও কেল্টিক Rix শব্দের ন্যায় ছিল। অভিজাতবংশীয়দের মধ্য হইতেই একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইত। এইজন্য গ্রীক অভিজাতেরা সকলে যেমন নিজেদের Basileus বলিত, প্রত্যেক কেল্টিক কৌমের সর্দ্দারগণ নিজদিগকে Rix বলিত, তদ্রূপ-ভারতীয় অভিজাতবর্গ নিজদিগকে 'রাজন্য' বলিত। পরবর্ত্তী যুগের লিচ্ছবী কৌমগুলির প্রত্যেক সর্দ্দার বা মাতব্বর নিজেকে 'রাজা' বলিয়া পরিচয় দিত। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে 'রাজশব্দোপজীবিনঃ সংঘ'-এর কথা বলিয়াছেন এবং কৌটিল্যও পরবর্ত্তী যুগের এই প্রকার অনেক রাষ্ট্রের কথা তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় কৌমগুলির রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা বেদে পাই, তাহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে তখন সকল কৌম বা 'জন' মিলিয়া একটা বড় জাতি (Nation) হয় নাই। তাহারা রাষ্ট্র গঠনের সেই অবস্থায় ছিল যেই অবস্থায় জুলিউস সিজার গলের (France) কৌমগুলিকে দেখিয়াছিল। আর রোমীয় আক্রমণকে বাধা প্রদান করিবার জন্য যেমন তাহারা একটি কৌমের সর্দ্দার ভের্সিঙ্গেটোরিক্সকে তাহাদের প্রধান সেনাপতির পদে বৃত করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল তদ্রূপ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বৈদিক কৌমগুলিও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একটি কৌমের সর্দ্দারকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লইত। ইনি কিয়ৎকালের জন্য 'সম্রাজ' পদবী প্রাপ্ত হইতেন। পারস্যের অধিপতি যেমন কুরাসের সময় হইতে 'ক্ষয়থিয়া ক্ষয়থিয়ানাং' (রাজার

রাজা) উপাধি ধারণ করিয়া আসিয়াছে, তদ্রূপ 'সম্রাট' (Latin—Imperator, =Emperor) পদ বেদে অভিব্যক্ত হয় নাই, যদিচ শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে 'সম্রাজ' রাজার চাইতে বড়। এতদ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে বেদের কৌমগুলি সকলে মিলিত হইয়া একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে নাই; তাহাদের 'কৌম-রাষ্ট্র' পৃথক ছিল। সেই সময়ে প্রত্যেক কৌম স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা দেবতাকে অপর কৌমের দেবতা অপেক্ষা বড় বলিয়া দাবী করিত! এইজন্যই বেদে দেবতাদের কোন সংঘ বা স্তরভেদ (hierarchy) উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অনুকরণে দেবতাদের মধ্যেও বর্ণ ভেদ ছিল (২)। এই যুগে রাষ্ট্রগুলি একীভূত হয় নাই বলিয়া দেবতারাও একীভূত ও এক কেন্দ্রাধীন হয় নাই।

বৈদিক রাজারা প্রথমে একাধারে রাজা, পুরোহিত ও আইনের বিচারক (Judge) ছিল। এই রীতি আমরা গ্রীস ও রোমের প্রথমাবস্থার রাজাদের বেলায়ও দেখিতে পাই; পরে শেষোক্ত দেশসমূহে যেমন এই তিন প্রকার কর্ম্ম (Function) পৃথকীকৃত হয়, ভারতেও তদ্রূপ হয়।

ভারতের রাজন্যবর্গ (ক্ষত্রিয়গণ) ও ব্রাহ্মণেরা যে একই বংশ সম্ভূত ছিল—তাহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। দেবাপী ও শান্তনুর দৃষ্টান্ত ব্যতীত বিস্তর প্রমাণ আছে যাহা এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। ভবিষ্য পুরাণে একই পৌরব বংশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির কথা স্বীকৃত আছে। পুরুষসূক্তগুলি যতই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর জন্ম বিভিন্ন উৎপত্তির কীর্ত্তন করুক না কেন ইতিহাস উহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করে। আমরা গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে একই অভিজাত বংশ হইতে Aristocrats ও Priests উদ্ভূত হইয়াছিল। অভিজাতবংশীয়েরাই পুরোহিতের পদটি একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল এবং ইহার কোন প্রকার অন্যথা বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই দেশেও সমাজের

২। ভারতীয় সমাজের ন্যায় দেবতারাও চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল,—দেবতাদের মধ্যে অগ্নি, বৃহস্পতি প্রভৃতি—ব্রাহ্মণ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।৫—২।২।৯।১); ইন্দ্র, বরুণ, সোম প্রভৃতি—ক্ষত্রিয়; বসু, আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য, এবং পূষা প্রভৃতি শূদ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৪।২,২৩-২৫)।

উচ্চস্তরের লোকেরাই রাষ্ট্রের রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, এবং উভয় শ্রেণীই প্রথমে এক বংশোদ্ভব ছিল।

বেদে নর্ত্তকী ও বেশ্যার উল্লেখ আছে—শেষোক্তদের 'সাধারণী' (১,১৬৭,৪) এবং 'মহানগ্নী' (অথর্ব্ব ২০,১৩৬,৫) বলিত। আর 'নিয়োগ' প্রথা অর্থাৎ বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর দেবর অথবা স্বামীর স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদ্বারা পুত্রোৎপাদন প্রথা বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল (১০,৪০ ২)।

ভারতে বৈদিকযুগের সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, একটি পশুপালক জনসমূহ যাহা আদিমকালে সামাজিক স্তর-বিহীন ছিল তাহা ক্রমশঃ শ্রেণীভেদ অভিব্যক্ত করে। এই জনসমূহের যাযাবর আদিম অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য অজ্ঞাত; যখন তাহাদের সংবাদ বেদে উল্লিখিত দেখা যায় তখন তাহাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ যৌবনকাল। এই সময়ে তাহারা নানা সংঘর্ষের ভিতর দিয়া গিয়া শ্রেণীবিভেদ, রাজা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নাগরিকত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বিবর্ত্তিত করিয়াছে। অবশ্য এই বিবর্ত্তন হইতে অন্ততঃ দুই হাজার বা ততোধিক বৎসরেরও অধিককাল লাগিয়াছে। এক সময়ে এই রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ ছিল না—বংশ বা পেশা দ্বারা লোকের সামাজিক পদ নির্দ্ধারিত হইত না। ঋকবেদে এই বিখ্যাত শ্লোকটিই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। 'আমি একজন চারণ বা স্তোত্ররচনাকারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আমার পিতা হইতেছে ভীষক, আমার মাতা জাঁতা পিষে। বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়া, ধন কামনা করিয়া আমরা গরুর ন্যায় অপরের অনুসরণ পূর্ব্বক জীবন যাপন করি। সোম বহমান হও, ইন্দ্রের জন্য বহমান হও (৯,১১২,৩)।' বেদে অবশ্য আমরা কৌমপদ্ধতিকে বরাবরই থাকিতে দেখিতেছি; তবে সভ্যতার অগ্রগতির (advancement) সহিত তাহাদিগকে উন্নীত হইতে দেখা যায়। তাহাদের একাংশ নানা প্রকার ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকায় একটি ব্যবসায়ী (বৈশ্য) শ্রেণী উদ্ভূত করিতে দেখা যায়। 'দস্যু' ও 'দাস' শব্দদের পরিবর্ত্তে 'শূদ্র' নামে একটি অধিকার-বিহীন শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা তাপ দেবতার পুত্র,—শোকতাপ করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম। ইহারা এবং আরও কতকগুলি সমাজচ্যুত শ্রেণী লইয়া এই যুগের পতিত শ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল

শ্রেণীর ক্রন্দনের রোল ভারতের ইতিহাসে আদিকাল হইতেই শোনা যাইতেছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বলেন—আলেকজাণ্ডারের অভিযান পর্য্যন্ত ভারতের সভ্যতা প্রস্তরযুগের সভ্যতার স্তরেই অবস্থিত ছিল। ইহা যে সত্য নহে তাহা আজকালকার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে বৈদিকযুগের সভ্যতা কৃষ্টির কোন স্তরে অবস্থিত ছিল? বৈদিকযুগকেও প্রস্তর যুগ বলা যায় না। কারণ 'অয়স' ধাতু সেই যুগের শেষভাগে ব্যবহৃত হইত। 'অয়স' অর্থ প্রথমে 'পিত্তল' বুঝাইত, পরে 'ধাতু'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, যদিচ বৈদিকযুগের সভ্যতা বেশী উচ্চদরের ছিল না, তত্রাচ উহা 'প্রস্তর যুগ' অতিক্রম করিয়া ইহার ও লৌহ যুগের মধ্যবর্ত্তীযুগ যাহাকে Chalcolithic যুগ বলা হয়; সেই স্তরে বৈদিক আর্য্যেরা বেদের সময়ে উপনীত হইয়াছিলেন। ঋকবেদে প্রস্তর নির্ম্মিত তীরের ফলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৯।১১২।২); আবার ব্রোঞ্জ (Bronze) নির্ম্মিত জিনিষও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পরে কৃষ্ণায়স বা লৌহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋকবেদের এই যুগের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের সহিত মহেনজো-দাড়োর ক্যালকোলিথিক (Chalcolithic) যুগের সভ্যতার সহিত সমান স্তর-মিল নিরীক্ষণ করি।

বেদের পরবর্ত্তী যুগ

বেদের পরবর্ত্তী যুগ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের যুগ॥ এই যুগের শেষভাগে আমরা সঠিক ইতিহাসের অধ্যায়ে প্রবেশ করি॥ ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণকালে আমরা বেদের অভ্যুদয় স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্ব-আফগানীস্থান ও পাঞ্জাবে বিভিন্ন কৌম বা জনের সন্ধান পাই; এই জনসমূহের কতকগুলির সহিত আমরা বেদেই সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ভারতে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া ভারতকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করে। মৌর্যসাম্রাজ্য কৌমগত রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র-পদ্ধতি বিধ্বংস করিয়া সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারতীয় একজাতীয়তা (Nationality) আনয়ন করে॥

বৈদিকযুগের অবসান হইলে যেমন পৌরহিত্যবাদ প্রাধান্য লাভ করে,

তেমনি উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নানাপ্রকার উদার বা চরমপন্থীয় মতবাদ ও ধর্ম্মপদ্ধতি উত্থিত হইয়া পৌরহিত্যবাদকে হটাইয়া দেয়। এই যুগেই একদিকে যেমন পৌরহিত্যবাদের চিহ্নস্বরূপ স্মৃতিসমূহ রচিত হইতে থাকে এবং তাহাতে তাহাদের গুণগরিমা ও প্রাধান্যের কথাই কীর্ত্তন করে, অন্যদিকে বৌদ্ধজাতক সমূহ, জৈনদিগের পুস্তক, চার্ব্বাক প্রভৃতির মত সমূহে উহার বিপরীত দিক দেখা যায়। আমরা এইসব নূতন ধর্ম্মমতের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করি। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে 'রাজন্য'বর্গ ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণপূর্ব্বক নূতন ধর্ম্মসমূহ গ্রহণ করিতেছে; আর এইসকল ধর্ম্মের স্থাপয়িতাগণও রাজ-বংশীয়। এই যুগসন্ধিক্ষণেই যজুর্ব্বেদের 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্র সমূহে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে শ্রেণী সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়াছি, ধর্ম্মজীবনে ও সমাজ-পদ্ধতিতে উহার সমুর্ত্ততা আমরা দেখিতে পাই।

বোধ হয় বৈদিকযুগের পরে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যাস্ক জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বৈদিক শব্দের অর্থ তৎকৃত 'নির্ঘণ্টু' ও 'নিরুক্ত' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকে—'কিংতে কুর্ব্বন্তি কীকটেষু গাবঃ' নামক বৈদিক শ্লোকের অর্থ করিবার সময় তিনি বলিয়াছেন—'কীকটা নাম দেশো অনার্য্য নিবাস' (৩)। এই অনার্য্য শব্দের অর্থ কি? ইতিপূর্ব্বে আমরা 'অনার্য্য শব্দটিকে 'কৃষ্টিবাচক বলিয়া ধরিয়াছি। 'অনার্য্য' যে ভেদ্দা-পূর্ব্ব বা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতীয় একমূলজাতির লোক তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নাই। কীকটেরা 'অনার্য্য'। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন যে, তাহারা 'অদিক্ষীত' ও ব্রহ্মণ্যবাদে আস্থাবান ছিল না, অথবা তাহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল বলিয়াই যাস্ক তাহাদিগের উপর ক্রোধভরে এই অপবাদ দিয়াছেন (৪)।

এই সময়ের খুব নিকটবর্ত্তী কালেই বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই মগধকেই প্রাচীনকালে 'কীকট' নামে অভিহিত করা হইত (৫)। হয় বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের ফলে অথবা তাঁহার অগ্রগামী অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপক্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারের ফলে কীকটের লোকেরা

৩। যাস্ক—নিরুক্ত, ৬।৩২।
৪। Weber—Ind. Stud.—1. 186.
৫। এই বিষয়ে মতান্তরও আছে।

ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্যবাদ গ্রহণ করে নাই বলিয়া তাহাদের যাস্ক এই অপবাদ দিতেছেন, অথবা তখনও মগধ আর্য্যসভ্যতা বা আর্য্যভাষা গ্রহণ করে নাই বলিয়া কি তাহাদিগকে 'অ-নার্য্য' বলা হইয়াছে? কিন্তু বেদে আমরা মগধের উত্তরে 'বিদেহ'তে ক্ষত্রিয় রাজা জনকের নাম উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পরে, মগধে আমরা আর্য্যভাষা ও ক্ষত্রিয় রাজার শাসন দেখিতে পাই। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে এই জনপদের লোকেরা আর্য্য ভাষায় কথা না কহিত, তাহা হইলে বুদ্ধ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকেরা প্রাকৃত ও পালি ভাষায় কি প্রকারে গ্রামে গ্রামে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন? যাস্ক ও বুদ্ধের সময়ের মধ্যে যে-কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে, তাহার মধ্যে একটা জাতি আর একটা জাতির সভ্যতা বিশেষতঃ ভাষাকে এতটা সর্ব্বজনীনভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আমাদের ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে 'কীকট' (মগধ) দেশের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য-পৌরহিত্যবাদ অস্বীকার করিয়া তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম পদ্ধতি মানিত না বলিয়া 'অনার্য্য' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে, ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্যবাদ ও তাহার প্রতিপক্ষীয় মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গিয়াছে।

এই যুগের সমাজপদ্ধতির অনুসন্ধানের পূর্ব্বে আমাদের প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহ (data) সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। এই যুগ হইতে সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা ভারতের অবস্থার বাস্তবিকতা অনুভব করি। কিন্তু এই সময় হইতে কেবল ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তকের সংবাদের উপর আমাদের নির্ভর করিলে চলিবে না; কারণ উহা শ্রেণীস্বার্থ দুষ্ট। আমাদের জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তক সমূহ বিশেষতঃ পুরাণ সমূহের মধ্যেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ এই সত্যই উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাঠের এই দোষ এখনও ভালভাবে নিরাকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে লিখিবার সময় এতদিন কেবল খানকতক সহজলব্ধ ব্রাহ্মণদের রচিত ধর্ম্মপুস্তকের উপরই নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, এবং আমরাও এতদিন তাহারই বদহজম করিতেছি। তাঁহারা কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষার তথ্য

আবিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক যুগের অনুষ্ঠান (Phenomenon) ও প্রতিষ্ঠানগুলি (Institution) কি এবং কি প্রকারে তাহাদের উদ্ভব হইল সে সম্বন্ধে তাহারা অনুসন্ধান করেন নাই। এতাবৎকাল পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য হইয়াছে বলিয়াই ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর নরতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক যে সকল তথ্য আছে, তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই। বিভিন্ন ধর্ম্ম মতাবলম্বী লোকদিগ কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণের তুলনামূলক পাঠদ্বারা ভারতের রাষ্ট্রিক তথ্য আবিষ্কার করা হয় নাই। বরং সংস্কৃত সাহিত্যের 'আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত' অর্থাৎ বেদ বা আপস্তম্ভ, বৌধায়ন হইতে রঘুনন্দন অথবা তাহা হইতেও আধুনিক লেখকের পুস্তক হইতে শ্লোক-সমূহ একত্রিত করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া কতকগুলি 'ঐতিহাসিক তথ্য' আবিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া খুব বড়াই করা হয়। আর এইগুলিই ভারতের ইতিহাস বলিয়া সাধারণের নিকট আদৃত হইতেছে! কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের নষ্ট-কোষ্ঠির উদ্ধার করিতে হইলে ভাষার Morphology অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক পুস্তকের বয়স অর্থাৎ রচনাকাল নিরূপণ করিতে হইবে। কোন যুগের কোন শতাব্দীতে কোন ঘটনাকালে কি পুস্তকের মধ্যে আমরা কি প্রকারের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রিক পদ্ধতি পাই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদিগকে ইতিহাস লিখিতে হইবে। বৈদিক যুগের অনুসন্ধান-কালে আমরা এই মুস্কিলের সম্মুখীন হইয়াছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যুগের বয়স দুই হাজার হইতে তিন হাজার (২০০০—৩০০০) অথবা ততোধিক বৎসর; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একটা জাতি তাহার ভাষা ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং জাতীয় লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইতিহাস তাহার বহু সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেইজন্য ঋক্‌বেদ হইতে একটি শ্লোক, তৎপর যজুর্ব্বেদ অথবা অথর্ব্ববেদ হইতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কোনও একটা রাষ্ট্রিক পদ্ধতির বিবর্ত্তনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া স্বীকারই করিত না। আজকালকার পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—অথর্ব্ববেদে পারস্যের জারতুস্ত্রীয় পুরোহিতদিগের (মাগী বা মোবেদ) প্রভাব

আছে। আবেস্তার 'অথরাবাণ' বা অথর্ব্বান' নামক পুরোহিতদের নামানুসারে 'অথর্ব্ববেদ' নামকরণ হইয়াছে। (অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণেরাও 'অথর্ব্বান' বলিয়া অভিহিত হয়)। পূর্ব্বে ইহাকে 'অথর্ব্ব-অঙ্গীরস' বলা হইত, এবং 'ত্রয়ী বেদা' ও বলা হইত। পরে অথর্ব্ববেদকে বেদেরই একাংশ বলিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া নেয়। এইজন্য অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত একটি রীতির (custom) বয়সের সহিত ঋক্ বেদের একটি রীতির বয়স এক সময়ের হইতে পারে না। অন্যপক্ষে অথর্ব্ববেদে ম্যাজিক (magic) ও তুক-তাকের মন্ত্রের আধিক্য দেখিয়া ইহাকে ঋক্‌বেদ অপেক্ষা অতি প্রাচীন যুগের পরিচয় প্রদান করে বলিয়া অনুমান হয়। আর ঋক্‌বেদের 'দস্যু' যজুর্ব্বেদের 'শূদ্র'তে পরিবর্ত্তিত হইতে (যদি তাহাই হইয়া থাকে!) নিশ্চয়ই বহু শতাব্দী লাগিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুস্কিলের কথা আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মস্তকে আসে না। সেইজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে এবং আধুনিক কালের যেখান সেখান হইতে কতকগুলি শ্লোক দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইতিহাস রচনা করিলে উহা ভ্রমপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হইবে। এই তথ্যটি সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালভাবেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বেদের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে আমাদের প্রথম সমকালীন (তৎকালীন) অর্থনীতিক অবস্থা—যাহার উপর সমাজ ও তাহার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বৈদিক যুগের সাদাসিধা অর্থনীতিক অবস্থার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৈশ্যেরা কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায়াদি কার্য্যে নিজেদের নিযুক্ত করিত। এই যুগের ব্যবসায়ের অভিব্যক্তির সহিত একটা প্রশ্ন উঠে যে এই সঙ্গে 'শিল্প-শ্রম ব্যবসায়ের সংঘ' (industrial combination) এবং 'কারিগরদের সংঘ' (craft guilds) উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা? এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গেল্ডনার ও রথ ব্রাহ্মণসমূহে ইহাদের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু অপরাপর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার বিপরীত বলিয়া থাকেন (৬)। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস বৈদিক পুস্তক

৬। Santosh Kumar Das—The Economic History of Ancient India. P. 63—65.

সমূহে 'শ্রেষ্ঠীন' ও 'শ্রেষ্ঠ' (অথর্ব ১।৯।২) শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় মনে করেন যে ইহাদ্বারা 'গিল্ড' ও উহার কর্ত্তাকে বুঝায়, এবং এই প্রতিষ্ঠান দুইটি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তিনি আরও মনে করেন যে শিল্প সূত্রানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্মের বড় মিস্ত্রীরা সমাজে উচ্চ পদ পাইত। আবার রামায়ণ পাঠে ইহা দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ কোদাল, লাঙ্গল দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে (৭)। এবং এই কর্ম্মদ্বারা তাহার কোন সামাজিক বদনামও হইতেছে না। অন্যদিকে কারুকার্য্য (arts) বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে। রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে বড়মিস্ত্রীরা (craftsmen) বিশেষত যাহারা শিল্পশাস্ত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত তাহারা সমাজে উচ্চপদ পাইত। এই প্রকারে যাহারা জলসেচকর্ম্মে (Irrigation works) ও সরকারী গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত তাহারা উচ্চাধিকার ভোগ করিত। গিল্ডের (সঙ্ঘ) নাম (৮) রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে মহাভারতের সময় ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম করা নিন্দনীয় ছিল (৯)। এই সময়ে শ্রেণীবিভেদ (বা বর্ণ-বিভেদ) আরও ভালভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয় তাহার প্রজাদের রক্ষা করিবে, বৈশ্য ধনার্জ্জন করিবে, এবং শূদ্র পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা করিবে' (১০)। এতৎ সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে—'উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিজেদের জাতিধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে' (১১)। এই বর্ণনা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে রামায়ণের সমাজ মহাভারতের সমাজ অপেক্ষা আরও প্রাচীন ছিল।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, রামায়ণের অনেক কাহিনী এবং মহাভারত কাব্যের ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নায়কগণ বেদে উল্লিখিত আছেন (১২)। রামায়ণের

৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৩।

৮। রামায়ণ—বালকাণ্ড, ৫।

৯। মহাভারত—সভাপর্ব্ব : ১২।৯১।

১০। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব : CXXXII, 30 ; শান্তিপর্ব্ব : XCI, 3,2.

১১। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব : CXXXII, 30 ; শান্তিপর্ব্ব : XCI, 32.

১২। Ludwig বলেন যে তিনি ঋকবেদে একটি শ্লোক পাইয়াছেন যাহার অর্থ

অনেক কাহিনী বৈদিক উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। যেমন গ্রীক হোমারের মহাকাব্য হইতে নায়ক ও নায়িকাদের কাহিনী অবলম্বনে পরে কাব্য লেখা হয়, হয়ত সেইরূপ বৈদিক অনেক গল্প রামায়ণ ও মহাভারত মহা কাব্য সমূহে সন্নিবিষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মত এই যে রামায়ণ ব্রাহ্মণদের কলমের censorship সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্য প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে জৈন ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, কার্ত্যাবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র সুভৌম একবিংশতিবার পৃথিবী 'নিঃ ব্রাহ্মণা' করিয়াছিল (১৩)। এই রামায়ণেই ব্রাহ্মণ পরশুরামের ক্ষত্রিয় রাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সংবাদ উল্লিখিত আছে। রামায়ণে এক একটি ক্ষত্রিয়কুলের রাজত্বের বিষয় উল্লেখ দেখা যায় যদিচ সর্ব্ব পেশার লোক অর্থাৎ শ্রেণীবর্গের সহিত রাজাকে পরামর্শ করিতেও দেখা যায়।

পক্ষান্তরে মহাভারতে কুলগত বৈরীভাব (blood-feud), স্পষ্ট বর্ণ-বিভাগ, নিয়োগ প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ ব্যতীত দুইটি একটি বড় অনুষ্ঠান আমাদের চক্ষে পড়ে : (ক) একটি হইতেছে—একজন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ধর্ম্মরাজ্য (Theocracy) সংস্থাপন ; (খ) আর একটি হইতেছে—সামন্ততন্ত্র (Feudalism) প্রতিষ্ঠা। কেহ কেহ অনুমান করেন যে মহাভারতের বর্ত্তমান সঙ্কলন গুপ্তযুগে সংসাধিত হয়। এই যুগে ব্রহ্মণ্যবাদ প্রবল হয় ; কাজেই

হইতেছে—'ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কি শোচনীয় পরিণাম! (Abhandlung Bochmesche Gesellschaft, 1884 ; P. 5 দ্রষ্টব্য) কিন্তু আর কেহ বৈদিক সাহিত্য মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের নায়কদের উল্লেখ পান নাই। Hopkins বলেন যে বেদে ভারত এবং কুরুদের উল্লেখ আছে, কিন্তু পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে (৪।১৭।৯) প্রক্ষিপ্ত অংশটি বাদ দিলে কুরুদের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে ; যথা :—যতো যতো আবর্ত্ততে তৎ তৎ গচ্ছতি মানবাঃ।

কুরুন অস্মাভি রক্ষতি……

(E. W. Hopkins—The Great Epic of India, p 387) এই সম্পর্কে Maxmuller-এর S. B. E. (Sacred Book of the East, 1) p 71 পুস্তকও দ্রষ্টব্য।

১৩। জৈন হরিবংশপুরাণ ও সুভৌমচরিত দ্রষ্টব্য। আনন্দ ভট্ট বিরচিত সংস্কৃত বল্লালচরিতেও সুভৌমের 'নিব্রাহ্মণাক্ষিতি' করিবার বিষয় উল্লিখিত আছে।

মহাভারতে সেই সময়কার রাজনীতিক ভাবসমূহ যথা,—ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজার অধীনে ভারতে একজাতীয়তা আনয়ন করা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন পরিকল্পনা, —ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির উপর রাষ্ট্র ও সমাজকে সংস্থাপন করা, রাষ্ট্রে সার্ব্বভৌমিক সম্রাটের অধীনে স্তরভেদ করা প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। এইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্য—'noblesse oblige,' chivalry প্রভৃতি মহাভারতে বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। মহাভারত যে বিভিন্ন সঙ্কলনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাহা আমরা একই পুস্তকে 'নিয়োগ প্রথা' (junior levirate), ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (chivalry) পাশাপাশি বর্ণিত হওয়ায় সহজেই বুঝিতে পারি।

রামায়ণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে শ্রেণীসংগ্রামের ভীষণ যুদ্ধ বর্ণিত আছে এবং উহার জের রামায়ণের প্রধান নায়ক রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। ভবভূতির 'মহাবীর-চরিত' নামক পুস্তকে দশরথের মুখ দিয়া পরশুরামের শাসনকর্ত্তা 'ক্ষত্রিয়গণ' বলা হইয়াছে এবং রামের নিকট পরশুরামের পরাজয়ের বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু মহাভারতের স্ব-শ্রেণী প্রেমিকত্ব বিশেষভাবে প্রকীর্ত্তিত হইয়াও শ্রেণী-সংগ্রাম এই কাব্যের তথ্য নয়; বরঞ্চ একটা বড় রাজনীতিক ভাব ইহার পশ্চাতে লুক্কাইত রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টাটি কি বৌদ্ধদের অশোকের ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র সংস্থাপনের চেষ্টারই অনুকরণ নয়? ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ বলেন,—হিন্দুরা কখন রাষ্ট্রে Theocracy (ধর্ম্মতন্ত্র বা দেবরাষ্ট্রিকতন্ত্র) আনয়ন করে নাই—অশোকের রাজত্বে উহার কাছাকাছি আসিয়াছিল (১৪)। কিন্তু মহাভারতোক্ত ধর্ম্মরাজ্য যেখানে সকল জাতি, সকল বর্ণ ও শ্রেণীর লোক এক রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিবে, তাহা কি উপরোক্ত একটা ধর্ম্মতন্ত্র সংস্থাপন চেষ্টার ন্যায় ছিল না? ইহা কি বৌদ্ধদিগের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা দ্বারা উদ্ভূত করা হয় নাই? এই রাষ্ট্রে কি ধর্ম্মের নামে ঘুম পাড়াইয়া শ্রেণীসমূহের শ্রেণীসহযোগিতা (class collaboration) করিবার চেষ্টা বিকৃত হয় নাই? মহাভারতের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন পাশ্চাত্য রাজনীতি বিজ্ঞানের খাঁটি Theocracy না হইতেও পারে, তবে অনুমান হয় যে এই ভাবের সহিত

১৪। Vincent Smith—Early History of India.

ইউরোপের মধ্যযুগের 'Holy Roman Empire' সংস্থাপনের উদ্দেশ্যের কতক সৌসাদৃশ্য আছে। এইজন্যই বর্ত্তমান মহাভারত যে-যুগেই সংঙ্কলিত হউক না কেন, তাহাতে যে মধ্যযুগীয় প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না (১৫)।

আজকাল পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে পুরাণ সমূহে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিত পার্জিটারের মতে (১৬) পুরাণ সমূহে ক্ষত্রিয়দের তরফের ভারতীয় জনশ্রুতি যথার্থভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সেইজন্য তন্মধ্যেও অনুসন্ধান প্রয়োজন। মৎস্য ও বায়ুপুরাণ দুইটীর মতে মহাভারতোক্ত পৌরব রাজা জন্মেজয়ের সহিত বৈশম্পায়ন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়। যজ্ঞে গো-হত্যা প্রয়োজন কিনা এই নিয়া রাজসনেয় ব্রাহ্মণদের সহিত জন্মেজয়ের ঘোরতর বিতর্ক উপস্থিত হয়। রাজা পশুহত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন। মৎস্য পুরাণের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; তাহাতে বলা হইয়াছে—এই বিবাদে রাজা কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণদের বিপক্ষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদের কথায় সায় দিয়া তাহার পুত্রকে রাজ্যাভিষেক করিয়া রীতি অনুযায়ী বনে গমন করেন (বনং যযৌ)। পরে বায়ুপুরাণে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিপক্ষতাচরণে কৃতকার্য্য হওয়ার অসুবিধাজনক খবরটি চাপিয়া রাখিয়া বলা হইয়াছে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত (ক্ষয়ং যযৌ) হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা তাহাকে মারিয়া ফেলে এবং তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসায়। এই জুয়াচুরি বিষয়টি সম্পর্কে পার্জিটার বলেন,—ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদের দাবীর

১৫। মহাভারতে মধ্যযুগীয় প্রভাবের অপর একটি নমুনা—অশ্বমেধ যজ্ঞে দ্রৌপদীর প্রতি ব্যবস্থা। সংস্কৃতজ্ঞেরা জানেন, যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজমহিষীকে নিয়া কি অদ্ভুত brutal কেলেঙ্কারীই না করা হইত। পৌরহিত্যবাদের চূড়ান্ত অত্যাচার এইস্থলে প্রদর্শিত হইত। রামায়ণে কৌশল্যাকেও মৃত অশ্বকে স্বামী ভাবিয়া একরাত্রি তাহার সহিত যাপন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একবার বসিয়াই খালাস পাইয়াছিল! শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত মহাশয় তাহার 'ঋকবেদ' নামক পুস্তকে বলেন—নারীর প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের জন্য হইয়াছিল; কিন্তু ইহা কি সামন্তযুগীয় Chivalry ভাবের জন্যই হয় নাই।

১৬। F. E. Pargiter—The Indian Traditon.

বিপক্ষতাচারণ করা ব্যাপারটি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তিত করা হয় (১৭)। এই সংবাদ দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বৈদিক যুগের পরেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নানা প্রকারে চলিতেছে, এবং ক্ষত্রিয়েরা তখনও ব্রাহ্মণদের দাবী শুনিতে রাজী হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৭। Pargiter—The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age p. 88.

আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থা

সম্প্রতি নানা কারণে এদেশে আমেরিকা সম্বন্ধে কৌতূহল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খবরের কাগজের পাঠকেরা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমেরিকার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফল বিশেষভাবে নির্ভর করে। যে দেশের শিল্পপ্রতিভার এবং অর্থপ্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া বৃটিশসাম্রাজ্য জার্ম্মানদিগের সহিত যুদ্ধ চালনা করিতেছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি, সামাজিক ব্যবস্থা, লোকবল এবং শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট তৃতীয়-বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে যে মহা আন্দোলন কয়েক মাস ধরিয়া হইয়াছিল তাহার আভাস সংবাদপত্রে আমরাও কিছু কিছু পাইয়াছি। এই ব্যাপার লইয়াও আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। সুতরাং আমেরিকার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমেরিকার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে গৃহীত এবং তাহার পর বৎসর সর্ব্বপ্রথম পরিচালিত হয়। এই কারণে গত তিন বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় এই রাষ্ট্রতন্ত্রের ১৫০ তম জন্মোৎসব করা হইয়াছে। নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার (World Fair) এই জন্মোৎসবের একটি অঙ্গবিশেষ। অনেকেই জানেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার উপনিবেশগুলি বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭৭৫ সনে তেরটি উপনিবেশ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক কারণে অস্ত্রধারণ করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে (১৭৭৬ খৃঃ অব্দ) ৪ঠা জুলাই ফিলাডেলফিয়া সহরে তাহাদের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাপত্র স্বাধীনতার এবং জগতের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। টমাস জেফারসন এই ঘোষণাপত্র রচনা করিয়া-ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য প্রতিনিধিরা ইহাতে স্বাক্ষর

করিয়াছিলেন। পেন্‌সিলভেনিয়া উপনিবেশের রাজধানী ফিলাডেলফিয়া নগরের যে গৃহে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছিল সেই গৃহখানি এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তখনকার ব্যবহৃত আসনগুলিও তদবস্থায় রক্ষা করা হইয়াছে।

প্রায় সাত বৎসর 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' চালাইবার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। পূর্ব্বে উপনিবেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হইতেছিল। কিন্তু স্বাধীনতাসংগ্রাম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে একত্র হইয়া এই সংগ্রাম না চালাইলে জয়ী হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক একতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে আর্টিক্‌ল্‌স্ অব কনফেডারেশন (Articles of Confederation) রচিত হইল এবং ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলি তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে সামান্যই ক্ষমতা দেওয়া হইল। রাষ্ট্রীয় অধিকারের অধিকাংশই বিভিন্ন ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়া গেল। এই দুর্ব্বল যুক্তরাষ্ট্র নির্ম্মাণের ফল স্বভাবতঃই ভাল হইল না। ইহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি পরস্পরবিরোধী হইয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইল। অনেকেই ভাবিয়াছিল যে বৃটিশসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতপূর্ব্ব উপনিবেশগুলি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য এবং বিবাদ বিসংবাদ আরম্ভ হওয়ায় ইহাদের নেতৃবৃন্দ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

আমেরিকার নেতৃবৃন্দ কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশীদিন থাকিতে দিলেন না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে নূতন অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহারা এক ফেডারেল শাসনতন্ত্র সংগঠন করিলেন। এই নূতন শাসনতন্ত্র সংগঠিত হইয়াছিল ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে। ঐ বৎসর আমেরিকার তেরটি ষ্টেটের মধ্যে বারটি হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই কনভেনশন গঠন করা হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ৫৬ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম

এদেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। ওয়াশিংটন ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের মাউণ্ট ভার্ণন এষ্টেটের বড় জমীদার ছিলেন। বহু জমিজমা এবং অসংখ্য ক্রীতদাসের অধিকারী জর্জ্জ ওয়াশিংটন কিন্তু নিজের জমিদারী পরিচালনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই। পূর্ব্বে ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল ওয়াশিংটন তখন যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ইংরাজ পক্ষে বিশেষ সমরকৌশল দেখাইয়াছিলেন। যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয় ওয়াশিংটনের তাহা ছিল না। তিনি কোন কলেজে প্রবেশ করিয়া গ্রীক্, লাটিন ভাষার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন নাই। এমন কি তিনি শুদ্ধ করিয়া ইংরাজীও লিখিতে পারিতেন না। প্রায়শঃই বানান ভুল তাঁহার হইত। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বিষয়কর্ম্মে তিনি সহজেই নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। চরিত্রবলও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই কারণেই কি যুদ্ধক্ষেত্রে কি রাজনীতিক্ষেত্রে লোকের উপর তিনি বিশেষ প্রভাব খাটাইতে পারিতেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে যখন আমেরিকাবাসিগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন তখন একবাক্যে সকলেই ওয়াশিংটনকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা স্থির করিলেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে ওয়াশিংটনের চরিত্রবল, একাগ্রতা, অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি এবং প্রকৃষ্ট সমরকৌশলের জন্যই স্বাধীনতাসংগ্রামে আমেরিকাবাসিগণ বিজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। এই সংগ্রাম শেষ হইবার পরে ওয়াশিংটন নিজ জমিদারীতে ফিরিয়া যান। কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার প্রভাব কেবল যে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা নহে, ক্রমে দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যখন ফিলাডেলফিয়া কনভেনশন গঠন করিবার উদ্যোগ হয় তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে এই কনভেনশনের কাজ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে পরিচালিত হইলে উহা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। অন্যথা গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে। এই কারণে ওয়াশিংটন যে কেবল ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আসিলেন তাহাই নহে, অন্যান্য প্রতিনিধিগণ মিলিয়া তাঁহাকে কনভেনশনের প্রেসিডেণ্ট এবং কর্ণধারও নির্ব্বাচিত করিলেন।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এই সময়ে অশীতিতম বৃদ্ধ। তাঁহার ছাপাখানা, তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তাঁহার দৌত্যকার্য্য প্রভৃতি সকল ইতিহাস

পাঠকেরই পরিচিত। আমেরিকা যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত তাঁহার দেশবাসীগণ সেই সময় তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিয়া ফরাসী দেশে তাঁহাদের দূত হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। ভলটেয়ারের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহুবৎসর পরে যখন এই প্রবীণ এবং নির্ব্বাসিত ফরাসী কবি এবং দার্শনিক প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁহার এক পৌত্রকে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং পৌত্রের জন্য কবির নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ভল্‌টেয়ার 'স্বাধীনতার উপাসক হও' বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ফিলাডেল্‌ফিয়া কনভেন্‌শন আরম্ভ হইবার সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের গভর্ণর। তাঁহারই রাজধানীতে কন্‌ভেনশন সমবেত হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাঁহারই কনভেনশনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার কথা। কিন্তু অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়ায় এই গুরুভার গ্রহণ করিতে তিনি অস্বীকৃত হন। তথাপি কন্‌ভেনশনের কার্য্যাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, সময় সময় তাঁহার উপদেশ কতখানি সময়োপযোগী ও কার্য্যকরী হইয়াছিল। ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিন ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রতিনিধির নামও আমরা এইখানে উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে জেমস্ ম্যাডিসনের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য। তিনিও ওয়াশিংটনের ন্যায় ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের লোক এবং পরে পর পর দুইবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আলেক-জাণ্ডার হ্যামিল্‌টন নিউ-ইয়র্কবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন ফরাসী এবং পিতা ইংরাজ। ইঁহার ন্যায় মেধাবী এবং মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আমেরিকায় তথা জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সতের আঠার বৎসর বয়সে স্বাধীনতাসংগ্রামের সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পার্শ্বচর (aid de camp) নিযুক্ত হইয়া তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। এবং পরে আইন-ব্যবসায়ী এবং আমেরিকার ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব হইয়াও অনেক দক্ষতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। যে কয়েক ব্যক্তির নাম এইখানে উল্লেখ করিলাম তাঁহারা সকলেই দেশের এবং জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ লোক কন্‌ভেনশনের কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এইস্থানে তাঁহাদের

বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কন্‌ভেনশনের ৫৬ জন সভ্যের সকলেই বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সুপরিচিত ছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কন্‌ভেনসনের কার্য্য শেষ হয়। ইহার পর পরিকল্পিত রাষ্ট্রতন্ত্র অনুমোদন করিবার জন্য প্রত্যেক ষ্টেটে একটি করিয়া কন্‌ভেনশন গঠন করা স্থির হইল। ক্রমশঃ কন্‌ভেনশনগুলি গঠিত হইলে, যুক্ত রাষ্ট্রতন্ত্র তাহাতে গৃহীত হইল। এইরূপে একে একে এগারটি ষ্টেট ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে যুক্ত রাষ্ট্রতন্ত্র গ্রহণ করিল এবং নিজেদের যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বলিয়া স্বীকার করিল। দুইটিমাত্র ষ্টেট ঐ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে এবং নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হইবার অল্পদিন পরেই তাহারাও ইহাতে যোগদান করিল। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের প্রথমেই নূতন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত করিবার সকল আয়োজন হইতে লাগিল, এবং ঐ বৎসরেই নিউ ইয়র্ক সহরে এই গভর্ণমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ করা হইল। নিউ ইয়র্ক তখন ছিল ছোট একটি সহর। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা সেই সময় চল্লিশ হাজারের বেশী নয়। দেড়শত বৎসর পরে বর্ত্তমানে এই সহরটির লোক সংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে আমেরিকার প্রগতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্কে অল্পদিন মাত্র কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিয়াছিল। সেখান হইতে ফিলাডেলফিয়াতে রাজধানী তুলিয়া লওয়া হয় এবং দশ বৎসর পরে পোটোম্যাক্ নদীর তীরে কলোম্বিয়া প্রদেশে ওয়াশিংটন সহর নির্ম্মিত হইলে সেইখানে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এবং অধিকার অতি সামান্য ছিল বলিয়াই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র (Confederation) বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই এবং সেই জন্যই নূতন যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং অনেকেই মনে করিতে পারেন যে নূতন আমলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। যে সমস্ত বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অধিকার

খাটাইবার কথা সেই বিষয়গুলির সামান্য কয়েকটি মাত্র কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এইরূপ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সকলগুলি ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ থাকিল। সেগুলির সম্পর্কে কোন আইন-কানুন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট করিতে পারিবে না। বাস্তবিক পক্ষে সেগুলির উপর ষ্টেট গভর্ণমেণ্টগুলিকে একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হইল। তবে এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে যে-সমস্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইল সেগুলির উপর এই গভর্ণমেণ্টের অধিকারও একচ্ছত্র করা হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপন ইচ্ছামত কেবল যে আইন-কানুন তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবে তাহাই নহে, আপনার ইচ্ছামত এবং নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াই সেই আইন কানুনগুলি ব্যবহারে লাগাইতে পারিবে। ষ্টেট-গভর্ণমেণ্টগুলির এ বিষয়ে কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। যে সমস্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত করা হইল তাহার মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কারেন্সি, বহির্বাণিজ্য, অন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইমাত্র কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এইবার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ এবং সংগঠন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ বা শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার কার্য্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই তিনটি সরকারী দায়িত্ব বিভিন্ন হস্তে অর্পিত না হইলে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না এবং দেশবাসীর স্বাধীন জীবনযাপনের নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকা-বাসিগণ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগ বিভিন্ন হস্তে ন্যস্ত করিলেন। আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল কংগ্রেসের উপর। ঐ আইনগুলিকে কাজে লাগাইবার এবং সাধারণ শাসনকার্য্য চালাইবার ভার অর্পণ করা হইল প্রেসিডেণ্টের উপর। বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালত এবং কতকগুলি নিম্ন আদালতের ব্যবস্থা করা হইল।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। নিম্ন পরিষদের নাম হাউস অব রেপ্রেসেনটেটিভস্ (House of Representatives)। উচ্চ পরিষদ সেনেট (Senate) নামে পরিচিত। এই দুইটি পরিষদ লইয়া কংগ্রেস গঠিত করিবার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। তন্মধ্যে দুইটির উল্লেখ এখানে করিব। প্রথমতঃ ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনের সভ্যগণ মনে করিয়াছিলেন যে একটি পরিষদ লইয়া কংগ্রেস গঠন করিলে হঠকারিতার সহিত আইন প্রণয়ন হইতে পারে। দুইটি পরিষদ থাকিলে একটি অন্যায়ভাবে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিলে অপরটি তাহাতে বাধা দিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেট বা প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় সমতুল্য ছিল না। বড় প্রদেশগুলি দাবী করিল যে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় বিভিন্ন ষ্টেটগুলি তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। অপরদিকে ছোট প্রদেশগুলি বলিয়া বসিল যে ঐ সভায় সকল ষ্টেটগুলি সমানভাবে প্রতিনিধি পাঠাইবে। এই দুইটি দাবীর কোনটিকেই একেবারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য ঠিক হইল যে দুইটি পরিষদ লইয়া কংগ্রেস গঠিত হইবে। প্রথমটিতে বিভিন্ন প্রদেশগুলি লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবে এবং দ্বিতীয়টিতে কি বড় কি ছোট প্রত্যেক প্রদেশ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সেনেটের সভ্যসংখ্যা ছিল মোটে ছাব্বিশটি। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আটচল্লিশটি। সেই কারণে সেনেটের সভ্যসংখ্যা এখন ছিয়ানব্বই। নিম্ন পরিষদটিকে কিন্তু বৃহৎ বলা যাইতে পারে। ইহার সভ্যসংখ্যা বর্ত্তমানে চারিশত পঁয়ত্রিশ।

অর্থাদি সংক্রান্ত আইনের খসড়াগুলি নিম্নপরিষদে প্রথম উপস্থিত করিতে হয়। অন্যান্য বিল যে কোন পরিষদে প্রথম উপস্থিত করা যাইতে পারে। আইনে পরিণত করিতে হইলে দুইটি পরিষদ দ্বারাই বিলগুলি অনুমোদিত করিতে হয়। দুইটি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হইবার পর প্রত্যেকটি বিল প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠানো হয়। প্রেসিডেণ্ট উহা অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিলে বিলটি দেশের আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনুমোদন না করিয়া প্রেসিডেণ্ট বিলটিকে কংগ্রেসের নিকট ফিরাইয়া দিতে পারেন। তখন

কংগ্রেসের প্রত্যেকটি পরিষদ বিলটির পুনরালোচনা করিয়া যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে উহা গ্রহণ করে তবে প্রেসিডেন্টের বিনা স্বাক্ষরেই বিল আইনে পরিণত হইবে অন্যথা ইহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নিম্ন পরিষদের কার্য্যাবলি নিয়মিত করিবার জন্য উহার সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পরিষদে যে দল যখন গরিষ্ঠ হয় সেই দলের মধ্য হইতেই স্পীকার নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে হাউস অব কমন্সে এক ব্যক্তি একবার স্পীকার নির্ব্বাচিত হইলে সাধারণত বৃদ্ধ হইয়া অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকেই বার বার ঐ পদ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকায় এই নিয়ম পালন করা হয় না। সেনেট সভার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। বস্তুতঃ ভাইস প্রেসিডেন্টের এই সেনেট সভার কার্য্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা ভিন্ন দেশের শাসন কার্য্যের সহিত অপর কোনও সংস্রব নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট এবং কতকগুলি নিম্ন আদালত লইয়া গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নয়জন। প্রধান বিচারককে চিফ জাস্টিস্ এবং অন্যান্য বিচারকদিগকে এসোসিয়েট জজ বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মনোনয়ন করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এই মনোনয়ন সেনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। অনেক সময় নিম্ন আদালতের জজদিগের মধ্য হইতে এবং অনেক সময় আইনব্যবসায়ী এবং আইনের অধ্যাপকদিগের মধ্য হইতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদিগকে মনোনয়ন করা হইয়া থাকে। সাধারণ বিচারকার্য্য ছাড়া ফেডারেল কোর্টগুলি, বিশেষ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিচারকার্য্য করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের হস্তে কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। যদি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি অতিক্রম করিয়া কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন করে তবে ঐ আইন অমান্য করিয়া যে কোন ব্যক্তি ব্যাপারটিকে সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে আনিতে বাধ্য করিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট তখন ঐ মোকদ্দমা মীমাংসা করিতে যাইয়া আইনটিকে নাকচ করিয়া দিতে পারে অথবা উহাকে শাসনতন্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া বহালও রাখিতে পারে।

বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোন্ কোন্ বিষয়গুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে তাহা দেড়শত বৎসর ধরিয়া সুপ্রিম কোর্টই ঠিক করিয়া দিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ যদি কেবল শাসনতন্ত্রের কথাগুলির উপরেই সমস্ত আস্থা স্থাপন করিয়া চলিতেন এবং প্রগতিশীল দেশের অবস্থার উপর নজর না দিতেন তাহা হইলে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে সামান্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইহাকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু নানাকারণে যেমন জাতির একতাবোধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সহানুভূতি পাইয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট নিজের ক্ষমতাগুলি ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিল। এই কারণেই আজ দেড়শত বৎসর পরে এই গভর্ণমেণ্ট একটি বিরাট আকার ধারণ করিতে পারিয়াছে।

এতক্ষণ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আইন এবং বিচার বিভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন শাসনবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের তৃতীয়বারের নির্ব্বাচন লইয়া আমেরিকার এই শাসনবিভাগ সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উক্ত বিষয় আলোচনা করিবার অবকাশ হইবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

"দ্বিতীয় প্রকৃতি"

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই সীতানাথ হা হা ক'রে কেঁদে উঠলেন। এই কান্না এমনি অশোভন, আর কাঁদবার সময় তাঁর মুখ এমনি ভয়াবহ রকমের কুশ্রী দেখাচ্ছিল যে, যারা সুযোগ বুঝে একটু সমবেদনা প্রকাশ করতে এসেছিল, তারা মুখ ঘুরিয়ে কোন রকমে অপরিসীম বিতৃষ্ণা দমন করল।

অঘটন এ বাড়ীতে না ঘটেছে, এমন ত নয়! এই সেদিন, একুশ বছরের, বি এ পাশ করা, আশি টাকায় সদ্য সরকারের দপ্তরে ঢোকা, সমর্থ ছেলেটা মারা গেল। সীতানাথ কী করলেন সেদিন? সমবেদনা?—প্রতিবেশীর ঘরে অঘটন ঘটলে সমবেদনা জানাতে যারা আসে, তারা এত শীগ্‌গিরই ভোলে না। সীতানাথ সেদিন স্থাণুবৎ বসে রইলেন। আর একসময়ে ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'আমার সিগার কেস্‌...!' অবিশ্যি নেশার আওতায় যারা বেড়ে উঠেছে, সুসময়ে দুঃসময়ে নেশার দ্রব্যটির কথাই আগে মনে পড়ে তাদের। কিন্তু তাই ব'লে...। আহা, একুশ বছরের, কী নাম যেন ছিল তার, প্রদ্যোৎ; প্রদ্যোতের কথা এখনও মনে পড়ে প্রতিবেশীদের। রমানাথ ডেপুটি একমাত্র মেয়ে শোভনার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে, কারণে অকারণে, আশি টাকায় সদ্য সরকারের দপ্তরে ঢোকা ছেলেটাকে বাড়ীর মধ্যে আনা সুরু করেছিলেন কেবল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছেলেটা গেল মরে। অথচ এখনও সন্দেশের দোকানে দেনা; শোভনার হালফ্যাশনের ব্লাউস্‌ কেটেছিল যে দরজি, রোজই একবার আসে পাওনা নিতে। রমানাথের তাতে আক্ষেপ নেই। নানা ছুতোয় ফিরিয়ে দেন আর মনে মনে বলেন, দেনা পাওনাই ত সংসার। রমানাথের এই তিপ্পান্ন চলছে। অথচ সেদিন সীতানাথ কিনা অম্লানবদনে বললেন, 'আমার সিগার কেস!' আর আজ আটচল্লিশ বছরের (বায়ান্নও হতে পারে) স্ত্রীবিয়োগে তিনি হাউ হাউ ক'রে কাঁদছেন। যেন কোলের মেয়েটার মোমের পুতুলের একখানা হাত ভেঙ্গেছে, এমনি অস্থির কান্না। ভাবতেও লজ্জা করে, দেখতে ত রীতিমত দৃষ্টিকটু।

অশনিবিকাশ থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দামী পালঙ্কখানার দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে

তাকিয়ে ছিলেন। জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত, কালিদাস আচার্য্যি মশায় 'সৎকারের কী ব্যবস্থা?' বলতেই অশনিবিকাশ আধঘণ্টা যাবৎ যে নস্যের টিপ্‌টি দু' আঙ্গুলে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং আঙ্গুল টাটিয়ে উঠলে হাত বদল করছিলেন, অকস্মাৎ সশব্দে তা নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করলেন।

সমস্ত সহরে সীতানাথের একজন আত্মীয় খুঁজে পাওয়া গেল না। বড় ছেলে সাগর টাটায় চাকরী করে। তাকে অসুখের সংবাদটা জানানোর সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবু সীতানাথের স্ত্রী সৌদামিনীকে সৌভাগ্যবতী বলতে হবে বৈকি! বয়স তাঁর আটচল্লিশই যদি ধরে নিই, তাহ'লে তাঁর চুল যে অধিকাংশই সাদা হয়ে গিয়েছিল, এটাও ধরে নিতে হয়। পাকা (চুল) মাথায়, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে, উপযুক্ত এক ছেলের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাণী প্রেরণ ক'রে, স্বামীকে নিদারুণ এক বিস্ময়ের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে তিনি চলে গেলেন। কাতুঝি কোত্থেকে এক থান্‌ মেটে সিঁদুর এনে তেলে জলে গুলে সৌদামিনীর মাথায় লেপ্‌টে দিল। সতী মেয়ে না হলে এমন সৌভাগ্য হয়? কাতু আবার লেপ্‌টান সিঁদুরের খানিকটা তুলে আঁচলে রাখল বেঁধে তার মেয়ের জন্য।

সৌদামিনীকে প্রতিবেশীরা যখন নিয়ে গেল সীতানাথ আর একবার উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, আশপাশের বাড়ীতে লোকজন বাস করে এবং তারা জানালা বা দরজায় পরম কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কান্না থেকে এক অদ্ভুত রসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। বাস্তবিক, অন্যের কান্না শুনলে এক একজনের মনে এক এক ভাবের উদয় হয়। অনেকের হাসিও পায়। সবাই যে দুঃখিত হবে এমন কোন কথা নেই। অনেকে ভেবে লজ্জিত হয়, ছি, এত সশব্দে কী কাঁদতে আছে! আরও একটু গুছিয়ে, আরও একটু শোভনভাবে—শিক্ষিত আর অশিক্ষিত মনের পার্থক্য বোধ হয় এইখানে।

দিন গড়িয়ে রাত্রি এল। সীতানাথ আরাম চেয়ারে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘরের আশ্চর্য্যরকম নিস্তব্ধতায় তাঁর তন্দ্রা টুটে গেল। জেগে উঠে তিনি দামিনী বলে ডাকতে যাবেন কিন্তু ডাকলেন, 'ওগো!' অতিরিক্ত প্রয়োজনের সময় তিনি 'ওগো' বলতেন আর সস্নেহে ডাকতে হলে বলতেন 'দামিনী'।

সীলিংয়ে শব্দ আছড়ে পড়ে ফিরে এল। সীতানাথ আবার শব্দ ক'রে কেঁদে উঠবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল প্রশস্ত পালঙ্কের ওপর। ভৃত্য পরিপাটি শয্যা রচনা করেছে। উপাধান একটি। অর্থাৎ, তিনি আজ একাই শোবেন। সীতানাথ ভাবলেন, দামিনী তাঁর সঙ্গে নিদারুণ পরিহাস করেছে। দু'দিন না খেলেও তাঁর কিছু এসে যায় না। কিন্তু একক শয্যায় ঘুমনো তাঁর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। দু'চার দিনের অনিবার্য্য কারণের ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে আজ চৌত্রিশ বছর নিয়মিতভাবে তিনি সৌদামিনীর পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছেন। নিশ্চিন্ত, পরিতৃপ্ত, সুন্দর সুষুপ্তি। মাঝ রাতে হঠাৎ যদি সীতানাথের ঘুম ভেঙ্গে যায় কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, 'উঠলে কেন?' সীতানাথের মাঝ রাতে জেগে উঠে একগ্লাস জল খাওয়ার অভ্যাস ছিল বরাবর। সৌদামিনী তা জানতেন। তবু, ঐ একই প্রশ্ন চৌত্রিশ বছর ধরে করেছেন (অনিবার্য্য কারণের ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে)। সৌদামিনীর ঘুম ছিল ভারি সজাগ। সীতানাথের এই দীর্ঘকাল ধরে ঐ একই উত্তর দিতে কখনও ক্লান্তি বোধ হয়নি। বলতেন, 'জল খাব'। জল খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। স্বামীর এমন নিটোল ঘুম, দামিনী ঠিক সুস্থচিত্তে গ্রহণ করতে পারতেন না। তবু বলতেন মনে মনে, এই বয়সে এমনি ঘুমই ভাল, নইলে শরীর টিঁকবে ক'দিন? আর স্বামীর শ্বাস প্রশ্বাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আরও গভীর হত ততক্ষণ তিনি পরম স্নেহভরে তাঁর চুলের মধ্যে বিলি কাটতেন। ঘুমের মধ্য দিয়ে সীতানাথ এই স্পর্শ, এই আরাম উপভোগ করতেন। কিন্তু নেহাৎই নিবিড়ভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন বলে সৌদামিনীকে মুখে বলে ধন্যবাদটা জানানো হয়নি কোন দিন। তাই আজ সীতানাথ মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলেন, অকৃতজ্ঞ!

সৌদামিনীর মৃত্যুর পর প্রথম রাত্রি কাটল। শয্যায় অসাড় হয়ে বিনিদ্র পড়ে থাকা যে এত ক্লান্তিকর, সীতানাথ তা আগে জানতেন না। সীতানাথ রাত্রে শয্যায় এসে চাইতেন ঘুম এবং তা অনতিবিলম্বেই পেতেন। ঘুমের আবাহনের জন্য জেগে থেকে প্রশান্ত সমুদ্র বা ধূ ধূ মরুভূমির ছবি কল্পনায় কোন দিন তাঁকে আঁকতে হয়নি। সেই ঘুম আজ হঠাৎ এমন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল কেন? সীতানাথ বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সীলিংয়ে হোয়াইট্ ওয়াশ

করবার সময় এক জায়গায় এক পোঁচ চুণ বেশী পড়েছিল। সেই জায়গায় কতকগুলি দাগ পড়েছে; ভারতবর্ষের মানচিত্র বলেও মনে করা যায়, আবার কোন পরিচিত মানুষের মাথার মতও মনে হয় যেন। সীতানাথ সেই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলেন। আজ তাঁর চোখে ঘুম নেই দামিনী নেই ব'লে—একক শয্যায় তিনি ঘুমুতে পারছেন না। তাহলে, ডাক্তার সংবাদটা জানিয়ে বেরিয়ে যেতেই তিনি যে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন সে কী কেবল এই জন্য,—তাঁর মনে বিদ্যুৎ চমকের মত এই চিন্তাই কী দোলা দিয়েছিল যে, দামিনী আজ তাঁর পাশে শোবে না। আশ্চর্য্য! সীতানাথ ভেবে দেখলেন, ঠিক তাই। দামিনী জিজ্ঞেস করবে না, 'উঠলে যে'! আর সীতানাথের উত্তর দিতে হবে না, 'জল খাব'। চৌত্রিশ বছরের অভ্যস্ত জীবনে এমন সাংঘাতিক ফাটলও লুকিয়ে ছিল? তাহলে কী সীতানাথ দামিনীকে ভালবাসতেন না? উনষাট বছর বয়সে চৌত্রিশ বছরের অভ্যস্ত স্ত্রীর সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন মনে জাগাও যে রীতিমত হাস্যকর। তবু, মন হাতড়ে কোন উত্তর পেলেন না।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে সীতানাথ এলেন বারাণ্ডায়। আরাম চেয়ারে এসে বসতেই ভৃত্য জিজ্ঞেস করল, 'কী দেব'?

আশ্চর্য্য, এমন বেয়াড়া প্রশ্ন তাঁকে শুনতে হল। সমস্ত শীতকালটা সকালে তিনি কফি খেয়ে থাকেন। আনুষঙ্গিক হিসেবে হাল্কা কয়েকখানা বিস্কিট। উত্তপ্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'আন্ তোর যা খুসী'!

ফলে ভৃত্য নিয়ে এল চা আর একরাশ খাবার। খাবার তিনি স্পর্শ করলেন না আর চা নিঃশেষ ক'রে যখন মুখ মুছলেন তখন বমি করতে পারলে তিনি বাঁচেন, এমনি অবস্থা। ভালবাসার প্রশ্ন বাদ দিয়েও এই সব সময়ে দামিনীর প্রয়োজনীয়তা যে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দুপুরে খেতে বসে তিনি দেখলেন, অবোধ ভৃত্য তাঁকে খুসী করবার জন্য প্রায় এক সের ওজনের এক রুই মাছের মাথা পরিবেশন করেছে। অথচ, সীতানাথ কোন মাছের মাথাই সহ্য করতে পারতেন না। নিজের মাথার ওপর আস্থা ছিল না তাঁর। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে মাথার কী প্রয়োজন? মাথার কাজ শেষ হয়েছে। দামিনী তা জানতেন। তারপর, সীতানাথ

ভেবে রেখেছিলেন, কিছুদিন অন্তত, তিনি নিরামিষাহারী হবেন। সীতানাথের খাওয়া হল না।

আবার সেই শয়নঘর। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর। চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষগুলো প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীতা স্ত্রী ছাড়া একদিনও বাঁচে কী ক'রে—অনেক ভেবেও সীতানাথ ঠিক বুঝতে পারলেন না। ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করতে করতে সীতানাথ খবরের কাগজ খুললেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই কাগজ একপাশে সরিয়ে রাখলেন। দামিনী অদূরে ঐ চেয়ারটায় বসে কত কথা বলত এই সময়ে। 'এই চাকরটা ভারি ভাল। বাজারের পয়সা চুরি করে না।' 'কেমন ক'রে বুঝলে?' সীতানাথ বিস্মিত হবার ভান করতেন। 'বোঝা যায় না! এই সময় রুইমাছ কখনও কোনদিন তোমার আগের চাকর এগার আনা ক'রে এনেছে? পাজী, নচ্ছার! দশ আনা, এগার আনায় এনে বলত, চোদ্দ আনা।' সীতানাথ বলতেন, 'হ্যাঁ, মানুষটা ন্যাকা বোকা। ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

তারপরেই অন্য প্রসঙ্গ: 'সাগরকে একবার আসতে লেখ না! বৌমাকে কত দিন দেখিনি। খোকা হয়েছে। তা তুমি ত চিঠিতে আশীর্ব্বাদ আর পার্সেলে একরাশ উপহার পাঠিয়েই খালাশ। বলি, একবার দেখতেও কী ইচ্ছে করে না?'

বাস্তবিক, সাগরের ছেলেটাকে একবার দেখবার ইচ্ছা সীতানাথের প্রায় দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সাগর কতটুকু ছিল। ছেলেবেলায় ছিল ভারি রোগা, কিন্তু ভারি দুরন্ত। তার দুষ্টুমিতে ঘর বারাণ্ডা একাকার হয়ে যেত। বার পেরোতেই সাগর হঠাৎ অসম্ভব রকম দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল। আর ভালভাবে কয়েকটা পাশ দিতেই সীতানাথ তার বিয়ে দিলেন। সাগর নিল চাকরী টাটায়—দেড়শ' পাচ্ছে এখন। সেই সাগরের ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে করে না তাঁর? বলে কী দামিনী! ছেলেটা কী সাগরের চোখ আর ভ্রূ পেয়েছে? তাঁদের পরিণত যৌবনের সন্তান—সাগর। সীতানাথ বলেন 'ওর ছুটি খুব কম। আসবে কী ক'রে! চল, আমরাই একদিন যাই।'

যাওয়ার আয়োজনের মধ্যপথেই দামিনী মারা গেলেন। সীতানাথ চোখ তুলে দেখলেন, আলমারীর মাথায় সাগরের ছেলের জন্য কেনা মস্ত ডল্

পুতুলটা নীল চোখে নিমেষহীন তাকিয়ে আছে। সীতানাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢক্ ঢক্ ক'রে একগ্লাস জল খেলেন।

চার দিন চার রাত অতিবাহিত হল। সীতানাথ এই চার দিন ঘুমুলেন না, প্রায় কিছু খেলেন না। যে ক'টা চুল সাদা হতে বাকি ছিল, পঞ্চম দিনের প্রত্যূষে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন, তা সাদা হয়ে গেছে।

সীতানাথ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, একজন দুঃস্থ, বয়স্ক, বিধবা মহিলা চাই। বিজ্ঞাপন ছাপা হবার তিন দিন পর সীতানাথ যা খুঁজছিলেন, পেলেন।

বহু মহিলাই এলেন। বয়স তাঁদেরও কম ছিল না, বৈধব্য বিষয়েও সন্দেহ করবার মত কিছু নেই। তবু, কেন যে সবাইকে তাড়িয়ে সীতানাথ সৌদামিনীকে রাখলেন, সে এক রহস্য।

আমাদের দৃষ্টিতে সৌদামিনীর তিনটি গুণ ধরা পড়ে, যাতে বিশেষ ক'রে সীতানাথ তাকেই মনোনয়ন করলেন। প্রথমত, নাম সৌদামিনী; দ্বিতীয়ত সৌদামিনীর দুঃস্থতা সম্বন্ধে তার দিকে তাকালেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়; তৃতীয়ত, সৌদামিনীর বয়স। কত? আটচল্লিশ কিম্বা বায়ান্নও হতে পারে,—এমনি সন্দেহজনক বয়স—সৌদামিনী যে বয়সে মারা গেছেন।

সৌদামিনী কাজে নিযুক্ত হবার পর সীতানাথ অন্তরে বাইরে এক অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করলেন। সীতানাথের যেন মনে হল, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন—ঘুম আসছে। সত্যিই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না। সৌদামিনীকে ডেকে বললেন, 'কী করছিলে?'

'রান্নাঘরে ছিলাম। চাকরটা দেখলাম মাংস এনেছে। রাত্তিরে মাংস আপনার ঠিক সহ্য হবে না ভেবে, ক'খানা লুচি আর সুজির পায়েস করেছি। দু'টো মিষ্টি আনিয়ে দেব।'

শীতকালে জ্বর আসবার মত সীতানাথের গা, হাত, পা শিরশির ক'রে উঠল, রোমাঞ্চে। ঠিক দামিনীর মত কথা বলবার ভঙ্গী। সীতানাথ লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, এবং এতক্ষণ পর যেন মনে হল, নাকটা ওর ঠিক যেন দামিনীরই মত। সীতানাথ বললেন, 'তুমি যা ভাল বুঝে করবে, তাই হবে। আর দেখ, তোমাকে আমি তুমিই বলব; তোমাকে ছোট করবার জন্য নয়,—আমার

কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে। বহুদিন কাউকে আপনি বলবার দরকার হয়নি, বলিনি……' সীতানাথ কথা অসমাপ্ত রেখে সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকালেন।

সৌদামিনী মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই বলবেন।'

সীতানাথ সিগার ধরালেন।

তারপর রাত্রে অনেক দিন পর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার ক'রে সীতানাথ শয়ন ঘরে ঢুকলেন।

সৌদামিনী পান আনল।

'এ কী, এত অল্প সময়ে, এত সব কাণ্ড তুমি করলে কখন? পান ত আমি বিশেষ খাই না।'

'তা জানি। তবু, শুনলাম এ ক'দিন কিছুই এক রকম আপনি খাননি। আজ যা হোক সামান্য কিছু খেয়েছেন। পান আর সামান্য মশলা নিন, ক্ষতি করবে না।'

বৃদ্ধ হলেও কোন কিছু খেয়ে এত দূরে দৃষ্টি রাখবার কোন প্রয়োজন সীতানাথ বোধ করতেন না। দৃষ্টি রাখতেন দামিনী। আর এ যেন সেই দামিনীরই প্রতিচ্ছবি।

সীতানাথ পান খেলেন আর পানের রসে সিক্ত মুখে বললেন, 'দেখ, এই বুড়োর আর একটা আবদার আছে। তোমাকে আমি দামিনী বলে ডাকব।'

'আপনার স্ত্রীর'……

সীতানাথ অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে সৌদামিনীর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'না-না সে কী কথা, সেজন্য নয়। মানে, একটা কিছু বলে তোমাকে ডাকতে হবে ত! নামটাকে একটু ছোট ক'রে নিলাম মাত্র।'

'বলবেন,' নতমুখে বলল সৌদামিনী।

তারপর বাতি নিভিয়ে সৌদামিনী নিষ্ক্রান্ত হল।

বহুক্ষণ সৌদামিনী ঘুমুতে পারল না। না পারাই স্বাভাবিক। সহর-তলীর কোন এক জীর্ণ ঘরে এ সময়ে উনুনে যা হোক চাট্টি চাপিয়ে পা গুটিয়ে বসে চরকা কাটত। পাড়ার এক ছোকরা, কাগজটা এনে দেখায়। এ বাড়ীর চাকর মারফত একহাঁড়ি সন্দেশ সৌদামিনী পাঠাবে লাটুকে। শেষ বয়সে

তার জীবনে এমন অঘটনও অপেক্ষা করে ছিল, কে জানত! বুড়োটা বড় আবদেরে। একটা না একটা কিছু চাইবেই সব সময়। তবু, সৌদামিনী শেষ বয়সে অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যে প্রশান্তি ও যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে এসে পড়েছে এর জন্য সীতানাথকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। সৌদামিনী যুক্তকরে সীতানাথের উদ্দেশ্যে নমস্কার করল। কাল থেকে দামিনী বলে ডাকবে। ডাকুক! ওঁর কোন সাধই অপূর্ণ রাখবার ইচ্ছা সৌদামিনীর নেই। কত আর চাইবে, কীই বা চাইবে? তার নিজের বয়স এই উনপঞ্চাশ, আর বুড়ো নিশ্চয়ই ষাটের নীচে নয়। মানুষের উষ্ণ নিঃশ্বাসে তাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না। সাদা চুলে আর লোল চামড়ায় বহু সহস্র সূর্য্যরশ্মি বাঁধা পড়েছে। ভয় নেই আর কিছুতেই।

দ্বিতীয় দিনের আরম্ভেই সৌদামিনী ডাক শুনতে পেল: 'দামিনী, দামিনী!'

ডাকটা ভাল লাগল দামিনীর। সকালে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠতেই কোন পুরুষের অসহায় কণ্ঠের ডাক এমনি ভাল লাগে বোধ হয়। দামিনী এমনি শুনতে অভ্যস্ত ছিল, স্বামী ডাকতেন। আর স্বামীরা স্ত্রীদের কাছে চিরদিনই অসহায়,—কেউ কেউ আবার বাড়িয়ে মনে করেন, অসহায় শিশু।

সৌদামিনী ও ঘরে গেল। 'ডাকলেন'?

'হ্যাঁ। দেখ, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। হয়ে গেছি। মানুষ রাতে একটু ঘুমতে না পারলে পাগল হবে না ত কী হবে?'

'একটা ওষুধ খেলে পারেন,' সৌদামিনী কণ্ঠে সহানুভূতি এনে বললে। সেও ঘুমতে পারত না প্রথম প্রথম। স্বামী গত হয়েছেন প্রায় এক বছর হল। ঘুমুতে না পারার সেই যে অবিচ্ছেদ্য যন্ত্রণা, তার সঙ্গে পরিচয় আছে সৌদামিনীর।

'ওষুধ! তুমি কী পাগল হলে নাকি? ওষুধ খেয়ে ঘুমব! আমি মরে যাব।'

মানুষ পর পর অনেকগুলি রাত্রি ঘুমতে না পারলে তার মরে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সৌদামিনী কী ভেবে ঘাড় নাড়ল।

সীতানাথ বিষম উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'ঘাড় নাড়ছ কী, আমি মরে যাব!'

'না, আমি বলছিলাম, ওষুধ খাবেন না।'

'তবে, করব কী আমি ?'

এর উত্তর নেই। অগত্যা কোন কাজের অজুহাতে সৌদামিনী বেরিয়ে এল।

সীতানাথ সেদিন কিছু খেলেন না। তাঁর চেহারায় এমন একটা রুক্ষ কাঠিন্য এসেছিল যে, পরিচিত কেউ দেখলে নিঃসন্দেহে ভাবত, তাঁর পাগল হতে আর কিছু বাকি নেই।

সন্ধ্যায় সীতানাথের মাথার যন্ত্রণা বাড়ল—ক্রমশই বাড়তে লাগল। অবশেষে সীতানাথ শয্যাগ্রহণ করলেন।

সৌদামিনী বেদনাকাতর মুখে বলল, 'ডাক্তার ডাকতে বলব।'

'না, আমি স্বাভাবিকভাবে মরব। তুমি অমন মুখ করছ কেন? যেন মাথার যন্ত্রণা আমার না হয়ে তোমার হয়েছে'।

বাস্তবিক, সৌদামিনী কারও কষ্ট দেখতে পারত না। স্নেহে ভিজেছিল ওর অন্তরটা। প্রতিকার সব সময় ওর হাতে থাকত না। তবে কিছু করতে পারলে ওর স্নেহস্রাবী অন্তর শান্তি পেত। সৌদামিনী কোন কথা বলল না। একখানা হাত রাখল সীতানাথের মাথায়। সীতানাথ ব্যাকুলাগ্রহে সেই হাতখানা চেপে ধরলেন।

সময় সরে যেতে লাগল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। সৌদামিনী শয্যাপার্শ্বে বসে সীতানাথের মাথায় কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল। দীর্ঘ, মন্থর এই হাত বুলোন অনেকটা ঘুমেরই মত। একভাবে একই কাজের পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি, এ যেন দেখা সমুদ্রকে বার বার দেখা,—সমুদ্রের স্বপ্নের সঙ্গে ঘুম কেমন ক'রে জড়িয়ে গেল।

তারপর গভীর রাতে হঠাৎ সীতানাথ অভ্যাস বজায় রাখতে উঠে পড়লেন। ঘুমজড়ানো চোখে, প্রশ্নহীন উত্তরে বললেন, 'জল খাব'। জল খেয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন আবার। অন্ধকারে দেখলেন, এঁকে বেঁকে সৌদামিনী তাঁর নিজের বালিশের পাশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমচ্ছে। নিজের মাথায় হাত দিয়ে সীতানাথ মনে ক'রে দেখলেন, এই মাথারই পরিচর্য্যা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে মনে বললেন, বেচারা। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে পরিতৃপ্ত এক ঘুমের শেষে সীতানাথ উঠলেন। সৌদামিনী কখন উঠে গেছে। ও হয়ত ভেবেছে, সীতানাথ তার দুর্ব্বলতা জানতে পারেন নি। ভালই হয়েছে।

সমস্ত দিন কাটল ভাল।

রাতে শয়নঘরে ঢুকেই সীতানাথ বিপদে পড়লেন। মনে হল, ইহজীবনে তিনি আর ঘুমতে পারবেন না। সমুদ্র কী রকম, তিনি মনে করতে পারছেন না। অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেন তাঁর কানের গোড়ায় একযোগে শব্দ ক'রে ক্রমেই তাঁকে উত্তপ্ত ক'রে তুলছে। দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা শরশয্যা হয়ে উঠল।

গভীর রাত্রি। সহরের কর্ম্মচঞ্চলতা থেমে গেছে সৌদামিনী স্বপ্নে শুনল কে যেন ডাকছে, 'দামিনী'। না, এ ত স্বপ্ন নয়। এ ত অসহায় পুরুষের যে ডাক শুনে রোমাঞ্চে গা শিউরে ওঠে, সে স্বর নয়। দৃপ্ত, উদ্ধত, স্থির, প্রগাঢ় স্বর।

'দামিনী'। অন্ধকারে সীতানাথের গলা শোনা গেল।

সৌদামিনী ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। 'এত রাতে—কী হয়েছে…অসুস্থ বোধ করছেন'?

'আমি মরে যাব দামিনী।' সীতানাথের গলা এবার অসহায় কান্নায় ভিজে এল।

সৌদামিনী উঠে আলো জ্বালতে গেল। সীতানাথ বাধা দিলেন। সৌদামিনীর বালিশটা তুলে নিয়ে সীতানাথ আদেশের কণ্ঠে বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো'।

সৌদামিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত সীতানাথকে অনুসরণ করল।

বালিশটা নিজের বালিশের পাশে স্থাপন ক'রে সীতানাথ দার্শনিক গলায় বললেন, 'শুয়ে পড়, এই বয়সে যত ঘুম হয় ততই ভাল। আমাকে শুধু স্বাভাবিকভাবে মরবার সুযোগটুকু দাও। ভয় পেয়ো না; দিনের আলোয় ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো, সারা অবয়বে বার্দ্ধক্যের শ্বেত নিশান উড়ছে।'

সীতানাথ অচিরেই নিদ্রায় নিভে গেলেন।

সৌদামিনী, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এত দূর হাত বাড়াতে হবে তা আগে

বুঝতে না পারলেও, যা-নয়-তাই বলে, ফুঁপিয়ে, অস্থৈর্য্য প্রকাশ ক'রে একটা দৃশ্যের অবতারণা করল না। শান্তচিত্তে শয্যা গ্রহণ করল। তারও ভাল ঘুম হয় না রাতে। স্বামী মাত্র বছরখানেক হল গত হয়েছেন।

স্বপ্নে সৌদামিনী এলেন। সীতানাথ, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে তাঁর বড় শত্রুকেও বরং কামনা করুন, কিন্তু দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী এই সৌদামিনী—কী অসহ্য, অসহ্য! সৌদামিনী কী যেন বলতে গেলেন। সীতানাথ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'দামিনী, ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে স্বাভাবিক ভাবে মরতে দাও! মানুষ না ঘুমতে পারলে পাগল হবে না ত কী হবে? দ্বিতীয় প্রকৃতির দাস আমি,—তার আজ্ঞা আমি অবহেলা করি কী ক'রে?'

ঘুম ভাঙ্গল। সকাল। সীতানাথ শয্যায় উঠে বসে নিবিড় সুখে হাই তুললেন আর মুখের কাছে ডান হাতখানা তুলে তিন তুড়ি মারলেন।

শ্রীসরোজকুমার নন্দী

ছন্দ

(২)

দেহের রূপরেখাকে ফুটিয়ে তুলতে বসন ভূষণ যেমন সাহায্য করে, রস-প্রভাবেরও তেমনি একটা বাহ্য প্রকাশের দিক আছে। ছন্দ আর নানা অলঙ্কার আর কবিতার অন্যান্য পদ্ধতি সে প্রকাশকে স্পষ্ট আর লাবণ্যযুক্ত করে। এ সম্পর্কে এখানে আলোচ্য ছন্দ।

আবেগ আত্মপ্রকাশ করতে চায় ধ্বনিতে। অর্থাৎ কাব্যে ব্যক্ত ধ্বনিকে এমন হ'তে হবে যা শ্রোতার অনুভূতিতে আবেগের রসরূপের ঐক্যবোধ ঘটিয়ে তার আনন্দবাসনাকে তৃপ্ত করতে সাহায্য করবে। কাব্যের মধ্যেকার ধ্বনি-সমষ্টিকে তাই এমন ভাবে সঙ্কলিত আর সঙ্গতিবিশেষে পর্য্যবসিত হ'তে হবে যাতে সে সময়য়ের প্রভাব হবে অখণ্ড। অর্থাৎ তাতে থাকবে সুরের ধর্ম্ম, যাকে প্রথম সংখ্যা 'উত্তরামন্দ্র' পত্রিকায় সঙ্গীত-শিল্পী রবীন্দ্রলাল রায় বর্ণনা করেছেন 'the *integral unity* of the language of music' ব'লে। কাব্যে ধ্বনির ঐ বিন্যাস, যা ভাবরূপকে ফোটায় সুরময়তা দিয়ে, সেটা ঘটানো হয় ছন্দের সাহায্যে।

কাব্যে ভাবের বিকাশের পক্ষে সুরধর্ম্মের এই আবশ্যকতা, আর সেই সঙ্গে ছন্দের প্রয়োজনের কথা, একটু অন্যভাবেও বোঝা চলে। গত মাসের 'ভাব, রস ও রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে যেমন বলেছি, ভাষার শব্দরাজিতে মিশে আছে বিনা অর্থের ধ্বনির আবেগ-মূল্যের সঙ্গে অর্থের সম্পদও। ভাবাবেগের বিশুদ্ধ প্রকাশ হ'তে পারে অর্থবিহীন ধ্বনিতে, গানে যেমন বাক্যবর্জ্জিত সুরের আলাপে হয়। কবিতায় কিন্তু অর্থসম্পন্ন ভাষার ব্যবহার করতেই হয়, আর যেহেতু ভাষাতে নিরালম্ব ধ্বনির আবেগ-মূল্যের সঙ্গে অর্থের সম্পদও মিশে আছে, তাই ভাষাকে যেমন আছে তেমনি ভাবেই কাব্যে ব্যবহার করলে তাতে সহজ সরল আবেগের প্রকাশ সুরে প্রকাশের মতন বিশুদ্ধ আর অবিমিশ্র হ'তে পারে না। কাব্যের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের তাই এমন কোন পদ্ধতি

অবলম্বন করতে হয় যাতে ভাষার মাধ্যমে হওয়া সত্ত্বেও ভাবকে যতটা সম্ভব তার স্বরূপেই বিকাশ করা যায়; অর্থাৎ সে বিকাশ যতটা সম্ভব সুরের প্রকাশের মতনই হয়, Walter Pater যেমন বলেছেন যে সকল শিল্পেরই লক্ষ্য হ'ল সঙ্গীতের ধর্ম্মের কাছাকাছি যাওয়া। কাব্যে বাক্যকে ছন্দে বেঁধেই সঙ্গীতের রীতিতে ভাব বিকাশের চেষ্টা করা হয়। সুরধর্ম্ম ছাড়া (পদ্য ছন্দের কবিতা হ'লে) যে গতিধর্ম্ম বা দোলা তাতে জাগবে সেটা এলোমেলো না হয়ে হবে একটা নিয়মিত আন্দোলন যাতে সে একটা স্মৃতিগত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, কেননা প্রত্যাশার পূরণও আনন্দ সঞ্চারে সহায়তা করে। এই নিয়মিত দোলা বা যতিবিন্যাসও ছন্দের কায। সঙ্গীতেও এই যতিবিন্যাস আছে সে কথা সকলেই জানেন।

কাব্যরচনায় ছন্দের প্রয়োজন উপরোক্তভাবে গূঢ় বলেই অনেক সময়ে ছন্দকে মোটামুটি কাব্যের মূল লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয় এবং কাব্যের পরিভাষা করা হয় ছন্দোবদ্ধ বাক্য ব'লে। ছন্দের প্রভাবকে নির্ভুল, নির্দ্দিষ্ট আর নিশ্চিত করতে চরণ, মাত্রা, মিল প্রভৃতি উপায় সকল উদ্ভাবিত হয়েছে। যে পরিমাণে এই সকল নিয়ম দৃঢ় করে প্রয়োগ করা হয় সেই পরিমাণে কাব্যকে বলা যায় ছন্দোবদ্ধ বাক্য। যে পরিমাণে এই নিয়মগুলিকে শিথিলভাবে ব্যবহার ক'রে ছন্দকে মূলতঃ মুক্ত বা স্বাধীন ক'রে রাখা হয়, যেমন মিলহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বা আজকের চরণ-মাত্রাহীন গদ্যছন্দ, সেই পরিমাণে কাব্যকে ছন্দোবদ্ধ বাক্য না বলে' বলা চলতে পারে ছন্দোময় বাক্য।

ছন্দ যদি আবেগের হর্ষধর্ম্মকে ভাষার ক্ষেত্রে সম্যকভাবে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্যের পদ্ধতিই হয়, তাহ'লে এটা বোঝা যায় যে কোন কবিতায় কি ছন্দ দেখা দেবে সেটা নির্ভর করবে সে কবিতার ভাবরূপ আর তার বিকাশের ওপরেই—তার সঙ্গে একান্ত হয়ে জড়িত হয়ে। দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি কথার সমষ্টি অনিয়মে অবস্থিতি করলে অর্থটুকু মাত্র প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু সেই কথাগুলিই পর্য্যায়বিশেষে অর্থাৎ একটি নির্দ্দিষ্ট ছন্দে সাজান হ'লে অর্থের অতিরিক্ত আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, রসরূপকে বাহ্যতঃ আরো স্পষ্টতা দিতে পারে। পূর্ব্ব প্রবন্ধের উদাহরণ স্মরণ করা যাক্। 'বঁধু আমি কি আর কহিব; জীবনে মরণে জনমে জনমে তুমি আমার প্রাণনাথ

হইও' এবং 'বঁধু কি আর কহিব আমি, জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি,' এই দুটি উক্তিতে তফাৎ যোজন যোজন যদিও ব্যবহৃত কথাসমষ্টি একই; একটি অর্থহীন প্রলাপ—দৈনিক খাওয়া পরার জগতের প্রয়োজনের ভাষায় 'প্রাণনাথ' নামক কোন জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয়টি উজ্জ্বল ভাষণভঙ্গীতে উপলব্ধির সত্যনিষ্ঠ প্রকাশ।

কাব্যকে কাব্য হ'তে হ'লে পদ্য ছন্দে হ'তেই হবে কি? এ প্রসঙ্গে সম্প্রতিকার অনিয়মিত যতি মিলের কবিতা এবং গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা চলে। এই সকল আধুনিক ছন্দের প্রবর্ত্তকরা অনেকটা এই ভেবে অগ্রসর হয়েছেন যে সাধারণ বাক্যরীতিগত কথাসমষ্টিকে পর্য্যায়-বিশেষে বিন্যাস করেই যখন ছন্দ সাজান হয় তখন আজকের ভাব আর চিন্তা-জীবনের অনিয়মিত প্রকৃতির পক্ষে কাব্যক্ষেত্রেও একটা অসম ছন্দে, গদ্যপদ্যের মিশ্রিত ভঙ্গীতে, মিলে অমিলে, প্রকাশ পাওয়াই সম্ভব। জীবনের স্থিরতা আর চঞ্চলতা, ভাবের নানা বৈচিত্র্য তাতে ফুটে ওঠে। এমন না ক'রে নিয়মিত মিল আর যতি বিন্যাস করলে, ধ্বনির কালবিভাগের নিয়মাবলী প্রয়োগ করলে, অনেক সময়ে প্রকাশিতব্য আবেগরূপের বিকাশ আর মুক্তি পেতে অসুবিধা হয়। নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে কাটছাঁট করতে গিয়ে, সংকোচন প্রসারণের নানা অনুরোধে, ঠিক যে ভাবরূপকে কবি গড়ে' তুলতে চান তা পেরে ওঠেন না। ব্যক্ত রূপ ঈপ্সিত রূপ থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে।

এর ওপর গদ্যকবিরা এটা দেখলেন যে আবেগ যখন বেগবতীই, তখন সে যদি ভাষায় প্রকাশ পায়, তাহ'লে তার স্বাভাবিক একটা বেগ বা গতিচাঞ্চল্য সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাবেই এবং অনেক সময়ে ধ্বনিরাজ্যে ততটা গতিবোধই ব্যক্ত আবেগকে চিত্তরঞ্জিনী করে তুলতে সমর্থ হবে; অন্য কথায়, রসরূপ রচনা করবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এই ভিত্তি থেকেই সম্ভবতঃ বাঙলায় গদ্য ছন্দের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ সে ছন্দের উদ্বোধন ক'রে 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় লিখলেন:—

"অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।"

পরে, ১৩৪৩ সালের পৌষ মাসের 'কবিতা'য় আরো বিশদ ক'রে বললেন:—

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিক ভাবে কাব্য তা নয়, কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।"

গদ্য ছন্দকে কবি ক্রমশঃ আরো বুঝিয়েছেন এই ব'লে যে সেটা ধ্বনির গতিতে একটা 'স্বাধীনতার আস্বাদ,' এবং সেটাই ছন্দের 'স্বাভাবিক চাল' (কবিতা, পৌষ, ১৩৪২) ; গদ্যছন্দ 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে' 'তার থেকে মুক্তি' (পুনশ্চ, ভূমিকা)।

গদ্যছন্দকে রচনাক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গদ্যকবিরা এই নিয়মাবলী বেঁধেছেন :—

"(১) ছন্দ ও মিলের প্রয়োজনে অকারণ কথা, বাড়তি শব্দ, অর্থহীন বিশেষণ প্রভৃতি বসাতে হবে না।

(২) বাক্যবিন্যাস ঠিক গদ্যের মুখের ভাষার মত হয়। কবিতা চলে ভাবের ইঙ্গিত নিয়ে এবং গদ্যে সেটা ফোটে মৌখিক ভাষার প্রকৃত লীলাতেই। মুখের ভাষার সহজ প্রাণস্পন্দনের জোরেই গদ্য কবিতা হয়ে উঠতে পারে।

(৩) গদ্যে চলে না এমন কোন কথা ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় না।"

—(কবিতা আশ্বিন ১৩৪২)।

এই নিয়মাবলী থেকে আমরা গদ্যকবিদের মূল উদ্দেশ্যটুকু বুঝতে পারছি যে রসাবেগের স্বাভাবিক বেগ বা গতিকেই প্রকাশ করা গদ্যছন্দের উদ্দেশ্য, বিশেষ ক'রে আবেগময়ী ভাষণ-ভঙ্গী তাতে আরোপ করা হবে না। নিজের ওপর নির্ভর ক'রে, বাহ্যিক সজ্জার সাহায্য না নিয়ে, পাঠকের অন্তরে রস সঞ্চার করতে পারার মধ্যেই থাকবে তার সত্যতা, শুদ্ধতা আর বাস্তবতার প্রমাণ।

গদ্যকবিদের এই প্রচেষ্টার মূলে যে মনোভাব কায করেছে সেটা হয়ত এই ধরণের যে পূর্বতন কবিরা ছন্দ, অলঙ্কার, প্রভৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে কল্পিত রূপের থেকে ব্যক্ত রূপের ভিন্নতা ঘটলে চিন্তিত হ'তেন না। শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্টিই রসসৃষ্টি হলেই যেন তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। বর্ত্তমানে কিন্তু কবির দৃষ্টি অধীষু। জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর একটা গূঢ় বিশ্লেষণী কৌতূহল। সেই সকল বিষয় নিয়েই তিনি তাঁর বেশীর ভাগ কবিতা লেখেন। কাযেই কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর প্রথম লক্ষ্য হয় যে রূপ লাভ করতে গিয়ে আবেগের প্রকৃতির যেন পরিবর্তন না ঘটে। যে ভাব আর চিন্তা

কবিকে ক্রমাগত বিচলিত করে সে ভাব আর চিন্তা তাঁর কাছে একান্ত মূল্যবান আর তার অবিকল সঞ্চারই সেই জন্যে কবির বিশেষ উদ্যম। আবেগকে রূপ দিয়েও তার প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবার এই প্রয়াসের পক্ষে গদ্যপদ্ধতি আজকের কবিদের খুব কাযে লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই গদ্যপদ্ধতি যদিও পরীক্ষামূলক হয় (যে কথাটার স্বীকৃতি 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় পাওয়া যায়), অন্যান্য গদ্যকবিদের কাছে সে পদ্ধতি এত প্রিয় হয়ে উঠবার কারণ বোধ হয় অনেকাংশে এই যে সেটা তাঁদের মুখর হ'তে সাহায্য করেছে। তাঁরা অনেকেই বেশ ক্ষমতাশালী পদ্যকবি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা গদ্যপদ্ধতিকে অভিনন্দন করেছেন তার সাহায্যে ভাবরূপের ব্যক্তিগত ধারণা বা তাঁদের একান্ত নিজস্ব idea-রাজির রূপরেখা অপরের মধ্যে সেই নিজস্ব ভাবেই সঞ্চার করতে পারছেন বলে।

গদ্যকবিরা একথাও বলতে পারেন যে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে আজকের জীবনে প্রশান্তি আর তৃপ্তির চেয়ে সমস্যা-সঙ্কুলতা আর তজ্জনিত দুঃখ, বিরক্তি, হতাশা, নৈরাশ্য আর বিষাদই বেশী, কাযেই তার থেকে উদ্ভূত কবিত্বরস একটু ব্যক্তিগত, একটু অশান্ত, একটু যন্ত্রণাকাতর আর তর্কপ্রবণ হতে বাধ্য, আর এই শাণিত বায়ুমণ্ডলের পক্ষে গদ্যই সঙ্গত। অনেক সমালোচক প্রকৃত পক্ষে একেই গদ্যপ্রেরণার মুখ্য কারণ ব'লে বিশ্বাস করেন, যেমন অধ্যাপক Garrod :—

"The body of our joy has sensibly shrunken. From the old Greek, and the old human unity of words, music and dance, we have dropped to mere verse ; and already we are asking whether it need scan, and yet again, whether poetry need be in verse at all."

বাঙালী গদ্যকবিরা কিন্তু এ পর্য্যন্ত এদিক থেকে গদ্যপদ্ধতির যৌক্তিকতা দেখাবার কোন চেষ্টা করেন নি এবং আমাদেরও মনে হয় না যে এ যুক্তির সবটা খাটে, কেননা জীবনে আনন্দের অভাবের প্রভাব রস আর রূপের ওপর পড়লেও, রচনাকালের আনন্দ স্বতন্ত্র জিনিষ, সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যেই যার প্রমাণ আর স্বীকৃতি। অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণার বোধ বেশী মাত্রাতেই সৃষ্টির প্রেরণা দিতে সক্ষম হয়।

গদ্যকবিদের সকল যুক্তি সত্ত্বেও গদ্যকবিতা সত্যই কবিতা কিনা এ প্রশ্ন

অনেকের মনে জাগে। শ্রীলীলাময় রায় 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বিশেষ সমালোচনা সংখ্যায় এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। হাতে কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখবার চেষ্টা করা যাক্। নীচে রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য প্রবন্ধ আর একটি গদ্য কবিতার অংশবিশেষ পর পর তুলে দিই :—

(১) "আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২০

"উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। * * * মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটীর পথ চলে গেছে তাতে লোক চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ, প্রসারিত; চারিদিক থেকে পলিপড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠাসা ক'রে আনে নি। তার পশ্চিম দিকের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী, যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুঁড়ে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ। * * * আমিও সমস্ত দুপুর বেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ ক'রে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি। * * * মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোট ঝরণা হয়ে ঝ'রে পড়তো। সেখানে জমেছিল একটি ছোট জলাশয়; তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার পক্ষে যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির ঝির ক'রে বয়ে যেত নানা শাখা প্রশাখায়; ছোট ছোট মাছ সেই স্রোতে উজান মুখে সাঁতার কাটতো। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশু ভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী; মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে অচেনা জিওগ্রাফীর মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম।"

(২) "খোয়াই" (পুনশ্চ, ৩০এ শ্রাবণ, ১৩৩৯) :—

পশ্চিমে বাগান বন চষা ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগ্‌নি বাষ্প রেখায়;
মাঝে মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ীর প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ
দিশাহারা অনির্দ্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা,
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি একধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে;
মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
ঊর্ম্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।
মাঝে মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ডের মত।

পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে রচনা করেছে
ছোট ছোট অখ্যাত খেলার পাহাড়;
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

* * * *

এসেছিনু বালক কালে।
ওখানে গুহা গহ্বরে
ঝির ঝির ঝরণার ধারায়,
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্য কথা
খেলেছি নুড়ী সাজিয়ে
নির্জ্জন দুপুর বেলায় আপন মনে একলা।"

এখন একবার পড়লেই উপলব্ধি করা যায় যে প্রথম রচনাটি একটি ধারাবাহিক বিবরণ। একটানা একটা বক্তব্য বলা হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে মনে হয় যেন একটা বিশেষ বক্তব্য আছে আর সেটাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে ক্রমাগত আয়োজন চলেছে। একটি ছবির কেন্দ্রগত বিষয়টিকে ফোটাবার জন্যে, আর তার চারিপাশে একটা উজ্জ্বল পরিবেষ্টন গড়ে' তোলবার জন্যে, যেন ক্রমাগত নানা রঙের তুলির ছোপ পড়ছে, রেখার বিন্যাস চলছে। বক্তব্য দুই রচনাতেই এক—শৈশবের একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কিন্তু প্রথম রচনাতে সেটা বলাই হয়; দ্বিতীয়টিতে তার আলেখ্য সৃষ্টি করা হয়। স্বয়ং শিশুটি যেন তাতে কথা কয়। স্পষ্টভাবে তার প্রতি মনোযোগ যায় কবিতার এমন স্থলে, অন্তঃশীলা ছন্দের সমস্ত দমক ফুটে ওঠে এমনভাবে শব্দগুলিকে সাজিয়ে বলা হ'ল 'এসেছিনু বালক কালে।' প্রথম বর্ণনায় শিশুটিকে বিশেষ ক'রে ছবির কেন্দ্রে স্থাপন করা হয় নি। প্রথমেই তার আসার কথা বলা হয়ে যায়। তার পর একটা ভৌগলিক বর্ণনাই মূল বক্তব্যের মতন হয়ে থাকে। উঁচু নীচু কাঁকুরে জমির কথা এ রচনাটিতে দ্বিতীয় রচনা অপেক্ষা স্পষ্টতর স্থান গ্রহণ করে আর শিশুর কাহিনী সমগ্র রচনাটির মধ্যে লতার মতন জড়িয়ে জড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্যে যেমন লতা বা ফুলের মালার পরিকল্পনা রচনার সংগঠনকে নির্দ্ধারিত করলেও মূল বক্তব্য হয়ে দাঁড়াত না, তেমনি শিশুটির কাহিনী প্রথমে উদ্ধৃত রচনায়। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে বক্তব্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে দিয়ে বালকজীবনের একটি

অভিব্যক্তিকেই একটি রসাশ্রিত ঐক্যে পরিণত করবার সজ্ঞান প্রয়াস ; একটা অখণ্ড রসপ্রভাব সৃষ্টি করবার উদ্যম। এ রচনাটি তাই উপকরণের নির্ব্বাচনে, পরিমাণের বোধে, শব্দের একটা সমঞ্জস সম্বন্ধ-বিন্যাস। পাঠক অতি সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন যে যদিও একই সময়ের একই বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে দুটি রচনায় একই চিত্ররাজির অবতারণা করা হয়েছে তবু রূপগত উদ্দেশ্যভেদে কিভাবে দুটিতে তাদের সংকোচন প্রসারণ করা হয়েছে, ছবিলতার দিক থেকে স্পষ্ট অস্পষ্ট করা হয়েছে ; উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদ দেওয়া হয়েছে। দুটি রচনাতে উপমা-প্রয়োগ রীতিরও তারতম্য আছে যাতে তাদের রস-প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রমাণিত করে। এ প্রমাণের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র দত্তের উক্তির কাছে ঋণী। তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি ধরেছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোন মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে ; সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর'। কিন্তু তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্য্যের তাগিদে।' শেষোক্ত শ্রেণীর, অর্থাৎ ভাবসঙ্গতির জন্য, উপমা 'খোয়াই' নামক গদ্যকবিতায় মূলতঃ এইগুলি :—'দিশাহারা অনির্দ্দিষ্টকে দিক দেখাবার ব্যাকুলতা' ; 'মাঝে মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি মহিষাসুরের মুণ্ডের মত।' 'দিশাহারা অনির্দ্দিষ্ট' সম্বন্ধে কারো ধারণা স্পষ্ট হ'তে পারে না। মহিষাসুর কেউ বাস্তব চক্ষে দেখে নি। তাই এসকল উপমার প্রয়োগের উদ্দেশ্য অর্থকে স্পষ্ট করা হতেই পারে না—গদ্যরচনার যেটা মূল উদ্দেশ্য। এদের প্রয়োগ কবিতাতেই যার উদ্দেশ্য, সুধীন্দ্রনাথের নিপুণ ভাষায়, 'সঙ্গতি-অসঙ্গতির' অতীতে কবি ও পাঠককে জড়িয়ে 'ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন' সৃষ্টি করা। এছাড়া পাঠকালে দুটি রচনার গতি বা বেগের মধ্যেও স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় রচনার বাক্য-ধারাগুলি ছোট ছোট ; ঘন ঘন যতির দমক। এ স্থলে স্বয়ং রচয়িতার কথাগুলিই সুপ্রযুজ্য :—'রসরচনা মাত্রেরই' যে একটা 'স্বাভাবিক ছন্দ থাকে,' পদ্যে যেটা 'সুপ্রত্যক্ষ,' 'গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।' আর সেটা উপলব্ধি করা যায় 'গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে থাকলে (কবিতা—পৌষ, ১৩৪৩)।

ফলকথা, গঠননীতির তারতম্য অনুসারে দ্বিতীয় রচনাটিকে কবিতাই বোধ

করি বলা যায়। 'রূপের সম্পূর্ণতা,' 'রসের সমগ্রতা' ব'লে গদ্যকবিরা গদ্য-কবিতার যে মূল মাপকাঠি নির্দ্দেশ করেছেন (কবিতা—চৈত্র, ১৩৪৩, পৃঃ ৬৩), সে পরীক্ষায় সম্ভবতঃ এ রচনাটি উত্তীর্ণ হয় এবং লীলাময় বাবুর এ উক্তিতে সায় দেওয়া যায় না যে 'গদ্যে কবিতা হ'তে পারে না, যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব ;.....পদ্যকবিতাই কবিতা।' অর্থাৎ লীলাময় বাবুর মতে পদ্যছন্দটাই কবিতার সব। এই যদি লীলাময় বাবু বলেন তো বলবেন ; এ তো সত্য কথা যে কবিতার বিশেষত্বই হ'ল—যার কাছে যে দিক থেকে সেটা বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে সেটাই তার সত্য পরিচয়।

আমাদের মনে হয় যে লক্ষিতব্য এই যে রচনায় ভাবের ঐক্য সৃষ্ট হ'ল কিনা। যদি হয় তাহ'লে রচনা গদ্য হলেও হবে কবিতা আর তা না হ'লে পদ্য হ'লেও কবিতা হবে না। গদ্যকবির আবেগ হ'তে পারে যুক্তিবাদীর, rationalist-এর, আবেগ, কিন্তু যে কালে আবেগকে রসের একটি প্রভাব-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করা তার লক্ষ্য আর সচেতন চেষ্টা, তখন তার রচনা কবিতা। অর্থকে সে অর্থরূপে দিতে চায় না, সে তাকে ভাবপ্রতীকে রূপান্তরিত করে। দ্বিজেন্দ্র মৈত্রের 'সূর্য্যমুখী' কি কবিতা নয়, কিম্বা স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের 'হাউই' ?

কবিত্বময় গদ্য তাকেই বলবো যাতে রসের আবেষ্টন থাকলেও একটা স্ব-সম্পূর্ণ অখণ্ড রস-সমন্বয় সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়, স-রস করে বা আবেগময়ী ভাষায় কথার অর্থটিকেই প্রকাশ করা যার লক্ষ্য মাত্র। নীচের দুটি লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করি :—

(১) "আমাদের এই কোণ-ঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেইদিন বাঙালী সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে, এর পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি যে টি কলো না, বাঙলার ঘরে বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটলো না, তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোল আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না.....ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি.....রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবনমুক্তি, অর্থাৎ স্থূলশরীরের বন্ধন হ'তে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্বেষ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকের প্রথম সূত্র।"

(শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—"রূপের কথা"।)

(২) "মাসীমার সংস্কার আছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটানা বারিধারার ঘুমপাড়ানী শব্দের মতন তার ধ্বনি, তবু পয়ারের পাড়াগেঁয়ে একঘেয়েমী নয়। কোথায় যেন খানদানী গাম্ভীর্য্য রয়েছে সন্দেহ হয়। এর জোরে কত রাজকুমার সংসারত্যাগী হ'ল, বৃদ্ধ থেকে সেদিনকার ছাতুবাবু পর্য্যন্ত। ব্রহ্মচারিণীর কাঠিন্য রাজলক্ষ্মীর সতীত্ব, লোপ পায় নি এখনও এরই কৃপায়, তা ছাড়া, শান্তি চায় লোকে, মাসীমার মুখে চোখে দীপ্তি নেই, তবু ব্যবহারে প্রশান্তি, আভিজাত্য রয়েছে, তাঁর পায়ের তলায় মাটি কাঁপে না, তাঁর আকাশ নির্ম্মল।

কিন্তু সে শূন্যে নক্ষত্র যেন নিশ্চল, বাতাস নিস্পন্দ। প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে। মাসীমার ধর্ম্ম মাসীমার, অন্যের নয়। এই সেদিন একদল ইংরেজ ছোকরা আরবদের জাতীয় নিয়তিকে আপন ক'রে নিলে·····তবু পারলে না আপন হ'তে·····অন্যের ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করতে করুণ ভাবে মানা করেছেন·····ঘৃণা হবে শেষে নিজের ওপর। ঘৃণায় দেহ অবশ হয়, অভ্যাসের আদেশটুকু পালন করতে পারে। চিত্ত ভাসে ওপরে, নিশ্রিত বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে লক্ষ্মীর মতন, শবের ওপর বিদেহী আত্মার মতন। দেহ ও চিত্তে সমন্বয় হয় না; সংস্কার ও দৃষ্টিতে রফা চলে না। স্বধর্ম্মত্যাগই সব চেয়ে বড় মিথ্যা, মিথ্যায় মানুষ বাঁচে না।"

(শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"আবর্ত্ত"।)

'রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র' আর 'স্বধর্ম্ম ত্যাগই সব চেয়ে বড় মিথ্যা, মিথ্যায় মানুষ বাঁচে না'—রচনার দিক থেকে একই ছন্দ, একই ধ্বনি। দুটি উক্তিই রূপে রূপায়িত, অর্থাৎ আবেগের বা কবিত্বের রূপে; কিন্তু ওগুলি কবিতা নয়। প্রমথ চৌধুরী বা ধূর্জ্জটিপ্রসাদকে কেউ গদ্যকবি বলে না। দুটি লেখাই যুক্তিতথ্যপূর্ণ। অর্থজ্ঞাপনই ওদের মূল লক্ষ্য, ভাবসঞ্চার নয়। অতএব ও দুটি আবেগায়িত গদ্যরচনা হ'তে পারে—impassioned prose—বা কবিত্বময় গদ্য (লেখকদ্বয় হয়ত তাতে আপত্তিই করবেন)—কিন্তু গদ্যকবিতা থেকে আলাদা।

লঘুতর বিষয়ে দুটি ইংরাজী রচনার নমুনা :—

(1) "Goodwood Park gives me little pleasure. I miss the deer ; and when the first park that one knew was Buxted, with its moving antlers above the brake fern, one is almost compelled to withhold the word 'park' from any enclosure without them It is impossible to lose the feeling that the right place for cattle—even for Alderneys—is the meadow. Cows in a park are a poor makeshift ; parks are for deer. To my eyes Goodwood House has a chilling exterior ; the road to the hill-top is steep and lengthy ; and when one has climbed it, and crossed the summit wood, it is to come upon the last thing that one wishes to find in the heart of the country, among rolling the downs, sacred to hawks and solitude—a grand stand

and the railings of a race course ! Race courses are for the outskirts of towns, as at Brighton and Lewes ; or for hills that have no mystery and no magic, like the heights of Epsom ; or for such mockeries of parks as Sandown and Kempton. The good park has many deer and no race course.

And yet Goodwood is superb, for it has some of the finest trees in Sussex within its walls, including the survivors of a thousand cedars of Lebanon planted a hundred and fifty years ago ; and with every step higher one unfolds a wider view of the channel and the plain."

(E. V. Lucas—"Highways and Byways in Sussex).

(2) "For the Acropolis is the personification of all peace, it is the crown of Athens, the eternal symbol raised aloft which proclaims that Greece has no kith or kin with the crowded barbarians to the North, or the massed savages to the East. Oh ! I know perfectly well that the Turk is a fine fellow—a finer fellow than the average Greek, and that modern Greece has little in common with the Greece that first lit the lamp of civilization of Europe. But Turkey has no Acropolis. And as long as those matchless columns hover, like a benediction, over Athens, Greece will be different from her neighbours."

(Beverley Nichols—"Twenty-five").

'The good park has many deer and no race course' আর 'But Turkey has no Acropolis'—আবার এক সুর, এক ধ্বনি। দুটি লেখাই কবিত্বময় গদ্য হ'তে পারে, কিন্তু কবিতার অখণ্ড ভাবরূপের সংগঠন ওতে নেই। তাই ওরা গদ্যকবিতার জাতি নয়।

শেষতঃ গদ্যকবিতার একটা রীতি আছে যে কবি যেখানে বোধ করেন যে ভাবের রূপকল্প চেতনার এতই গূঢ় স্তরে পর্য্যবসিত যে তাঁর নিজেরই কাছে সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়—Harold Monro প্রসঙ্গে Eliot যেটাকে 'the dark embryo' ব'লে হয়ত অবিহিত করেছেন—সেখানে তিনি সেই চিত্রাভাসগুলিকে বর্ণনার মধ্যে পাশাপাশি বিন্যাস করেই যেন বাঁচেন। সমীকরণের ভার থাকে পাঠকের সায় দেবার ক্ষমতা (responsiveness) আর কল্পনাশক্তির (imagination-এর) উপর। Eliot এবং বিষ্ণু দের অনেক কবিতা এই ধরণের। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কবিতা না হ'লে, শুধু কবিত্বময় গদ্যরচনায় এ রীতির প্রয়োগ হ'তে পারে না। অর্থকে না ব্যক্ত ক'রে, কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্রকে পাশাপাশি

স্থাপন ক'রে লেখক কখনও সরে' পড়েন না। অতএব নানাদিক থেকেই কবিত্বময় গদ্য আর গদ্যকবিতার মধ্যে পার্থক্য অনুভব করা চলে।

সকল গদ্যকবিতা যা লেখা আর প্রকাশ হয়েছে তার সবই কবিতা হয়েছে কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে মনে করি যে গদ্যে ভালো কবিতা বেরিয়েছে, যা গদ্যে ব'লেই ভালো, পদ্যে যা কবিতা হ'তে পারতো না বা অতটা ভালো হ'ত না। বাঙালী পাঠকের কাছে গদ্যছন্দের কবিতা আরো ধৈর্য্যপূর্ণ পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়:—

"সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ ব'লে কথে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে, তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে, টিঁকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিতাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতি-ভাগের অমিতি এবং মিলের অভাবসত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষর রীতির বহু দূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরও বাইরে পদক্ষেপে যে তার চির নিষেধ, অন্তঃপুর-চারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায় এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না···এ কালের পাক ধরার সময় এখনো আসেনি, সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণে বলতে পারি যে ছন্দে বাঁধা কবিতা যে আগ্রহে লিখেছি সেই আগ্রহেই, এবং ব্যক্তিগত রুচির দিক থেকে বলতে পারি ভালো পদ্যকাব্য আমার তেমনি ভালো লাগে যেমন ভালো লাগে ভালো গদ্যকাব্য। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই ভালো লাগার রসভেদ আছে, যেমন আম ভালো লাগা আর জাম ভালো লাগা।" (বাংলা কাব্যপরিচয়-ভূমিকা)।

শ্রীনবেন্দু বসু

পুস্তক-পরিচয়

(১) Living Space and Population Problems, By R. R. Kuczynski, No. 8. (২) Encirclement, By J. L. Brierly, No. 12. (৩) The Refugee Question, By John Hope Simpson, No. 13. (৪) Czecho-Slovakia, By R. Birley, No 15. (৫) The Blockade, 1914-1919, By W. Arnold Forster, No. 17. (৬) National Socialism and Christianity, By N. Micklem, No. 18. (৭) Who Hitler is, By R. C. K. Ensor, No. 20. (৮) The Nazi Conception of Law, By J. Walter Jones, No. 21. (৯) Was Germany Defeated in 1918, By Cyril Falls, No. 35. (Oxford Pamphlets on World Affairs, Price : 3d. net)

পূর্ব্বে শাসকের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস রচিত হত। আধুনিক কালে শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্বন্ধ ইতিহাসের প্রাণবস্তু। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস-রচনার কলা ও কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। যখন শাসক ছিল মুখ্য, তখন ইতিবৃত্তের ঘটনা ছিল প্রধান; এখন রাজা-প্রজা, দু'পক্ষই মুখ্য, তাই ঘটনার আখ্যানের চেয়ে ব্যাখ্যান হয়েছে প্রথম কথা। ঘটনার রহস্য আমরা মতবাদের আলোকে সুস্পষ্ট করতে চাই। তাই আধুনিক যুগের ইতিহাস বিভিন্ন মতবাদের আকরে কীর্ণ হয়ে থাকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস জাগতিক ঘটনার উপর অনেক খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন। পুস্তিকাগুলি বিজ্ঞ লোক দ্বারা লিখিত কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার্থে প্রকাশিত। লেখকবৃন্দ নানা ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন—তাই তাঁদের নিজস্ব মতকে প্রচার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। মতের সঙ্গে মিল না থাকলেও সুচিন্তিত মত যে শ্রদ্ধার বস্তু—একথা আমি মানি। তাই পুস্তিকাগুলি আমার ভাল-লাগাকে বিঘ্নিত করতে পারেনি। এই পুস্তিকাগুলি যথার্থ লোক-শিক্ষার কার্যে সাহায্য করবে।

য়ুরোপে যে যুদ্ধ চলেছে, তা' বুঝতে হলে প্রথম জানা দরকার যে হিটলার কে এবং তাঁর মূল্য কোথায়। হয়তো একথা সত্যি যে 'Hitler possesses

ordinary qualities in extrarodinary mass and momentum,' কিন্তু তাঁর শক্তির উৎস জার্মানীর জনসাধারণ। অবশ্য জনসাধারণ তাঁর হাতের পুতুল এবং জার্মানীর নানা বিভাগের নেতারা তাঁরই ইঙ্গিতে পরিচালিত। গোয়েরিং এক ব্রিটিশ এম্বেসেডারকে বলেছিলেন—'when a decision has to be taken, none of us count more than the stones on which we are standing. It is the Fuehrer alone who decides।' এই সত্য আজ জার্মানীর ইতিহাসে প্রধান সত্য—এবং এই সত্যের ভিতরই আধুনিক যুদ্ধের রহস্য লুকায়িত। জার্মানীর এই নব-জাগরণ বা নব-আন্দোলনের ভিত্তি হল—the leadership principle এবং the racial principle। তাঁদের আন্দোলনের প্রথম কথা যে তাঁরা কোন নেতাকে বরণ করবেন এবং তাঁদের ভিতর বিশুদ্ধ জার্মান জাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল হবে নেতৃপ্রধান অর্থাৎ কোন নেতার আধিপত্য বিস্তৃত থাকবে, এবং বিশুদ্ধ জার্মান রক্তে জন্ম না হলে কোন সুযোগ বা সুবিধাই তাঁকে দেওয়া হবে না। এর উপর দাঁড়িয়ে নতুন আন্দোলন নানা দিকে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের 'doctrine of Lebensraum' প্রচারিত হয়েছে। এই মতবাদের প্রথম কথা হল—'All nations ought to have an equal share in the goods of this world।' এর অর্থ নয় যে সমস্ত স্বাধীন জাতি সমানভাবে পৃথিবীর পণ্য ভাগ করে নেবেন। এর মানে হল—'Each nation ought to have a share in proportion to its population.' এসব সমস্যা উক্ত পুস্তিকার নানা খণ্ডে আলোচিত হয়েছে এবং সে সব দাবি ও মতের যে গলদ আছে, তা' সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। জার্মানীর দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃষ্টিভঙ্গী—দু'দিকের ইতিহাসই আলোচিত হয়েছে এবং সভ্যতার পক্ষে তা' যে পরিপন্থী, সে-কথা গ্রন্থকারগণ নানাভাবে প্রচার করেছেন।

১৯১৮ সনে জার্মানী কিভাবে পরাজিত হয়েছিল,—তার মূল কারণ ১৭ এবং ৩৫ নম্বর পুস্তিকাতে আলোচিত হয়েছে। আজ হিটলারের নবদর্শন পৃথিবীতে শান্তি-প্রসূ নয়। কারণ তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—Never consider the Reich as made secure, unless, for centuries to come, it can give to every descendant of our people his own piece of ground

and soil. Never forget that the holiest right in this world is the right to the earth which a man wishes to cultivate for himself, and that the holiest sacrifice is the blood which he sheds for this earth।' এই দাবির সঙ্গে আপোষ চলে না—তাই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ জার্মানীর নবদর্শন—কোন রাজনৈতিক গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নয়। এই দর্শন যতদিন বজায় থাকবে, যুদ্ধের সম্ভাবনা ততদিন বিরাজ করবে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবাসীর সজাগ থাকা প্রয়োজন—কারণ বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাতে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্ট হবে, তাতে পৃথিবীর অধিবাসী হিসাবে আমরা এবং সবাই জড়িত। তাই যুদ্ধের বিস্তৃতি যত সীমাবদ্ধই থাকুক না কেন, এর ফলাফল সুদূর প্রসারিত।

শচীন সেন

বেদেনী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী ভবন। মূল্য—দুই টাকা।

'জলসাঘর'-এর লেখক তারাশঙ্কর বাবুকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার করে না। কেননা, তিনি যে সত্যই একজন ক্ষমতাশালী গল্প-লেখক, এ সম্বন্ধে ঐ পুস্তক পড়বার পর আর কোনো সংশয় থাকা সম্ভব নয়,—বিশেষত 'পরিচয়' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার মত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী বিদগ্ধ ভদ্রমণ্ডলীর তো বটেই।

'বেদেনী' তাঁর অধুনা প্রকাশিত আর একখানি গল্প-পুস্তক। মোট তেরটি গল্প আছে এতে। এবং বিশেষ খুটিনাটির মধ্যে না গিয়েও প্রারম্ভেই বলা যায় মোটামুটি সবগুলিই রসোত্তীর্ণ হ'য়েছে।

প্রথম গল্পটির নামানুসারেই নামকরণ করা হয়েছে বইখানির,—বেদেনী।

চমৎকার গল্প। যেমন ঘটনা সংস্থান, তেমনি চরিত্রাঙ্কণ, ভাষার ভঙ্গীও তেমনি তীর্য্যক এবং প্রাণবান, সব মিলেমিশে গল্পটি একেবারে চমৎকার। বাজে কথার ভিড় নেই, নতুন কিছু দেখাবার প্রয়াস নেই,—সোজা সহজ ক'রে সেই চিরন্তন কথাটিই বলা হ'য়েছে। সেই প্রেমের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব। ফলে, মনে ঝাঁকুনী না লাগলেও দোলা লাগে,—রেশ থাকে তার অনেকক্ষণ, অনেকদিন। দেবতারাও জানতে পারেন না যে-নারীচরিত্রকে, তাদেরই একজন আমাদের এই রাধিকা, কিন্তু গল্প-লেখকের ওস্তাদ কলমের আঁচড়ে মনে হ'ল যেন চিনলাম; দেবতারা না পারুন, আমরা চিনলাম।

দ্বিতীয় গল্পটিও জমেছে ভালই। সংঘাতটা এখানে অবশ্য অন্য রকমের,—প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আর নবাগত বৈদেশিক শিক্ষার মধ্যে। আমাদের হাস্যকর অথচ প্রায় পবিত্র রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সত্যসন্ধানী জাগ্রত বিবেকের বিদ্রোহ। গল্পের দিকে চেয়ে শেষকালে অবশ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবেকের অক্ষম ব্যর্থতার কথাই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, কিন্তু দ্বন্দ্বটা ফুটেছে ভাল। এবং চাকা যে কোনদিকে ঘুরছে তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। জয়টাই আসল কথা নয়, আসল কথা মনের বৈপ্লবিক অনুভূতি। লেখক ভালভাবেই দেখিয়েছেন, এই অনুভূতি বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বিপ্রনান্দী গ্রামের ততোধিক সনাতন এক পণ্ডিত পরিবারেও ঢেউ তুলেছে। এঁরাটা হয়ত পরাজয়ই তার ঘটল। তবু ভবিষ্যৎ আছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত আমার কোনো বন্ধুর একটি অভিযোগের এইখানে উত্তর দিয়ে নেব মনে করছি। তিনি বলেছেন, তারাশঙ্কর বাবুর 'একপেশেমী' আছে; তিনি আজও প্রাচীন পল্লিবাসীর কৌলিন্য বজায় রেখেছেন; 'কাল-ধর্ম্মের' 'প্রভাব' 'তারাশঙ্কর বাবুর গায়ে আঁচ লাগায় নি'।···কালধর্ম্মের প্রভাব যে তারাশঙ্কর বাবু সর্ব্বত্রই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তা নয়। কেননা, যে অর্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রভাবধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন' (ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বলেন), তারাশঙ্কর বাবুকে হয়ত সে অর্থে বিচার করলে একটু খণ্ডিত দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই মনে হবে। তাই ব'লে যে তিনি একেবারে 'প্রভাব-ধর্ম্মকে' অস্বীকারও করেছেন, তা বলা অন্যায় হবে। 'পিতাপুত্র' গল্পটি আমার এ বিবৃতির অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে। আর দেবে সেই গল্প যার নাম

'দিল্লীকা লাড্ডু'। আরো একটু মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এটি সত্যই প্রথম শ্রেণীর গল্প হ'তে পারত ব'লে আমার ধারণা। সে প্রতিশ্রুতিও গল্পের মধ্যে ভালভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঘটনাগুলো যেন এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, লেখকের কলমটাকে যেন বারেবারেই মনে পড়ে, 'willing suspension of disbelief'-এও অন্তরায় ঘটেছে। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায়, বোধ হয় প্রভাবধর্ম্মের আঁচ একটু লেগেছে এসে এখানে ঈষৎ আত্মসমাহিত লেখকের গায়ে।

এ ছাড়া বইখানির মূলসুর বিয়োগান্তক—ট্র্যাজিক। এ সম্বন্ধে লেখকের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য।—'বাংলাদেশে করুণ রসই জমে ভাল; আর তা ছাড়া আছেই বা কি? বাংলার তারুণ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে তারুণ্য রাম-লক্ষ্মণের মত নাগপাশে বন্দী। বাকি যাঁরা, তাঁরা সত্যকার জোরের অভাবে ভাবের ঘরে চোরের মতই কলরব করেন। তাঁদের আস্ফালন প্রলাপের মত অর্থহীন, বিলাপের মতই করুণ। তার চেয়ে সত্যকার অর্থপূর্ণ করুণ রসই ভাল। (হোলি)।'···বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গল্পগুলিতে এই 'সত্যকার অর্থপূর্ণ করুণরসে'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বারবার ক'রে। ভালো লাগে।

'ডাইনী' গল্পটি এদিক দিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। চমৎকার ফুটেছে মেয়েটির ট্র্যাজেডী; সামনের পরিপ্রেক্ষিত—মাঠখানিও চমৎকার কাজে লেগেছে। অন্য ধাতের হ'লেও, তেমনি ট্র্যাজিক হ'য়ে দেখা দিয়েছে 'রাধারাণী'র মূল-গায়েনের জীবন। দুজনেই ব্যর্থ; এবং দুজনের কারোই হাত ছিল না এই ব্যর্থতার ব্যাপারে। একজনের জন্মাবধি লোকে মনে করতে লাগল, সে ডাইনী; এই ধারণাটা ক্রমে তার নিজের মনে সংক্রামিত হওয়ায় তার জীবন হ'ল ব্যর্থ। আর একজন জারজ—গণিকার ছেলে; প্রেমের এবং সমাজ জীবনের অধিকারটা পর্য্যন্ত তার নেই। এরই পাশে একদা সুন্দরী কিন্তু বর্ত্তমানে 'স্থূলাঙ্গী বিরলকেশা স্ত্রীলোক' (!) রাধারাণীর নিজের চিত্রও কম ট্র্যাজিক নয়।

তারাশঙ্কর বাবুর আর একটা গুণ তিনি সজাগ লেখক। অর্থাৎ তিনি যা লেখেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন। আর সে অভিজ্ঞতা এত দৃঢ়মূল

এবং সূক্ষ্ম যে এদিক থেকে তাঁর মনকে শিল্পরসিক না ব'লে প্রায় বৈজ্ঞানিক বলা যায়। আমার এক বন্ধু সেদিন বলছিলেন, এজন্য দায়ী তারাশঙ্করের পারিপার্শ্বিক। তাঁর বাড়ী এমন একটি জেলায় যেখানে বেদে, পটুয়া, সাঁওতাল ইত্যাদি নানা ধরণের নানা আচার ব্যবহারের লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর পক্ষে চরিত্রচিত্রণের বৈচিত্র্যের অবকাশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর।—কথাটা মিথ্যা নয়, এবং অনেকাংশে সত্য। কিন্তু তাতে কী হ'ল ? লেখকের ক্ষমতাটা নিশ্চয়ই তাতে ছোট হ'য়ে পড়ে না। বরং পারিপার্শ্বিকে এই জটিলতা এবং বৈচিত্র্য আছে ব'লে এবং সেগুলিকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনতে পেরেছেন দেখে, তাঁর প্রতিভা এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। আর তাঁর দৃষ্টিটা এত তীক্ষ্ণ যে সমাজের নিচের স্তর যেখানে বোধ করি সূর্য্যালোকও পথ খুঁজে পায় না, সেখানেও সমস্ত কিছু সহজ সহানুভূতির সঙ্গে ধরতে পেরেছেন তিনি। সমাজের নিচু স্তরের লোক নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষমতাশালী লেখকই শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের উচ্চ স্তরের শিক্ষিত—sophisticated—ধারণা ও হৃদয়বৃত্তি আরোপ ক'রে বসেন তাদের ওপর। ফলে ব্যাপার দাঁড়ায় এই যে সমস্ত জিনিষটাই মনে হয় অবাস্তব। আমাদের সৌভাগ্য, তারাশঙ্কর এই মর্ম্মান্তিক পতন থেকে বেঁচে গিয়েছেন আশ্চর্য্যজনক ভাবে। তিনি সমাজের নিচু স্তরের নরনারীর সুখ-দুঃখ আশা-বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে গল্প রচনা করেন, কিন্তু নিজেদের ধারণা ও হৃদয়বৃত্তি তাদের ওপর আরোপ না ক'রে মনটাকে টেনে নিয়ে যান তাদের মাঝখানে। ফলে, গল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে দ্বিমত হ'লেও পারিপার্শ্বিকটা মনে হয় যেন একেবারে life-like, জীবন্ত।

এই প্রসঙ্গেই কথা ওঠে লেখকের বর্ণনাচাতুর্য্যের। 'চাতুর্য্য' কথাটাকে বোধ হয় একটু বেখাপ্পা শোনায়। কেননা এর অনুষঙ্গে মনে ওঠে একটা sophistication-এর ভাব,—যা তারাশঙ্করের নেই। সোজা ঝরঝরে ভঙ্গীতে আপন বক্তব্য তিনি ব'লে যান। ফলে মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো হয়ত হয়, কিন্তু সব মিলেমিশে জিনিষটা দাঁড়ায় একেবারে জীবন্ত। সাবধানে খুঁজে খুঁজে ভাস্করের মত বাক্য তৈরী করবার চেয়ে তাঁর এই পটুয়ার মত এলোমেলো বলিষ্ঠতাই ভাল লাগে,—আমার অন্তত।

পরিশেষে তারাশঙ্কর বাবুকে নিবেদন, তিনি যেন ভবিষ্যৎ পুস্তক প্রকাশকগণের দিকে আরো একটু মনোযোগ রাখেন। এ-বইখানিতে এমন কতকগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ চোখে পড়ল যা চোখকে একটু পীড়িত করে।

বাংলাদেশে গল্পের বইয়ের কাটতি হয় না।—কোনো বইয়েরই হয় কিনা সন্দেহ। তবু স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি যাঁদের আগ্রহ আছে (যাদের নেই তারা আর যাই হোক মানুষ নয় নিশ্চয়ই !), যাঁরা এতটুকু দরদ ও গৌরব বোধ করেন নিজেদের কৃষ্টি এবং প্রগতিসম্পন্নতার জন্যে, তাঁদের নিশ্চয়ই কেনা উচিত এই বইখানি। টাকা পয়সার অভাবের কথা শোনা যায়, কিন্তু ফুটবল-ক্রীকেটের মাঠের সর্ব্বোচ্চমূল্যের আসনও লোকে ভর্ত্তি দেখে, এবং প্রতিদিন তিন বার ক'রে সিনেমা হল্-এর সামনে 'House Full' ঝোলানো দেখে সে কথা বিশ্বাস করবার কারণ থাকে না। বাংলা বই বিক্রী না হবার কারণ পাঠক-শ্রেণীর বিত্তহীনতা নয়, ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্যের আঘাতে কয়জন সত্যকার প্রতিভাশালী লেখক সাহিত্য ছেড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিনেমার গল্প লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। যে রকম হারে এই ঔদাসীন্য হু হু করে বেড়ে চলেছে তাতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সত্যই আশঙ্কার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এখনো প্রতিরোধের সময় আছে।

মণীন্দ্র রায়

নতুন পাতা—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন। দুই টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তাঁর 'নতুন পাতা'য় হয়তো অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। প্রথমত এ বই আগাগোড়া গদ্যছন্দে লেখা। এবং গদ্যছন্দ বর্তমান যুগের যে সংগ্রাম, নৈরাশ্য ও মোহমুক্তির প্রতীক 'নতুন পাতা'য় তা-ও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু আমার মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত সেগুলো হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে কেউ বা পৌঁছয় কবিত্বের রাস্তা ধরে, কেউ বা রাজনীতির। পথের বিচার করেই আমরা কাউকে কবি বলি,

কাউকে বলতে দ্বিধা করি। বুদ্ধদেব বাবু তাঁর 'নতুন পাতা'য় কবিতাই লিখেছেন—এবং তা আশ্চর্য উজ্জ্বল এবং বেগময়। যে কোনো জায়গা থেকে উদাহরণ নেওয়া চলে :—

আমি অপেক্ষা করতে পারতুম তোমার জন্য :
তলোয়ারের মত দীর্ঘ দীপ্ত দিন ;
ডালে আর পাতায় হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশে মর্মরিত
গাছের মত রাত্রি।

সূর্য যখন দক্ষিণে আর দিন ছোটো, আমি সুগন্ধি তন্দ্রার মধ্যে
তোমার কথা ভাবতুম ;
সূর্য যখন উত্তরে আমি সূর্যাস্তের আকাশের দিকে উড়িয়ে দিতুম
আমার ভাবনাগুলি
সাদা পায়রার ঝাঁকের মতো—
তাদের ডানার হাওয়া কবিতার সুর। (সময় নেই)

* * * *

আর আমাকে টেনে নিয়ো তোমার কাছে,···
টেনে নিয়ো সেই অতল অনির্বচনীয় অন্ধকারে
যেখানে ঝরছে তোমার সঙ্গোপন সূর্য
পল্লবের পর পল্লবে—
যা আমাকে উষ্ণ করে তুলবে আমার রক্তে বিদ্যুতের সঞ্চারে,
আমি যখন
তোমার কাছে আসবো, দিনের কাজের শেষে,
সন্ধ্যার অন্ধকারে,
সন্ধ্যার লাল আলোয়। (সন্ধ্যায়)

* * * *

বন্ধ্যা, শ্বেত দিন।
সেই দিন আমার যেটুকু নেবার, তা নিয়েছে।
সেই দিন আমি পার হয়ে এসেছি—গর্বহীন লজ্জাহীন নিরানন্দ।
আর এখন স্মৃতির বিদ্যুতের ঢেউ-তোলা এই রাত্রি
তা তোমার, তোমার। (বিচ্ছেদের দিন)

'নতুন পাতা' পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে গদ্যছন্দেই বোধহয় বুদ্ধদেব বাবুর কবিতা সবচেয়ে উপভোগ্য হয়। মনে হয়েছে ভাষার এ-বেগ এ-দীপ্তি বুঝি ছন্দের বাঁধনে পড়লে ব্যাহত হোতো। অবশ্য এ আমার ভুল—এবং এখানেই কবির শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়। ভালো কবিতার লক্ষণই এই যে পড়লেই মনে হয় এ-কবিতা ঠিক এ ভাবে ছাড়া লেখা চলতো না। ধরুন 'সমুদ্র স্নান'।

'ছাখো না সমুদ্র তোমার কী করে
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মতো হাওয়া।

ঢেউ তোমাকে মেজে দিয়ে যাক্
শাদা ফেনার তোলপাড়ে,
সমুদ্র তোমাকে নিয়ে খেলা করুক
তোমার মসৃণ পরিষ্কার শরীর নিয়ে,
তোমাকে জড়িয়ে ধরুক চারদিক থেকে তার বালু-বাদামি জল :
যেমন সে তৈরি করেছে হাজার বছর ধ'রে ধব্‌ধবে শাদা শঙ্খ,
তেম্‌নি সে তৈরি করুক তোমাকে, তোমার ব্রাউন মসৃণ শরীর।

এই নিরলঙ্কার উক্তির কবিত্ব প্রায় কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত সহজ—এবং তেম্‌নি বিস্ময়কর।

'নতুন পাতা'র পশ্চাৎপট সমুদ্র এবং পাহাড়ে বিচিত্র—কিন্তু সেটা নেহাৎই পশ্চাৎপট। যা আমাদের মনোযোগ দাবি—এমনকি অধিকার, করে, তা সেই পটের সামনেকার পাত্র-পাত্রী—মানুষ। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর বুদ্ধদেব বাবু অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেও ভালো কবিতা বিশেষ লেখেন নি। 'নতুন পাতা'য় তো সে প্রচেষ্টা একেবারেই অনুপস্থিত। পুরুষের স্বাকামিহীন প্রেমের এমন বলিষ্ঠ বিচিত্র প্রকাশ বাংলার কবিতায় বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

'এত মধুর তুমি, এমন নরম—তোমার হাত
বার বার আমার হাতের মধ্যে মিশে যেতে চায়,
গলে যেতে চায় মোমের মত আগুনে ;
আর তুমি—তোমার দুই চোখের উৎস থেকে
বাসনার তারাময় স্রোত আমার উপর ঝরিয়ে দিয়ে বলো—
মৃদু স্বরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে, তোমার ঐ ভাঙা ভাঙা নরম গলায়
শুধু বলো—'কী ?' (মুখ)

এই হচ্ছে একটা মুহূর্ত। আবার কোনো মুহূর্তে

'তোমার তৃতীয় নয়নে যখন রোষবহ্নি জ্বলে ওঠে,
যখন আকাশ ফাটিয়ে ভেঙে পড়ে তোমার বজ্র,
আমি ভস্ম হয়ে যাই, নিঃশেষ হয়ে যাই—
কী অপরূপ সেই আতঙ্ক, কী জ্যোতির্ম্ময় সেই মৃত্যু তোমার
রোষের অগ্নিময় বিস্ফোরণে।'

এ-যুগের অভিশাপ বুদ্ধদেব বাবু এড়াতে পারেন নি। পারলে নিশ্চয়ই তিনি অধিকাংশ সমালোচকের মতে কবি বলে স্বীকৃত হলেও পাঠযোগ্য বলে' বিবেচিত হতেন না। তাই মাঝে মাঝে শুনি কাতর সুর—

'তুমি কি দ্যাখোনি আমার দুর্ব্বলতা, আমার হিংস্রতা আর তিক্ততা,
আমার ব্যর্থতা, আমার কান্না, আমার নিঃসঙ্গতা ?'

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা

ভুলে' যাও, ভুলে' যাও এই পৃথিবীকে
যা চাবুক মারছে তোমার মুখে।
ভুলে' যাও মানুষ, আর মানুষের কথা—'

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে মন হৃদয়কে, চিন্তা আবেগকে ঢাকতে পারে শুধু ক্ষণকাল—শরতের মেঘের মতো। তাই আবার অনুরোধ :

'বাহিরে তাকাও।
নীল কাচের মত সন্ধ্যার আকাশ।
আর চেয়ে দ্যাখো, তোমার জানলার বাইরে রাত্রি চুপ করে' দাঁড়িয়ে
যে-কোনো মেয়ে প্রিয়তমের চুম্বনের অপেক্ষায় স্তব্ধ।'

'নতুন পাতা' বইখানাকে লেখক তিন অংশে ভাগ করেছেন। দ্বিতীয় অংশ পুরী-ভুবনেশ্বর-চিল্কার রঙে রঙীন। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর কবিতায় বাহিরের প্রকৃতি নেপথ্যচারিণী বলে' প্রথম অংশের সঙ্গে এ-অংশের মূলত কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করিনি। তৃতীয় অংশ বিমুখ সমাজের প্রতি কবির মনোভাবের প্রকাশ। এ-অংশে একদিক থেকে কৌতূহলী পাঠক কবির মতামতের পরিচয় পেয়ে খুশি হবেন বটে, অপর দিকে কাব্যরসিক পাঠকের পক্ষে এ-অংশের আকর্ষণ তীব্রতম হবে বলে' মনে হয় না। কারণ আমার মতে বুদ্ধদেববাবু তখনই সবচেয়ে বড় কবি যখন তিনি বলেন—

'বিচ্ছেদকে কেন ভয় করবো
যদি পাই আশ্বাস।'

তখন শুনি :

তুমি আর আমি, আমরা সুখী;
আমাদের সুখে পৃথিবী কি নতুন হয়ে উঠবে না ?

অজিত দত্ত

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র ১৩৪৭

পরিচয়

বিদেহ-কৈবল্য

(২)

গত মাসের 'পরিচয়ে' বিদেহ-কৈবল্যের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ দশায় জীব 'অশব্দে নিধনং এতি'—তখন তিনি 'সোহং আপে আপ'—'He has no further consciousness of objects—of *anything* outside of himself.'

ঐ যে কৈবল্য-মুক্তির অবস্থা—তাহার স্বরূপ মননের, বচনের, গ্রহণের অতীত—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আসে।'

যেহেতু, যিনি বিদেহ-মুক্ত তিনি—

এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে
—তৈত্তি, ২।৭

—'সেই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (unconscious), অবাচ্য (unutterable), অনিলয়ন (অগাধ—unfathomable) ব্রহ্মপদার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তবেই তাঁহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ? সেইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—

অত্থং গতসস্ (নির্বাণপ্রাপ্তের) পমাণং (ইয়ত্তা) নত্থি। কারণ, নির্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধর্ম্মপদ, পিয় বগ্গো, ১০)।

অতএব,

> Measure not with words
> The immeasurable, nor sink the plumb of thought
> Into the Fathomless ! who asks doth err,
> Who answers errs. Say naught.—Light of Asia

কারণ, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (The Voice of the Silence).

অতএব এ ক্ষেত্রে, তুষ্ণীমেব বরং—Silence is golden। পরিনির্বাণ-দশা 'অস্তি-নাস্তির' অতীত অবস্থা। * সংযুক্ত-নিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি ? উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই ? উত্তর 'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই ? কারণ, তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়ো দুপ্পরিযোগাহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো'—'যিনি তথাগত (পরিনির্বাণপ্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ—যেমন মহাসমুদ্র—'He is indefinable inscrutable immeasurable like the great ocean'। সেই প্রাচীন উপমা—

> যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
> অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়
> —মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally-extinguished Delivered One is nowhere and everywhere. (p. 359).

* কারণ, পরিনির্বাণ is 'a kind of existence, that in our sense is no longer existence—(it is) at the portals of the unrecognisable, the transcendental. * * Therefore no conception and consequently no words fit it.
—The Doctrine of the Buddha, p. 178

Nothing whatsoever, absolutely nothing can be told about it ; the rest is—silence !—Ibid, p. 502.

বিদেহ-মুক্তি যখন অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত বা view প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি ? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ ! ভিক্খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। 'নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং—দীর্ঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming) ; যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য ; পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য।'

অতএব এই অস্তি-নাস্তির অতীত বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিতণ্ডা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়—বেশ অশোভন। কিন্তু বিদেহমুক্তি বা পরিনির্বাণ অতর্ক্য অবর্ণ্য অকথ্য অচিন্ত্য হইলেও—পরিনির্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—বিদেহমুক্তি নাস্তিত্ব নয়—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'abyss of absolute annihilation' বলিয়াছেন, পরিনির্বাণ নিশ্চয়ই সে বিনাশ নহে। * সেই জন্য 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি' এরূপ বলায় পাছে উচ্ছেদের আশঙ্কা হয়, তাই যাজ্ঞবল্ক্য সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—বিদেহ-কৈবল্যেও 'অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪)।

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে ! ভিক্খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্স হেতু ? দিট্‌ঠে বাহং ভিক্খবে ! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি।—মজ্‌ঝিমনিকায়, ২২

'হে ভিক্ষুগণ ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত অর্থাৎ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত—ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন ? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনই (Here and Now) অননুবেদ্য (untraceable)। এইরূপ বলার জন্য কেহ কেহ

* সেই জন্য জর্জ গ্রিম এই নাস্তিত্ববাদকে 'the nonsense of absolute Nihilism' বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। (The Doctrine of the Buddha p. 162).

আমায় 'বৈনাশিক' অপবাদ দেন—'বেনসিকো সমনো গোতমো'—কিন্তু ঐ অপবাদ অমূলক (অসতা তুচ্ছা মৃষা—wrong, erroneous, false)।

এই প্রসঙ্গে স্যার এডুইন্ আর্ণল্ডের উদাত্ত শ্লোকগুলি আমাদের স্মর্তব্য।

If any teach, Nirvana is to cease
Say unto such they lie.
If any teach, Nirvana is to live
Say unto such they err ; not knowing this
Nor what light shines beyond their broken lamps
Nor lifeless, limitless bliss.
—Light of Asia., Book VIII.

ঠিক কথা! যে নির্বাণ অস্তি-নাস্তির পরাৎপর অবস্থা—আমরা বদ্ধ মানুষ এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি মন লইয়া তদ্‌বিষয়ে কি জল্পনা করিব? এ যেন—'as though a sparrow with his limited wing-power and restricted eye-reach should titter of the eagle from his umbrageous cover'—এ যেন তিত্তিরের সমুদ্রতরণ, সফরীর সমুদ্র-শোষণ—তেমনি ব্যর্থ, তেমনি বিফল, তেমনিই হাস্যকর—নয় কি?

এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতী ভক্ত মধুসূদন স্বরস্বতীর একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণীয়—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অর্থাৎ, 'ভগবান্ সমুদ্র, ভক্ত তরঙ্গ—তরঙ্গই সমুদ্রে অন্তর্মিত হয়, সমুদ্র তরঙ্গে নয়। মহামিলনে ভক্ত-ভগবানের ভেদ অপগত হইলেও, ভগবান্ ভক্তের পরতন্ত্র হন না—ভক্তই ভগবানের পরতন্ত্র হয়।'

সেই জন্য দেখিতে পাই যে—

Those who know assure us that the mystic experience ends with the words 'I live, yet not I, but the God in me' (Racejac). So Bishop Leadbeater says : 'The dewdrop slips into the shoreless sea, but is not lost therein'—and Krishnaji : 'Liberation is not annihilation.....It is not entering into a mere void and there losing yourself.....True, there is no separate self, but there is the Self of all.'

অর্থাৎ মহামিলনে 'আমিত্বের' সম্প্রসারণ হয়—স্বাতন্ত্র্যের, ক্ষুদ্রত্বেরই নির্বাণ হয়। 'It is the annihilation of selfhood—the doing away of separateness,'

এই আমিত্বের সম্প্রসারণই মুক্তি। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্বং অস্মি, ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা।' অর্থাৎ

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness (Deussen).

সেজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'—মুক্ত দশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না (that is, he is without individual conscionsness).

'দেব ইব রাজা ইব'—যাজ্ঞবল্ক্যের এ বর্ণনার সহিত বৌদ্ধের দিক্ হইতে স্যার এডুইন্ আর্ণল্ডের নির্বাণের বর্ণনা তুলনা করুন।

Until greater than kings, than Gods more glad,
The aching craze to live ends, and life glides
Lifeless, to nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana—sinless, stirless rest—
That change which never changes !
—The Light of Asia, Book VI.

পুনশ্চ—

He goes unto Nirvana. He is one with life * yet lives not. He is blest, ceasing to be. * * * Seeking nothing, he gains all ; foregoing self, the Universe grows 'I'.—Ibid, Book VIII

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববিদ্যাসভার ভূতপূর্ব নেত্রী ডাঃ অ্যানি বেসেন্টের কয়েকটি মনোজ্ঞ উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihiiation' ; it is existence raised to a vividness and intensity, inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind. As the farthing rush-light to

* অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি—কৌষীতকী, ৩।৩

the splendour of the sun at noon, so is the earthbound consciousness to the Nirvanic, and to regard it as annihilation, because the limits of the earthly consciousness have vanished, is as though a man, knowing only the rush-light, should say that light could not exist without a wick immersed in tallow.—The Ancient Wisdom, pp 221-22.

বাস্তবিক ব্যক্তিত্বের বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকর—তাহাতে নাস্তিত্ব আসে না। আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (Individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবারিধির তরঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহরীও নয়—নগণ্য বুদ্‌বুদ মাত্র—mere soap-bubble। এই বুদ্‌বুদ-ভঙ্গে এত ভয়! আর আমাদের Personality—যাহা চিদাভাসের ছায়া—সে ত আরও তুচ্ছ! Persona শব্দের অর্থ মুখস (mask)—যে মুখস পরিয়া প্রাচীন রোমে গ্রীসে অভিনেতারা অভিনয় করিত—এখনও তিব্বতে নর্তকেরা নৃত্য করে। বস্তুতঃ এই Personality জীবের মুখ নহে, মুখস—ঐ মুখস পরিয়া জীব ভব-রঙ্গালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করে। ঐ মুখসের তিরোধানে এত সঙ্কোচ কেন? দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সোপেন্‌হুয়র যথার্থই বলিয়াছেন—

Everybody knows himself only as an individual. * * * If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherance to it.

সোপেন্‌হুয়র তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আর একজন তত্ত্বদর্শীর কথা শুনাইব—ইনি রাজকবি টেনিসন্।

And thro' loss of self
The gain of such large life as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.
—The Ancient Sage. *

* টেনিসন্ একান্তে বসিয়া একাগ্রভাবে নিজের নাম উচ্চারণ করিলে একরূপ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার loss of personality (ব্যক্তিত্বের বিলোপ) ঘটিত। ঐ অবস্থার বর্ণন করিয়া টেনিসন্ তাঁহার বন্ধু টিন্‌ডেলকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক উহা হইতে দেখিবেন loss of personality বস্তুতঃ কিছুই নহে।

I have never had any revelations though anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite

কিন্তু নাস্তিত্ব না হইলেও বিদেহ-কৈবল্যকে শূন্যতা-সিদ্ধি বলা অসঙ্গত নহে। কোন কোন উপনিষদ্ ঐরূপই বলিয়াছেন—

শূন্যভাবেন যুজ্যীয়াৎ—অমৃত, ১১
শুদ্ধঃপূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম ইহার সংপ্রসারণ করিয়াছেন—

Denying every predicate to our Ego—then, in that moment the Ego ceases to be the Subject, (i e. being without object) ceases from its introduction, by means of the I-idea, into the world of experience. It vanishes again into nothing.
—Grimm's Doctrine of the Buddha p. 187.

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything.'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন।

নাহং কচনি কস্যচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম কচনি কিস্মিংচি কিংচন নত্থি
—মজ্‌ঝিমনিকায়।

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

পুন চ পরং ভিক্খবে! সারিপুত্তো! সব্বসো বিঞ্ঞানানাং চায়তনং সমতিক্কমা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ! হে সারিপুত্র! (নির্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া 'কোন কিঞ্চিৎ নাই'—এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া, অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায়—sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি? কারণ, 'Where all phenomenon has ceased, naming is gone'. (Grimm).

up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being and this not a confused state but the clearest, the surest, the utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি'—'মোক্ষ দশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এসকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংবদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসীদিগকে অধ্যাপক গ্রিম কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—

Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence.

(The Doctrine of the Buddha, p. 164).

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই বিদেহ-মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ shallow-thinkerরা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা চিরদিনই অবিনাশী—'অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'—অর্থাৎ, বিদেহমুক্তির অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ ঘটে না। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তত্র পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তত্র পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি অন্যৎ ততঃ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তত্র জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তত্র জিঘ্রতি। নহি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ।

যদ্ বৈ তত্র বদতি। বদন্ বৈ তত্র বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বদেৎ।

যদ্ বৈ তত্র শৃণোতি শৃণন্ বৈ তত্র শৃণোতি, নহি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ।

যদ্ বৈ তত্র মনুতে মনানো বৈ তত্র মনুতে, নহি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত।

যদ্ বৈ তত্র স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তত্র স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং স্পৃশেৎ।

যদ্ বৈ তত্র বিজানাতি বিজানন্ বৈ তত্র বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ বিজানীয়াৎ।

—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ, ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে?

ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না আস্বাদন করেন না, বচন করেন না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির ঘ্রাণ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মননশক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ ঘটে, তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী; কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন?

অর্থাৎ, মুক্ত আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ

—প্রশ্ন, ৪।৯

বুদ্ধদেব যে বলিলেন—'He has won to the sphere of nothingness,' উপনিষদের ঋষি যে বলিয়াছেন—'অশব্দে' (শূন্যে) নিধনম্ এতি—ঐ শূন্য কি? ঐ শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৬)। তিঁহ সদসদ্ভ্যাং অনির্বাচ্য—ন সৎ ন চাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহেন, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ২।১৪

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে অন্য, কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'—এক কথায় 'সর্বকার্যধর্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)*

—তখন তিনি 'শূন্য' বই আর কি? স এষ নেতি নেতি আত্মা

—বৃহ, ৪।২।৪

* The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought * * The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.

—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজষ্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, মন নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্বিশেষ-দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে —যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ—যিনি শূন্যবাদীর শূন্য তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম। বিদেহ-কৈবল্যের আলোচনা এখানেই সাঙ্গ করিলাম। যদি এ আলোচনার ফলে এই অতর্ক্য অচিন্ত্য অকথ্য বিষয়ের ঘনান্ধকারে কথঞ্চিৎ আলোকপাত হইয়া থাকে, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাদের নৈশ আহার-পর্ব্ব তখন সমাধা হওয়ার মুখে, সামনের জানলা খোলা—সন্ধ্যা হব-হব।

জ্যাঁ নীরব। কিন্তু তার উদ্ধত কণ্ঠ বিষোদ্গারের উন্মুখতায় উদ্‌গ্রীব—সব সময়ে সেই একই অপ্রিয় আলোচনা, যে দুর্দ্দান্ত দুঃখ দিনরাত তাকে হনন ক'রে ফিরছে তারই প্রতিক্রিয়ায়, কুদালের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন থেকে, ফানিকে কেবলই সে নিষ্ঠুর বাক্যের আঘাতে নির্দ্দয়ভাবে জর্জ্জরিত করছে।

জ্যাঁর অবরুদ্ধ কণ্ঠ কী যে ব্যক্ত করার অপেক্ষায় উন্মুখ, অনুমান করতে পারে ফানি :

'শোনো, তুমি কী বলবে আমি জানি। আমি সত্যি ক'রে বলছি, আমার অতীত এখন মৃত আমার কাছে, যেদিন থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সেদিন থেকে তোমাকে বই আর কারুকে আমি জানি না, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার'—

'তাই যদি হয় তুমি যা বলছ, যদি সত্যিই তোমার অতীত তোমার মন থেকে, তোমার জীবন থেকে মুছে গিয়ে থাকে'—

গোসঁ্যা বলে চলে ফানির উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে :

'তাহ'লে অতীতের স্মৃতি কেন তুমি তবে তুলে রেখেছ তোমার পোষাকের দেরাজে, শুনি?'

তার ধূসর চোখ কালো হয়ে আসে :

'তুমি জানো তাহ'লে?'

যত প্রেমের চিঠি, প্রেমিকদের ফটো, আর অতীত জীবনের উজ্জ্বলতার কাহিনী, মহিমার চিহ্ন, যা সে এতদিন সযত্নে বাঁচিয়ে এসেছে ধ্বংসের কবল থেকে—সবই কি তাকে তাহ'লে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে?

'এরপর থেকে তাহ'লে আমায় বিশ্বাস করবে তো তুমি?' ফানির এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসে গোসঁ্যা।

ফানি ছুটে যায়, ছোট্ট বাক্সটা নিয়ে আসবার জন্য—খোদাইকরা লৌহ-নির্ম্মিত শিল্পকারুর নিদর্শন, তার পোষাকের দেরাজের ভেতর থেকে। ঐ সন্দেহজনক অদ্ভুত বাক্সটা, গত কয়েকদিন থেকেই, গোস্যাঁর চিত্ত ঈর্ষা-সংশয়ে পীড়িত করছে।

'নাও, পোড়াও, ছিঁড়ে ফেল—যা খুশি কর। এ-সব তোমার।' বলে ফানি।

গোস্যাঁর মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায় না, চাবি ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বাক্সের ডালা সে খুলে ফেলে; তার অভ্যন্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করে অসংখ্য আকারের ও প্রকারের বিবিধ রঙে রঙিন এক চিঠির তাড়া। কালিতে লেখা, পেন্‌সিলে লেখা, দীর্ঘ এবং কয়েকছত্রের মধ্যে সমাপ্ত কত রকমের চিঠি, ভিজিটিং কার্ড, সাজানো-গোছানো নয়, এক সঙ্গে পুঁজি-করে জড়ো-করা; গোস্যাঁর কম্পিত হস্ত চালিত হয় সেই স্তূপাকারের মধ্যে।

'দাও আমার হাতে দাও। তোমার চোখের সাম্‌নেই আমি পুড়িয়ে ফেল্‌ছি।'

হাঁটু গেড়ে বসে ফানি সামনেই,—তার পাশেই প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিয়ে।

'দাও, দাও আমায়।'

কিন্তু গোস্যাঁ বলে:

'না অপেক্ষা করো।'

তারপর গলা নামিয়ে, যেন একটু লজ্জিতভাবেই বলে:

'আমি পড়তে চাই।'

'কেন বল ত'? নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দেবে কেবল।'

গোস্যাঁ বেদনা পাবে, কেবল এই কথাটাই সে ভাবে, কিন্তু তার আগের যে-সব প্রণয়ী তাকে ভালোবেসেছিল, তাদের আবেগ ও কামনার কথা সে যে অপরের রূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করছে, তাদের আত্মমর্য্যাদা ও অন্তর্নিহিত রহস্যের লাঞ্ছনা ঘটাচ্ছে, সে-কথা তার মনে জাগে না। গোস্যাঁর পাশ থেকে সেও পড়ে সেই সব চিঠি আবার,—চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করে গোস্যাঁর ভাব-ভঙ্গী।

লা গুরনেরির স্বাক্ষর-করা দীর্ঘ দশ পৃষ্ঠা, য়্যালজিয়ার্স থেকে দীর্ঘচ্ছন্দে

কবি জানিয়েছেন দূর-প্রবাসের বিরহ-ব্যথার কাহিনী। সহস্র সৌন্দর্য্য সমারোহ, উৎসব ও আয়োজনের মধ্যেও, কবির মনে জেগেছে ফানির কথা—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে ভুলতে পারেন নি, তাকে দেখবার জন্য মৃতপ্রায়। কবির প্রতিভা সেই দূর বিদেশকে যেন ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছে চিঠির পাতায়—প্রত্যেকটি কথা যেন জহরতের টুক্‌রোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে সোনালী আলোয়।

'ওঃ! গত রজনীতে আমি স্বপ্ন দেখেছি—রু দে লা' আরকেদের বিস্তৃত শয্যায় যেন তুমি আর আমি! আমার আদরের অজস্রতা পাগল ক'রে তুলেছে তোমায়—আনন্দে তুমি কাঁদছ! তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে দেখি আমি এখানে—তারকাখচিত আকাশের তলায়! ভোর হয়ে আসছে, নিকটের মস্‌জিদ থেকে মোয়াজ্জিনের ডাক ভেসে আসছে, কিন্তু তার প্রার্থনার সুরের মধ্যে তখনো আমি তোমার গলাই শুনছি যেন'—

পড়তে পড়তে নিদারুণ ঈর্ষায় গোস্যাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। আস্তে আস্তে চিঠিখানা কেড়ে নিতে চায় ফানি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পড়ে যায় গোস্যাঁ। তারপর আরেকটা পড়ে ফেলে দেয় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে—প্রতিভার, প্রেমের, কাব্যসৃষ্টির, এবং কবির বেদনার পরিণতি পর্য্যবসিত হয় লেলিহান শিখার জঠরে।

একটা প্রতিকৃতি—গাভর্যাঁ সাক্ষরিত, তার ওপরে লেখা: 'আমার বন্ধু ফানি লগ্রাঁকে, এক সরাইখানায় বসে একদা বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়।'

বুদ্ধি-দীপ্ত বিষণ্ণ একখানি মুখ, গভীর দৃষ্টি।

'কে এ?'

'আঁদ্রে দিজয়ি। ওই সইটার জন্যই আমি রেখেছিলাম।'

'বেশ রেখে দাও, আপত্তি নেই।' গোস্যাঁ বলে; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা নিরানন্দের ক্ষুব্ধতা যে, ফানি, ছবিখানা নিয়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে আগুনের মধ্যে বিসর্জ্জন দেয়।

ঔপন্যাসিকের চিঠিগুলি এবার একে একে পড়তে থাকে গোস্যাঁ। পড়বার মাঝখানে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে এক জায়গায়:

'আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি না পৃথিবীসুদ্ধ লোক পাগল হয়ে তোমার পেছনেই বা ধাওয়া করে কেন।'

ঔপন্যাসিকের বাণ্ডিল শেষ হ'লে, এবার আসে সেই খোদাইকারের পালা; অন্য সব প্রণয়ীর মত এর প্রতিভার বিখ্যাতি নাই—সেই পুলিশ-গেজেটের বর্ণনা ব্যতীত, কিন্তু এর চিঠিও স্থান পেয়েছে আর সবার সঙ্গেই প্রেমের প্রাঙ্গণে। মাজাস্ জেলখানা থেকে লেখা, গেঁয়ো হস্তাক্ষরে, সাধারণ আবেগপূর্ণ সব চিঠি — নিতান্ত নগণ্য গ্রাম্য লোকেরাই যেমন লিখে থাকে; কিন্তু তার ছত্রে ছত্রে সরলতার আর শ্রদ্ধার পরিচয়—কি রকম আত্মহারা হয়ে ফানিকে কতখানি সে ভালোবেসেছিল তারই উদ্দীপ্ত চিহ্ন যেন সেই চিঠিগুলিতে। ফানি যে ছাড়া পেয়েছে সেই আনন্দ সে ব্যক্ত করেছে একখানিতে, আর একখানিতে সে লিখেছে তার কোন দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই, ফানির সঙ্গে দু'বছরে যে স্বর্গসুখ সে পেয়েছে তার সারা জীবন পরিপূর্ণ ক'রে রাখতে সেই স্মৃতিই তার পক্ষে যথেষ্ট।

তারপরে, সর্ব্বশেষ চিঠি, ছ-মাসের আগের ডাকের ছাপ-মারা:

'আমাকে কাল দেখা দিতে এসেছিলে, কী আনন্দই যে পেলাম। আর কি সুন্দরই যে দেখাচ্ছিল তোমাকে, কী যে অপরূপ তুমি। আমার কয়েদীর পোষাকে তোমার পাশে দাঁড়াতে কী লজ্জাই যে করছিল আমার। কী চমৎকার—কী সুন্দর—কী ভালোই যে তুমি'—

রূঢ় কণ্ঠের চীৎকারে ফেটে পড়ে জাঁ:

'এখনও তুমি দেখতে যাও তাকে?'

'মাঝে মাঝে দয়া-পরবশ হয়েই।'

'আহা! কী দয়াবতী দেবী আমার!' গোর্স্যার গলা বর্ব্বরতায় ধারালো ছুরিকার মত হয়ে উঠেছে তখন।

ওর সঙ্গে মিলনের পরেও, এখনো, ফানি যে একজন সামান্য জালিয়াৎকে ভুলতে পারে নি—এখনো দেখতে যায় তাকে, এই ধারণাই সব চেয়ে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে জাঁকে। তার গর্ব্ব, তার অহঙ্কার যেন প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, সে গজ্‌রাতে থাকে মনে মনে।

অবশেষে শেষ-প্যাকেট পত্র, সবুজ রীবনে মোড়া, ওপরে মেয়েলি হস্তাক্ষর—হাতে তোলে গোর্স্যা।

'চেরিয়ট রেস্ শেষ হ'লে আমার পোষাক বদলাব, তুমি আমার সাজঘরে এসো তখন'—

'না না, পড়ো না।'

ফানি গোর্স্যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর অর্থবোধ হবার পূর্ব্বেই, সমস্ত বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়ে, ফেলে দেয় আগুনের গর্ভে; আগুনের আভায় তার মুখ তখন লজ্জায় লাল:

'তখন আমি নেহাৎ ছোট,—ও হচ্ছে কুদাল—সেই হতভাগাটা—কিছুই জানতাম না, সে যা বলেছে তাই করেছি'—

'তখন জাঁ সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ:

'আ! বুঝেছি, সাফো—এবং ইত্যাদি'—

তারপর, যেন একটা নোংরা জঘন্য জীব, এইভাবে ফানিকে পা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়:

'যাও সরে যাও। ছুঁয়ো না আমায়! বমি হয় তোমাকে দেখলে'—

ফানি আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে, কিন্তু তার আওয়াজ ছাপিয়ে হঠাৎ যেন এক বজ্রধ্বনি গর্জ্জন ক'রে ওঠে অত্যন্ত সন্নিকট থেকেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুনের উজ্জ্বল লক্‌লকে শিখা উৎক্ষিপ্ত হয়ে কড়িকাঠে গিয়ে স্পর্শ করে। আগুন! আগুন! ভয়-বিমূঢ় ফানি লাফিয়ে ওঠে, টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল নিয়ে পুঞ্জিভূত জ্বলন্ত পত্ররাশির উপর ঢেলে দেয়। তারপরে, বালতির জল, কুঁজোর,—কিন্তু আগুনের উদ্দামতা কমতে চায় না, ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত তার লেলিহানতার উদ্ধত বাহু সে বিস্তার করে। আর কোন উপায় না দেখে ফানি ছুটে যায় বাহিরে, বারান্দায়, চীৎকার করতে থাকে: 'আগুন! আগুন!'

প্রতিবেশী হেতেমারা ছুটে আসে প্রথমে, তারপরে বাড়ির সদরের প্রহরী এবং রাস্তার পাহারাওয়ালা। কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে:

'জল! জল আনো! কম্বল চাপা দাও আগে।'

তারপর আগুন নিবে যায়, প্রতিবেশীরা চলে যায় নিশ্চিন্ত হয়ে, রাস্তার

ল্যাম্পপোষ্টের কাছে জমায়েৎ জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়—প্রণয়ীযুগল, নীরবে বসে থাকে, দলিত মথিত পর্য্যবসিত তাদের গৃহস্থালির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। চারিদিকে জলের ছড়াছড়ি, ধূলো-বালি-কাদার সমারোহ, ওলোট-পালট আসবাবের মধ্যে বসে তাদের উত্তেজনা তখন শান্ত, উৎসাহ নিবে এসেছে—নতুন ক'রে ঝগড়া সুরু করবার কিম্বা চারিধার পরিষ্কার করবার শক্তি আর নেই তাদের। পাপের প্রভাব যেন স্পর্শ করেছে তাদের, প্রবেশ করেছে তাদের আত্মার অন্তস্তলে। তারই রহস্যাচ্ছন্ন ছায়ায়, পরস্পরের প্রতি বিরাগ তারা ভুলে যায়। সেদিন রাত্রের মত তারা উভয়েই শুতে যায় এক ভাড়াটে বাসায়।

(৯)

একদিন সন্ধ্যায়, ডিনারের মুখে বাড়ি ফিরেই গোস্যাঁ দু'জনের জায়গায় তিনজনের জন্য, খাবারের টেবিলে, আহারের আয়োজন দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। তার বিস্ময় আরো বেশি বাড়ে যখন সে দেখে, অদূরে বসে ফানি খর্ব্বাকৃতি একটি লোকের সঙ্গে তাস খেলছে। লোকটিকে প্রথমে সে চিনতে পারে না, কিন্তু, তার পায়ের শব্দে, লোকটিই ফিরে তাকায়, তখন তার বুনো ছাগলের মত জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা নাক, রোদে পোড়া মানান্‌সই মুখ, মাথার টাক আর চাঁপ দাড়ি দেখে আর না চেনার উপায় থাকে না। কেজ্যার—তার কাকা!

ভ্রাতুষ্পুত্রের বিস্ময়-ব্যঞ্জক উচ্চ সম্ভাষণের জবাবে, তাস না ফেলেই, তিনি শুধু বলেন :

'দেখে যাও, একেবারে হাঁদা নই আমি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সঙ্গে বেজিক্ খেলছি—জিত্‌ছিও!'

ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ!

আর জাঁ, যে এই ব্যাপার, ফানির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা, বাড়ির থেকে, খুব সতর্কতার সঙ্গে এতদিন গোপন ক'রেই এসেছে, তার মনের ভাব তখন অনুমান করবার মতো।

ফানির সঙ্গে কেজ্যারের এত মাখামাখি তার ভালো লাগে না। খাবার

টেবিলে বসে, ফানি যখন পরিবেশন-সূত্রে ব্যস্ত অন্যত্র, কেজ্যার চাপাগলায় গোস্যাঁর কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন :

বাহাদুর ছেলে! 'কী হাত, কী চোখ, কী চাউনি,—একেবারে রাজভোগ্য!'

আহারের সময়ে, জিনিসটা আরো জটিল হয়ে ওঠে—অধিকতর খারাপের দিকেই এগোয়, যখন কেজ্যার তাঁর যৌবনের কাহিনী, প্রেম এবং অভিসারের আত্মজীবনীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

গোস্যাঁ কথাটা ঘোরাবার, পারিবারিক প্রসঙ্গে আনবার প্রয়াস পায় :

'ভালো কাকা! বাড়ির খবর কি? মা? মা কেমন আছেন?'

'মা? তোমার মার কথা আর বলো না! বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কেমন তার মাথার গোলমাল হচ্ছে আজকাল। স্মৃতিভ্রম হয়ে যায় সময়ে সময়ে—সব কিছু ভুলে যান, এমন কি ছেলেদেরও। সেদিন তো তোমার কাকিকে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, তোমার বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই : 'ওই যে চমৎকার ভদ্রলোকটি, প্রায়ই যিনি আমায় দেখতে আসেন—উনি কে ভাই?'

ফানি হাসতে থাকে, গোস্যাঁ কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়—বাড়ির কথা, মার কথা, বিগত কৈশোর-জীবনের কথা কি মনে পড়ে যায় তার?

'পরিবারের মধ্যে কখনো কেউ পাগল হয়েছিল কি?' জিজ্ঞাসা করে ফানি।

'কখনো না।' রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে কেজ্যার উত্তর দেন :

'তবে খুব খুঁটিয়ে ধরতে গেলে আমারই বরং পাগলামির দিকে একটা ঝোঁক ছিল—আমার তরুণ যৌবনে। অবশ্য আমার সেই পাগলামি মহিলারা পছন্দ করত, আমাকে সেজন্য ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন কেউ মনে করে নি!

ফানি হাসে, কেজ্যারও হাসতে থাকেন। জাঁ তাকিয়ে থাকে দু'জনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে; মার দুঃসংবাদে তার মন তখন ভেঙে পড়েছে।

ক্রমশ, কেজ্যার, তাঁর প্যারিসে আসার কারণ প্রকাশ করেন। বহুদিন আগে তাঁর এক বন্ধুকে আট হাজার ফ্রাঁ তিনি ধার দিয়েছিলেন—সেই বন্ধুটি মারা গেছে সম্প্রতি। এই টাকাটা ফিরে পাবার প্রত্যাশা কোনোদিনই তাঁর

ছিল না, কিন্তু সেই বন্ধুর এটর্নি তাঁকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন—আট হাজার ফ্রাঁ ফেরৎ নেবার জন্যে।

'বুঝেছ জাঁ,—' কেজ্যার ব্যক্ত করেন :

'রোণের ওপরে প্রথম যে দ্বীপ, তাইতে বিস্তর জমি কেনা যাবে ঐ টাকায়, নতুন কায়দায়, আঙুরের ফসল ফলানোর ইচ্ছা আছে আমার। অবশ্য একথা কেবল তোমার মধ্যে আর আমার মধ্যে, বাড়ির কাউকে জানাইনি জানাবও না—'

'তোমার বৌ-কেও না, কাকা?' হাসতে হাসতে ফানি প্রশ্ন করে।

'ওঃ! দিভোন!—দিভোনকে না জানিয়ে কিছু করি না আমি। আমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস।'

এবার কেজ্যার বৌ-এর গল্প সুরু করেন, তার স্নেহ-যত্ন, তার সেবার কথা—আবার ফিরে আসে তাঁর প্রথম যৌবনের কাহিনী! আর দেখতেও এমন সুন্দরী—যেমন গড়ন তেমনি রঙ্।

'তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।' এই বলে, কেজ্যার, স্নেহোজ্জ্বল সম্ভ্রমে, দিভোনের ফটোগ্রাফ্ পকেট বইয়ের ভেতর থেকে বার ক'রে ফানির হাতে দেন—সব সময়েই এটি সঙ্গে থাকে তাঁর।

গোস্যাঁর অসুখের সময় দিভোনের নাম বারবার সে শুনেছে তার বিকারের ঘোরে—তাই থেকে, গোস্যাঁর কাকি সম্বন্ধে, মার বয়সী, পাড়া গেঁয়ে, সাধারণ চেহারার একটি মেয়ের ধারণা হয়েছিল তার—কিন্তু এই অপরূপ সুষমাবতীর ছবি এখন দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় সে।

'খুব সুন্দরীই বটে!' ফানি শুধু বলে—তার গলার স্বর কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে যায়।

'আর কি গড়ন!' কাকা বলেন পুনরায়।

ডিনার শেষে ওরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়—কী চমৎকার রাত! নিরুদ্দেশ-যাত্রী ভেসে-যাওয়া এক টুক্‌রো মেঘ থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়ে আকাশে-বাতাসে অভিনব স্নিগ্ধতার সঞ্চার করেছে। তাঁর প্রথম যৌবনে, এই সদ্যবিগত বন্ধুটির সঙ্গে আরেকবার কবে তিনি প্যারিসে এসেছিলেন, কেজ্যারের মনে পড়ে যায়; এবং তাঁর বর্ণনা আর ফুরোতে চায় না।

ওঃ সে কী স্ফূর্তিই না করা গেছে! কী খাশা সময়ই না ছিল! তাঁর এই বন্ধুটি আর তার নায়িকা—মেয়েটি গান গাইত অপেরা হাউসে—কি মিষ্টিই না গলা ছিল তার—!

মধ্য-রাত্রে তিনি বিদায় নেন্ ওদের কাছ থেকে নিজের হোটেলের উদ্দেশে—Hotel Cujas নামীয় একমাত্র যেটি পরিচিত তাঁর প্যারিসে। উচ্চ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামতে থাকেন—ফানি তাঁকে আলো দেখায় এগিয়ে দিতে—ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর দিকে তিনি চুম্বন ছুঁড়ে দেন এবং জাঁকে ডাক দিয়ে বলেন :

'সতর্ক থেকো আজ রাত্রে—বুঝেছ তো!'

কেজ্যার চলে যাবা মাত্রই, ফানি, গম্ভীর মুখে গিয়ে ঢোকে পোষাক-বদলাবার ঘরে; সেখান থেকেই, মধ্যবর্তী উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে, শয়নোন্মুখ গোস্যাঁর দিকে চেয়ে সে বলতে থাকে :

'এখন বুঝতে পেরেছি সব! জ্বরের ঘোরে কেন কেবল দিভোন আর দিভোন করেছ! তোমার খুড়িটি দেখতে নেহাৎ মন্দ নন—বয়সও কাঁচা—'

গোস্যাঁ বাধা দেয়, অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই—তার খুড়ি তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, যে তার নিজের মায়ের মতই—একবার প্রায় মরমর অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে বলতে গেলে—তার সম্বন্ধে এই অশ্লীল ইঙ্গিত সে সহ্য করতে পারে না।

'যাও, যাও, সব জানি, আর বলতে হবে না—' রূঢ়স্বরে ব'লে চলে ফানি :

'যতই বলো, কিছুতেই তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, ঐ মুখ, ঐ চোখ আর অমন চেহারা যার—যে গড়নের কথা এতক্ষণ ধ'রে বক্‌বক্ ক'রে গেল ঐ আহাম্মকটা, ঐ দিভোনির যে তার সুপুরুষ ভাইপোর দিকে একেবারেই নজর নেই, এ কথা ম'রে গেলেও আমি বিশ্বাস করব না। রোণের এধারেই কি, আর ওধারেই বা কি—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা সব মেয়েই সমান!'

বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকেই যেন এ কথা বলে ফানি—তার ধারণা, পৃথিবীতে সব নারীই, তারই মতই, লালসা-মাত্রেরই বশীভূত—পুরুষের দেহকামনা ছাড়া

অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। গোস্যাঁ প্রতিবাদ করে—কিন্তু কে শোনে তার প্রতিবাদ? কার কাছে এই প্রতিবাদ—এ-সম্বন্ধে ফানির অভিজ্ঞতা আর অভিমত পাহাড়ের মতই অটলনীয়।

হঠাৎ ফানি এসে দাঁড়ায় গোস্যাঁর সামনে; দিভোনের ছবিতে যেমন পাড়াগেঁয়ে-মস্তকাচ্ছাদন ছিল, তারই অনুকরণে, মাথায় রুমাল জড়িয়ে:

'আমি কি দিভোনের মত দেখতে?'

ওঃ! না, একেবারেই না! মস্তকাবরণের অনুকরণ করলেই যদি দিভোন হওয়া যেত—, কিন্তু গোস্যাঁ কিছু বলে না, কথা বাড়াতে ইচ্ছা করে না ওর। বরং, মাথায় রুমাল-জড়ানো ঐ ফানিকে দেখে তার মনে পড়ে যায় সেন্ট্-ল্যাজার হাজতের সেই নায়িকাকে, যে খোলা আদালতে তার কয়েদী নায়কের দিকে বিদায়-চুম্বন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল—'ভাবনা করো না প্রিয়তম, সুখের দিন আবার আসবে ফিরে।'

এবং এই দুঃসহ স্মৃতি এমনি তাকে ব্যথিত ক'রে তোলে, যে, ফানি শয্যাগত হবা মাত্রই সে বাতি নিবিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি—যাতে একমুহূর্ত্তও বেশি আর না দেখতে হয় ওকে।

পরদিন প্রাতঃকালেই কাকা এসে পৌঁছন—জোর সোরগোল ক'রে—'এই যে, কেমন আছো খোকাখুকু?'

তাঁর উৎসাহ যেন আগের দিনের মাত্রাও অতিক্রম করেছে এখন! আট হাজার ফ্রাঁঙ্ক পকেটে পড়লে হবারই কথা! এক নামজাদা হোটেলে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ ক'রে বসেন তিনি দু'জনকে—এত টাকা পেয়ে, দু-দশ টাকা, ভ্রাতুষ্পুত্র-বধুর জন্য ব্যয় করতে বিন্দুমাত্রও তাঁর দ্বিধা নেই!

রেঁস্তোরায় গিয়ে কেজ্যারের স্ফূর্ত্তি আর ধরে না! অনর্গল কথায়, আদবে কায়দায়, তাঁর প্রথম-যৌবনের যত কিছু চাল-চলন তাঁর রপ্ত ছিল, সব দিয়ে, এই প্যারিসি মহিলার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেন তিনি। অনেক পুরোন রসিকতার আমদানি করেন—যা বোকামির বাহুল্যের পরিচয় কেবল,—কিন্তু তাতেই ফানি জোর ক'রে উচ্চহাস্য করে। এ-সবেই গোস্যাঁর চিত্ত পীড়িত হয়, তাকে মাঝে রেখে এবং তাকে ডিঙিয়ে যে কাকা ও ভাইঝি বৌ-এর মধ্যে অন্তরঙ্গতা ক্রমশই জমে উঠছে বেশি ক'রে—এতে সে ভারী অস্বস্তি বোধ

করে। দু'জনের এমন মাখামাখি দেখলে কে না বলবে যে এদের হৃদ্যতা বিশ বছরের নয়—নিতান্তই গতকল্যকার সূত্রপাত!

প্রাতরাশ-শেষে কেজ্যার উঠে পড়েন—অকস্মাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যান তিনি:

'আমি এখনই আমার হোটেলে ফিরে গিয়ে বাক্স-প্যাট্‌রা গুছিয়ে নেব—পরের ট্রেনেই রওনা হব বাড়ি। প্যারিসের হাওয়া ভালো নয় আমার পক্ষে—কি বলো জাঁ?'

জাঁ তাঁকে থাকার জন্য অনুরোধ করে না, যাতে তিনি না থাকেন সেই বিষয়েই বরং সযত্ন হয়—ক্রমশই কাকার উৎসাহ ও রসিকতার বহর যেমন প্রবর্দ্ধমান হতে সে দেখছে তাতে কাকার প্রস্তাবে সে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থন জানানোই সমীচীন মনে করে।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঘুম থেকে উঠে, কাকাকে বাড়ি পাঠানোর বাহাদুরির জন্য যখন সে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে এবং মনে করছে যে কাকা এতক্ষণে বাড়িতে, দিভোনের কাছে, নিরাপদ—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কাকার পুনরাবির্ভাব হয়; তাঁর বেশবাস বিত্রস্ত, মুখ মলিন, বিপর্য্যস্ত চেহারা।

'একি! কাকা! বাড়ি যাও নি? কী হয়েছে তোমার?'

কেজ্যার একটা আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে যান—বাক্যহীন, বিভ্রান্ত অবস্থায়। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে যা তিনি বলেন তার মর্ম্ম এই: হোটেল-ফেরার পথে কাল এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে, সন্ধ্যায় এক নামজাদা রেঁস্তোরায় ডিনারের চূড়ান্ত ক'রে, রাত্রে তার সঙ্গেই এক জুয়ার আড্ডায় যাওয়া; তারপরে,—তারপরে? তারপরে সেই আট হাজার ফ্রাঁঙ্কের আর একটিও এখন অবশিষ্ট নেই। একটিও না। এখন তিনি কি করেই বা বাড়ি ফিরবেন,—দিভোনের কাছে এ-মুখ দেখাবেনই বা কি ক'রে? চীৎকার, হাহুতাশ, হতাশার তাঁর অবধি থাকে না।

'কাকা, কাকা!' নিরানন্দ গোস্যাঁ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। সে কী করতে পারে আর? তার এমন কোন বন্ধু নেই—এবং ফানির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অবকাশে কারো সঙ্গেই বন্ধুত্বের প্রয়োজন সে অনুভব করে নি যে

আজ সেখান থেকে কিছু সাহায্যের আশা ছিল। আর ফানি? সে কপাল কুঁচকে ভাবতে থাকে—একটা নাম তার মনে পড়ে যায়। দ'শেলেৎ? দ'শেলেৎ প্যারিসে এসেছে বটে সম্প্রতি—ধনী, উদারহৃদয়, আলাপীবৎসল দ'শেলেৎ।

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই!' বলে জাঁ।

'আমি নিজেই যাব।' ফানি জবাব দেয়।

'বলো কি? তুমি?'

'ক্ষতি কি?'

পরস্পরের চক্ষু মিলিত হয়—দু'জনেই বোঝে দু'জনকে। দ'শেলেৎ ছিল তার প্রণয়ীদের অন্যতম—যদিও এক ঘণ্টার বেশিক্ষণ নয়—তবু গোস্যাঁ তাদের একজনকেও দুষ্কৃতির বহির্গত করতে পারে নি।

'যদি তুমি না চাও—'ফানি থেমে যায়।

কিন্তু কাকা কেজ্যারের হাহুতাশের বাড়াবাড়ি দেখে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেই সম্মতি দিতে হয় গোস্যাঁকে।

ফানি চলে যাবার পর প্রতি মুহূর্ত, প্রতি ঘণ্টা যেন দীর্ঘ—অতি সুদীর্ঘ মনে হতে থাকে দু'জনের কাছেই। যে আশঙ্কা ওদের মনে জাগে, ওরা তা ব্যক্ত করতে পারে না—দু'জনেই বারান্দায় ঝুঁকে প'ড়ে ফানির প্রত্যাবর্তনের পথের দিকে চেয়ে থাকে।

'তাহ'লে অনেক দূরে থাকেন বুঝি, এই দ'শেলেৎ?'

'আদৌ না। খুব কাছাকাছিই।' ক্ষিপ্র কণ্ঠে জবাব দেয় জাঁ। দ'শেলেতের ভালবাসার আদর্শ, 'মুহূর্তের জন্যই প্রেম—কাল নয়, পরে আর নয়—' থেকে, সাফোর সম্বন্ধে তার বক্রোক্তি থেকে সান্ত্বনা পাবার ভরসা লাভের সে চেষ্টা করে।

অবশেষে ফানিকে দেখা যায় পথের বাঁকে।

উজ্জ্বল মুখে, ঢুকতে ঢুকতেই বলে ফানি:

'হয়েছে, টাকা পেয়েছি আমি।'

আট হাজার ফ্রাঁক যখন চোখের সামনে সে মেলে ধরে, তখন কেজ্যার আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুপাত করতে থাকেন। তিনি এই ঋণের জন্য ভদ্রলোককে একটা রসিদ দিতে চান, একটা সুদ স্থির করার কথাও তোলেন।

কিন্তু ফানি বলে:

'কোনো দরকার নেই কাকা! তোমার নামও আমি করি নি তাঁর কাছে। আমাকেই তিনি ধার দিয়েছেন—আমাকেই। তুমি যখন পারবে আমাকেই শোধ দিও—যতদিন পরে তোমার খুশি।'

'তোমার এই উপকার—' কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলেন কেজ্যার: 'জীবনে আমি শুধতে পারব না।'

গোস্যাঁ এবার নিজে যায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে—আর একাকী, প্যারিসের রাস্তায় কাকাকে ছেড়ে দিতে সাহস হয় না তার।

সারা রাস্তা কাকা বলতে বলতে চলেন: 'কী মেয়ে! কী রত্ন! ওকে সুখী কোরো তুমি—করবে ত'? এমন মেয়ে আর হয় না!'

আর জাঁ? সে চুপ ক'রে সঙ্গে চলে—তার চিত্ত এই ব্যাপারে চূড়ান্ত বিরক্ত—তার কেবলই মনে হ'তে থাকে, যে-শৃঙ্খল নিজের গলায় সাধ করে সে জড়িয়েছে তার বোঝা ক্রমশই যেন আরো ভারী, বাঁধন আরো দৃঢ় আরো শক্ত হচ্ছে দিন দিন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আলফঁস দোদের 'সাফো' হইতে অনূদিত

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

এই সময়ে অর্থাৎ বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে আমরা ক্ষত্রিয়দের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি। রাজপদ অনেকস্থলে বংশগত হইলেও রাজা কখনও যথেচ্ছাচারী হইতে পারিত না। তত্রাচ আমরা পঞ্চম শতাব্দীতে একটি নূতন ধরণের রাষ্ট্র-পদ্ধতি বিবর্ত্তিত হইতে দেখিতে পাই। কৌটিল্য ইহাকে 'রাজশব্দোপজীবিন'-রূপ বলিয়াছেন (১)। বেদের ব্রহ্মণাংশে আমরা মিথিলাতে রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই। রামায়ণ (১,৪৭ ; ২,১৭) ও পুরাণে (বায়ু ৮৬, ১৬-২২ ; বিষ্ণু ১,১৮) বিশালী রাজার দ্বারা শাসিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধের সময় বিদেহ (২) (মিথিলা) রাজবংশের, পরিবর্ত্তে ভজ্জিদের সংঘ সেখানে সংস্থাপিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (৩)। মল্লদের দেশ পূর্ব্বে একজন রাজার দ্বারা শাসিত হইত ; কিন্তু বিম্বিসারের সময়ের পূর্ব্বেই সেখানে সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয় (৪)। পক্ষান্তরে জনশ্রুতি বলে যে হস্তিনাপুর গঙ্গার জল দ্বারা মগ্ন হওয়ায় কুরুবংশ কৌশাম্বিতে রাজধানী স্থাপন করিবার পর 'কুরু'দের দেশ ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় ; পরে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সংঘ বা সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয় (৫)। এই প্রকারে অনুমান হয় যে পাঞ্চালেরাও সংঘরূপ রাষ্ট্র স্থাপন করে (৬)।

১। Kautilya—Arthasastra : 1919 Edn. p. 378. ২। আজকাল কেহ কেহ বলেন 'বিদেহ' কোন বংশগত রাজার অধীনে ছিল না ; 'জনক' একটি উপাধি মাত্র।
৩। Dr. H. C. Roy Choudhuri—History of Ancient India p. 84—106.
৪। Dr. H. C. Roy Choudhuri—History of Ancient India : p. 84-106
৫। Dr. H. C. Roy Choudhuri—Histoy of Ancient India : p 84—106.
৬। Dr. H. C. Roy Choudhuri—History of Ancient India : p. 84—106.

মহাভারতে কাম্বোজদের রাজকীয় রাষ্ট্রাধীন থাকিবার কথা উল্লিখিত আছে ; কিন্তু পরে তাহারাও সংঘরূপ রাষ্ট্র বিবর্ত্তন করে (৭)। কৌটিল্য (৮) তাহাদের 'বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবিনঃ' রাষ্ট্ররূপ বলিয়াছেন। এমন কি সুদূর উত্তরবঙ্গেও সেই সময়ে 'সাম-বঙ্গীয়' ('Sam-Vangians') নামে অভিহিত স্থানীয় লোকেরাও লিচ্ছবী ও শাক্যদের ন্যায় সংযুক্ত সংঘরাষ্ট্র (confederated community) বিবর্ত্তন করিয়াছিল। জয়সওয়াল অনুমান করেন যে ইহারাও ব্রাহ্মণ্য-সম্পর্ক-বিরহিত ও লিচ্ছবীদের সম্পর্কীয় আর্য্য জনসংঘ (৯)। এই সঙ্গে বুদ্ধের সময়ের সংবাদ মধ্যে আমরা শাক্যদেরও এই প্রকারে সংঘরাষ্ট্রাধীন থাকিবার কথা শ্রবণ করি। কিছুকাল পরে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে পাঞ্জাবে আমরা এইরূপ কতকগুলি কৌমগত সংঘরাষ্ট্রের সংবাদ পাই। 'মুসিকানী' কৌমের বর্ণনাকালে গ্রীক লেখকেরা বলিতেছেন যে নাগরিকেরা একসঙ্গে আহারাদি করিত। অথর্ব্ববেদেও এই প্রথা উল্লেখ আছে, যেমন ;—তোমাদের পানীয় (drink) এক হউক, তোমাদের খাদ্যের অংশও সাধারণ (common) হউক (১০)।

এই সকল সংবাদ ও তথ্য হইতে আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতির মধ্যে বিবর্ত্তনের একটি নূতন ধাপ পর্য্যবেক্ষণ করি। পুরাতন কৌমগত রাজশক্তির পরিবর্ত্তে সংঘশক্তির শাসন প্রথা অনেক কৌম-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এইগুলি আজকালকার রাজনীতিক ভাষায় যাহাকে Democracy (গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র) বলে তদ্রূপ গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী ছিল না ; বরং এইগুলি অভিজাতিক সাধারণতন্ত্র (Aristocratic Oligarchy) ছিল। বোধ হয়, এইগুলিকেই কৌটিল্য "রাজশব্দোপজীবিন" প্রকারের রাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের রাষ্ট্রে অভিজাতদের দ্বারা সংগঠিত একটি সংঘ (committee) রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিত। সকল অভিজাতবর্গ 'রাজা'

৭। Dr. H. C Roy Choudhuri—History of Ancient India : p. 84—106.
৮। Kautilya—Arthasastra : p. 378, Ed. 1919.
৯। Jayaswal—Presidential Speech at the Oriental Conference : 1934.
১০। Bloomfield —S. B. E. (Sacred Book of the East) : p. 134.

উপাধি ধারণ করিত (১১)। গ্রীসের ক্লাসিক্যাল যুগের রাজাকে বিতাড়িত করিয়া অভিজাতশ্রেণী দ্বারা রাষ্ট্রগঠন আমরা গ্রীসের ইতিহাসে বর্ণিত হইতে দেখিতে পাই। এই গ্রীক অভিজাতেরা প্রত্যেকেই Basileus (রাজা) উপাধি গ্রহণ করিত। রোমের রাজাকে বিতাড়িত করিয়া অভিজাতশ্রেণী (Patricians) সম্মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট (শাসন-ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রকারের অভিব্যক্তি ভারতেও কৌমগত রাজ-পদ (Kingship) বিবর্তনের পর কৌমের অভিজাতদের সংঘবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থা (Government) সংগঠিত হইয়া রাজশক্তি সংঘগত হয়। কৌটিল্য অপর একটি সংঘপদ্ধতির নাম দিয়াছেন—'বার্তাশাস্ত্রোপজীবিনসংঘ'। যে-সকল ক্ষত্রিয়-সংঘ ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম ও সামরিকবৃত্তি অবলম্বন করিত, কৌটিল্য তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন (১২)।

পাণিনি বাহিকদেশের সঙ্ঘগুলির বিষয়ে তদ্ধিত নিয়ম দিবার কালে আর এক প্রকারের সাধারণতন্ত্রের সংবাদ (৫,৩,১১৪-১২৭) দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এই নিয়মগুলি দ্বারা একটি সংঘের সভ্যদের নাম ডাকিলেই তাহারা ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয় কিংবা অন্য বর্ণের লোক কিনা তাহা বুঝা যায় (১৩)। এই প্রকারের সংঘগুলি সকল বর্ণের লোক লইয়া সংগঠিত হইত; একটি বিশিষ্ট বর্ণ বা কৌমের হস্তে এই সংঘ-রাষ্ট্র গণ্ডীভূত থাকিত না (১৪)। এই রাষ্ট্রপদ্ধতিতে একটা যথার্থ সাধারণতন্ত্র (Res Publica) বিবর্ত্তিত হইবার চেষ্টা দেখা যায়। অপরপক্ষে এই যুগে মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি রাজধানী রাষ্ট্রও বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায় এবং তাহারা যে ক্ষুদ্র সংঘ-রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাও বুদ্ধের জীবনীতে পাঠ করা যায়। ইহাতে এই প্রতীত হয় যে কতকগুলি 'জনে'র সংঘরাষ্ট্র ও আর কতকগুলি জনপদের

১১। Dr. B. C. Law—Kshatriya Class in Buddhist Indiaতে—লিচ্ছবীদের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ১২। স্থইডেনের Vikings-গণ রুশ বিজয়কালে এই প্রকারের ব্যবসায়ী ও যোদ্ধৃসংঘ গঠন করিয়া রুষ-মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে (Kluchevsky—History of Russia দ্রষ্টব্য)। ১৩। মনুতে লোকের পদবী হইতে তাহার বর্ণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। সনাতনপন্থী হিন্দুদের মধ্যে আজও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে। ১৪। K. P. Jayaswal—"Hindu Polity", Part I : p. 351.

একজাতীয়তা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। অবশ্য যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় এই রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দের তরফ হইতে এইসব বিষয়ে কি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। ক্ষত্রিয়দের তরফের বিবরণ কিছু কিছু জৈন ও বৌদ্ধপুস্তক সমূহে পাওয়া যায়। জয় ঘোষ নামক একজন জৈন সাধু বিজয় ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণকে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ ক্ষত্রিয়ের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'একজনের কর্ম্মদ্বারা সে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয় (উত্তরাধ্যায় যজ্ঞসূত্র ২৫,২৪,৩৩)। বৌদ্ধ পুস্তক (১৫) সমূহে দেখা যায়, যদিচ চারিবর্ণের কথা (ক্ষত্তিয়, ব্রাহ্মণ, বেশ্য এবং শূদ্দ) এই যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির দোহাই দিয়া নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত, তথাপি 'পিটক' সমূহে দেখা যায় যে, 'রাজন্যেরা' এই দাবী স্বীকার করিত না। ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই বিভাগগুলি 'জাতি' (Caste) ছিল না। একই বর্ণের লোকদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি ক্রিয়া চলিত না; প্রত্যেক বর্ণকে পরিচালনা করিবার জন্য একটা সমিতিও (Governing Council) ছিল না। চতুর্থ বর্ণের সহিত অপর তিন বর্ণ পৃথক ছিল এবং শেষোক্তেরা সামাজিক পদ দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক ছিল। বাস্তব জীবনের সহিত এই বিভাগ মোটামুটি মিলিলেও চারিশ্রেণীর মধ্যে আবার সূক্ষ্ম স্তরসমূহ থাকিত। একটি শ্রেণী হইতে আর একটি শ্রেণী ধাপে ধাপে বিভক্ত হইত, এবং এই স্তরগুলির গণ্ডীও নানা রকমের এবং অস্পষ্ট ছিল। এই শ্রেণীসমূহের বাহিরে আজকালকার নিম্নজাতিসমূহের ন্যায় কতকগুলি শ্রেণী ছিল। এই পিটক সমূহে তাহাদের উপরোক্ত চতুর্বর্ণের নিম্নস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তর গ্রন্থে (১,১৬২) ইহা বিবৃত হইয়াছে; অন্য পুরাতন পুস্তকসমূহে (অম্বলায়ন—মজ্ঝিমা ৯৩; অঙ্গুত্তর ২,৮৫; সম্যুত্ত ১,৯৩; বিনয় ৪,৬—১০) এই নিম্ন-

১৫। T. W. Rhys Davids—"Dialogues of the Buddha" in "Sacred Books of the Budhists" : Vol, II. p. 100—101.

শ্রেণীগুলির মধ্যে আরও কয়েকটি নাম ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে : যথা—বেন, নিষাদ এবং রথকার। ইহারা সকলেই স্বাধীন শ্রেণীর লোক ছিল, ইহাদের ব্যতীত গোলাম ছিল। গৃহস্থের চাকর, অতি ধনীদের বাড়ীর উল্লেখ প্রসঙ্গে কখন কখন ইহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত বৌদ্ধ পুস্তকসমূহের বিবরণ হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে যখন বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ লিখিত হইয়াছিল, তখনও জাতিভেদ উদ্ভূত হয় নাই—শ্রেণীভেদ ছিল।

এই শ্রেণীবিভাগ মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের স্থান কোথায়, তাহা বৌদ্ধ পুস্তক মধুরা সুত্তে (১৬), কণ্ঠন ও মধুরার রাজার কথোপকথনের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের মত উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণেরা অতীতকে বিস্মৃত হইয়া তাহাদের দাবীসমূহ উপস্থাপিত করে। তাহাদের দাবীর বাস্তব কোন ভিত্তি নাই। ন্যায়পরায়ণতাই (ধর্ম্ম) মানুষে মানুষে আসল পার্থক্য উপস্থিত করে, শ্রেণী-বিভেদ (বর্ণ) দ্বারা তাহা হয় না' (এই বিষয়ে 'মিলিন্দা পঞ্হ' দ্রষ্টব্য)। রিস্ ডেভিডস্ বলেন, গৌতমের এই উত্তর বৌদ্ধদের একরকম সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ের পুস্তক (Book of Genesis) বিশেষ। গৌতম স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'তারপর, অম্বত্থ, একজন লোক স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের তুলনা করুক, বা পুরুষের সহিত পুরুষের তুলনা করুক, ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন···অতএব ক্ষত্রিয়েরা অতি নিম্নে পতিত হইলেও ইহা ঠিক, যে ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন (১৭)।

বৌদ্ধ পুস্তকে শ্রেণীসমূহের আসন কি ছিল সে সম্বন্ধে রিস ডেভিডস্ বলিতেছেন 'সমাজের শীর্ষোপরি ক্ষত্রিয়েরা, অভিজাতেরা ছিল ; ইহারা গৌরবর্ণের এবং সুপুরুষ ছিল ; তৎপর যাজ্ঞিক পুরোহিতদের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া ব্রাহ্মণেরা আসিত···ইহার নিম্নে ছিল কৃষককুল—সাধারণ লোক সমূহ (the people) ; ইহারা বৈশ্য বা বেশ্য ছিল। সর্ব্বশেষ আসিত শূদ্রেরা যাহারা মলিন বর্ণের ছিল। কিন্তু শূদ্রদের নীচেও 'ছোটজাতি' (হীন জাতিয়ো)

১৬। Rhys Davids—'Dialogues of the Buddha" in "Second Book of the Buddhists" : Vol. II. p. 105—121. ১৭। R Davids—p. 120—121.

এবং ছোট কারবারের লোক (হীন সিপ্পানি) ছিল। লোকেরা এই সব ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের পেশা পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতকে (৫,২৯০) উক্ত আছে যে একজন প্রেমাতুর ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ক্রমে কুম্ভকার, ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, বেতের কার্য্য, মালাকার এবং পাচক হইয়াছিল। এতদ্বারা তাহার কোন দুর্নাম বা শাস্তি হয় নাই। পুনঃ অপর এক জাতকে (৬,৩৭২) উল্লেখ আছে যে একজন শেঠ দরজী ও কুম্ভকারের কার্য্য করে ; এবং এতদ্বারা সে নিজের উচ্চবংশীয় আত্মীয়দের নিকট সম্মান হারায় নাই।

উপরোক্ত এইসব শ্রেণীর লোকেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু ইহা ব্যতীত গোলামও ছিল। যুদ্ধ অথবা লুণ্ঠতরাজে ধৃত এবং দাসত্বে নিপতিত ব্যক্তিরা (জাতক ৪,২২০) কিম্বা যাহারা আইন দ্বারা শাস্তি পাইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছে (জাতক ১,২০০) অথবা যাহারা নিজেই দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছে (বিনয় পুস্তক ১,১৯১) তাহারাই দাস অথবা গোলাম-রূপে গণ্য হইত। এই দাসত্বের অবস্থায় তাহাদের পুত্র সন্তানাদি হইলে তাহারাও দাস হিসাবে গণ্য হইত। এই গোলামদের খালাস (মুক্তি) দিবার কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্রীস দেশের খনিতে, রোমীয় জমিদারীতে (Latifundra) কিম্বা খৃষ্টান মালিকের আবাদে (Plantation) গোলামদের প্রতি যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত, ইহাদের সম্বন্ধে সেই প্রকার কিছুই শোনা যায় না। ভারতের এই যুগের গোলামেরা অধিকাংশ বাড়ীর দাস থাকিত এবং তাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহারও করা হইত না ; ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না (১৮)। এই যুগে যে সামাজিক পদ (১৯) খোলাখুলি পরিবর্ত্তন করিবার খুব সুবিধা ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই যুগে অবৈধ যৌন-সম্মিলনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই অবৈধ যৌন সম্মিলনে উৎপন্ন সন্ততিরা রাজন্য ও ব্রাহ্মণের পদ পাইয়াছে (জাতক ৪,৩৪,১৪৬,৩০৫ ; ৬, ৩৪৮, ৪২১ (২০)। এই সময়ে আমরা কাহার সহিত খাওয়া-বসা (commensality) চলিতে পারে সে সম্বন্ধে বাচ-বিচারের প্রথম

১৮। R. Davids—Dialogues of the Buddha : Vol. I ; p 101.
১৯। I. R. A. S.—1901 : p 868 ; Jatakas—11,4,2,5 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
২০। R. Davids—Buddhist India, p. 57.

উল্লেখ হইতে দেখি। জাতকে (২,৩১৯-৩২০) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একসঙ্গে আহার-বিহারের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হওয়ার কথাও (জাতক ২,৮২) উল্লিখিত আছে। কোশলের রাজা পশানেদির (প্রসেনজিৎ) এক শাক্য সর্দ্দারের শূদ্রা উপপত্নীর গর্ভজাত 'বাসব-ক্ষত্রিয়া' নাম্নী শাক্য কুমারীর বিবাহের পর যখন এই কুমারীর গর্ভ-প্রসূত সন্তান 'বিরুঢ়বের' সহিত তাহার মাতামহ গোষ্ঠীর কেহ আহার করে নাই, কারণ তাহার মাতা একজন দাসী-পুত্রী সেইজন্য সেও পতিত—এই কথা ব্যক্ত হইলে যে উভয় রাজকুলে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার এবং উপরোক্ত চণ্ডালের দৃষ্টান্তের মূলে দেখা যায় যে সেই সময়ে সমাজে পতিতদের অপাংক্তেয় করা হইয়াছিল। অন্যদিকে জাতকে (৫,২৮০) একটি গল্প আছে, যে জনৈক ব্রাহ্মণ একজন ক্ষত্রিয়ের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে তাহার একমাত্র পত্নীরূপে গ্রহণ করে। আবার এই সময় ব্রাহ্মণদের 'হীন-জাচ্চ' (হীন-জাতি) বলিয়া ঘৃণা করাও হইত (জাতক ৫,২৫৭)।

এই প্রকারে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সমূহে ব্রাহ্মণদিগকে অভিজাতদের (রাজন্য বা ক্ষত্রিয়) নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পুস্তকে ক্ষত্রিয়দের অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে; কারণ এই সকল ধর্ম্মের স্থাপয়িতা ও প্রধান প্রচারকেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিলেন। এই সব ধর্ম্মপুস্তকে উভয় শ্রেণীর মধ্যে যে-সব সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে তাহাই স্বাভাবিক; অন্যান্য দেশের ইতিহাসে আমরা তাহাই দেখি। যোদ্ধ্-শ্রেণী শাসকরূপে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের অভিজাতশ্রেণী হয়; যাহারা রাষ্ট্র-শাসন করে তাহাদের অর্থনীতিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; এবং রাজশক্তি হাতে থাকে বলিয়া তাহারা সমাজের শীর্ষদেশে থাকে। পুরোহিতবর্গ তাহাদের আশ্রিত হইয়া থাকে,—তাহাদের (ক্ষত্রিয়দের) তাঁবেদার শ্রেণীরূপে থাকে। ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম—প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া ও আজকালকার সামাজিক অবস্থা দেখিয়া, প্রাচীন কালের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া লোকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহাই ভারতেও প্রথমে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঈজিপ্ত ও বাবিলনের মন্দিরের পুরোহিতেরা ধর্ম্মরূপ উপায় দ্বারা নিজেদের ক্ষমতা

বিস্তার করিলেও দেশের রাজা তাহাদের উপরে ছিল; প্রথমোক্ত দেশে প্রথমে প্রদেশের (nome) শাসনকর্ত্তা বা অভিজাত জমিদার সেই স্থানের পুরোহিতদের শীর্ষদেশে থাকিত।

এক্ষণে ব্রাহ্মণদের বিরচিত ধর্ম্মপুস্তকসমূহে কি সমাজচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। ব্রাহ্মণদের লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যাহা 'স্মৃতি' বলিয়া কথিত হয়—তাহা 'অর্থশাস্ত্র' হইতে ভিন্ন। শোষোক্ত পুস্তকসমূহে রাজনীতির চর্চ্চা বিশেষভাবে রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি-বিজ্ঞানের চিন্তার ধারা এই সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নাকি মন্ত্রী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার অর্থশাস্ত্র তৎকালীন মৌর্য্য সম্রাটদের অনুমোদিত ছিল (২১), অর্থাৎ ইহা 'গভর্ণমেণ্ট আইন' ছিল। স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটি গভর্ণমেণ্টবিশেষ দ্বারা অনুমোদিত বা গৃহীত হইয়াছে (২২), কোনটি সম্প্রদায় বিশেষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সমস্ত স্মৃতিগুলি ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত হইয়াছে—এইজন্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর অভিমত ইহাতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে আপস্তম্ব, গৌতম ও বৌধায়ন সূত্র সর্ব্ব পুরাতন বলিয়া অনুসন্ধানকারীরা অনুমান করেন। ইহাদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ছয়শত হইতে তিনশত শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয় (২৩)। এতদ্দ্বারা এরূপ মনে হয় যে, বেদ রচনার শেষকালে এবং তাহার পর এই ধর্ম্মসূত্রগুলি রচিত হয়। এইগুলির মধ্যে আপস্তম্বকে সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি যবনদের (২৪) উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাজসনেয়কদের মত উল্লেখ করিয়া গোমাংস ভক্ষন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন (২৫)। তিনি বলেন, শূদ্রেরা আর্য্যদের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের তত্ত্বাবধানে তাহাদের উচ্চবর্ণের মনিবদের জন্য খাদ্য রন্ধন করিতে পারে (২ প্রশ্ন) (২৬); আবার ইহাও বলেন যে

২১। Jayaswal—Age of Manu & Jagnavalka. ২২। Jayaswal—Age of Manu & Jagnavalka; P. V. Kane—"History of Dharmasastra"; Jolly—"Recht und Sitte." ২৩। Kane—History of Dharmasastras p. 8; ২৪। Kane—History of Dharmasastras; p. 45. ২৫। Kane—History of Dharmasastra: p. 45. ২৬। Kane—History of Dharmasastra: pp. 8, 35.

স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের মধ্যে জনশ্রুতি (tradition) অনুযায়ী যে জ্ঞান আছে তাহাই হইতেছে বিদ্যার শেষ সীমা ; এবং ইহাই অথর্ব্ববেদেরই পরিশিষ্ট (supplement) (২৭)। পক্ষান্তরে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণদের মারিয়া ফেলা অথবা আহত করা কিম্বা গোলাম করা যাইতে পারে না (২ প্রশ্ন)। আপস্তম্ভ বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে জন্ম গ্রহণ করিলেও নিয়োগ-প্রথা নিষেধ করেন। আপস্তম্ভ তাঁহার গৃহ্যসূত্রে (২৮) (যজ্ঞ-পরিভাষা-সূত্র) বলিয়াছেন—যজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। পুনঃ তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে অব্রাহ্মণ বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিয়াছেন (২,৫,১১)।

অতঃপর গৌতমকে ধরিলে দেখা যায় যে গৌতম (২৯) বলিয়াছেন, যবনেরা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রা রমণী কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে (৪,১৭,১)। এতৎসঙ্গে তিনি অনেক মিশ্র-জাতির উল্লেখ করিয়াছেন : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কর্ত্তৃক শূদ্রা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান পরাশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই আখ্যা সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উচ্চবর্ণের লোকদ্বারা তাহার ঠিক নিম্ন কিম্বা তাহারও পরের বর্ণের কন্যা দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পাঁচ ও সাত পুরুষ পর্য্যন্ত নিজের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে পারে। বিপরীতপক্ষে নিম্ন-বর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র কোন ধর্ম্ম-ক্রিয়াকাণ্ড (শ্রাদ্ধ প্রভৃতি) করিতে অনুপযুক্ত। বিভিন্ন জাতীয় শূদ্রের মধ্যে বিবাহের সন্তান নিম্নগামী ও বড় অসৎ চরিত্রের হয়। বিভিন্ন জাতির জীবিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন, অভাবে একজন ব্রাহ্মণ একজন অব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গুরুর সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পালন না করিয়া ক্ষত্রিয়ের জীবিকা (যুদ্ধ) গ্রহণ করিবে, তাহা না পাইলে বৈশ্যবৃত্তি (ব্যবসায়, কৃষি ও পশুপালন) অবলম্বন করিবে। শূদ্র ব্যতীত অন্যান্য জাতিগুলি নিজ পেশা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করিতে

২৭। Kane—History of the Dharmasastras : P 41.

২৮। The Sacred Books of the East : Vol. XXIX, p 315-316.

২৯। Gautama Samhita—Ch. IV ; VII.

পারে। যেখানে জীবন সংশয় সেখানে ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণ করিতে পারে এবং ক্ষত্রিয় ব্যবসা করিতে পারে। আইনদ্বারা সম্পত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে গৌতম বলিতেছেন, শূদ্র শুধু সেবা দ্বারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে (৩০)। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের নিকট ত্রুটি অথবা অন্যায় করিলে কিম্বা তাহাকে আঘাত করিলে, যে অঙ্গদ্বারা সে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে রাজা উহা ছেদন করিয়া দিবেন (৩১)। কোন শূদ্র যদি জানিয়া শুনিয়া কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সহবাস করে তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে (৩২)। যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়াছে বা তাহার জিনিষ চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যে শূদ্র বিছানায় অথবা আসনে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে চায় কিম্বা রাস্তায় ব্রাহ্মণকে সমকক্ষ ভাবিয়া তাহার (ব্রাহ্মণের) সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহার একশত 'পণ' জরিমানা হইবে (৩৩)। একজন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণের উপর দুর্ব্যবহার করিলে তাহারও উপরোক্ত পরিমাণ জরিমানা হইবে ; আর ব্রাহ্মণ যদি প্রহৃত হয় তাহা হইলে জরিমানা দ্বিগুণ হইবে। অপরপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ যদি কোন ক্ষত্রিয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ পণ 'জরিমানা' শাস্তি হইবে ; এবং বৈশ্যের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহারের জন্য তদর্দ্ধ জরিমানা এবং কোন শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ দুর্ব্যবহার করিলে সেইজন্য তাহার কোন শাস্তি হইবে না। কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় শূদ্রের প্রতি এবম্প্রকার ব্যবহার করিলে তাহার শাস্তি হইবে।

পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে গৌতম বলেন (৩৪) একজন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সুসন্তান তাহার ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সহিত সমান বখরা (ভাগ বা অংশ) পাইবে ; ক্ষত্রিয়া-জাত পুত্র যদি পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে সে প্রথম পুত্রের অধিকার পাইবে না। ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভোৎপন্ন সন্তানেরা তদনুযায়ী অংশ পাইবে। একজন

৩০। গৌতম সংহিতা—১০ম অধ্যায়। (৩১) গৌতম সংহিতা—১২শ অধ্যায়। (৩২) গৌতম সংহিতা—২৩শ অধ্যায়।

৩৩। গৌতম সংহিতা—১২শ অধ্যায়। ৩৪। গৌতম সংহিতা—দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তাহার অন্য কোন পুত্র না থাকিলে শিষ্যের ন্যায় তাহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বোধায়ন প্রথমেই বলেন—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রীতি বিভিন্ন (১ প্রশ্ন); ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন (১,৮,২ ; ১৮,৮); চতুর্ব্বর্ণ ও মিশ্রিত জাতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সময় ও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে যদি এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বিশিষ্ট স্মৃতি হয়, তাহা হইলে ইহাতে ব্রাহ্মণের দাবী বিশেষভাবেই উল্লিখিত হইতে দেখি। এই তিন শাস্ত্রকারদের মধ্যে আপস্তম্ভকে সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং ব্রাহ্মণদের দাবী বজায় রাখিয়া শূদ্রদের উপর বেশী খাপ্পা নন (৩৫)। আপস্তম্ভের মত দেখিয়া তাঁহাকে বৈদিক যুগের কাছাকাছি বলিয়া প্রতীত হয়। পণ্ডিতেরা তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ ৬০০—৩০০শতক বলিয়া অনুমান করেন। গৌতম স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের লম্বা চওড়া দাবী ও শূদ্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিধান-ব্যবস্থা দেখিয়া সন্দেহ হয় যে গৌতম মনুসংহিতা রচয়িতার সমসাময়িক। কিন্তু তিনি উপরোক্ত যুগেরই লোক, তবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরে যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—কারণ তিনি 'যবনদের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬)। বোধায়ন সেই সময়ের লোক যে-সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে আচার ব্যবহারের পার্থক্য ও বিভিন্নতা সকলের চোখেই পড়িয়াছে। এইজন্য তাঁহাকে আরও আধুনিক কালের লোক বলিয়া মনে হয়।

৩৫। অনেকে বলেন আপস্তম্ভের দক্ষিণাপথে বাসস্থল ইহার কারণ। আপস্তম্ভীয় ব্রাহ্মণদের দক্ষিণ ভারতেই পাওয়া যায়।

৩৬। 'আওনীয়' নামক গ্রীক কৌমটির একটি অংশ এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করে বলিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে গ্রীকেরা 'ইউনানী, যোন, যবন' প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছে। পুরাতন বাইবেল অনুযায়ী নোয়ার (Noah) সন্তান "যবন" গ্রীকদের পূর্ব্বপুরুষ। পশ্চিম এশিয়া হইতে আলেকজাণ্ডারও হেলেনিষ্টিক (গ্রীক ভাবাপন্ন) লোকেরা ভারতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা "যবন" নামে পরিচিত হয়। কোন একটি নূতন জাতি ভারতে আগমন করিলে হিন্দুরা তাহাদের সম্বন্ধে একটা গাঁজাখুরি গল্প রচনা করে। বর্ত্তমান ইংরেজ বা ইউরোপীয়দের উৎপত্তি বিষয়েও অদ্ভুত কিংবদন্তি ছিল।

এই তিনজনের উদারতা ও গোঁড়ামী উভয়ই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দাবী এবং ক্ষত্রিয়াদি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা গণ্ডীভূত। এই সময়ে শ্রেণীসমূহ বিশিষ্ট রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছিল যদিচ তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া চলিত। এই সময়ে গৌতমে দৃষ্ট হয় যে, প্রতিলোম বিবাহের সন্তানেরা অধিকার বিচ্যুত হইত; পিতার জাতি দ্বারাই সন্তানের জাতি নির্ণীত হইত। এই শাস্ত্রকারদের ব্রাহ্মণদের দাবীর বড়াই ও অব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়া হয়ত মনে হয় তৎকালীন রাজশক্তি এই শাস্ত্রগুলিকে গ্রাহ্য করিয়া সমাজকে এই মানদণ্ড দ্বারা শাসন করিত। কিন্তু এই সময়ের রাজার ক্ষত্রিয়শ্রেণীর লোক ছিল; এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ঘোর শ্রেণী-সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তাহার জের ভরদ্বাজ (৩৭) কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অধিকারের (অর্থশাস্ত্র ৫,৬) উপর কটাক্ষপাত দ্বারাই বোধগম্য হয়। এই যুগে যে শ্রেণী-সংগ্রামের জের চলিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তক সমূহ এবং ব্রাহ্মণদের লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকগুলির তুলনামূলক পাঠে বুঝিতে পারি। এই শ্রেণী-সংগ্রামে পতিত শূদ্র এবং তাহা হইতেও পতিত শ্রেণীগুলির অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক হয় নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের দাবীতে খাপ্পা হইয়া ক্ষত্রিয়েরা জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেছে; ক্ষত্রিয়েরা নিজেরাই নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতেছে এবং এই সব ধর্ম্মে 'সর্ব্বজীবে সমভাব,' 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' প্রভৃতি ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু পতিতগণের অর্থনীতিক ও সামাজিক দুরবস্থা হইতে উত্তোলন ও উদ্ধার করিবার কোন ব্যবস্থাই কেহ দেন নাই!

বিভিন্নশ্রেণীর নিজ পক্ষের এই সকল কথা শ্রবণের পর, সেই সময়ে যথার্থ অবস্থা কি ছিল তাহা জানিবার জন্য—বুদ্ধের সময় কি প্রকারের সমাজ-পদ্ধতি ছিল, তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। বুদ্ধের সময়ে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে কি প্রকারের সামাজিক রীতিনীতি ছিল তাহা তৎকালীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এইগুলি সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্ (৩৮) একখানি

৩৭। অর্থশাস্ত্র—৫,৬।

৩৮। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestlichen Indien Zu Buddhas Zeit.—(The Social Organisation in North-East India in Buddha's time). Translated by S. K. Maitra.

পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্বারা আমরা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অবস্থার বিবরণ অবগত হইতে পারি। এই পুস্তকে সংগৃহীত সংবাদ পাঠে আমরা দেখি যে 'ক্ষত্তিয়েরা (ক্ষত্রিয়) অন্যান্য দেশের রাজবংশের ন্যায় নিজেরা একটা গণ্ডীভূত শ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল; নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্য্যাদাজ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের বিশিষ্ট কতগুলি রীতি-নীতি ছিল যেজন্য স্ব-শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হইত; নিম্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহ এমন কি সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তাহা দ্বারা অপবিত্রতা সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্বারা তাহারা সমাজে জাতির (Caste) ন্যায় একটি স্পষ্ট বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্ষত্তিয়েরা নিজেদের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিত, এমন কি রাজা অরিন্দমের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সে সোনাক নামে একজন পুরোহিতের সন্তানকে হীনজাতীয় (৩৯) (হীনজাচ্চ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ক্ষত্তিয়েরা রক্তের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ নজর দিত। এইজন্য কোন লোক সম পদমর্য্যাদার লোক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও সে যদি পিতা কিম্বা মাতার দিক হইতে ভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ রক্তের লোক বলিয়া গণ্য করা হইত না (৪০)।

পালি পুস্তক সমূহে 'ক্ষত্তিয়'দের একটি জাতি (Caste) বলা হইয়াছে, এবং জাতিপর্য্যায় তাহাদের প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বদেশ সমূহে ক্ষত্তিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার হ্রাস আমরা পালি সাহিত্যে দেখিতে পাই। জাতক সমূহেও এই সংবাদের সত্যতা পাওয়া যায়। 'দিঘা নিকায়' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ 'পোখরা সাদি'র সহিত কোশলের রাজা পসানেদির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আছে তাহা উপরোক্ত অভিমতের মিলিয়া যায়: 'সে (পসানেদি) নিজের আশ্রিত ব্রাহ্মণকে কখন নিজের মুখ দেখিতে দেয় না: এমন কি তাহার সহিত কোন পরমার্শের সময় একটা পরদার আড়াল

৩৯। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestlichen Indien Zu Buddhas Zeit. (Social Organisation in North-East India in Buddha's time).—Translated by S. K. Maitra.

৪০। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestlichen Indien Zu Buddhas Zeit. (Social Organisation in North-East India in Buddha's time) : Translated by S. K. Maitra.

দিয়া কথা বলে' (৩,২৬)। এই ব্যবহার (৪১) ব্রাহ্মণ অশ্বত্থ গর্ব্বিত শাক্যদের আচরণ সম্বন্ধে যে নালিশ (অভিযোগ) করিয়াছিল তাহার সহিত মিলিয়া যায়। অশ্বত্থ একদিন কপিলা বস্তুতে আসিয়া শাক্যদের সভাগৃহে (Mote-hall)—যথায় তাহারা উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছিল—প্রবেশ করিলে তাহাকে উচ্চহাস্য ধ্বনির মধ্যে অঙ্গুলি দ্বারা পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার বিষয়ে শাক্যেরা কৌতুক করিতে থাকে, কিন্তু কেহই তাহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলে না।

যদি ধরা যায় যে পালি পুস্তক সমূহে ক্ষত্রিয়দের যে উচ্চাসন প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিদ্বেষী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত রঙ্ (Colouring) প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তক সমূহও সেই একই দোষাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; আবার রাজশক্তি হাতে থাকার ফলে যে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব আসে তদ্ব্যতীত ধর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা ক্ষত্রিয়দের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই। পূর্ব্বদেশ সমূহের রাজবংশীয়েরা যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও ঘোর সাংসারিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ ও কলহ করিয়াছিল তাহাও দৃষ্ট হয় এবং ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উপনিষদে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণদের উপদেষ্টারূপে বর্ণিত আছে।

পুনঃ ফিক্ বলেন, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে পুরোহিত শ্রেণীর যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহার কোন নজীর পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না (৪২)। তিনি আরও বলেন, ব্রাহ্মণেরাও একটি জাতি ছিল; ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত ছিল; তবে জাতীয় সঙ্কীর্ণতা কেবল একটা মতের (idea) মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। বুদ্ধের সময়েই ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারা একটি সংঘবদ্ধশ্রেণী ছিল না। যে ব্রাহ্মণ জন্ম বা বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞকে মূল্য না দিয়া সাধু অথবা পবিত্র জীবন যাপনের

৪১। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestlichen Iniend Zu Buddhas Zeit. (Social Organisation in North-East India in Buddha's time) Translated by S. K. Maitra.

৪২। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordestlichen Indien Zu Buddhas Zeit. (Social Oaganisation in North-East India in Buddha's time) Traslated by S. K. Maitra.

প্রতি লক্ষ্য রাখিত সে-ই অত্যন্ত সম্মানিত হইত। এই সময়ে উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত; শেষোক্তদের উহারা 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া কটাক্ষপাত করিত। কিন্তু এই সময়কার ব্রাহ্মণেরা নানা বৃত্তিধারীর লোক ছিল; 'ব্রাহ্মণ' বলিলেই কেবল বেদাধ্যয়নকারী ও যাজ্ঞিক পুরোহিত দল বুঝাইত না (৪৩)।

এই সময় আমরা ব্রাহ্মণদের লাঙ্গলচালক কৃষক, ব্যবসায়ী, শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কসাই প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিতে পাই (৪৪)। এতদ্বারা আমরা ব্রাহ্মণেরা সমাজের সকলের মাথার উপর যে উচ্চাসন নিজেদের জন্য কল্পনা করিয়াছে সেই আসনের পরিবর্ত্তে দৈনিক জীবিকা সংগ্রহের জন্য বস্তুতান্ত্রিক জগতে ব্যাপৃত বিবিধ রঙের ব্রাহ্মণ নামধারী লোক সমূহের সাক্ষাৎ লাভ করি।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৪৩। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestlichen Indien Zu Buddhas Zeit, (Social Organisation in North-East India in Buddha's time): Translated by S. K. Maitra

(৪৪) দশব্রাহ্মণ জাতকে (১২) উনিশ প্রকার ব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে। ইহার মধ্যে কেবল এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলা হইয়াছে; কতকগুলিকে আবার অতি হীন-পেশাবলম্বীবলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও কার্ল্ মার্ক্স্

বিখ্যাত অধ্যাপক ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের জটিল সমস্যা সমাধানে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ করতে হলে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনীশক্তির খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুফল আশা করা যায় না। পশ্চিম ইয়োরোপের পণ্ডিতম্মন্য 'সোশালিষ্টদের' মুখে এরকম কথা শুনে আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নয়। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্কের এক কাগজে মার্ক্স্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং আজীবন সহকর্ম্মী এঙ্গেল্সের সঙ্গে চিঠিপত্রে ভারতবর্ষের কথা নিয়ে যে আলোচনা তিনি করেছিলেন, তাতে আমাদের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাতের 'সোশালিষ্ট' মহল যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৮৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট্ ইস্তাহারে মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ ভারতবর্ষে ও চীনদেশে নতুন বাজার আর ব্যবসার আড্ডা তৈরী হওয়ার ফলে ধনিক ব্যবস্থার বিকাশে যে প্রভাব পড়বে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঐ বৎসর ইয়োরোপের নানা দেশে বিপ্লবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন ইয়োরোপের বাইরে—এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে ধনিক উৎপাদনী-ব্যবস্থার প্রসারে। এ বিষয়ে মার্ক্স-এঙ্গেল্সের কয়েকটি মূল্যবান চিঠি আছে। ১৮৫৮ সালের ৮ই অক্টোবরে মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্কে লেখেন :—

'বুর্জোয়া সমাজ আবার যেন দ্বিতীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে চলেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তার জন্ম, আর এবার তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে বলে আমি মনে করি। বুর্জোয়া সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে সারা দুনিয়াতে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য বাজার সৃষ্টি করা আর সেই বাজারের ভিত্তিতে উৎপাদনব্যবস্থা করা। কিন্তু পৃথিবী গোল; তাই আর নতুন বাজার তৈরী করার যায়গা নেই। এখন আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে এই :—ইয়োরোপে

বিপ্লব আসন্ন, আর তা সাম্যবাদী রূপ নিতে বাধ্য ; কিন্তু এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে বুর্জোয়ারা যদি প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকে তো এই ছোট্ট ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট তারা করবেই।'

এ কথা মার্ক্‌স্ বলেছিলেন প্রায় আশী বছর আগে ; অনেকেই আজ তার যাথার্থ্য বুঝছেন। ইয়োরোপ দুনিয়ার সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে বলেই বুর্জোয়া ব্যবস্থা মরেও মরছে না। ভারতবর্ষের মত তাঁবেদারী দেশই হচ্ছে তাই সাম্রাজ্যবাদের আসল খুঁটি। এই তাঁবেদারী দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন ও পর্য্যুদস্ত না হলে ইয়োরোপের জনসাধারণও বুর্জোয়াদের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। আমাদের ভবিষ্যতে কি ঘটবে ভেবে অনেক সময় আমরা ইয়োরোপের দিকে চেয়ে থাকি ; কিন্তু ইয়োরোপেরও ভবিষ্যৎ আমাদের চেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের গণশক্তির উপর নির্ভর করছে। দুনিয়ার যারা সর্ব্বহারা, তাদের আন্দোলন সর্ব্বদেশে একই সূত্রে গ্রথিত রয়েছে।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থা (Village System) ভেঙে গেছে। এর মূলগত কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে মার্ক্‌সের চিন্তাধারা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

১৮৫৩ সালে এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্‌স্‌কে এক চিঠিতে লেখেন যে প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে সেখানে ভূমিস্বত্ব কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয় নি। ইয়োরোপে রোমান, টিউটন, কেল্ট, স্লাভ প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেখানে ক্রমে সামন্ততন্ত্র ও ভূম্যধিকারীশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। প্রাচ্যদেশে কেন তা হয় নি বোঝাবার জন্য এঙ্গেল্‌স্ আরও বলেন যে এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে সেখানে সাহারা থেকে আরব, পারস্য, তাতার হয়ে এশিয়ার সর্ব্বোচ্চ অধিত্যকাগুলি পর্য্যন্ত বিরাট মরুভূমি বিস্তৃত হয়ে আছে বলে কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা অবশ্য-প্রয়োজন ছিল, আর সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিল সরকার কিম্বা পল্লীসঙ্ঘ, কোন ব্যক্তির পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। তাই দেখা যায় যে এশিয়াতে অতি প্রাচীন কাল হতে মোটের উপর তিনটি সরকারী বিভাগ চলে এসেছে—রাজস্ব, যুদ্ধ এবং পূর্ত্তকার্য্য।

পল্লীব্যবস্থায় প্রত্যেক ছোট গ্রামেরই স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসনশৃঙ্খলা

ছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিলাতের পার্লামেণ্টে পেশকরা একটা পুরোণো সরকারী রিপোর্ট থেকে মার্ক্‌স্ একটা লম্বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন :—

'ভূগোলের দিক থেকে দেখলে একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসঙ্ঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা পটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করেন, গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা তদারক করেন আর খাজনা আদায় করেন ; গ্রামের মুহুরির কাছে থাকে চাষবাসের হিসাবদপ্তর ; একজন বা দুজন গ্রামবাসী ফৌজদারী ব্যাপারের ভার নিয়ে থাকেন আর পথিকদের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন ; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন, দরকার হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন ; পুকুর, নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জলবিলির ব্যবস্থা করেন ; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে ; গুরুমশায় ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি দেন ; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন। সাধারণত এই কয়েকজন কর্ম্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান ; তাঁদের সংখ্যা কোথাও বেশী, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই রকম সাদাসিদে ভাবে গ্রামের শাসন চলে এসেছে। গ্রামের চৌহদ্দি নিয়ে অদলবদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা মহামারিতে দেশ বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায় নি। একই নাম, পরিমিতি, চিন্তাধারা, গোষ্ঠীবর্গ পর্য্যন্ত বহুকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থানপতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয় নি ; গ্রামের অস্তিত্ব যতদিন অক্ষুণ্ণ, ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তন তাদের বিচলিত করতে পারে নি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থায় কোন বিকৃতি ঘটে নি। এখনও গ্রামের মোড়ল পটেল ; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।'

ভারতবর্ষের এই সমাজব্যবস্থা ইংরেজ বণিকের আবির্ভাবের ফলে সমূলে উৎপাটিত হতে আরম্ভ হল। আরও বহু বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছিল, কিন্তু কোনো জাত এমন নিদারুণ ভাবে এখানকার জীবনব্যবস্থায় ওলট্ পালট্ এনে দেয় নি, ইংরেজের মত কেউ শুধু বিদেশীই থেকে যায় নি। এদেশে মাত্র

কিছুকাল কয়েকজন বাস করে এখানকার দৌলত বিদেশে রপ্তানী করায় নি। তাই মার্কসের ভাষায় বলা যায় : —

'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের দুর্গতি পূর্ব্বের তুলনায় শুধু বিভিন্ন প্রকৃতির নয়, বহুগুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্রও বটে। এর কারণ কেবল এশিয়ার আর ইয়োরোপের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দানবীয় সংযোজন নয়; ঐ সংযোজন ইংরেজের বিশেষত্ব নয়, ওলন্দাজ শাসনের অনুকরণ মাত্র।.....অবিরাম গৃহবিবাদ, আক্রমণ, পরাজয়, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দরুণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে জটিল ও সংহাররূপে দেখা দিলেও এ সমস্ত ঘটনা সমাজের বহিরাবরণ স্পর্শ করে গেছে মাত্র, আমূল পরিবর্তন আনে নি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ভেঙে গেছে। এখনও তা নতুন করে গড়ে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে ফেলেছে, নতুন জীবনের সন্ধান পায় নি। ইংরেজ শাসনে হিন্দুস্থান ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, তার অতীতের সঙ্গে সংস্রব হারিয়েছে। এখনকার ভারতীয় জীবনে তাই শুধু যে বিষাদ আছে তা নয়, একটা বিশেষ রকম অবসাদও মিশে রয়েছে।'

ইংরেজ শাসনের এই সংহার-মূর্ত্তির বর্ণনা মার্কস্ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৮১৩ পর্য্যন্ত সোজাসুজি লুণ্ঠন চলেছিল—পূর্ব্বতন শাসকরা যে পূর্ত্তকার্য্য ও জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল, ইংরেজ আমলে তা অবহেলিত হল, নষ্ট হল, লুঠের নেশায় তখন ইংরেজ মশগুল। এদেশের মাল যাতে বিলাতে না ঢোকে—এমন কি ইয়োরোপের কোনও দেশে না যেতে পারে—সেজন্য আইন করে আমদানী বন্ধ হল কিম্বা বেজায় বেশী হারে মাশুল বসানো হল। ইংরেজের ভূমিস্বত্ব আইন এখানে কায়েম হল, ইংরেজের ফৌজদারী আইন এল।

উনিশ শতক হল ধনিকতন্ত্রের মরশুমের সময়। ১৭৮৪ থেকে ১৮৩৩ পর্য্যন্ত আইনকানুনের অদল বদলের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হল। ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের লীলাক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। আর ইংরেজ পুঁজিদারদের মুনাফা বাড়াবার জন্য এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা হল। তাই দেখা যায় যে ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে বিলাত থেকে এদেশে আমদানী মালপত্রের দাম বাড়ল ৩,৮৬,

১৫২ পাউণ্ড থেকে ৮০,২৪,০০০ পাউণ্ড। ১৭৮০তে বিলাতের মোট রপ্তানীর মাত্র বত্রিশ ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষে আসত; ১৮৫০ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেল। যে-বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন হল ভারতবর্ষ, বিলাতের লোক-সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ সেই ব্যবসা থেকেই জীবিকা উপার্জ্জন করতে লাগল; বিলাতের রাজত্বের এক-দ্বাদশাংশ এল বস্ত্র ব্যবসায় থেকে। ভারতবর্ষের বস্ত্র শিল্পকে নির্ম্মমভাবে নির্ম্মূল করার ফলেই বিলাতের এ সমৃদ্ধি সম্ভব হল।

১৮৫৩ সালের ১০ জুন তারিখের 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন্' পত্রে মার্কস্ লিখেছিলেন : '১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিলাত থেকে ভারতে সুতা রপ্তানী ৫,২০০ গুণ বেড়েছিল। ১৮২৪ সালে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হত কি না সন্দেহ; অথচ ১৮৩৭ সালে ৬ কোটী ৪০ লক্ষ গজেরও বেশী আমদানী হয়েছিল। ঐ সময়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দেড়লক্ষ থেকে বিশ হাজারে নামল। শুধু যে বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থানগুলিরই পতন হল তা নয়; ফল হল আরও ভয়াবহ। সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পকর্ম্মের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল, তা ইংরেজদের বিজ্ঞান আর বাষ্পযন্ত্র একেবারে ছিন্ন করে দিল।'

'বিলাতের কার্পাসশিল্পে যন্ত্র প্রচলনের ফল ভারতবর্ষের পক্ষে ভয়াবহ হল। ১৮৩৪-৩৫ সালে বড়লাট দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানালেন, 'বাণিজ্যের ইতিহাসে এরূপ দুর্গতির তুলনা নেই। তাঁতিদের হাড়ে যেন হিন্দুস্থানের মাটি সাদা হয়ে যাচ্ছে'।' (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

কৃষি ও শিল্পকর্ম্মের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল এদেশের পল্লীব্যবস্থার আশ্রয়। ভারতীয় সমাজের খুঁটি ছিল চরকা আর তাঁত। সেই দেশে ইংরেজ ঢুকে তাঁত ভাঙলে, চরকাকে নষ্ট করলে। ইংরেজ এল অবশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য; কিন্তু তার আসার ফলে একটা বিরাট সমাজবিপ্লব এদেশে আরম্ভ হয়ে গেল : পুরোনো শিল্পপ্রধান শহরগুলো নষ্ট হল, শহরের লোক গ্রামে গিয়ে ভিড় বাড়াবার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে যে সরল সামঞ্জস্য ছিল তাও নষ্ট হল। কৃষিকর্ম্ম ছাড়া উপার্জ্জনের উপায় বন্ধ হয় বলে জমির উপর চাপ বেড়ে গেল, চাষ করে কোনোক্রমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করা শক্ত হয়ে উঠল। আজ পর্য্যন্ত গ্রামের সেই অবস্থা রয়েছে, চাষীদের দুর্গতির সীমা নেই। সরকার

কেবল খাজনা আদায় করেই চলল, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য সামান্য প্রয়াসও করল না। ১৮৫০-১ সালে দেখা যায় যে খাজনা ১ কোটী ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড, অথচ নদীনালা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ড খরচ হল। মার্ক্‌স্ তাই 'ক্যাপিটালে' এই অবস্থার উল্লেখ করে বললেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি প্রায় অসম্ভব, আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, তাদের কোন রকমে বেঁচে থাকতে হবে, সভ্য জীবনের কোন পরিচয়ই তারা পাবে না। ঐ সময় সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ আরও লিখলেন :—'ইংরেজ পুঁজিদারদের মূলধনের উপর সুদ ইত্যাদিতে ভারতবর্ষ বিলাতে বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কর পাঠাচ্ছে। এটা হল 'সুশাসনের' দাম। তাছাড়া ইংরেজ রাজপুরুষেরা তো বেতন থেকে বাঁচিয়ে অনেক টাকা দেশে পাঠাচ্ছে, আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লাভের বেশ খানিকটা অংশ খাটাবার জন্য ফেরৎ দিচ্ছে।'

কিন্তু ভারতের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থার পতনে মার্ক্‌স্ অশ্রু বিসর্জ্জন করতে রাজী হন নি। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে সকল দেশে জনসাধারণের যে দারুণ দুর্গতি ঘটেছিল, তার বর্ণনা অবশ্য মার্ক্‌সের মত কেউই দিতে পারে নি। কিন্তু তিনি জানতেন যে পল্লীব্যবস্থার মত প্রাচীন সমাজ-আদর্শ ইতিহাসের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক, তাকে নির্ম্মমভাবে অপসৃত করা ভিন্ন উপায় নেই। আমাদের দেশে অনেকে আছেন যাঁরা আগে চলতে চান না, কেবল চেয়ে থাকেন পিছনের দিকে, আবার পুরোণো চরকা-তাঁতের যুগে ফিরে যেতে চান। তাঁদের পক্ষে মার্ক্‌সের কথা বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার :—

'অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতি-শাসিত পল্লীসমাজ ছিন্নভিন্ন হল, প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকানির্ব্বাহের বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রণার অবধি রইল না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিরীহ পল্লীসমাজগুলিই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখতো, এদের শাসনে মানুষ হত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাঁদের ছিল একপ্রকার বর্ব্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু

খানিকটা জমির উপর : সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা ইত্যাদি তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মত লাগত, বিচলিত করত না; অথচ তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একান্ত অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অশ্রদ্ধেয় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষ্যহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। নরহত্যা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কলুষিত করে রেখেছিল, সেখানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না করে বশ্যতা স্বীকার করত। অচঞ্চল, অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতি-প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করত, প্রকৃতিপূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হত, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চ্চনা করত।'

তাই ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পদ্ধতিকে মার্ক্‌স্ 'জঘন্য' আখ্যা দিলেও বলেছিলেন : 'এশিয়ার সমাজব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অভীষ্ট সাধন সম্ভব কি না? যদি না হয় তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংলণ্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।'

মার্ক্‌স্ ১৮৫৩ সালে বলেছিলেন যে ভারতে ইংরেজের কাজ ছিল দু'রকমের—এশিয়ার সনাতন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা, আর সেখানে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ভিত্তি স্থাপন করা।

'ভারতবিজেতাদের মধ্যে ইংরেজই প্রথম সভ্যতায় অধিক অগ্রসর বলে হিন্দুসংস্কৃতির কাছে বশ্যতা মানে নি। এবং ইংরেজ এসে দেশের সমাজকে ভেঙেছে, শিল্পকে নির্ম্মূল করেছে, সমাজের যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে। তাদের ভারতশাসনের ইতিহাসে এখনও শুধু ধ্বংসেরই বর্ণনা আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুনর্গঠনচেষ্টা প্রকাশ হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনর্গঠন আরম্ভ হয়ে গেছে বলা যায়।'

'পুনর্গঠনের' লক্ষণ মার্ক্‌স্ কোথায় দেখেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন :—

(১) 'মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে সুদূর-বিস্তারী ও সুসংহত রাষ্ট্রিক ঐক্য।

ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষের উপরে সে ঐক্য চাপিয়েছে, আর তা এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।'

(২) 'স্বরাজ অর্জনে আর বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারতীয় সৈন্যদলকে ইংরেজ গড়ছে, অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে।' (মার্ক্‌স্ লিখেছিলেন অবশ্য ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে; ঐ ঘটনার ফলে ইংরেজদের সামরিক কর্তৃত্ব কঠোরতর করা হয়, আর ভারতের সৈন্যদলের এক-তৃতীয়াংশ হয় গোরা।)'

(৩) 'স্বাধীন সংবাদপত্র' (১৮৩৫ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৭৩ থেকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্কটের পরিচায়করূপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক আইন প্রবর্ত্তিত হয়।)

(৪) ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্বের প্রবর্ত্তন, যার বৈপ্লবিক ফলাফল অবশ্যম্ভাবী।

(৫) 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অল্প কয়েকজন ভারতীয়কে কলকাতায় শিক্ষা দিচ্ছে বলে ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী আর দেশশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।'

(৬) 'বাষ্পযানের কল্যাণে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের যোগাযোগ দ্রুত ও নিয়মিত হয়েছে।...ভারতবর্ষের পঙ্গুতার যে প্রধান কারণ ছিল বিদেশের সংস্রব বর্জ্জন, তা থেকে দেশ উদ্ধার পেয়েছে।'

মার্ক্‌স্ বলেছিলেন যে ভারতের অগ্রগতি নিয়ে বিলাতের শাসকসম্প্রদায় বিশেষ মাথা ঘামায় নি। 'সেখানকার অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল দেশটাকে ঘটা করে জয় করতে, পুঁজিদাররা চেয়েছিল লুঠ করতে আর কারখানার মালিকরা চেয়েছিল সস্তায় নিজেদের মাল বেচার সুবিধা যোগাড় করতে।' কিন্তু ক্রমে মালিকরা বুঝল যে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ভারতবর্ষে সামান্য কিছু শিল্পোৎপাদন দরকার, আর তাই দেশের মধ্যে রেলে যাতায়াত ও জলসেচ ব্যবস্থা একেবারেই অপরিহার্য্য। এ সম্পর্কে মার্ক্‌স্ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:—

'আমি জানি যে বিলাতের কারখানার মালিকেরা সস্তায় তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লা উৎপন্ন হয়, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার

যন্ত্রের প্রবর্ত্তন হলে সেখানে আর যন্ত্র নির্ম্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজ-কে রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে সব শিল্পের সঙ্গে রেলের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে।...যে পুরুষানুক্রমিক কর্ম্মভেদ ছিল জাতি-ভেদের ভিত্তি, রেলপথ বিস্তারের ফলে আধুনিক শিল্পের প্রবর্ত্তন হওয়ায় তা নষ্ট হবে, ভারতের প্রগতির ও গণশক্তির পথের যে চরম অন্তরায় ছিল তা অপসৃত হবে।'

যদি কারুর মনে ধারণা হয়ে থাকে যে মার্ক্‌স্ তো ক্রমাগত ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সুপারিশই করে চলেছেন, তবে সে ধারণা হাস্যকর হবে। ভারতের গণশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। ইংরেজ শাসন শুধু তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে, বিদেশী শাসন এসে অত্যাচার অনাচার করে পুরোণো সমাজের কাঠামো না ভেঙে দিলে তা সম্ভব হত না। কিন্তু বিদেশী শাসনের কাজ সেখানেই শেষ; ভারতের গণশক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎকে গড়তে পারে। তাই মার্ক্‌স্ বলেছিলেন:—

'ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে গণসাধারণের দাসত্ব মোচন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতিও হবে না। সেজন্য শুধু দেশের উৎপাদনী-শক্তির সংবর্দ্ধন নয়, সে শক্তিকে গণসাধারণের করায়ত্ত করা প্রয়োজন, ইংরেজ শাসনে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয় স্থাপিত হবে। কিন্তু কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর বেশী কিছু করেছে? তারা কি কখনও মানুষকে রক্ত আর পঙ্কিলতা আর দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে না টেনে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে? যতদিন বিলাতের শ্রমিকেরা শাসকশ্রেণীকে নিষ্কাসিত না করে, কিম্বা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তিবলে ইংরেজদের শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ না করে ততদিন ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, সেই বিশাল, চিত্তাকর্ষক দেশের পুনর্জ্জীবন আসবে, যে দেশের শান্ত

অধিবাসীরা প্রিন্স সল্‌টিকভের ভাষায় 'ইতালিয়ানদের চেয়ে মার্জ্জিত ও নিপুণ,'' যারা বশ্যতাস্বীকার করলেও নিজেদের সৌম্য আভিজাত্য হারায় নি, যারা স্বাভাবিক শৈথিল্য সত্ত্বেও যুদ্ধে অসাধারণ বীর্য্য দেখিয়ে ইংরেজ নায়কদের আশ্চর্য্য করেছে, যাদের দেশ হচ্ছে আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্মের উৎস, যাদের জাটদের মধ্যে প্রাচীন জার্ম্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকের মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই।'

আজ বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের দিনে আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস ভারতবাসীর উপর যে দায়িত্ব চাপিয়েছে আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইন্দ্রপ্রস্থ

দেখেছি পাণ্ডুর মুখে
অনিমিত্ত চেতনার ছোপ।
এই দেশে গোলাপ-উচ্ছ্বাস—
নিভেছে অনেক দিন ;
যাত্রীদল বেঁধেছে শিবির।
গ্রন্থাগারে দীর্ঘ ইতিহাস॥
জেনেছি হাজার বাস্তু কপোতের দাম্পত্য কূজনে
এখানে স্থবির কাল কোনো কীর্ত্তি রাখেনাকো মনে।

অনেক বসন্ত আসে,
—সমাধান-অতীত বিস্ময়।
অনেক দুঃসহ স্মৃতি—
পাণ্ডুসুত,…প্রখ্যাত নাদির।
দিন যায়,—কত দিন। কী বিচিত্র চেতনার স্রোত।

শুনেছি অদ্ভুত হাসি,
জেগে ওঠে পাণ্ডবের প্রেত।
খেমেছে ভাড়াটে টাঙা ; তীব্র ত্রেষা,…করুণ দম্পতী
বিবর্ণ হলুদ চোখ, ক্ষীণ হাসি, রক্তাল্প শরীর।
সমুখে বধির স্তূপ নিরবধি, অপূর্ব্ব স্থবির।

জীবন-বুদ্বুদ তবু মুক্তি চায়—নির্ব্বাণ সে নয়।
শিরায় নতুন রক্ত…কুরুপক্ষে তীব্র পরাজয়॥

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রশ্ন

শুনিয়াছি :
ধরণীর ধ্যানের স্বপনে—
ধূলি পরে নেমে আসে
স্বরগের ছায়া কভু অকস্মাৎ,
সেই ক্ষণে দেখা যায় দেবতা ধরায়।

ফুটপাতে অনাহার-ক্লিষ্ট হাত পাতা,
স্তন্যহীন কোলে কাঁদে শিশু।
আশা-আকাঙ্ক্ষায়—
সেই সাথে কাঁপে বুঝি অন্তরাত্মা মার।
উন্মত্ত জনতা চলে,
তাকায় না কেহ—
তাকাবার নাহি অবসর।
অকস্মাৎ ভরে যায় হাত
নিশাচর মল্লপের অকৃপণ দানে!
কেঁপে কেঁপে ভেসে যায়
নিশীথ-বাতাসে :
'ভগবান'।.....

যার লাগি কাঁদে মন
কাঁদে দেহ-প্রাণ ;
অন্তরের অন্তস্তল যার লাগি কাঁদে—
সেই প্রেয়সীর বুকে মুখে,
আর লাল ঠোঁটে,
পায় প্রিয় স্বরগের স্বাদ—
যবে অকস্মাৎ

মানুষী সে হয়ে ওঠে দেবী,
আত্মার আত্মীয়া।
জেগে থাকে দু'জনারে ঘিরি
একটি মাহেন্দ্র-ক্ষণ—
অজর, অমর।.....

'নিজের জীবিকা দিয়ে
নিজেরে চালাবে তুমি,
নিজের গৌরবে—
উপহাসি কঠিন বাস্তব
আর অসৎ পৃথিবী।'
এই কথা—এ অমৃত
ঢালি দিয়া কানে,
হাল্‌কা করিয়া নিয়া ব্যথাতুর মন—
ধীরে ধীরে গুটাইছে
কামনার জাল।
জড়ায়ে উঠিছে তায়
বিধবার দেহ।
পরহিত উপকার লাগি
আত্মা কাঁদে—
মিটিতেছে আত্মার সে-ক্ষুধা!.....

স্বরগ, দেবতা বলি
কিছু আছে কিম্বা কিছু নাই—
প্রশ্ন জাগে মনে।.....

শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত

স্তম্ভ

ভাঙা স্তম্ভের ওপর রক্ত আলোর বর্শা এসে লাগ্‌লো।
যেন জিজ্ঞাসার বিরাট আগ্রহ কেঁপে উঠ্‌লো,
শীর্ণ গাছে নতুন পাতার মত।

কুয়াশার সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনের
জোরালো আলোর কথা মনে পড়েঃ মগজের দুরন্ত দুশ্চিন্তা যেন।
কয়লা কুয়াশা
লোভ ভয় আশা
এই ভাঙা স্তম্ভের রক্ত আলোর ভাষা
সব কিছু মিলিয়ে বিরাট জিজ্ঞাসা।

এই ধুলোয় কখনো কি আমার পা আগে পড়েছে?
আমরা কি এই ধুলোয় কখনো মিশে গিয়েছি
আর ভেবেছিঃ
কোনো দাবানল বা আগ্নেয়গিরির উৎসাহে
ভয়ঙ্কর সুন্দর নতুন দিন আসবে?
আর কেঁপে উঠ্‌বে এই জীর্ণ শতাব্দীর স্তম্ভ
তুষারে সূর্য-রশ্মির মত?

কবে অসহায় দিনে তোমার আঙুলের আগুন
ছড়িয়ে দিয়েছিলে।
স্মৃতির কঙ্কালে
রক্ত-মাংস বসাবার অদ্ভুত আগ্রহ।
কী করে ফেলে যাই?
তোমার কথা কুকুরের মত আমার পেছনে ঘোরে।
আর ভাঙা স্তম্ভের অদ্ভুত জিজ্ঞাসার পিঠে
শীতের কুয়াসা জমে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

দ্বাদশ শিলানুশাসন

গিরণার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ক) দেবানংপিয়ে পিয়দসি রাজা সব-পাসংডানি চ পবজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি; দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে।

(খ) ন তু তথা দানং ব পূজা ব দেবানংপিয়ো মংঞতে যথা কিতি সার-বঢী অস সব-পাসংডাণং।

(গ) সারবঢী তু বহুবিধা।

(ঘ) তস তু ইদং মূলং য বচি-গুতী কিংতি আত্‌প-পাসংড-পূজা ব পর-পাসংড-গরহা ব নো ভবে অপ্রকরণম্হি, লহুকা ব অস তম্হি তম্হি প্রকরণে।

(ঙ) পূজেতয়া তু এব পর-পাসংডা তেন তেন প্রকরণেন।

(চ) এবং করুং আত্‌প-পাসংডং চ বঢয়তি পর-পাসংডস চ উপকরোতি।

(ছ) তদ্‌-অংঞথা করোতো আত্‌প-পাসংডং চ ছণতি পর-পাসংডস চ পি অপকরোতি।

(জ) যো হি কোচি আত্‌প-পাসংডং পূজয়তি পর-পাসংডং ব গরহতি,—সবং আত্‌প-পাসংড-ভতিয়া, কিংতি আত্‌প-পাসংডং দীপয়েম ইতি,—সো চ পুন তথ করোতো আত্‌প-পাসংডং বাঢতরং উপহনাতি।

(ঝ) ত সমবায়ো এব সাধু কিংতি অঞমংঞস ধংমং স্রুণারু চ সুসুংসের চ।

(ঞ) এবং হি দেবানংপিয়স ইছা কিংতি সব-পাসংডা বহু-স্রুতা চ অসু কলাণাগমা চ অসু।

(ট) যে চ তত্র তত প্রসংনা তেহি বতব্যং—

(ঠ) দেবানংপিয়ো নো তথা দাণং ব পূজাং ব মংঞতে যথা কিংতি সার-বঢী অস সর্ব-পাসডানং।

(ড) বহুকা চ এতায় অথা ব্যাপতা ধংম-মহামাতা চ ইথীঝথ-মহামাতা চ বচ-ভূমীকা চ অঞে চ নিকায়া।

(ঢ) অয়ং চ এতস ফল য আত্প-পাসংড-বঢী চ হোতি ধংমস চ দীপনা।

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী সব সম্প্রদায়ের লোককে, প্রব্রজিত-দেরও (গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী) গৃহস্থদেরও, পূজা (সম্মান) করেন; (তিনি) দান দ্বারাও এবং বহুবিধ সম্মান দ্বারাও তাহাদিগকে সম্মান করেন।

(খ) কিন্তু দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শী) দান বা পূজাকে সেরূপ (মূল্যবান) মনে করেন না যেমন (ইহাকে মনে করেন—) যথা— সব সম্প্রদায়ের সার-বৃদ্ধি হউক।

(গ) কিন্তু সার-বৃদ্ধি বহুবিধ (প্রকারে সম্ভব)।

(ঘ) কিন্তু তাহার (সার-বৃদ্ধির) মূল এই, যথা—বাক্-গুপ্তি (বাক্-সংযম) অর্থাৎ অপ্রকরণে (অপ্রয়োজনে, অক্ষেত্রে) যেন আত্ম (নিজ) সম্প্রদায়ের পূজা (প্রশংসা, সম্মান) বা পর-সম্প্রদায়ের নিন্দা (করা) না হয়, অথবা প্রত্যেক ক্ষেত্রে (তাহা =প্রশংসা বা নিন্দা) যেন লঘু (পরিমিত) হয়।

(ঙ) কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পর-সম্প্রদায়ের সম্মান করা উচিত।

(চ) এরূপ করিলে (লোকে) আত্ম-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি (উন্নতি-সাধন) করে, পর-সম্প্রদায়েরও উপকার করে।

(ছ) তাহার অন্যথা করিলে (লোকে) আত্ম-সম্প্রদায়েরও ক্ষতি করে, পর-সম্প্রদায়েরও অপকার করে।

(জ) কারণ যে কেহ আত্ম-সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে বা পর-সম্প্রদায়ের নিন্দা করে,—সবই (এইরূপ) আত্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি হইতে যে আত্ম-সম্প্রদায়ের গৌরব-বৃদ্ধি করিব,—এইরূপ করিলে সে আত্ম-সম্প্রদায়ের আরও বেশী ক্ষতি করে।

(ঝ) অতএব সমবায়ই (সহযোগিতা, মৈত্রী, concord) সাধু, অর্থাৎ (লোক) যেন পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করে ও পালন করে।

(ঞ) দেবতাদের পুত্র (রাজা প্রিয়দর্শীর) ইহাই ইচ্ছা যে সব সম্প্রদায়ের লোকই যেন বহুশ্রুত (পণ্ডিত, জ্ঞানী) হয় এবং কল্যাণাগম (তাহাদের আগম = শাস্ত্র বা মতবাদ যেন কল্যাণ = শুদ্ধ) হয়।

(ট) এবং যাহারা নিজ নিজ (সম্প্রদায়ের) প্রতি প্রসন্ন তাহাদিগকে এরূপ বলা উচিত—

(ঠ) দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শী) দান বা পূজাকে সেরূপ (মূল্যবান) মনে করেন না যেমন (ইহাকে মনে করেন) যথা— সব সম্প্রদায়ের সার-বৃদ্ধি হউক।

(ড) এই উদ্দেশ্যের জন্য বহু (কর্ম্মচারী) ব্যাপৃত আছেন, (যথা) ধর্ম্ম-মহামাত্রগণ, স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্রগণ, ব্রজ-ভূমিকগণ (গোশালা-পরিদর্শক) এবং অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ।

(ঢ) এবং ইহার ফল এই যে (ইহাদ্বারা) আত্ম-সম্প্রদায়েরও বৃদ্ধি (উন্নতি) হয়, ধর্ম্মেরও দীপনা (গৌরব বৃদ্ধি) হয়।

টিপ্পনী

(ক) 'সব-পাসংডানি'র পর 'চ' টি অবান্তর এবং অন্যস্থানের লিপিগুলিতে নাই।
বিবিধায় চ পূজায়—এখানে ৩য়া বিভক্তি, ৪র্থী নহে।
নে = সং তানি, ২য়ার বহুবচন।

(খ) কিতি = কিংতি < সং কিম্ ইতি = 'তাহা কি' ? = যথা, for example, namely ইত্যাদি।
অস = সং স্যাং।

(ঘ) বচি-গুতী—অন্য লিপিগুলিতে আছে বচ-গুত্তি, বচি > অর্দ্ধমাগধী বই = বাক্।
আত্প = আত্ম ; তু. চলিত বাংলা আপ্ত, যেমন আপ্ত-স্বজন প্রভৃতি।

(ঝ) সমবায়ো—শাহবাজগঢ়ীর লিপিতে আছে সয়মো = সংযম।
স্থণারু = সং শৃণ্বন্তু।

(ট) তেহি—৪র্থীর বহুবচন।

(ড) অথা—৪র্থীর ১ বচন
ইথীঝখ—ইথী (= ইত্থি < স্ত্রী) + ঝখ (< অজ্‌ঝক্‌খ < অধ্যক্ষ)।
বচ = ব্রজ = গোশালা।
এই বাক্যটিতে অশোক-নিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধর্ম্ম-মহামাত্র'দের কথা আগেই বলা হইয়াছে (৫ম শিলানুশাসন, ড ও পরবর্ত্তী বাক্যগুলিতে)। 'স্ত্রী অধ্যক্ষ মহামাত্র'রা বোধ হয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তু. গণিকাধ্যক্ষ (কৌটিল্য)। ব্রজভূমিক—তু. গবাধ্যক্ষ (বাৎস্যায়ণ-কামসূত্র) ও গো'ধ্যক্ষ (কৌটিল্য)।
'অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ'—৭ম স্তম্ভানুশাসনে অশোক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহাদের কাজ ছিল বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, আজীবিক, নির্গ্রন্থ (জৈন) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরিচর্য্যা করা।

ত্রয়োদশ শিলানুশাসন

গিরণারের এই লিপিটির বহুস্থান একেবারে অস্পষ্ট বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাত্র এখানে ওখানে কয়েকটি কথা এখনও পড়া যায়। অথচ লিপিটি বেশ দীর্ঘ। সেইজন্য এই বিনষ্ট শিলানুশাসনটির গিরণারের পাঠ উল্লেখ করার চেষ্টা আর করিব না। বিনষ্ট অংশের অনেক স্থান কাল্‌সী ও শাহবাজগঢ়ীর লিপি মিলাইয়া পড়িলে তাহার অর্থবোধ হয়। কিন্তু কাল্‌সী ও শাহবাজগঢ়ীর প্রাকৃতের বানান, ব্যাকরণ ও ভাষা গিরণার-প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন, সেইজন্য গিরণার-লিপির লুপ্ত অংশ কাল্‌সী ও শাহবাজগঢ়ীর লিপি উদ্ধার করিয়া পুরাইয়া দেওয়াও সম্ভব নহে। ৫ম শিলানুশাসনে নষ্ট অংশগুলি ছোট ছিল বলিয়া তাহা কাল্‌সী ও ধউলি হইতে উদ্ধার করিয়া পুরাইয়া

দেওয়া সহজ হইয়াছিল, কিন্তু এই ১৩শ শিলানুশাসনটি এ ক দীর্ঘ, তাহাতে আবার ইহার পড়া যায় এমন অংশের চেয়ে বিনষ্ট অংশ অনেক বেশী। অতএব এখানে আমরা গিরণার কাল্‌সী ও শাহবাজগঢ়ীর পাঠ মিলাইয়া যে অর্থবোধ হয় তাহারই উল্লেখ করিব এবং প্রয়োজন হইলে টিপ্পনীতে বিভিন্ন স্থানের লিপির পাঠও আলোচনা করিব। এই লিপিটি অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে।

অনুবাদ

(ক) অষ্টবর্ষাভিষিক্ত (অর্থাৎ তাঁহার অভিষেকের আট বৎসর পরে) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর দ্বারা কলিঙ্গ দেশ জয় করা হইয়াছিল।

(খ) যাহাদের সেখান হইতে অপবহন (deport) করা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা দেড়শত-সহস্র (দেড় লক্ষ); যাহারা সেখানে নিহত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা শত-সহস্র (১ লক্ষ) এবং যাহারা সেখানে মারা গিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা বহুশত-সহস্র।

(গ) তারপর যখন কলিঙ্গদেশ বিজিত হইল তখন দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শীর) ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মকামনা ও ধর্ম্মশিক্ষাদান তীব্র হইল।

(ঘ) কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শীর) অনুশোচনা হইল।

(ঙ) দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শীর) ইহা অত্যন্ত বেদনাকর ও গুরুতর মনে করেন যে অবিজিত দেশ জয় করিবার সময় (বহু) লোকের বধ, মৃত্যু ও অপবহন হয়।

(চ) এবং দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শী) ইহাকে আরও গুরুতর মনে করেন যে—

(ছ) সেখানে (বিজিত দেশে) যে ব্রাহ্মণগণ বা শ্রমণগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকগণ বা গৃহস্থগণ বাস করে, যাহাদের মধ্যে এইগুলি পালন করা হয়—(যথা) অগ্রভৃতিদের (যাহারা উচ্চ বেতন লাভ করে) আজ্ঞা-

পালন, মাতাপিতার আজ্ঞাপালন, বয়োবৃদ্ধদের আজ্ঞাপালন, মিত্র-পরিচিত ব্যক্তি-সঙ্গী-জ্ঞাতি-ভৃত্য-দাস প্রভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এবং দৃঢ় ভক্তি—তাহাদের ক্ষতি, বধ বা প্রিয়জনের অপবহন হয়।

(জ) মিত্র-পরিচিত ব্যক্তি-সঙ্গী-জ্ঞাতিদের প্রতি যাহাদের স্নেহ অব্যাহত তাহারা যদি এইভাবে দুর্ভাগ্য ভোগ করে, তবে তাহারা নিজেরা সুবিহিত (well provided for) হইলেও এই দুর্ভাগ্য তাহাদেরও পক্ষে ক্ষতিজনক হয়।

(ঝ) ইহা সকলকেই ভোগ করিতে হয় এবং দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রিয়দর্শী) ইহা গুরুতর মনে করেন।

(ঞ) যোন (যবন) দের মধ্যে ছাড়া এমন দেশ নাই সেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই (দুই) শ্রেণীর লোক বাস না করে এবং কোন দেশে এমন স্থান নাই যেখানে লোক কোন না কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত নয়।

(ট) অতএব কলিঙ্গদেশ জয় করিবার সময় যত লোক নিহত হইয়াছিল, মারা পড়িয়াছিল বা অপবাহিত হইয়াছিল তাহার শতাংশ বা সহস্রাংশ-ও দেবতাদের প্রিয় (রাজা প্রি·) এখন গুরুতর মনে করিবেন।

(ঠ) এবং দেবতাদের প্রিয় মনে করেন যে যে ক্ষতি করে তাহাকেও যদি ক্ষমা করিতে পারা যায় তবে ক্ষমা করা উচিত।

(ড) এবং দেবতাদের প্রিয়ের রাজ্যে যে সব বন আছে তাহাতে যাহারা বাস করে, এমন কি তাহাদেরও দেবতাদের প্রিয় শান্ত করেন ও ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

(ঢ) এবং তাঁহার অনুশোচনা সত্ত্বেও তাহাদিগকে শাস্তিদানের যে ক্ষমতা দেবতাদের প্রিয়ের আছে তাহা তাহাদিগকে বলা হয়, যাহাতে তাহারা তাহাদের পাপকার্য্যের জন্য লজ্জিত হইতে পারে এবং নিহত না হয়।

(ণ) কারণ দেবতাদের প্রিয় সর্ব্বভূতের (প্রতি) অক্ষতি, সংযম, সমচর্য্যা (অপক্ষপাতিত্ব) এবং মৃদুতা ইচ্ছা করেন।

(ত) এবং দেবতাদের প্রিয় এই বিজয়কেই শ্রেষ্ঠ বিজয় মনে করেন, যথা—ধর্ম্মবিজয়।

(থ) এবং ইহা (ধর্ম্মবিজয়) পুনঃপুনঃ দেবতাদের প্রিয় এখানে (তাঁহার

রাজত্বে) এবং তাঁহার প্রতিবাসীদের সকলের মধ্যে, উভয় স্থানেই লাভ করিয়াছেন—এমন কি ছয় শত যোজন দূর পর্য্যন্ত যেখানে যোনরাজ অন্তিয়োগ (রাজত্ব করেন) এবং এই অন্তিয়োগের পর যেখানে চার জন রাজা (রাজত্ব করেন), যথা তুরমময় নামক (রাজা), অন্তেকিন নামক (রাজা), মকা নামক (রাজা) এবং অলিকাসুদল নামক (রাজা); এবং সেইরূপ দক্ষিণেও (যেখানে) চোড় ও পাণ্ড্য (রাজা) গণ (রাজত্ব করেন), এমন কি তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত।

(দ) সেইরূপ এই রাজ্যের মধ্যে, যোন ও কম্বোজদের মধ্যে, নভক ও নভপংক্তিদের মধ্যে, ভোজ ও পিতিনিক্যদের মধ্যে, অন্ধ্র ও পারিন্দদের মধ্যে, সর্ব্বত্র লোকে দেবতাদের প্রিয়ের ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতেছে।

(ধ) এমন কি যাহাদের কাছে দেবতাদের প্রিয়ের দূতরা যায় নাই, তাহারাও দেবতাদের প্রিয়ের ধর্ম্মবাক্য, ধর্ম্মবিধান ও ধর্ম্মানুশাস্তির কথা শুনিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছে ও করিবে।

(ন) ইহার দ্বারা সর্ব্বত্র যে বিজয় লাভ করা হইয়াছে তাহাতে প্রীতিরস (সন্তোষ) জন্মে।

(প) এই প্রীতি দৃঢ় হয়, ধর্ম্মবিজয়ের দ্বারা যে প্রীতি।

(ফ) কিন্তু এই প্রীতির দাম অল্পই।

(ব) দেবতাদের প্রিয় মনে করেন যে পরলোকের ফলই মূল্যবান।

(ভ) এই উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইল, যেন আমার যে পুত্রগণ ও পৌত্রগণ জন্মিবে তাহারা যেন নূতন বিজয়ের কথা মনে না করে, যদি বিজয় তাহাদের ভাল লাগে তবে তাহারা যেন দয়া ও লঘু দণ্ডদানে আনন্দ লাভ করে, এবং তাহারা যেন ধর্ম্মবিজয়কেই একমাত্র সত্য বিজয় বলিয়া মনে করে।

(ম) এই বিজয় (ধর্ম্ম বিজয়) ইহলোকে ও পরলোকে ফলপ্রসব করে।

(য) এবং উদ্যমে (চেষ্টা, exertion) রতিই যেন তাহাদের সর্ব্ব রতি (আনন্দ) হয়।

(র) কারণ ইহা ইহলোকে এবং পরলোকে ফলপ্রসব করে।

টিপ্পনী

(ঙ) ইহাতে বুঝা যায় বনবাসী বর্ব্বর জাতিদের মধ্যেও অশোক তাঁহার প্রচার কার্য্য চালাইতেন।

(ঘ) এই বাক্যটিতে অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক সংবাদ আছে। অশোক তাঁহার সমসাময়িক যে বিদেশী রাজাদের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের রাজত্বকাল সেই বিদেশী দেশগুলির ইতিহাস হইতে জানা যায়, কাজেই অশোকের রাজত্বকালও সেই সময়েই ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। এই লিপিতে বিদেশী রাজাদের নামগুলি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য, কারণ নামগুলিকে অনেকটা ভারতীয় আকার দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, গ্রীকরাও ভারতীয় লোক, দেশ, নদী প্রভৃতির নাম গ্রীক আকারে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যেমন Palimbothra (পাটলিপুত্র), Sandrokottos (চন্দ্রগুপ্ত), Hydraotes (ইরাবতী নদী) ইত্যাদি।

যোনরাজ অন্তিয়োগ—২য় শিলানুশাসন, ক, টিপ্পনী দ্রষ্টব্য, ইনি সীরিয়ার রাজা Antiochus II Theos (খৃঃ পূঃ ২৬১—২৪৬)।

'চারজন রাজা'—২য় শিলানু', ক বাক্যেও অশোক Antiochus II এর প্রতিবেশী রাজাদের কথা বলিয়াছিলেন। ইহারা হইতেছেন—

(১) তুলময়—Ptolemy II Philadelphos of Egypt (খৃঃ পূঃ ২৮৫—২৪৭);

(২) অন্তেকিন—Antigonus Gonatas of Macedonia (খৃঃ পূঃ ২৭৬—২৩৯);

(৩) মকা—Magas of Cyrene (North Africa) (খৃঃ পূঃ ৩০০—২৫০);

(৪) অলিক্যসুদল—Alexander of Epirus (খৃঃ পূঃ ২৭২—২৫৫) অথবা বেশী সম্ভবত Alexander of Corinth (খৃঃ পূঃ ২৫২—২৪৪)।

চোড়, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী—২য় শিলানুশাসন, ক, টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(গ) যোন ও কম্বোজ—৫ম শিলানু', ঞ, টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

নভক ও নভপংক্তি—ইহাতে কাহাদের বুঝাইতেছে ঠিক বুঝা যায় নাই;

পিতিনিক্য—৫ম শিলানু', ঞ বাক্যের 'পেতেনিক', টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পারিন্দ—Buhler ইহাতে পুলিন্দ জাতিকে বুঝাইতেছে মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরণারের পাঠ আছে পারিন্দ এবং শাহবাজগঢ়ীতে আছে পলিদ ইহাতে পুলিন্দ বুঝান অসম্ভব। 'সর্ব্বত্র লোকে দেবতাদের প্রিয়ের ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতেছে'—ইহা নিশ্চয়ই অশোক নিজের চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার দূতরা, কর্ম্মচারিরা ও স্তাবকরা তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য নিশ্চয় এরূপ কথা তাঁহাকে বলিত। প্রতিবেশী রাজারাও বোধ হয় সৌজন্য করিয়া অশোককে বলিয়া পাঠাইতেন যে তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা হইতেছে। অশোক যে এসব কথা সহজেই বিশ্বাস করিতেন তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ নিজের মনোমত কাজ অন্যেও করিতেছে ইহা শুনিলে লোকে সাগ্রহে বিশ্বাস করে।

(ঘ) এই বাক্যটি যে অশোক তাঁহার মতলবী স্তাবকদের মিথ্যা কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছিলেন ইহা মনে করা বোধহয় ভুল হইবে না।

(ন) ও (প) বাক্যে অশোক যে আত্মপ্রসাদের কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গর্ব্ববিহীন সরলতা প্রকাশ পায়।

(ফ) ও পরবর্ত্তী বাক্যগুলিতে দেখা যায় অশোক আত্মপ্রসাদকেই চরম ফল মনে করিতেন না। তিনি তাহারও উপরে উঠিয়াছেন। সুকর্ম্মকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার আন্তরিকতা এবং অহংহীনতার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অনুশাসনটিতেও আমরা অশোকের সাধু মনের গভীর উৎসটিকে দেখিতে পাই।

চতুর্দ্দশ শিলানুশাসন

গিরণার

(ক) অয়ং ধংম-লিপী দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা, অস্তি এব সংখিতেন, অস্তি মঝমেন, অস্তি বিস্ততেন।

(খ) ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং।

(গ) মহালকে হি বিজিতং, বহু চ লিখিতং, লিখাপয়িসং চেব।

(ঘ) অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধুরতায়, কিংতি জনো তথা পটিপজেথ।

(ঙ) তত্র একদা অসমাতং লিখিতং, অস দেসং ব সহায়, কারণং ব অলোচেংপা, লিপিকরাপরাধেন ব।

অনুবাদ

(ক) এই ধর্ম্মলিপিগুলি দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর দ্বারা কখনও সংক্ষিপ্তভাবে, কখনও মধ্যমভাবে (অর্থাৎ না বড় না ছোট, মাঝামাঝি আকারে), কখনও বিস্তৃতভাবে লেখান হইয়াছে।

(খ) সব (লিপিগুলি) কিন্তু সর্ব্বত্র উপযোগী নয়।

(গ) কারণ (আমার) রাজ্য বিশাল, লেখাও হইয়াছে অনেক এবং লিখাইবও (আরও অনেক)।

(ঘ) সেই সেই বিষয়ের মধুরতার জন্য এবং যাহাতে লোকে তদনুসারে আচরণ করিতে পারে সেজন্য তাহার (লিপিগুলির মধ্যে অনেক কথা) পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে।

(ঙ) তাহার মধ্যে (লিপিগুলির মধ্যে) কোন কোনটি অসম্পূর্ণভাবে লিখিত হইয়াছে—হয় দেশ-হেতু, না হয় এইজন্য যে আমার কারণ (উদ্দেশ্য) (লোকের) ভাল লাগে নাই, না হয় লিপিকারের দোষ বশতঃ।

টিপ্পনী

এই লিপিটিতে মনে হয় অশোক তাঁহার কাজগুলির দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া তাহা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। বোধহয় কোনস্থানে

লিপিগুলিকে একত্র দেখিয়া ও তাহাদের ভুলত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিয়া অশোক সরলভাবে তাহার কারণের কথা এই লিপিতে জানাইয়াছেন। এখানে অশোক শুধু শিলানুশাসনগুলির (Rock Edicts) কথাই বলিতেছেন না, স্তম্ভ, গুহা, প্রভৃতির বিভিন্ন লিপিগুলিরও কথা বলিতেছেন।

(ক) অস্তি—কখনও।

(খ) ঘটিতং—উপযোগী।

(গ) মহালক—প্রাকৃত মহালয়=বড়, বিশাল।

(ঘ) এত কং=সং অত্র কিঞ্চিৎ

(ঙ) একদা—কোন কোন ক্ষেত্রে।

সহায়=সং সংখ্যায়=কারণে, হেতুবশতঃ।

'দেশ-হেতু'—উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ধউলি ও জউগড়ে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত শিলানুশাসনগুলি লেখান হয় নাই এবং তাহার বদলে তত্তৎ স্থানোপযোগী দুইটি 'স্বতন্ত্র অনুশাসন' সেখানে লেখান হইয়াছিল।

আলোচেংপা < অ+রুচ্ ধাতু=না রুচায়, ভাল না লাগায়। তাঁহার অনেক উদ্দেশ্য যে অনেকের ভাল লাগিত না তাহা এখানে এরূপ সরলভাবে স্বীকার করিয়া অশোক নিজের অকপটতা ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিকতাও ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

'লিপিকারের দোষবশতঃ'—যদিও আমরা এই আলোচনায় নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে লিপিতাত্ত্বিক (epigraphical) বিষয়ের বিচার করি নাই, তথাপি বলা প্রয়োজন যে লিপিকারেরা অনেক রকমের ভুলই করিয়া গিয়াছে। তাহারা তত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল না যে যাহা খোদাই করিত সব সময়ে তাহার অর্থ বুঝিত। তাহাড়া আরও একটি কারণে অনেক স্থানে ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই, যে অশোক তাঁহার লিপিগুলি নিজ মাতৃভাষায় রচনা করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতেন, সেখানকার রাজদপ্তরে তাহা আবার তত্তৎ-স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইত, এবং পরে এই অনুবাদ দেখিয়া লিপিকার খোদাই

করিত। কিন্তু রাজদপ্তরের অনুবাদকরা যখন অনুবাদ করিতেন তখন তাঁহারাও দেশের দূরত্ব হেতু ও ভাষার পার্থক্য বশতঃ এবং অপরের চিন্তা সম্পূর্ণ না বুঝায়, কিছু কিছু ভুল করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার

সম্রাট অশোকের চৌদ্দটি শিলানুশাসনের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম। শিলানুশাসনগুলি অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ লিপি-সমুদয়ের একাংশ মাত্র, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাই দীর্ঘতম অংশ। যে সম্রাট ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহার চরিত্রের, চিন্তার, মনোভাবের ও উদ্দেশ্যের প্রতিকৃতি তাঁহার স্বরচিত এই লিপিগুলিতে—এই প্রস্তরদর্পণে—স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অশোকের লিপিগুলিতে পণ্ডিতরা নানা প্রকার গবেষণার মশলা পাইয়াছেন যথা ভাষাতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক বৈয়াকরণিক, সমাজ-তাত্ত্বিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি। কিন্তু এসবেরই উপরে ইহাতে দেখা যায় একজনের চরিত্র-ছবি, যিনি বহু-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি হইয়াও অন্তরে ছিলেন সন্ন্যাসী এবং যিনি সমগ্র ও প্রতাপশালী রাজশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন প্রজাদের যথার্থ সুখ ও হিতের জন্য, সমাজ ধর্মবৃদ্ধির জন্য।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সমাপ্ত

বসন্ত-অভিযান

গল্প-উপন্যাসের নায়ক হবার যোগ্যতা রামলোচনবাবুর নেই। বয়স তাঁর পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মাথার সম্মুখের দিকে বিস্তীর্ণ টাক চকচক করছে। পিছনের চুলের বারো আনাও পেকে গেছে। গায়ের চামড়া এখনও লোল হয়নি সত্য, কিন্তু কথা বলবার সময় তাঁর কাঁচা-পাকা ঝাঁটার মতো গোঁফের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, সম্মুখে গুটিকয়েক দাঁত পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক একটি সাহেব কোম্পানীতে মোটা মাইনের বড়বাবুগিরি করেন। সকালে উঠে একখানি গামছা প'রে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিনি তাঁর স্থূলদেহে এবং স্থূলতর উদর প্রদেশে তৈলমর্দন করেন। নটায় স্নান, দশটায় আফিস্। সেখানে সাত-আট ঘণ্টাকাল রোগা-রোগা কেরাণী, মোটা-মোটা খাতা এবং ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা সাহেবের সঙ্গে মানসিক ও বাচনিক পাঞ্জা কষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার কোচানো চাদরখানি গলা-বন্ধ কোটের উপর ফেলে ট্রামে চড়ে বাড়ী আসেন। তারপরে আফিসের পোষাক ছেড়ে ছেলেমেয়েদের একখানা ছোট ধুতি কিম্বা শাড়ী প'রে একা একটি গড়গড়া নিয়ে বসেন। দিনের মধ্যে মাত্র এই সময়টাতেই তিনি শান্ত এবং সমাহিত থাকার অবসর পান।

এই পোড়া সংসারে তাও কি ছাই শান্তি মেলে!

রামলোচনবাবুর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ছেলেটি বছর খানিক হ'ল এম-এ পাশ ক'রে চাকুরীর চেষ্টায় দিবারাত্রি দিগ্বিদিকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, কখন ফিরছে, কখন খাচ্ছে তার কিছুই স্থিরতা নেই। এই ছেলেটির জন্যে রামলোচনবাবুরও চিন্তার শেষ নেই। বাস্তবিক, ছোকরা করবেই বা কি, চাকরীই বা কোথায় পাবে এ বাজারে? এদিকে তাঁর নিজেরও চাকরীর মেয়াদ আর বেশী নয়। বছর কয়েক পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে।

কিছু টাকা ভদ্রলোক জমিয়েছেন সত্য। কিন্তু পাড়ার লোকে যত বলে তত নয়। আর তত হ'লেই বা কি! বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডার উড়ে যায়।

পৈতৃক সূত্রে বাগবাজারের এই পুরোণো বাড়ীখানি তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু চাকরীটা পেয়েছিলেন বলেই তো বাড়ীখানা আজও আছে, এবং আরও দু'খানা বেড়েছে! নইলে ও বাড়ী কোন্ দিন নস্যের মতো উড়ে যেত। ছেলে-মেয়ের হাত ধরে তাঁকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ত। বাইরে থেকে কিছু না এলে কি ভদ্রলোকের চলে?

বাদলের জন্যে সেই কারণে তাঁর নিজেরও দুশ্চিন্তা অনেক। আগের দিন হ'লে তাঁর নিজের আপিসেও যে-কোনো একটা চেয়ারে ওকে বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন আর নেই। একে তো ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাই ভালো নয়। তার উপর লাগল যুদ্ধ। কবে যে এই যুদ্ধ শেষ হবে, কবে যে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে আসবে কে জানে। ততদিনে হয়তো তাঁর চাকরীই শেষ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের চাকরীর সম্ভাবনাও চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তা ছাড়া জীবন-মরণের কথাই বা কে বলতে পারে?

এই অবস্থায় একদিন তাঁর জামাই মেয়েটিকে এনে রেখে দিয়ে গেল।

যারা রামলোচনবাবুকে কৃপণ বলে, তারা মিথ্যা বলে। আসলে তিনি বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করা পছন্দ করেন না। নইলে অত টাকা ব্যয় ক'রে ওই ঘরে বিবাহ দেওয়া কৃপণ লোকের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হত না। সুনয়না বড় ঘরে পড়েছে। গায়ে তার ঝলমল করেছে অলঙ্কারের রাশি, চোখে ঝলমল করছে সব কিছু সম্বন্ধে কৌতুক ও কৌতূহলের হাসি। লাল টুকটুকে অধর সকল সময়ে স্ফুরিত হয়েই আছে।

সুনয়না সুখেই আছে। কিন্তু সম্প্রতি তার সন্তান হবে। এটি প্রথম নয়। গত বৎসর প্রথম সন্তানটি মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সেই ব্যাপারে রামলোচনবাবুকে যে অশান্তি, উদ্বেগ ও অর্থব্যয় করতে হয়েছিল, তার ধাক্কা সামলাতে অনেকদিন লেগেছিল। আবার একটা বৎসর যেতে না যেতেই সেই সম্ভাবনার সম্মুখীন হতেই রামলোচনবাবু ভিতর ভিতরে দমে গেলেন। তবু মুখে হাসি টেনে একমাত্র দুহিতাকে সাদরে আহবান করতে হ'ল। তা ছাড়া উপায়ই বা কি! মেয়েমানুষ এমন অবস্থায় মায়ের কাছে না গিয়ে পারে? এমন জোর আর কোথায় খাটে!

এই হল রামলোচনবাবুর সত্যকার অবস্থা। এ অবস্থা নিশ্চয়ই গল্পের

নায়ক হবার উপযোগী নয়। কোনো দুঃসাহসী গল্প-লেখকই তাঁকে তাঁর গল্পের নায়ক করতে সম্মত হতে পারেন না।

অথচ দৈবের বিপাকে এই রামলোচনবাবুই একদিন প্রেমের গল্পের নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন! সংসারে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। কিন্তু এর চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি হ'তে পারে!

রামলোচন তেল মাখেন, আফিসে যান আর ফিরে এসে নিদ্রাকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত মুদিত নেত্রে তামাক টানেন।

ইতিমধ্যে সুনয়না একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলে। ডাক্তার এল, ধাত্রী এল, নার্স এল। অনেক আশা ও আশঙ্কা, উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা, মেঘ ও রৌদ্রের মতো এল-গেল। সন্তান ও প্রসূতিকে নিয়ে দীর্ঘকাল টানাটানি চলল। রামলোচনের সঞ্চিত অর্থ অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। তবে সুনয়না ও শিশুর দেহে প্রাণ এবং রামলোচনের গৃহিণীর ঠোঁটে হাসি এল।

রামলোচন নিজে হাসলেনও না, কাঁদলেনও না। তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হল কিছুই বোঝা গেল না। সাড়া-শব্দ বরাবরই তাঁর কম। তিনি নির্বিষ্টচিত্তে শুধু ধূমপান করতে লাগলেন।

এমনি ক'রে আরও দুটো মাস গেল। সুনয়না তার রক্তহীন, দুর্ব্বল দেহ নিয়ে একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে লাগল। জামাই এসে বললে, এইবার সে সুনয়না ও শিশুকে নিয়ে যেতে চায়।

কথা শুনে গৃহিণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন: ওমা তাই কি হয়! আর ক'টা দিন যাক। সুনয়নার শরীর একটু সারুক, খোকা আর একটু ডাঁটো হোক, তবে তো!

আসল কথা, এখন তিনি সুনয়নাকে, বিশেষ ক'রে খোকনকে ছাড়তে রাজি নন।

বাদল আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হয় না। চাকরী না ক'রে সে বিয়ে করবে না। বাড়ীতে সংসার করতে ওই তিনটি প্রাণী। একজন দশটার মধ্যে আফিস চলে যাবে। একজন দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় টো টো ক'রে

ঘোরে। আর এই এত বড় বাড়ীতে গৃহিণী একলা সমস্ত দিন ভোর হয় আচার দেন, নয়তো ঘুমোন। দিন যেন তাঁর আর কাটতে চায় না।

সুনয়নার বয়স আঠারো বৎসর। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁদের বাড়ীতে আর শিশুর আবির্ভাব হয়নি এতকাল পরে ফুলের মতো ফুট ফুটে একটি শিশুর আবির্ভাব যদি হল, এত সহজে তাকে তার নিজের বাড়ীতে পাঠাতেও গৃহিণীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

জামাই অমন বলে! জামাই বললেই হল!

গৃহিণী কর্তার কাছে গিয়ে হাঁক দিলেন, শুনচ?

কর্তা চমকে উঠলেন। চোখ বন্ধ করে জামাক টানতে টানতে তিনি ভাবছিলেন, এ অবস্থায় আফিং ধরলে কেমন হয়!

গৃহিণীর ডাকে তাঁর বুকের ভিতরটা টিপ টিপ ক'রে উঠল: আবার কি হল?

—জামায়ের কথা শুনলে?

রামলোচন হাঁ করলেন।

—বলছেন, পরশুদিন সুনয়নাকে নিয়ে যেতে চান।

রামলোচন নিশ্চিন্তভাবে গড়গড়ার নল মুখে তুললেন।

গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: নিয়ে যাবে বললেই হল! মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখতে হবে না? এ ঘর থেকে ওঘর যেতে তার হাঁফ ধরছে। চোখের কোলে এক ফোঁটা রক্ত নেই। এরই মধ্যে কি কেউ শ্বশুরঘর করতে পারে? বেয়ান নিজেও তো মেয়ের মা। তাঁর আক্কেলটা একবার ভাব!

বোধ করি তাঁর আক্কেলটা নিবিষ্ট চিত্তে ভাববার জন্যেই রামলোচন আবার তাঁর গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিলেন।

গৃহিণী চাবির গোছা ঝনাৎ ক'রে পিঠে ফেলে দুম দুম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

অর্থাৎ সুনয়নার যাওয়া হল না। তৎপরিবর্তে জামাই নিজেই প্রত্যহ এসে রাত্রিযাপন ক'রে যেতে লাগলেন।

রামলোচন কিছুই বললেন না। তিনি তেল মাখেন আর আফিস যান, তামাক টানেন আর ঘুমোন।

ইত্যবসরে একটা কাণ্ড ঘটল:

বাদল সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে জানালে, সে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। স্বাস্থ্যপরীক্ষায় তাকে পছন্দ করা হয়েছে। শীঘ্রই সে এরোপ্লেন চালানো শেখবার জন্যে চলে যাবে।

শুনে রামলোচন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত দিন পরে গড়গড়ার নল তাঁর হস্তচ্যুত হ'ল। তাঁর মনে হ'ল একদল কীটাণু যেন তাঁর মাথা থেকে পায়ের ডগায় এবং সেখান থেকে আবার মাথায় ছুটোছুটি করছে।

কয়েক মুহূর্ত তিনি একটা কথাও বলতে পারলেন না।

তারপর বললেন, নাম লিখিয়ে চলে এলি?

গর্বিত হাস্যে বাদল বললে, কি করব? চাকরী নেই, তার আশাও নেই, শুধু শুধু আপনার অন্ন ধ্বংস কত দিন করব?

রামলোচন ভগ্ন কণ্ঠে বললেন, নাম লেখাবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলি না?

—কি হ'ত? আপনারা কি অনুমতি দিতেন?

রামলোচন আর একটা কথাও বললেন না। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

জামাই শুনে বললেন, চাকরী না পাওয়ার দুঃখে এই করলে? এতই যদি চাকরীর প্রয়োজন ছিল, আমাকে একবার বলতে পার নি।

বাদল হেসে বললে, আপনি দিতেন চাকরী?

—দিতাম না? আমার মামার আপিসে···

—ওঃ, মামার আপিসে!

বাদল আর সেখানে দাঁড়াল না।

সংবাদটা সব শেষে শুনলেন গৃহিণী। রান্না-বাড়া সেরে, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে যখন উপরে এলেন, দেখলেন রামলোচন নিঃশব্দে একভাবে বসে।

—তুমি শোওনি যে এখনও? রাত বারোটা বাজে।

কর্তা সাড়া দিলেন না। তারপরে গৃহিণীকে গমনোদ্যত দেখে ডাকলেন, শুনচ?

—কি?

—বাদলা নাম লিখিয়েছে।

—কোথায় ?

যুদ্ধ কথাটা উচ্চারণ করবার সময় রামলোচনের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

বললেন, ক'দিন পরেই ও চলে যাবে এরোপ্লেন চালানো শিখতে।

—বল কি গো ?

গৃহিণী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তখনই ছুটে গেলেন বাদলের ঘরে। সে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। তাকে উঠিয়ে তিনি হৈ হৈ আরম্ভ করলেন কিন্তু হৈ হৈ ক'রে কি হবে ? আর তো ঘোরাবার কোনো উপায় নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। বাদলকে যেতেই হবে।

বাড়ীতে গাঢ় শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল।

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। গৃহিণী নিঃশব্দে রাঁধেন, রামলোচন নিঃশব্দে খান। এমন কি তাঁর গড়গড়ার শব্দ পর্য্যন্ত স্তিমিত হয়ে এল। সুনয়নার ছেলেটি পর্য্যন্ত কাঁদে না। কাঁদলে তখনই সে তাকে বুকে চেপে ধরে শান্ত করে। বাদল পর্য্যন্ত যেন কি রকম হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম সে একটা কৃত্রিম উল্লাসে বাড়ীর নির্জ্জীবতা দূর করবার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেও হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর তারও সাড়া বড় একটা পাওয়া যায় না।

অবশেষে তার যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল।

চোখের জল মুছতে মুছতে মা তার জন্যে পাঁচ রকম রাঁধলেন। বাবা সেদিন আর আপিস গেলেন না। সুনয়না ছলছল চোখে শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে তার যুদ্ধের ইউনিফর্ম পরে বাদল এসে রামলোচনকে প্রণাম করলে, তখন চোখ ফেরাতে গিয়েও তিনি ফেরাতে পারলেন না। মা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় ললাটে পুনঃপুনঃ চুমু খেতে লাগলেন। আর বিস্ময়ে প্রশংসায় জড়ানো দৃষ্টিতে রামলোচন তার বলিষ্ঠ, উন্নত, ঋজু দেহের দিকে

নির্ব্বাক চেয়ে রইলেন। যুদ্ধের ইউনিফর্মে মানুষকে যে এত সুন্দর লাগতে পারে সে তাঁর ধারণাই ছিল না।

তারপর বাদল চলে গেল।

কেউ শাঁখ বাজালে না, কেউ ফুলের মালাও দিলে না। কম্পিত হাতে শুধু সুনয়না দাদার উন্নত ললাটে পরিয়ে দিলে একটা চন্দনের টিপ। জনক জননীর আশীর্ব্বাদ আর ছোট বোনের শুভকামনা, এই মাত্র সম্বল করে বাদল তার নতুন জীবনে দিলে ঝাঁপ।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। তার ঘরের সামনে রয়েছে তার নিত্য ব্যবহৃত জুতোগুলি। আলনায় ঝুলছে সিল্কের পাঞ্জাবী, কোঁচানো দেশী ধুতি, জরি-পাড় চাদর। বাদল সৌখীন ছিল। যাওয়ার আগেও তার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে গেছে। একটি জিনিসও অগোছালো ছড়িয়ে নেই।

বিশ্বাস হয় না সে চলে গেছে। মনে হয়, এইখানে কাছেই কোথাও গেছে,—ক্লাবে কিম্বা চাকরীর খোঁজে। এখনই ফিরে এসে এক পেয়ালা চায়ের জন্যে বাড়ী মাথায় করবে।

পরের দিন সন্ধ্যার পর জামাই এসে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়ালেন। বিনয়-কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, কাল দিন ভালো আছে। তাই মা বলছিলেন, কালকে যদি...

অস্ফুট কণ্ঠে শাশুড়ী বললেন, বেশ।

পরের দিন সুনয়না চলে গেল। যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল, দাদার খবর পেলেই আমাকে জানাবে মা। আমার মন এইখানেই পড়ে রইল।

মা তাকে চোখের জলে অভিষিক্ত ক'রে বিদায় দিলেন।

হাঁস, বাড়ী একেবারে খালি।

বাদল নেই, সুনয়না নেই। তবে সুনয়না আবার হয়তো আসবে। কিন্তু কোথায় বাদল ? আর কি সে আসবে ? কে বলতে পারে ? কে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে ?

আপিসের সাহেব রামলোচনের পিঠ চাপড়ে বলেছে, You ought to be proud of your son, Ramlochan Babu.

Proud ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বাদলের দীর্ঘায়ত সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, তার শান্ত অথচ অগ্নিগর্ভ চোখ, তার প্রশস্ত বীরত্বব্যঞ্জক ললাট, এবং তার যুদ্ধের ইউনিফর্ম, নিশ্চয়ই গর্ব্ব করবার মতো। ক'জনের ছেলে অমন সুন্দর, শ্রীমান। ক'জনের অমন সাহস, অমন তেজ !

সত্যই বাদলের জন্য তিনি গর্ব্বিত।

কিন্তু তারপরে ? এই তো শপরাহ্ণ গড়িয়ে আসে। আর একটু পরেই তিনি বাড়ী ফিরবেন। কি দেখবেন গিয়ে ?

রামলোচন অজ্ঞাতসারে চোখ বন্ধ করলেন। সব অন্ধকার ! বাড়ী অন্ধকার, ঘর অন্ধকার, বর্ত্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ···

হ্যাঁ, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। বাদল হয়তো আর ফিরবেই না, ফিরবেই না। দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে সেই নিরবলম্বন, শ্বাসরোধী অন্ধকারে দুটো বুড়ো-বুড়ীকে একাই জীবন কাটাতে হবে। সঙ্গী নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, আনন্দও নেই।

বাদল শুধু চলেই যায়নি, যাবার সময় তাদের পঞ্চাশ বছরের জীবনের বিস্তীর্ণ দৃশ্যপট যেন কালি দিয়ে লেপে একাকার ক'রে দিয়ে গেছে। তার আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই।

রামলোচন ভাবতে চেষ্টা করলেন, ত্রিশ বৎসর আগে বাদলের গর্ভধারিণীকে প্রথম যেদিন ঘরে নিয়ে এসেছিলেন, সেই বিস্মৃত অতীত দিনের কথা। কিছু মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির দিনে তিনি কি লজ্জিত বধূর দিকে চেয়ে হেসেছিলেন ? ফুলশয্যায় কিছু কি বলেছিলেন ?

কিছু মনে পড়ে না।

ভাবতে চেষ্টা করলেন, ওঁর পৈতৃক কটোমটো নামটা বদলে কি যেন একটা ছোট্ট মিষ্টি নাম তিনি দিয়েছিলেন। অনেক দিন ধরেই সেই নামে গোপনে তিনি ডাকতেন। বাদলের জন্মের পরেও অনেক দিন ধরে।

রেখাতে তাঁর ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তবু কিছুতে সে নাম মনে পড়ল না।

সুরমা ? ললিতা ? রাণী ? মণি ?

উঁহু। সে অন্য একটা কি যেন। এ কালের নাম নয়, সেকালের নামও নয়। দুই কালের মাঝামাঝি কি যেন একটা নাম। বোধকরি সেই মাঝামাঝি কালের মধ্যেই তা নিঃশেষে তলিয়ে গেছে। আর কোনোদিন উঠবে না, কোনোদিন পাওয়া যাবে না। মাথা খুঁড়লেও না।

যেমন ক'রে একালের মাঝামাঝি এসে বাদল হারিয়ে গেল, তেমনি ক'রেই কি সব জিনিষ হারিয়ে যায় ? তারপরে আর পাওয়া যায় না ? আর কিছুতেই পাওয়া যায় না ?

কে জানে !

রামলোচন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আপন মনেই প্রশস্ত টাকে একবার হাত বুলোলেন। তারপরে উঠে দাঁড়ালেন। আপিসের ছুটি হয়ে গেছে। সবাই যে যার নিজের নিজের বাড়ী চলে গেছে।

ছাতা হাতে ক'রে রামলোচন রাস্তায় নেমে এলেন।

চারিদিকে চলেছে উন্মত্ত জনস্রোত। রামলোচন অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

···কিন্তু কিছুতেই কি ফিরে পাওয়া যায় না ? কিছুতেই না ? কি ক'রে মানুষ বাঁচে তবে ? শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে !

বাদলের গর্ভধারিণীকে সেকাল ও একালের মাঝামাঝি কালের দেওয়া সেই নামটি তিনি মনে করার আর একবার চেষ্টা করলেন।

ট্যাক্সি ক'রে রামলোচন যখন বাড়ী ফিরলেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

আলুথালু বেশবাস। রক্তবর্ণ মুখ চোখ। কথা জড়িয়ে আসছে।

এক হাতে তাঁর সুন্দর একটি ফুলের তোড়া, অন্য হাতে প্রসাধনের সুদৃশ্য একটি কাস্কেট।

সেই দুটো বাদলের গর্ভধারিণীর দিকে এগিয়ে ধরে, ভগ্নদন্ত মুখে হাসি টেনে স্খলিত কণ্ঠে কি যেন একটা মিষ্টি নামে তাকে যেন তিনি ডাকলেন।

মুখে তাঁর মদের উগ্র গন্ধ।

বাদলের গর্ভধারিণী কিন্তু নাসিকা কুঞ্চিত করলেন না। পরম স্নেহে তাঁকে খাটের উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। তখনও তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। কি যেন একটা নাম জপমন্ত্রের মত বারে বারে ব'লে যাচ্ছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না?

অনেক কালের সেই বিস্মৃত নাম আবার কি তিনি ফিরে পেয়েছেন? না, এ আর কোনো নতুন নামে নতুন ক'রে ডাকতে চেষ্টা করছেন?

গৃহিণী ওঁর কোটের গলার বোতামটা খুলে দিলেন।

একটু পরেই রামলোচন নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যেতে লাগলেন।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

পুস্তক-পরিচয়

কাব্য বিচার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। মিত্র এণ্ড ঘোষ। মূল্য—আড়াই টাকা।

সভ্য মানুষের বুদ্ধি কি প্রাচীন কাল থেকে একাল পর্যন্ত ক্রমে বেড়ে চলেছে? প্রাণ-বিজ্ঞানী Weismann অনেকদিন পূর্বে এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত এর আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে এরকম বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, এবং জৈব ইভলিউশনের মূল তত্ত্বগুলি এরকম বৃদ্ধির কোনও ইঙ্গিত করে না। প্রাচীন গ্রীকের চেয়ে নবীন ফরাসির বুদ্ধিমত্তা বেশী এ কথা বলা চলে না। আর ইভলিউশন নির্ভর করে যে সব বৈশিষ্ট্যের উপর আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষায় প্রকৃষ্টতর উপযোগী জীব-বিশেষের শরীর ও মনে তাদের আবির্ভাব, এবং সংহতি-পরম্পরা সংক্রমিত হয়ে তাদের সঞ্চয়ের উপর। সভ্যতার যা সব উপাদান তা সৃষ্টি ও আবিষ্কার করেছে অসাধারণ মানুষদের মন ও বুদ্ধি। এই সৃষ্টি ও আবিষ্কারের কতকাংশ সভ্য মানুষের আত্ম ও বংশ রক্ষার শক্তিকে আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়েছে ও বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু সেই অসাধারণ মন ও বুদ্ধির যারা অধিকারী তাদের নিজের আত্ম ও বংশ রক্ষায় সেই অসাধারণত্ব সহায়তা করে নি, বরং অনেক সময় তা হয়েছে প্রতিকূল। লুই-পাস্তুরের যে বুদ্ধি রোগের জীবাণু-তত্ত্বের মূলে তা তাঁর নিজের বেঁচে থাকবার ও বংশ-বৃদ্ধির সাহায্য অন্য লোকের তুলনায় কতটা বেশী করেছিল? নিশ্চয় অনেক ফরাসী গুঁড়ীর ব্যবসায়-বুদ্ধি এ কাজে তাদের সহায়তা করেছিল অনেক বেশী। গ্যালিলিওর বুদ্ধি তাঁকে সাহায্য না ক'রে বিপদেই ফেলেছিল। গৌতম বুদ্ধের মনের বৈশিষ্ট্য তাঁকে যৌবনের আরম্ভেই করেছিল ঘরছাড়া; যীশু-খৃষ্টকে তুলেছিল ক্রুশে। কালের সঙ্গে সভ্য মানুষের বুদ্ধি বাড়ার প্রত্যক্ষ কি অনুমান-সাপেক্ষ কোনও প্রমাণ নেই।

Weismann-এর এই বিচার মনে পড়লো আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নূতন প্রকাশিত 'কাব্য-বিচার' নামে বইখানি পড়ে। প্রস্তাবনার আরম্ভে গ্রন্থকার লিখেছেন, 'ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্য্যন্ত কি

জগন্নাথ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ আলোচনা অন্য কোনও ভাষায় আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নেই। ইংরেজীতে বা ফরাসীতে সাহিত্য-বিচারের নানা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি অনেক বিষয়ে তাহা আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারের মত সূক্ষ্ম ও গভীর নহে এবং আমাদের দেশের সাহিত্য বিচারে যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে সেই সেই বিষয়ে য়ুরোপীয় কাব্যবিচার গ্রন্থে তদনুরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।' এই বই শেষ ক'রে অভিজ্ঞ পাঠকও যে সেই মতে মত দেবেন তাতে সন্দেহ অল্প। এবং তুলনায় বিচারের এই ফলে প্রকৃত বিস্ময়ের কিছু নেই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের তুলনায় আধুনিক কালে নানা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব প্রসারে, এবং তার আনুষঙ্গিক একালের জীবনযাত্রার যে কোনও পূর্ব্বকালের কল্পনারও অতীত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুকৌশলে হঠাৎ মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে একালের মানুষের বুদ্ধিই বেড়ে গেছে। সুতরাং এ কালের মানুষের চিন্তা ও সৃষ্টি প্রাচীন কালের চিন্তা ও সৃষ্টিকে সব জায়গায় ছাড়িয়ে যাবে। প্রাচীনের মধ্যে 'মডার্ণের' সাক্ষাৎ পেলে অনেকে যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হন তার মূল এইখানে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধি বাড়ার ফল নয়, একটা বিশেষ দিকে বুদ্ধির মুখ ঘোরানের ফল। প্রতি কালে মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বেশীর ভাগ প্রয়োগ হয় এমন সব বিষয় ও ক্ষেত্রে যা পরে প্রমাণ হয় অকিঞ্চিৎকর ও ঊষর। এই বুদ্ধির যেটুকুর সৌভাগ্য হয় সার্থক ও ফল-প্রসূ ক্ষেত্রে নিয়োগের সেইটুকুই সভ্যতার পুঁজি বাড়িয়ে চলে। বাকীটা ক্ষয় হয় আকাশে আতশ বাজি দেখিয়ে, যদিও তার ঔজ্জ্বল্য কিছু কম নয়। বিগত তিন শ বছর ইউরোপের নানাদেশের মনীষার একটা মোটামুটি বড় অংশ নিজেকে এমন পথে এমন বিষয়ে ব্যাপৃত করেছে যার সফলতা প্রমাণ হয়েছে আশ্চর্য্য রকমের। আর এই তিন শতাব্দী পশ্চিম-ইউরোপীয় সভ্যতার লোপ কি পশ্চাৎগতিতে বুদ্ধির এই চেষ্টা খণ্ডিত হয় নি; পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মনীষার ফল পরবর্ত্তী যুগের মনীষীরা সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পেরেছেন। এবং এই চেষ্টার নিত্য নূতন সফলতার আকর্ষণে এই কাজের ক্ষেত্রে প্রতিভাবানের কখনও অভাব হয় নি, বরং সংখ্যা বেড়ে গেছে।

এই যোগাযোগ যেখানে ঘটে—বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র যেখানে এমন যে বহু বুদ্ধির চেষ্টার ফল একত্র মিশতে পারে, এবং এই চেষ্টার ফলে প্রয়োগের ক্ষেত্রই বেড়ে যায় যাতে পরবর্ত্তী মনীষা এমন নূতন ক্ষেত্রে কাজ করে পূর্ব্বতন মনীষার কাছে যা উপস্থিত ছিল না—সেখানেই বর্ত্তমান ক্রমাগত অতীতকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বিষয়-বস্তু যখন এমন নয় যেখানে বুদ্ধির চেষ্টার ফল নৈর্ব্যক্তিক, যাতে এক চেষ্টার ফল অপর চেষ্টার ফলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, এবং যেখানে প্রাচীন কাল ও নবীন কাল এক বিষয়-বস্তুরই আলোচনা করে—সেখানে বর্ত্তমানের চেষ্টা অতীতের চেষ্টাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনও স্বাভাবিক কারণ নেই। কাব্য-বিচার সেই রকম বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র। যে কাব্য-বস্তু নিয়ে আলোচনা তার মূল রূপ অতীত ও বর্ত্তমানে এক। এবং এখানে প্রতি লোকের আলোচনায় তার মনের বিশেষ গড়ন ও ভঙ্গীর ছাপ পড়ে যাতে এক আলোচনা অন্য আলোচনার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং এখানে প্রাচীন ও নবীন আলোচনার মধ্যে কোনটি হবে শ্রেষ্ঠ তা নির্ভর করে যে বুদ্ধি সে আলোচনা করে তার শ্রেষ্ঠতার উপর। এবং নবীন কালের বুদ্ধি কেবল নবীনতার জোরে প্রাচীন কালের বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থপাঠে বাঙ্গালী পাঠক এ সত্যের একটা প্রমাণ পাবেন।

২

সংস্কৃত অলঙ্কার-সাহিত্য কত বিশাল গ্রন্থের 'শাস্ত্রধারা' নামে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার পরিচয় আছে। সেখানে ভরত থেকে জগন্নাথ পর্য্যন্ত যে বহু আলঙ্কারিকের নাম ও গ্রন্থের বিবরণ আছে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে কাব্য-বিচারের নানা প্রসঙ্গে তাঁদের প্রধানদের মতামত আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম—'দোষ, গুণ ও রীতি'। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের উপজীব্য এই পদার্থ-ত্রয়ের ও তাঁদের মতবিরোধের পরিষ্কার বিবরণ এতে আছে। এবং নবীন আলঙ্কারিকদের সমালোচনা যে এদের উপর নির্ভর ক'রে 'কাব্য-বিচার করা একান্ত বহিরঙ্গ সমাধান' তারও বিবরণ আছে। কাব্যের বিচার ও পরিচয়ে অন্তর্দৃষ্টির অভাবে শ্রেণীভাগ ক'রে কাজ সহজের চেষ্টার ভামহের

সমালোচনা আধুনিক কালের পাঠক আনন্দের সঙ্গে পড়বেন, কারণ এ চেষ্টা আজও অনেক দেখা যায়।

'গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্
গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়মমেধসাম্।'

গৌড়ীয়, বৈদর্ভী প্রভৃতি নানা নাম দিয়ে কাব্য-রীতির পৃথকত্ব কল্পনা গতানুগতিক মূর্খেরাই ক'রে থাকে।

এর পরের পরিচ্ছেদ 'বক্রোক্তিবাদ' প্রধানত 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের লেখক কুন্তকের আলোচনার পরিচয়। যদিও কাব্য শব্দের ধ্বনি ও অর্থের সমবায় তবুও সাধারণ লোক-ব্যবহারের মত ধ্বনি ও অর্থ সেখানে সোজাসুজি প্রয়োগ ও ব্যক্ত হয় না, তার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। এই সহজ প্রতীয়মান সত্যটি থেকে বক্রোক্তিবাদের উৎপত্তি। অর্থাৎ সব কাব্যে যখন এই ভঙ্গী থাকেই তখন এই ভঙ্গীই হচ্ছে কাব্যের কাব্যত্ব। এবং যখন এ মত প্রচার হয়েছিল যে কাব্য হচ্ছে অলঙ্কৃত বাক্য তখন বক্রোক্তিবাদীরা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে সকল রকম অলঙ্কার বক্রোক্তির প্রকার-ভেদ মাত্র; কুন্তকও সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুন্তক এই প্রাচীন মতকে এক আশ্চর্য্য পরিণতি দিয়েছেন। 'আমরা আধুনিককালে যাহাকে Aesthetic quality বলি সম্ভবতঃ কুন্তক বক্রতা শব্দে তাহারই সূচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।' অবশ্য কাব্যের কাব্যত্ব হচ্ছে তার aesthetic quality এ কথার একমাত্র সার্থকতা এই বলা যে কাব্যের কাব্যত্ব একটা বিশেষ গুণ, অন্য কোনও সামান্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে তাকে বোঝা যায় না। এ কথার মূল্য আছে। কিন্তু কুন্তকের আলোচনার বিশেষ মূল্য এই যে কাব্যের এই aesthetic qualityর কলা-কৌশলের গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা তিনি করেছেন। শব্দের ধ্বনি ও অর্থের যে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য, এবং তাদের যে সামঞ্জস্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে থাকে কুন্তক তার নানা-প্রকারভেদের আলোচনা করেছেন। কিন্তু এও দেখিয়েছেন যে 'কাব্যে বাক্যের মুখ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া, শব্দার্থ শক্তিকে তিরস্কৃত করিয়া তদতিরিক্ত বৃত্তির দ্বারায় ব্যঙ্গভূত একটি নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হয়।' 'এই চেতনা-চমৎকারী রস-সমুন্মীলন প্রস্তাবিত বাক্যার্থ হইতে ও তদীয় গুণালঙ্কারাদি হইতে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন।' আর এই যে কাব্য-সৃষ্টি কোনও mechanical চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। 'সুকবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তাঁহার চিত্তের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার ফলে বর্ণনায় বাস্তবিক জগতের পদার্থগুলি এমন একটি ভাবোজ্জ্বল বেশে আবৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার মধ্যে উদিত হয় এবং তাহা দ্বারা এমন একটি প্রেরণা উপস্থিত হয়, যাহার উত্তেজনায় কবি স্বপ্রতিভার সাহায্যে তাঁহার ভাবের রূপকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দ আহরণ করিতে পারেন'। সেইজন্য কাব্য এ রকম একটি unity বা অখণ্ড বস্তু যে তার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ ক'রে তার সত্যরূপ দেখান যায় না, কেবল ব্যুৎপত্তির সৌকর্য্যের জন্যই বিচ্ছিন্নরূপে তাদের আলোচনা করতে হয়। 'দৃশ্যতে চ সমুদায়ান্তঃপাতিনাম্ অসত্যভূতানামপি ব্যুৎপত্তি নিমিত্তম্ অপোদ্ধৃত্য বিবেচনম্'। কুন্তকের পরিচয় লেখক এই ব'লে শেষ করেছেন, যে 'সবদিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, কুন্তক যেরূপ সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বনিকার ও তাঁদের অনুবর্ত্তীদের লেখায় দেখা যায় না। * * * * নিবিষ্ট হইয়া অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাঁহার লেখার মধ্যে অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতির আভাস তাঁহার প্রাচীন পরিভাষার মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে'। গ্রন্থের শেষেও লেখক তাঁর এই মত আবার প্রকাশ করেছেন। আশা করি আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের বই এই প্রতিভাবান আলঙ্কারিক সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাব্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে।

গ্রন্থের শেষ দুই পরিচ্ছেদ 'রস ও কাব্য' এবং 'ধ্বনি' সংস্কৃত কাব্য-বিচার ধ্বনিকার, আনন্দ বর্দ্ধন, অভিনবগুপ্ত ও তাঁদের শিষ্যদের হাতে যে পরিণতি লাভ করেছিল তার বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ। আমার 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' নামে ছোট পুঁথিতে এর স্বল্প পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করেছিলাম। সেই amateurish আলোচনার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালী পাঠক এই দুই পরিচ্ছেদে expert-এর বিশদ আলোচনা পাবেন। অতঃপর বাঙ্গলা ভাষায় এ সম্বন্ধে যিনি কিছু লিখবেন এই দুই পরিচ্ছেদের তথ্য ও তত্ত্ব তাঁর অপরিহার্য্য হবে।

আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের এই বই বাঙ্গলার সুধী-সমাজ সাদরে

আমন্ত্রণ ক'রে নেবে। যে পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সমবায়ে এ বই সম্ভব হ'য়েছে তা দুর্লভ, আমাদের দেশে ও বিদেশে। ভরসা করি এই বই বাঙ্গলা দেশের কাব্য-বিচারে নূতনত্ব আনবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

Twilight in Delhi—Ahmad Ali. (Hogarth Press).

বিদেশী ভাষায় দেশী রচনার সার্থকতা আছে কিনা সে প্রশ্নটির উত্তর এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে। উত্তরটি যতটা দৃষ্টান্তমূলক, যুক্তিপ্রধান ততটা নয়। কিন্তু যে-জাত প্রায় দেড়শ বছর ধরে এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে বিদেশী ভাষা গ্রহণ করেছে সে-জাত কেন বিদেশী ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে না বুঝি না, এবং যদি না পারে তবে বুঝতে হবে বুদ্ধি বিদ্যায় গলদ আছে। পদ্যের কথা পৃথক, তবে গদ্যে উপযোগী ভাষা অর্জ্জিত সংস্কার সাপেক্ষ। তা ছাড়া, যদি মানাই যায় যে বিদেশী ভাষা আমাদের করায়ত্ত হয়নি ও হবে না তবে পাঠক-বৃন্দেরও অধিকার লোপ পায় তার উপযোগী ব্যবহার-বিচারে। এ-ক্ষেত্রে নীরব থাকাই ভাল, বিশেষতঃ যখন ই, এম, ফর্ষ্টারের মতন লেখক ও বনামী ডব্রের মতন সমালোচক আহমদ আলির ভাষার তারিফ করছেন।

আহমাদ আলি হচ্ছেন লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের প্রগতিশীল মুসলমান লেখক। মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন তরুণ যুবক-যুবতীর সাহচর্য্যে তিনি 'আঙ্গারে' অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার নামে উর্দ্দুতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে এমন কিছু মতামত ছিল না যেটি বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কাছে অতিশয় নতুন। অনেকটা কল্লোলের যে-কোন সংখ্যার মতন বল্লে অনেকে বুঝতে পারবেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ও সাহিত্যের বাধা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই সে-

বাধা ভাঙ্গতে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়। সহরে সহরে মৌলানা-বৃন্দ বইখানি পোড়াতে সুরু করলেন, মারপিট হবার যোগাড় হল, সরকার-বাহাদুর বইখানি বাজেয়াপ্ত করলেন। কিন্তু ঐ আগুনে উর্দ্দু সাহিত্যের নতুন রূপ খুলল। আজ উর্দ্দু সাহিত্যে নবজীবন এসেছে। আহমদ আলি ও তাঁর দলের কাছে অনেক নতুন লেখকই ঋণী। তিনি সেই থেকে অনবরত উর্দ্দু ও ইংরেজীতে লিখে যাচ্ছেন। New Writing-এর মারফৎ তাঁর গল্প ও নক্সার সঙ্গে অনেক ভারতবাসীই পরিচিত। কিন্তু নভেল লিখলেন তিনি এই প্রথম। নানা দোষ সত্ত্বেও বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে।

বিষয় হল দিল্লী সহরের একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙ্গনের ইতিহাস। কর্ত্তা মীর সাহেব বিশেষ কিছু করেন না, এক ঘুঁড়ি ও পায়রা ওড়ান ছাড়া। তাঁর পরিবারটি বৃহৎ, বড় ছেলে জীবিত নেই, তবে নাতি আছেন, যিনি গল্পের সরকারী নায়ক; মধ্যম পুত্র অন্যত্র চাকরী করেন। তা ছাড়া স্ত্রী; কন্যা, চাকর-বাকর, আত্মীয়-স্বজন আছে। আসফাক অর্থাৎ নাতি একটি আজকালকার সাধারণ ছেলে—প্রতিবেশ তার পছন্দ হয় না, অথচ ছেড়ে যাবারও শক্তি নেই, তাই অসন্তুষ্ট হয়েই জীবনযাত্রা নির্ভর করে। অবশ্য প্রেমেও পড়ে, নিতান্ত মামুলিভাবে। বিল্‌কীসকে ভাবে অপ্সরী, ও তার সঙ্গে মানসিক সম্বন্ধটা অনেকটা লয়লা-মজনু ধরণের। আমার মতে আসফাক্ কিন্তু নায়ক নয়। সাধারণ মানুষ ফোটান অত্যন্ত শক্ত, তাই পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় সহজে মীর সাহেবেরই দ্বারা। মীর সাহেবের দিনানুদৈনিক জীবনধারায় রস আছে। ফিউডাল যুগের অবসর আমাদের কাছে হেয় হলেও সেটা ভরা থাকত নানা রকমের ছোটখাট দায়িত্ব পালনে, আমোদ-প্রমোদে এবং আভিজাত্যের মর্য্যাদা রক্ষায়। আহমাদ আলি বিগত যুগের গুণে মুগ্ধ না হলেও তার প্রতি অবিচার করেন নি। মীর সাহেব একজন 'খানদানী' পুরুষ, নবাবী আমলের রেশ পড়েছে তাঁর চরিত্রে, হাত তাঁর দরাজ, মেজাজ তাঁর বড়, এবং দিল্লী সহরের পচা-নোংরা গলির মধ্যেও তাঁর শির উঁচু। রক্ত এখনও তাঁর হিম হয়নি, তাই বাদশা বাহাদুর শাহের রচিত গান শুনে, দিল্লী দরবারে সমারোহ দেখে তাঁর রক্ত নেচে ওঠে। কিছুই করে উঠতে পারেন না, ঘুঁড়ি ওড়ান, পায়রা-বাজী খেলেন, ফকিরের সঙ্গ

করেন, কোরাণ শোনেন—কিন্তু লুকানো আফশোষটি বেরিয়ে পড়ে কথনও কথনও। ব্যস্‌, এই পর্য্যন্ত, এর বেশী কিছু নয়…ক্রমে তাঁর সংসারের ভাঙ্গন ধরল, এক এক করে ছেলে মেয়েরা বিবাহ করলে, পৃথক হল, মায়া গেল—তিনিও দেহপাত করলেন।

অতএব নভেলটি ঘটনাবহুল নয়, মাত্র একটি ভাঙ্গনের ছবি। কেবল ভাঙ্গন নয়, অ-সার্থকতারও। ভাঙ্গনের দিক থেকে বইখানি কাব্য-ধর্ম্মী কিন্তু অ-সার্থকতার প্রকাশে প্রগতিশীল। আমি প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি। এ-যুগের উপযোগী বই বলে কেবল নয়, অ-বাঙালী মুসলমান সমাজের চমৎকার নক্সা হিসেবেও। যে-সব নক্সার লেখক সমাবেশ করেছেন, বিবাহের, মৃত্যুর, খুঁটি-নাটি তুচ্ছ ঘটনার, সেগুলি কেবল মুসলমান সমাজের নয়, সমগ্র ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। বিফলতার দৃশ্য আঁকায় লেখক যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন সেটা অন্য দোষের ক্ষতিপূরণ করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আধুনিক সাহিত্য মানে কেবল শ্রমিক-কিষাণদের ভবিষ্যৎ কল্পনা নয়, বর্ত্তমান সমাজের অকিঞ্চিতকরতাও দেখান।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তিন সঙ্গী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য—১৷৹ ও ২৲ টাকা।

গল্পগুচ্ছের সেই ঘন-সংবদ্ধ অন্তরঙ্গ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের অধুনা রচিত গল্প-সাহিত্যের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, কিন্তু ভাষার ঐন্দ্রজালিক শক্তি অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে 'শেষকথা' গল্পটি হচ্ছে তার প্রমাণ। সমস্যাসঙ্কুল ঘটনা সৃজনের তাগিদ না থাকায় এতে ভাষার বিভূতি পূর্ণতর

ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতি বাঁকে, প্রতি ফেরে পাঠকচিত্ত বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতিই হচ্ছে রোমান্টিক। বর্ত্তমান মূর্ত্ত জীবনের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে প্রগতি-নির্ণায়ক গল্প রচনা করা বোধ করি তাঁর স্বাভাবিক রুচিতে বাধে, তাই তিনি কল্পিত বা উপলব্ধ ভবিষ্য লোক হতে আলোক আহরণ করে অঙ্কিতব্য বিষয়কে অতিরঞ্জিত না করে পারেন না। অধুনা সে আলোক সাধারণ সমাজসমস্যার সীমারেখা পর্য্যন্ত পৌঁছচ্ছে না, উদ্ভাসিত করছে বিশেষ বিদগ্ধ মানুষের কয়েকটি আইডিয়াকে মাত্র—তথাপি রচনার এমনি মহিমা যে সাধারণ পাঠক যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি হচ্ছে আর একটি উদাহরণ। এটি আদ্যন্ত আজগুবী ও অসম্ভব ঘটনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু ভাষার সৌষ্ঠব পাঠককে স্বপ্নাবিষ্ট করে রাখে।

ভাষার চমকপ্রদ ও সুশোভন প্রয়োগ অবশ্য এর একমাত্র কারণ নয়। তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষের আইডিয়াগুলি দুর্ব্বোধ্য না হলেও অসাধারণ। এবং দূরাগত সমস্যাপুঞ্জের প্রতি সাধারণ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ এত সহজে হয় না। রচনার মধ্যে গ্রন্থকারের অন্তরজাত নিবিড় দুঃখ বা আনন্দবোধের নির্য্যাস থাকা চাই। এবং সেই রসের ইতর বিশেষেই আলোচ্য গল্প তিনটির মধ্যে তারতম্য বিচার হবে।

ভাষার উৎকর্ষ সত্ত্বেও 'রবিবার' গল্পটি অন্য দুইটির তুলনায় অনেকখানি নিকৃষ্ট হয়েছে। তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে বলতে হয় যে এখানি শিল্পসৃষ্টির তাগিদে রচিত হয় নি। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিদুষী রমণীর অন্তরস্থ আভিজাত্য দেখাবার জন্যে প্রতিপক্ষে খাড়া করেছেন বিগত যুগের কুসংস্কারগুলিকে এবং তাঁর সযত্ন কল্পিত কালাপাহাড় নাস্তিক নায়কটি 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থের জ্যাঠামশাই-এর অত্যন্ত ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু 'শেষকথা' গল্পটির মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ পরিস্ফুট। ঘটনার গ্রন্থনে চমকপ্রদ কিছু নাই। নায়ক দেশ উদ্ধার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেছে। প্রথম জীবনের সন্ত্রাসবাদ প্রচেষ্টা ছেড়ে বিদেশে গিয়ে শিখে এসেছে খনিজ বিদ্যা। বুঝেছে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের পাল্লা দিতে হলে তুলতে হবে ধরণীর জঠর হতে

কঠিন খনিজ পদার্থ। ছোটোনাগপুরের কোন অরণ্যের মধ্যে একান্ত তন্ময় হয়ে কাজে লেগেছে এমন সময় এক বাঙ্গালী তরুণী করলো তার ধ্যান ভঙ্গ। কোন স্বার্থপর আই সি এস-এর দ্বারা প্রতারিত ভগ্নহৃদয় নায়িকাকে নিয়ে জনৈক বৃদ্ধ অধ্যাপক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, তারপর দৈবাৎ হল ব্রাহ্মস্পর্শ। তরুণী ভুললো তার বিরহ। ব্রহ্মচারী ভুলতে বসলো তার প্রতিজ্ঞা। প্রেম নিবেদন হয়ে গেল মধুর ভাবে কিন্তু বিবাহ তাদের হল না। তরুণী তার প্রণয়ীর সঙ্কল্প নষ্ট হতে দিল না। মুখে বল্লে যে পূর্ব্বতন প্রণয়ীকে সে ভুললেও প্রথম প্রণয়ের স্মৃতিটুকুকে রাখবে অনাবিল। ফিরে গেল সে দাদুকে নিয়ে। তারপর দেশভক্ত জিয়লজিষ্ট যখন সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে ব'সে নিজের মুক্তির কথা ভাবে তখন তার মনে হয়—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল; নড়তে-চড়তে সেটা বাজে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসার থেকে মনে হবে গল্পের মধ্যে তেমন আর কি আছে। খানিকটা 'আলেয়া' আর খানিকটা 'শুকতারা'; সনাতন প্রেমের কাহিনী। তাই বটে, কিন্তু সাজাবার কি অদ্ভুত কৌশল ও সেই সঙ্গে নৈসর্গিক পটভূমিকায় কি বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। কবি অরণ্যের আনন্দময় ও ভীষণ রূপ সৃষ্টি করেছেন হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধি হতে তাতে কোন সন্দেহ নাই—

'নিচের পাথরকে প্রশ্ন ক'রে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশ ফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যবসাদাররা জৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেসমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফল। ঝির ঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম—তনিকা। এটা কারখানা ঘর নয়, কলেজ ক্লাস নয়, এ সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য, যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে, যেমন সে করে সূর্য্যাস্তের পটে।

'মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাপ—নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম; ভিতর থেকে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম ট্রপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানী ট্রপিক্‌স এদেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে—এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদু।

'বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দুভাগে চ'লে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দৃশ্যটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলছিলুম আমার বাংলো ঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহ্ণ সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একটা মানুষের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষতঃ নির্জন বনে।…'

এইরূপ খণ্ড চিত্র যেখান সেখান থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারতো। বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মোটামুটি একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। গহন বনের নৈসর্গিক রহস্য আর মানুষের অন্তঃকরণের কথা একই লয়ে মিশেছে। কাহিনী দীর্ঘায়িত হলে পাঠক হয়ত' শ্রান্ত হয়ে পড়তো কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে থাকে। সব চেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে এতখানি নিবিড় আবহের মধ্যেও সাধারণ কথোপকথন স্থান পেয়েছে অনায়াসে। অজস্র বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বুলির একটিও খোঁচা রেখে যায় নি।

নিছক কথোপকথন দিয়ে বাঁধা হয়েছে পরবর্ত্তী গল্প 'ল্যাবরেটরি'। এই গল্পের চরিত্রগুলি এত অত্যধিক মার্জ্জিত ও সংস্কারমুক্ত যে কেউ কোন বক্তব্যের সারাংশ ছাড়া উচ্চারণ করে না। বাহুল্য বর্জ্জিত নগ্ন অবস্থার কথাগুলি হয়ে উঠেছে যেমন অবাস্তব তেমনি অভিনব। অবাস্তব হলেও অবান্তর নয়—কারণ রচয়িতার উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় স্পষ্ট ভাবে। তিনি দেখিয়েছেন যে নারীর সতীত্ব দেহ-সর্ব্বস্ব নয়। পুরুষের মত নারীরও দেহাতিরিক্ত সাধনা থাকতে পারে যার জোরে সে মহত্ত্বের কোঠায় ওঠে।

প্রতিপাদ্য বিষয়টি যাই হোক প্রকাশের অভিনবত্ব হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

পাঠকের প্রথম চমক লাগে যখন ধনী বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোর নিছক বাক্যের দাপটে মুগ্ধ হয়ে এক অজ্ঞাত কুলশীল পাঞ্জাবী তরুণীকে জীবনসঙ্গিনী করে ফেল্লে। এতখানি অকুণ্ঠ বিশ্বাসে কার না মন পীড়িত হয়। নন্দকিশোর

ছিল সংস্কারমুক্ত সৃষ্টিছাড়া লোক আর তার ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। সে বানিয়ে তুললো মস্ত এক বিজ্ঞানাগার আর গ্রাহ্য করলো না তার সহধর্মিণীর অন্তরঙ্গ জীবনের অবাধ লীলা খেলা। সে চেয়েছিল সঙ্গিনী তার সাধনাকে করবে ভক্তি। সোহিনী সে বিষয়ে তাকে নিরাশ করে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বিজ্ঞান-মন্দিরটির মঙ্গলার্থে বয়োজীর্ণ দেহকে সাজিয়ে রাঙিয়ে মোহ-জাল বিস্তার করে বসলো। রূপ ও রসনার ছটায় ঘুরিয়ে দিল বড় বড় উকিল অধ্যাপকের মাথা। গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো কন্যা নীলাকে নিয়ে। ভালো ভালো ছাত্র মহলে তার জন্যে পাত্র সন্ধান করে সোহিনী যখন রেবতী ভট্টাচার্য্য নামে ছেলেটিকে বেছে নিয়েছে তখন নীলা করলো নিজের মনকে অনাবৃত। স্পষ্ট বল্লে 'ঐ ষ্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।'

সোহিনী পরলোকগত স্বামীর সাধনা নিজের জীবনের সাধনা বলে মেনে নিয়েছে। সহজে টলবার পাত্রী সে নয়। রেবতীকে দিল ল্যাবরেটরির ভার। তাকে জামাতা করবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিল এবং সেই জন্যে রূপসী কন্যার কাছ থেকে রাখলো দূরে। বিজ্ঞানাগারের দ্বারে বসলো প্রহরী। নীলা একটু বিলম্বে বুঝলো যে তার পিতার টাকার অধিকাংশ থাকবে ঐ ল্যাবরেটরির সঙ্গে বাঁধা আর মেরুদণ্ডহীন রেবতীকে বিবাহ করলে তার থাকবে যথেচ্ছাচার করবার অধিকার। সে মায়েরই মেয়ে। আপন রূপের মোহজাল বিস্তার করে কোন ফাঁকে রেবতীকে নিয়ে এল তুলে। করে দিল তাকে নিঙ্গেদের জাগানী ক্লাবের সভাপতি। বেচারার মাথা গেল ঘুরে। সোহিনীকে বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল সেই সময় পাঞ্জাবে। সে তার নির্ব্বাচিত বৈজ্ঞানিকের অধঃপতন টের পেল না।

এর পর কাহিনী সহসা উঠলো নাটকীয় স্তরে। একদিন ক্লাবের সভ্যদের সান্ধ্যভোজ ছিল একটা নামজাদা রেষ্টরাঁতে। নিমন্ত্রণ-কর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোষ্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে একজন, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট

টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ প'রে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির বোড়দৌড় চালিয়েছে।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকলো সোহিনী। রেবতী উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু নীলার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় তার মধ্যে পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। মা ও মেয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে ফুটে উঠল কলহের সুর। নীলা ইঙ্গিত করলো যে তার পিতার টাকা তার প্রাপ্য। সোহিনী সভার মাঝে ব'সে বললো—'কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস।' আরও বল্লে—'সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।'

এই বাদ্-বিতণ্ডার মধ্যে হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। রেবতীর পিসিমা এসে দাঁড়ালেন! বললেন, 'রেবি, চলে আয়।' সুড় সুড় করে রেবতী তার পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকালে না।

আজগুবী গল্পটি শেষ হল এমনি ভাবে। সাধারণ বাঙালীর মত রেবতী যে তার পিসিমার আঁচল ধরা ছেলে সে সংবাদ তার প্রথম দিককার অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন সোহিনীকে। সব কথা শুনে পাঞ্জাবী মেয়ের জেদ চেপে গিয়েছিল তখন। সে ব'লেছিল 'একটা মেয়ে ওকে ভুলিয়ে দিয়েছে, আর একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।'

তার উত্তরে চৌধুরী বলেছিল, 'স্পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম্। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তুলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা—ল্যাজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা সুরু হোক।'

এই রসিকপ্রবর মধ্যবয়সী লোকটির সঙ্গে সোহিনীর কথোপকথন হচ্ছে গল্পটির সার বস্তু। এঁর কাছে সোহিনী তার হৃদয় অবারিত করেছে অসঙ্কোচে এবং সহানুভূতি পেয়েছে অমুঠ। পাঠকের অবাক লাগে সংস্কার-মুক্ত লোকেদের মুখের বুলির শুনে, তার ওপর সোহিনী আর একটা বহু

অভ্যাস আয়ত্ত করেছিল, সেটা হচ্ছে প্রবীণ লোকদের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সৃজন-প্রতিভায় এই সকল অপ্রত্যাশিত ব্যাপার এমন একটি অলীক কৌতূহলপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যে কোন রসজ্ঞ পাঠককে পীড়া দেবে না।

এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার পূজার সংখ্যায় এবং সেই সময় অনেকে একে সংবাদ পত্র সেবনের মত দ্রুত গলাধঃকরণ করে ভেবেছিল যে রবীন্দ্রনাথ অত্যাধুনিক সমাজের রূপ নির্ণয় করতে গেছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। বর্তমান গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়ে প্রকাশ হওয়ায় বোধ করি সে ভ্রম অনেকাংশে শোধিত হবে—কারণ বার বার প্রণিধান না করলে অনেক সময় এই প্রকৃতির রোমান্টিক গল্পের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আলোচ্য গল্পের আঙ্গিক মাল মশলা যতই অভিনব হোক না কেন ইহার প্রকৃতি সনাতন পরী কাহিনীর অনুরূপ। এতে কথিত ব্যাপার হচ্ছে গৌণ আর অকথিত আবহ হচ্ছে আসল।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। কাত্যায়নী বুক ষ্টল হইতে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা

বাংলা সাহিত্যের-রচনায় প্রমথ বিশী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। কি ছোট গল্পে, কি নক্সায় তাঁর নিজস্ব একটি দেখার ও বলার ভঙ্গী আছে, যদিও স্থানে স্থানে সেটী ব্যক্তিগত মানসিক মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু 'প্র-না-বি'র হালকা ব্যঙ্গ-কৌতুক রসিক পাঠকমাত্রেরই

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা সাহিত্যে রস-রচনায় যে ক'জন লেখক সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যায়—যথা পরশুরাম, কেদার বাঁড়ুয্যে, ৺রবীন্দ্র মৈত্র, সজনী দাস ও বনফুল। এঁদের শিল্প-মার্গ প্রত্যেকেরই বিভিন্ন; কেউ নিছক 'টাইপ' সৃষ্টি করেন ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলিয়ে, কেউ বা জীবন ও সমাজের ধারাকে চিত্রিত করেন নিপুণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গ দিয়ে। কেউ বা বুদ্ধি-পন্থী, কেউ বা ভাব-প্রবণ, কারুর দৃষ্টি তির্য্যক্, কারুর বা সুস্থ ও সহজ। ভাষার দিক দিয়ে কেউ অনুপ্রাস বা যমকের পক্ষপাতী, কেউ বা লঘুপদা সরস্বতীকে প্রাধান্য দেন। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে বিদেশে বিশেষ ক'রে ইংরেজী সাহিত্যে রস-রচনার যতটা প্রসার ও চাহিদা, আমাদের দেশে এখনও ততটা হয় নি। প্রমথ বিশীর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, 'বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি নয়, হাস্য-বিস্মৃত জাতি।'

তাই প্রমথবাবু বাঙালীর সুখ-কল্পনা, অপরিণত কামনা, তার মর্ম্মান্তিক দুঃখ, তার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা, আর সর্ব্বোপরি তার জীবন ও সমাজের অধোগতি নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ কৌতুকের উপকরণ জড়ো করেছেন। অত্যন্ত দুঃখেই তিনি বঙ্গদেশের নামকরণ করেছেন 'রঙ্গদেশ,' যেখানে হালকা অমুক হাসির অভাব নেই কিন্তু সে হাসি বাসি, গতানুগতিক এবং নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। এর কারণ বা নিরাকরণের ইঙ্গিত তিনি দেন নি যেহেতু তিনি সন্ধানী মাত্র, পথ-প্রদর্শক নন।

প্রমথবাবুর সেরা অস্ত্র হ'ল satire। সে শ্লেষ কখনো মোলায়েম হাসি কখনো তীব্র কষাঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের রাষ্ট্রজীবনে অথবা সমাজ-অনুষ্ঠানে যে সব কপটতা বা গলদ আছে, যে সব ভণ্ডামি ও ভাঁড়ামি চলে, প্রমথবাবু সেগুলিকে পরিস্ফুট করেন তাঁর শাণিত মধুর ভাষায়। কখনো একটা অসম্ভব পরিবেশ-কল্পনা, কখনো বা একটা সত্যকল্প ঘটনা অবলম্বন করে তিনি তাঁর জোরালো মন্তব্যকে প্রকাশ করেন। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী তির্য্যক্, সেইজন্যে তাঁর বিদ্রূপ-বাণ অতর্কিতে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে বর্ষিত হয়। তাঁর নক্সায় কখনো হাল্কা-মিষ্ট হাসির ফুলঝুরি, কখনো উচ্চ হাসির উদারতা, কখনো বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী রসিকতার ঝল্‌সানো দীপ্তি। তবে

প্রমথবাবুর রসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে প্রধানতঃ সেটি কোনো একটি চরিত্র বা পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। অতএব সেই চরিত্র অথবা 'সিচুয়েশ্যন'কে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে চাই বলার ভঙ্গিমা অথবা 'ডায়ালোগ্'। প্রমথবাবুর 'ডায়ালোগ্' সত্যিই ভালো। বিরোধাভাস-মূলক উক্তির সাহায্যে তিনি আমাদের জড় ও গ্রথ চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করেন এবং পর মুহূর্তেই পাঠকের পিঠ-চাপড়ে তার আত্ম-প্রসাদী মনে সুড়সুড়ি দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রমথবাবুর টেক্‌নিক্ বনফুল অথবা পরশুরামের টেক্‌নিক্ থেকে ভিন্ন। কেননা তাঁর রসিকতার ধারালো আঘাত সূক্ষ্ম রেখায় বা ইঙ্গিতে ধরা পড়ে না। যেহেতু তাঁর চরিত্রগুলি ও পারিপার্শ্বিকের পটভূমিকা খুব বড়ো, সেই কারণে তুলির টান লঘুস্পর্শ হলেও অনেক স্থলে বারে বারে রঙ্ চড়াতে হয়েছে। অতিরঞ্জন যেখানে রসিকতার মূল সূত্র, সেখানে শিল্পে অত্যুক্তি-দোষ এসে পড়ে। ফলে, মধ্যে মধ্যে বক্তব্যের সুডৌল মুখ একটু ভোঁতা হয়ে পড়ে, বুদ্ধিমান পাঠক-ভাবে—এ তো obvious! একটা উদাহরণ দিই—'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব' নামক প্রথম রচনাতে বাঙালীর উদর হ'ল হৃদয়, তথ্যটিকে দু পাতায় ব্যক্ত করা হয়েছে। একে সংক্ষেপে প্রকাশ করলে হাসি ও সমালোচনা, দুয়েরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকত। এ রকম দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যেতে পারে। প্রমথবাবুর কয়েকটি প্রিয় ধারণা ও বক্তব্য আছে, তার ফলেই এই পুনরাবৃত্তি দোষটুকু এসে গেছে।

তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, প্রমথবাবু রীতিমতো শক্তিশালী লেখক এবং বিশেষ করে এই জাতীয় রস-রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাঁর জুড়ি নেই। প্রমথবাবু 'সিনিক্' নন্, যদিও বোধ করি এমন কোনো ঘটনা বা তথ্য নেই যা তাঁর সজাগ মন ও সক্রিয় লেখনীর খোরাক্ না জুগিয়েছে। প্রমথ-বাবুকে আপাত-দৃষ্টিতে নৈরাশ্য-বাদী মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের সুস্থ মানুষ, সুস্থ চিন্তা ও আচরণ এবং সুস্থতর পৃথিবীতে আস্থা রাখেন। তাঁর রস-ভাণ্ডারের আছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। এই হাস্যকর, কুশ্রী জগতের বিচিত্র জীবন ও চিন্তাপ্রবাহ, নরনারীর অদ্ভুত মিছিল থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর চিত্রায়িত রচনার বৈচিত্র্য। উদ্ভট পরিকল্পনায় অথবা সুস্থ সমালোচনায়

তাঁর শিল্প অগ্রগামী, আর সকলের পিছনে আছে সদা-জাগ্রত চোখ, সমব্যথী মন। শ্রীকান্ত থেকে পকেটমার, ইন্‌ডস্‌ট্রিয়াল প্ল্যানিং থেকে অবতার-বাদ, নির্ব্বাণ থেকে প্রাইভেট্ টুইশ্যন, এসব জানা খবর ও দেখা চরিত্র নতুন করে শুনি ও দেখি প্রমথবাবুর নিজস্ব ভাষায় আর সুচতুর চিত্রণ-কৌশলে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

সাহিত্যাহুরাগীদের মুখে প্রায়ই এই অভিযোগ শোনা যায় যে বাঙলা পত্রিকার সংখ্যা অনাবশ্যক বেড়ে চলেছে। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, একেবারে মিথ্যেও নয়। কেননা, যদিও অনেক পত্রিকাই ব্যাঙের ছাতার মতপর্যায়ের, তবু মাঝে মাঝে এমন এক একটি অখ্যাতনামা পত্রিকা চোখে পড়ে যেগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এই জাতীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্র যে সকল একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত তাদের কোনো না কোনো গোষ্ঠীকে অবলম্বন ক'রে। এই গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট রেশারেশি আছে এবং এই রেশারেশি নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু তবু এদের পিছনে রয়েছে মূলত সাহিত্যিক তাগিদ, তাই সাহিত্য সৃজনের অনুকূল আবহাওয়াও এদের মধ্যে আছে। অপর পক্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই সৃষ্টি হয়েছে যে-তাগিদে, অন্তত যার জোরে তারা চলছে, তা প্রধানত ব্যবসায়ের তাগিদ, সাহিত্যিক প্রেরণা নয়।

নিছক সাহিত্যিক প্রেরণায় যে-পত্রিকাগুলির উদ্ভব পাঠক সংখ্যাকে সাফল্যের মাপকাঠি ব'লে মানলে, বাঙলা পত্রিকা জগতে তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই স্থান এখনও গৌণ। সাহিত্য-চর্চা যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁদের এই গৌণ পত্রিকাগুলি ছাড়া গত্যন্তর নাই, কেননা বর্তমান বাঙলার সার্থক সাহিত্যিকদের অধিকাংশ রচনাই ছাপা হয় এই রকম সব অখ্যাত কিম্বা খ্যাতনামা অথচ অল্প-প্রচারিত পত্রিকায়। বাঙলা সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের পক্ষে এই রকম সব পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়।

'কবিতা' বা 'চতুরঙ্গ' এই শ্রেণীরই পত্রিকা ব'লে ধরতে হবে, কেননা বহু-প্রচারিত 'অমৃতবাস' বা সর্বংসহ পত্রিকাগুলির তুলনায় এদের পাঠক সংখ্যা সামান্য। কিন্তু বর্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের দরদ আছে তাঁদের পক্ষে এই দুটী কাগজই বিশেষ মূল্যবান, কেননা এদের পাতায় শুধু আধুনিক লেখকদের রচনা নয়, তাঁদের এবং রবীন্দ্রনাথেরও রচনার উল্লেখযোগ্য সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনাগুলি যে একতরফা স্তুতি নয়, তার প্রমাণ 'কবিতা' কাগজে প্রকাশিত আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের তীব্র মন্তব্য। আধুনিক কবিতার দোষত্রুটি এমন বিশদভাবে ও এমন বৈদগ্ধ্য সহকারে আর কেউ ইতিপূর্বে দেখাননি।

অতুলবাবুর ঐ রচনাটি এই পত্রিকা-প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছিল, কিন্তু 'রূপ ও রীতি' নামক আর একটি অখ্যাত কাগজের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অভিযোগ

করেছেন যে ঐ আলোচনা তেমন স্পষ্ট হয়নি। প্রমথবাবু লিখেছেন: 'অনামিক লেখককে আমি জানিনে, কিন্তু তিনি অতুলবাবুর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে দুঃখিত হয়েছেন। এ বিষয়ে অতুলবাবু অজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সমালোচক যোবা নন।' যীরবলের যোগ্য এই উক্তি; এতে খোঁচা আছে, কিন্তু তবু তা উপভোগ্য, কেননা তাতে অহমাত্র বিষ নাই।

কিন্তু 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ অতুলবাবুর যে উত্তর দিয়েছেন তা প'ড়ে প্রমথবাবু কখনই লেখককে বোবা বলবেন না। বিমলবাবুর যুক্তি যেমন ধারালো তেমনি স্পষ্ট ও তার বক্তব্য। তাঁর লেখা সম্বন্ধে এই আপত্তি হয়তো হ'তে পারে যে অতুলবাবু আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে যেমন অবিচার করেছেন, তেমনি বিমলবাবুও সর্বত্র অতুলবাবু সম্বন্ধে সুবিচার করেননি। কিন্তু তবু এ কথা মানতে হবে যে আধুনিক বাঙলা কবিতার এমন একটা দিক তিনি দেখাতে পেরেছেন যা অতুলবাবু বুঝতে পারেন নি, কিম্বা এড়িয়ে গেছেন। এড়িয়ে গেছেন বলার হেতু এই যে অতুলবাবুর ঐ লেখাটি প'ড়ে সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়না, মনে হয় আরো অনেক কথা তিনি বলতে পারতেন। এরকম মনে হবার একটি কারণ অবশ্য তাঁর লেখার উৎকর্ষ, কিন্তু আর একটি কারণ তাঁর যুক্তির অসম্পূর্ণতা।

এই প্রসঙ্গে বিমলবাবুর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, আধুনিক কবিতার সমালোচকেরা যখন কাব্যের চিরন্তন আদর্শ খুঁজে হয়েছে ব'লে অভিযোগ করেন, তখন যে আদর্শ তাঁদের মনে থাকে তার ভিত্তি মাত্র বিগত ৬'শ' বছরের কবিতা। অতুলবাবুর মতন ক্লাসিক্যাল কাব্যের সমঝদার সম্বন্ধে বিমলবাবুর এই উক্তি হয়তো সঙ্গত নয় কিন্তু একথা সত্য যে এই রকম ঢুঁনকো আদর্শের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। আধুনিক কবিতা যে সময়ে সময়ে অতখানি উৎকট হয় তার কারণ এর মূলে রয়েছে এই বিকৃত প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। অবশ্য এই অজুহাতে যদি এই উৎকটতার সমর্থন করা যায়, তার চেয়ে অসঙ্গত আর কিছু হ'তে পারেনা। এবং এই জাতীয় উৎকট কবিতা সম্বন্ধে যদি প্রমথবাবু বলেন—'আধুনিক কবিতা যে আধুনিক তা' নিশ্চয় তবে তা কবিতা কিনা,—এই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য'—তা হ'লে তার কথায় বিশেষ আপত্তি করা চলেনা, কেননা এই উক্তি রসিক জনের। তবে সব আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে নিশ্চয় একথা বলা চলেনা।

প্রমথবাবুর রসবোধ যে অক্ষুণ্ণ আছে তার আরো প্রমাণ সম্প্রতি পেলাম 'পত্রিকা' এই অদ্ভুত নামধারী কাগজে প্রকাশিত 'চাহার দরবেশ' নামক একটি গল্পে। কিন্তু যে-রসবোধের পরিচয় এই গল্পটিতে আছে তা সাহিত্যের রস নয়, জীবনের রস। গল্প না ব'লে আলেখ্য বললে বোধ হয় ঠিক হবে, কেননা, এতে না আছে সুনির্দিষ্ট প্লট, না আছে মামুলী ছোট গল্পের মতন এর অনিবার্য পরিণতি। এর বিষয়বস্তুও বলতে হবে হালকা, আর ভাষা একেবারে নিরাভরণ। কিন্তু তবু প'ড়ে মনে হয় মানুষের জীবনের—সমগ্র জীবনের অবশ্য

নয়, সামান্য একটু অংশের—এমন একটি ছবি যাকে ইংরেজীতে বলে spenking likeness : অর্থাৎ এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত মানুষগুলির কথাবার্তা মনে হয় যেন কানে শুনছি, লেখায় পড়ছিনা। এই জাতীয় রচনা প্রমথবাবুর শুধু বিশেষত্ব নয়, একেবারে তাঁর মৌরসী পাট্টা।

আধুনিক বাঙলা গল্পের লেখক এমন খুব কমই আছেন যিনি প্রমথবাবুর নিকট ঋণী নন। কিন্তু তবু একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে প্রমথবাবুর যথেষ্ট সমাদর আজ পর্যন্ত আমরা করিনি। তাই বর্তমান সংখ্যার 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমথবাবুর জয়ন্তী উৎসবের যে প্রস্তাব করেছেন বাঙলা দেশের পাঠক ও সাহিত্যিক সকলেরই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাতে সাড়া দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'পত্রিকা' উল্লেখযোগ্য শুধু অদ্ভুত নাম ও প্রমথবাবুর মতন লেখকের জন্য নয়। পত্রিকা-সমাজের পংক্তি ভোজনের দাবি করবার মতন যোগ্যতা এর অন্য কারণেও আছে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গল্পটি পড়েও খুশি হলাম।

এই রকম আর একটি অল্প পরিচিত অথচ যোগ্য পত্রিকার উল্লেখ ক'রে এইবারকার প্রসঙ্গ শেষ করব। এটি পাটনা হতে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার। এই অখ্যাত ও শিশু—এখনও এর এক বৎসর পূর্ণ হয়নি—পত্রিকায় শুধু একাধিক খ্যাতনামা লেখকের বিবিধ উপভোগ্য রচনা নয়, প্রবাসী বাঙালীদের সমস্যা সম্বন্ধে এমন সব আলোচনা প্রকাশিত হয় যা বাঙালী পাঠকমাত্রের পক্ষেই অত্যন্ত মূল্যবান। বাঙলার বাইরে যে-সব বাঙালী আছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপনের জন্যে এই জাতীয় কাগজ অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙালীরা এই বিষয়ে যতটা সচেতন, বাঙলাদেশবাসী বাঙালীরা ততটা নয়। বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী' এক সময়ে এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল, অবশ্য এখন 'প্রবাসী' সম্পূর্ণ বাঙলাদেশের কাগজ। আশা করি স্বদেশবাসী বাঙালী পাঠকেরা প্রবাসী বাঙালীর এই নতুন পত্রিকা 'প্রভাতী'কে উপেক্ষা করবেন না।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৮

পরিচয়

প্রমথ চৌধুরীর গল্প

ফাল্গুন-সংখ্যার প্রবাসীতে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী 'অনুকথা-সপ্তক' নামে প্রমথবাবুর আধুনিক গল্প-সঞ্চয়কে আশ্রয় করে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তার ফলে প্রমথবাবুর অন্যান্য গল্পের বই আবার পড়লাম। আশ্চর্য্য হলাম তাঁর গল্প-রচনার কৃতিত্বে। তাঁর কৌশল সেই ধরণের যার আনন্দ পুনঃপরিচয়ে চক্রবৃদ্ধির হারে বৃদ্ধি পায়। আমার বিশ্বাস যে বাঙলা সাহিত্যে প্রমথবাবুর পদমর্য্যাদা ক্রমেই বেড়ে যাবে। হয়ত এমন দিন আসতে পারে যখন বাঙালী আর গল্প লিখবে না, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, যাঁদের আচার-ব্যবহার, ভয়-ভাবনা, আশা-ভরসা বর্তমান সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তাঁরা লুপ্ত হবেন। কিন্তু গল্প লেখার ও পড়ার নেশা ও তাগিদ যতদিন বাঙলা দেশে থাকবে, ততদিন প্রমথবাবুর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গতি নেই মনে হয়। দূরদৃষ্টিতে তিনি লেখকের লেখক; যদিও আপাত-দৃষ্টিতে তিনি সাহিত্যানুরাগী জন-সাধারণের। দূরদৃষ্টি যখন আমার নেই, তখন সাধারণের একজনের মনোভাব ব্যক্ত করাই সঙ্গত।

প্রথমেই চোখে পড়ল প্রমথবাবুর গল্পের বৈচিত্র্য। অন্যদেশের কা কথা, আমাদের দেশেরই অন্য লেখকের তুলনায় তিনি কম লিখেছেন, তবু তাঁর গল্পের সংখ্যা মোটেই অল্প নয়। এতগুলি গল্পের বিষয় যদি স্বতন্ত্র হয় তবে তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসারকে তাঁর শক্তির প্রথম পরিচয় বলতে হবে। স্বল্পশক্তির

নিদর্শনই হল পুনরাবৃত্তি, তার কারণ অ-লেখকও আত্মজীবনের একটি প্রধান ঘটনার অবলম্বনে অন্তত দু একটি গল্পের খোরাক যোগাতে সমর্থ। লোকে বলে বাঙালীর জীবন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। স্বীকার করি, কিন্তু তার ফলে ভাব-প্রবণতারই জন্ম হয়, বিষয়ের পরিসর বলজাক্-এর গল্পে গাধার চামড়ার মতন কমে যায় না। প্রমথবাবু ভাবালুতাকে ত্যাগ করেছেন কেবল নয়, সঙ্কীর্ণ সমাজের আকাশ-পাতালে, আনাচে-কানাচে, ঘরে-বাইরে ঘুরে অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চার-ইয়ারী কথার প্রত্যেক ইয়ারের কাহিনী, আহুতি ও অমৃতকথার প্রত্যেক গল্প, নীললোহিতের হরেক কিস্‌সা অন্যটি থেকে পৃথক। ঘটনার ক্ষেত্র কখনও বড় কখনও ছোট সহরে, গ্রামে, মাঠে, ট্রেণে, ষ্টীমারে, বাঙলা দেশে, প্রবাসে, বিদেশে; চরিত্র ভূত-পেত্নী, আসামী, নেশাখোর, ভবঘুরে, পানওয়ালী; বাইজী থেকে আমিন-আমলা, কেরানী, মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক, প্রজা, লাঠিয়াল, বিলেত-ফেরতা, ইংরেজ গোরা, জমিদার পর্য্যন্ত; রসও বহু প্রকারের, হাসি, ভয়, ঠাট্টা, করুণা, সাহস, হিংসা, নিষ্ঠা ও আভিজাত্য-বোধের। এমন বিস্তারিত পটভূমিতে তাঁর লেখনী অনায়াসে বিচরণ করে। কল্‌কেতে তামাক ভরা, ডালকুত্তাকে খাওয়ান, বাইজী বাড়ির হালচাল, লাঠিয়ালের বাবরী চুলের প্রসাধন, এই সব প্রক্রিয়া যেমন তাঁর করায়ত্ত, তেমনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রীতি-নীতি, কালী বাড়ির ধূমধাম, শিকার-খেলা প্রভৃতি বড় মানুষী খেয়ালের বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আদৎ কথা এই যে প্রমথবাবু গল্পের বিষয়-বোধে প্রবুদ্ধ। যাঁদের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক বলা হয় তাঁদের পরিসরও প্রশস্ত, কিন্তু এই বিষয়-বোধের অভাবে তাঁদের রচনা নিরুদ্দেশ যাত্রারই সামিল হয়। বস্তুতান্ত্রিকের বিশ্ববিজয়-বৃত্তি সাহসের নমুনা, সাহিত্যের নয়। প্রমথবাবুকে কেউ আদর্শবাদী বলবে না, কিন্তু তাঁর নির্ব্বাচন-শক্তি প্রখর। সেইজন্য গল্প লেখার তাগিদ না এলে তিনি লেখেন না সন্দেহ হয়, ফলে তাঁর রচনা যেমন অপেক্ষাকৃত অল্প, সৌষ্ঠবে তেমনই সম্পূর্ণ। এক কথায়, তিনি গল্প লেখবার আগে ভাবেন।

বৈচিত্র্যের সঙ্গেই প্রমথবাবুর নির্ব্বাচন-শক্তি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সাধারণত, নির্ব্বাচনের দুটি দিক ও প্রক্রিয়া আছে। যাঁরা গল্পের শেষ পর্য্যন্ত গোড়ায় কল্পনা করে লেখেন, তাঁদের পক্ষে অবান্তরের পরিত্যাগ খুব কঠিন নয়,

তাঁদের রীতিতে শক্ত কাজ সুরু হয় তার পর, অর্থাৎ ঘটনার যাথার্থ্য ও তাৎপর্য্যকে পরিষ্কার করা থেকে। এর সার্থকতা নির্ভর করে ভাষার কৃতিত্ব ও বুদ্ধিবিচারের পরিমাণের ওপর। আরেক ধরণের সাহিত্যিক আছেন যাঁদের আনন্দ গল্পের নিজের খেয়ালে অর্থাৎ গতিতে। এঁদের বেলা পরিত্যাগটা গৌণ, ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য। অবশ্য একজন সাহিত্যিকই দুই ধরণের গল্প লিখতে পারেন। প্রমথবাবুর গল্প একত্র পড়লে মনে হয় যে তিনি তাই পারেন। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য আছে। দু'ধরণের গল্পই তিনি ভেবে লেখেন, এবং সেইজন্যই দ্বিতীয় ধরণের গল্পে, যার প্রাণ হল খেয়াল, তাঁর কৃতিত্ব আরো বেশী। খেয়ালের স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, অতর্কিত বিস্ময় থাকবে, অথচ গল্প অখণ্ড হবে, এর জন্য অতিরিক্ত সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন। গতি থাকা অগতির চেয়ে ভাল, কিন্তু পরিণতি না থাকলে কোনো খেয়ালই জমে না। দক্ষতার দিক থেকে ফরমায়েশী গল্প নীললোহিত, বীণাবাই, ঘোষালের সব কাহিনীই, যেগুলির অর্থ ও মূল্য আদিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয় মনে হয়, যেগুলি ধাক্কা খেতে খেতে মোড় সামলাতে সামলাতে চিরনূতন রূপ নিচ্ছে, সেইগুলিই গল্পলেখকের কাছে প্রিয়তর হতে বাধ্য। প্রমথবাবু বার্গসঁর শিষ্য—ক্রিয়েটিভ এভল্যুশনের সাহিত্যিক প্রমাণ এই ঘোষাল মশাইতে দিয়েছেন। এমার্জেন্ট এভল্যুশন লিখলাম না এই জন্য যে যদিও কোন্ খেয়ালে ঘোষাল গল্পকে কোন্ আঘাটায় পৌঁছে দেবে সেটি ঘোষালের নিজের কাছে এমন কি ঘোষালের মুরুব্বী জমিদার মশাইয়ের কাছেও অজ্ঞাত তবু সেটি ওপরকার জমিদার, অর্থাৎ গল্পলেখক প্রমথবাবুর কাছে গুপ্ত নয়। খামখেয়ালের ওভার-লর্ড—রাজাধিরাজ—হলেন আর্টিষ্ট। ছোট গল্পে এই প্রকার মুক্তপুরুষের সৃষ্টি ভারতবর্ষে স্বাধীনচেতার সৃষ্টির চেয়েও শক্ত। বঙ্কিম পেরেছিলেন কমলাকান্ত, ঘোষাল তাঁরই পাশে বসবার দাবী রাখে, আফিমের বদলে হুইস্কী খেলে কি হয়! নির্ব্বাচন-শক্তির ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার সমাবেশ ও অ-সাধারণ চরিত্রের সৃষ্টি অসম্ভব। পাকা ওস্তাদ রাগভ্রষ্টের আশঙ্কা জাগিয়ে রাগরূপ কেবল বজায় রাখেন না, ফুটিয়ে তোলেন। আর্টিষ্ট আত্মসমাহিত বলেই ক্ষণিক বিচ্যুতি তাঁর হস্তামলকবৎ। অন্য ধরণের গল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে

লিখলাম না, কারণ সেখানে পূর্ব্ব প্রতিভাস পরিণতির অনুকূল, যেমন বড় বাবুর বড় দিন, আহুতি প্রভৃতিতে।

অন্য ভাষায়, প্রমথবাবু সচেতন আর্টিষ্ট। কিন্তু বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নন। বুদ্ধি-সর্ব্বস্বদের রচনায় প্রাথমিক সহানুভূতি থাকে না, যেমন সমারসেট মমের গল্পে নেই। কিন্তু প্রমথবাবু গল্পের সব চরিত্রকে স্নেহচক্ষে দেখেছেন, কেবল সিতিকণ্ঠ ঠাকুর ও জমিদার বাড়ির বুড়ো অকর্ম্মণ্য আমলাকেই নয়, আন্দামান ফেরৎ অন্ধ জালিয়াত, লোটন-ঝোটনকেও। প্রগাঢ় সহানুভূতি না থাকলে বৃদ্ধ অধ্যাপকের নবীনা ছাত্রীর প্রতি ক্ষণিক দুর্ব্বলতা হাস্যকর হত, এবং মধ্যবিত্তের বাড়ির সালঙ্করা বধূ-কন্যা পাথরের মূর্ত্তির মতন খোদাই হত না। ঘোষালকে গভীর ভাল না বাসলে সে হত এ-যুগের গোপাল-ভাঁড়। শুষ্ক বুদ্ধির মন্তব্য গুণ্ডার হাতে ছোরা, প্রমথবাবুর হাতে সেটা পাকা খেলোয়াড়ের ছুরি খেলা, অর্থাৎ আঁচড় কেটেই খাপে ঢোকে। প্রমথবাবুর ঘটনাতে, মন্তব্যে যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ থাকে তাতে যন্ত্রণা দেয় না, জ্বলুনি ধরায়। অবশ্য আমরা বাঙ্গালীরা স্নেহ বলতে তেল-ঘিই বুঝি, তাই প্রমথবাবুর সংযত প্রয়োগকে নিছক বুদ্ধির না হয় আভিজাত্যের চিহ্ন ভাবি। পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করা এ-দেশে শক্ত নয়; আমাদের নরম ধাতে যাঁর আবেদন পৌঁছেছে তাঁর বই-ই বিক্রী হয়েছে।

কিন্তু যাঁরা নিজেকে সৎ রাখতে ব্যগ্র, পৃথক নয়, সৎ, যাঁরা সামাজিক পরিবেশ, মানুষের মনোভাব, ঘটনার পরিস্থিতিকে ভাগ্যবিধাতা না মেনে বিচার-বস্তু বিবেচনা করেন তাঁদের ভঙ্গী, তাঁদের রুচি ভিন্ন হতে বাধ্য। এটাকে বুর্জ্জোয়া-সভ্যতার ব্যক্তিস্ববাদ বলে লাভ নেই—এটা পৌরুষ। এই পুরুষকার প্রমথবাবুর প্রতি রচনায় ব্যাপ্ত থাকে; গল্পে প্রকাশ পায় অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত নায়কের প্রতি আন্তরিক টানে, পুরাণো জমিদার-গৃহিণীর দর্পে, যারা গরীব হয়েও মাথা তুলে রেখেছে, যারা ঝড়-ঝাপটায় ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। যে-মানুষ, যে-বাঙ্গালী বিপদের মধ্যেও লড়ে যাচ্ছে সে-ব্যক্তি যে কোনোদিন প্রমথবাবুর গল্পের নায়ক হতে পারেন। এই প্রকার দৃঢ়চিত্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা কতখানি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, কতটা সামাজিক তার বিচার করব না, তবে ঘাড় বাঁকা, গোঁয়ার, খামখেয়ালী ইয়ারের প্রতি দুর্ব্বলতা

থাকা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এবং পরাধীনতা, কেবল পলিটিক্যাল পরাধীনতা নয়, চিন্তার, সমাজের, আর্থিক পরাধীনতা প্রমথবাবুর কাছে বিষবৎ। সে যাই হোক, এই প্রকার পৌরুষভাব প্রমথবাবুর সাহিত্যিক সৎ-বুদ্ধি ও সংযমের, নির্ব্বাচন-শক্তি ও বৈচিত্র্য-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। গণতন্ত্রে মানুষ যদি মনুষ্যত্ব না হারায় তবে প্রমথবাবুর গল্পের খাতির ক্ষুণ্ণ হবে না।

পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর রাসায়নিক সমাবেশে যে-ভাষা তৈরী হয় বাঙালীরা তার নাম রেখেছে বীরবলী ভাষা। অর্থাৎ বীরবলী ভাষা হল প্রমথবাবুর প্রযুক্ত চৈতন্য। সে-সম্বন্ধে গালাগালি হয়েছে বিস্তর, আলোচনা হয়েছে স্বল্প। তা হোক, লোকে স্বীকার করেছে সে ভাষাকে, তাই যথেষ্ট। প্রমথবাবুর গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হল যে বীরবলী ভাষা প্রবন্ধে উপযোগী, কিন্তু ছোট গল্পে অনিবার্য্য। প্রধান কারণ এই: ছোট গল্প কেবল ছোট ও গল্প হলেই সার্থক হয় না, তার ছোটাও চাই; এবং ছোটবার জন্য কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবীর পরিবর্ত্তে শর্ট্ ও শার্টই সুবিধার। ভাষা যদি অযথা বিশেষণে, উপসর্গ ও কৃ ধাতুর নাগপাশে আটকে যায় তবে গতি ও পরিণতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। কি অদ্ভুত কৌশলে, অথচ কত সহজে কৃ ধাতুর ও অনাবশ্যক বিশেষণের ব্যবহার প্রমথবাবু পরিত্যাগ করেন দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। প্রমথবাবুর হাতে মুখের বর্ণনা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিষ। টানা চোখ, টিকলো নাক আর পাৎলা ঠোঁট সকলেই লিখতে পারে, কিন্তু টানা, টিকলো ও পাৎলা শব্দ বাদ দিয়ে ঐ রকম নাক, মুখ ও চোখের বর্ণনা এবং তাদের অধিকারীর জীবন্ত স্বরূপ প্রকট করা কত শক্ত তা একবার লেখকবৃন্দ নিজেরা চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আমার বক্তব্য এই যে বীরবলী ভাষাতেই সে বর্ণনা খানিকটা সম্ভব, পুরোটার জন্য অবশ্য প্রমথবাবুর প্রতিভার প্রয়োজন। এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালী গল্পলেখক ঘটনাকে করায়ত্ত করতে পারেন না বলেই বিশেষণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, সেইজন্য গল্প বর্ণনাবহুল হয়; এবং গতি সম্বন্ধে একপ্রকার অচেতন ব'লে কৃ-ধাতুর অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কথোপকথন দীর্ঘ ও অবান্তর হয়। প্রমথবাবুর গল্পে বর্ণনা ও কথোপকথন একটুও অতিরিক্ত নয়, যতটা পরিণতির জন্য দরকার, যতটা গতিকে সাহায্য করে তার অধিক ব্যবহারে তিনি কৃপণ।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের অর্থ এ নয় যে প্রমথবাবুর ভাষাভঙ্গী একই ধরণের। বিষয়বোধে বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সেটি অসম্ভব। উদ্দেশ্য অনুসারে প্রমথবাবুর ভাষা কখনও হাল্‌কা, কাটাকাটা, যেমন চার-ইয়ারের কথোপকথনে, কখনও গাঢ়সম্বদ্ধ, যেমন আহুতিতে। যেখানে আব্‌হাওয়া তৈরী করা প্রয়োজন সেখানে বীরবলী ভাষা এক কঠিন ছন্দে বেঁধে যায়। আকাশে বাতাসে থম্‌থমে ভাবের বর্ণনা ও গূঢ় ট্রাজেডীর ইঙ্গিত দেওয়া ভীষণ শক্ত। সমুদ্রের মুখে, পদ্মার বুকে ষ্টীমার যাত্রীর কাছে নিসর্গের বর্ণনা পড়তে পড়তে শঙ্কায় পাঠকের দম বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডের শ্মশানের অতুলনীয় বর্ণনার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। শরৎবাবুর কৌশল সেখানে ভিন্ন, রাজলক্ষ্মীর প্রতীক্ষা, শ্মশানের শঙ্কাময় নিজস্ব প্রতিবেশ, এবং পরিচিত গন্তব্যরীতি তাঁকে সাহায্য করেছে। প্রমথবাবুর সেপ্রকার বিষয়-সহযোগ নেই, বরঞ্চ প্রতিকূল ষ্টীমার যাত্রীরা নিতান্তই সন্তুরে এবং র‍্যাশনলিষ্ট; অতএব প্রথম শ্রেণীর ডেক্ থেকে আকাশের ভ্রূণ-কল্পনটি মাত্র ছয়-সাত লাইনে, বিশেষণ-বর্জ্জিত, তথাকথিত মৌখিক ভাষায় প্রকাশ করা ও সন্তুরে পাঠক-পাঠিকার বুক কাঁপানো বীরবলী ভাষার চরম সার্থকতা, প্রমথবাবুর আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বিশেষণ ত্যাগ তখনই সম্ভব যখন বিশেষ্য যথার্থ, ক্রিয়াপদ গতিদ্যোতক, এবং বাক্য অর্থবাহী। ভাষা, বিষয় ও লেখকের সংযম ও নির্ব্বাচন-বুদ্ধির রাজযোটকই আর্ট। যেমন প্রবন্ধে, তেমনই ছোট গল্পে প্রমথবাবু প্রকৃত আর্টিষ্ট।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সু যোগ ও কু-যোগ

বিগত খৃষ্টমাস উপলক্ষে বারাণসীতে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির যে বার্ষিক মহাসম্মেলন সংঘটিত হইয়াছিল—সেই সম্মেলনে আমি 'প্রকৃত যোগ কি?' (What is true Yoga ?) এই নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ফেব্রুয়ারী মাসের 'Theosophist'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যোগ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। 'পরিচয়ের' পাঠকবর্গকে ঐ প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ অবগত করাইতে ইচ্ছা করি।

'প্রকৃত যোগ কি?'—বুঝিতে হইলে, কি যোগ নয়—অর্থাৎ কু-যোগ কি—তাহা বুঝিতে হয়। সেইজন্য আমার এ প্রবন্ধে আমি প্রথমতঃ কু-যোগীর আলোচনা করিব এবং ঐ কু-যোগীর প্রতিভূ-স্বরূপ বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের নায়ক হিট্‌লারকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিব।

সকলেই জানেন হিট্‌লার জার্ম্মাণ নাৎসী সম্প্রদায়ের প্রধান। যাঁহারা ঐ সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতিযুক্ত, তাঁহারা হিটলারকে 'মহাযোগী' বলিয়া খ্যাপন করেন। হিটলার ইতিমধ্যেই কর্ম্মবীর কাইজার উইলিয়মকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং নেপোলিয়ানের মত অদ্বিতীয় ব্যক্তি যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই তিনি অচিরে তাহাই সম্পন্ন করিবেন—অর্থাৎ, পৃথিবীতে একটা নববিধান আনয়ন করিবেন—যাহাকে বলে—'A new world order'। *

* এই New order সম্বন্ধে সম্প্রতি আমেরিকান্ যুক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট কয়েকটি সারকথা বলিয়াছেন। তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

We know that although Prussian autocracy was bad enough, Nazism is far worse. The Nazi forces are not seeking mere modifications in colonial maps or minor European boundaries. They openly seek the destruction of all elective systems of Government in every continent, including our own. They seek to establish systems of Government on the regimentation of all human beings by a handful of individual rulers, who have seized power by force. These men and their hypnotised followers call this 'a new order'. ** The light of Democracy must be kept burning. Millions in Britain and elsewhere are bravely shielding the great flame of Democracy from the black-out of barbarism. It is not enough for us merely to trim the wick and polish the glass. We must provide in ever-increasing amounts to keep the flame alight.

তাঁহারা বলেন যে, হিট্‌লার একেবারে নিরামিষাশী—তিনি নিপট ব্রহ্মচারী—রমণীর কোন ধারই ধারেন না। তিনি নাকি একজন ধ্যানী—একজন উচ্চাঙ্গের তপস্বী—তাঁহার নিভৃত বার্চেস্‌গাডেন দুর্গে তপোনুষ্ঠান করেন এবং অর্ধসমাহিত অবস্থায় ঐ দুর্গস্থ মণ্ডপ-রূপী নির্জন 'গুহা'য় ধীরপদে পাদচারণ করিয়া তাঁহার সমস্ত প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। হিট্‌লার যে এক ধরণের যোগী—ইহা নিঃসংশয়। কিন্তু প্রশ্ন এই—তাঁহার অনুষ্ঠিত যোগ কি প্রকৃত যোগ?

প্রখ্যাত 'শ্বেত সরোজ কথা' (The Idyll of the White Lotus)-নামক থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে আমরা একজন শুক্লাম্বর মিশরীয় ঋষিকের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নাম ছিল আগ্‌মহ্‌দ (Agmahd)। তিনিও একজন যোগী ছিলেন। হিট্‌লারের কথা উঠিলে ঐ আগ্‌মহ্‌দের কথাই মনে পড়ে। 'শ্বেত সরোজ' গ্রন্থে দেখি আগ্‌মহ্‌দ সাধারণ মানুষের জীবন বৃত্তের অতীত; ধীর, স্থির, অজ্ঞেয়, অমেয় ভাবে নীরবতা ও আত্ম সংযমের উচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত—দয়াহীন, মমতাহীন, হৃদয়হীন, যেন অচল-প্রতিষ্ঠ—তাহার অগাধ নীল চক্ষু যেন রত্ন-বিনির্মিত। সঙ্গে সঙ্গে ঐ চক্ষে শীকারী জন্তুর কি ভীষণ কঠোরতা! আগ্‌মহ্‌দের আরাধ্য দেবতা শ্বেত সরোজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন—যিনি প্রজ্ঞা, প্রেম, সত্য ও কৃপার সাকার মূর্তি,—তাঁহার ইষ্টদেবী উমা হৈমবতী নহেন—কালী করালী, যিনি অবিদ্যার জননী—নাস্তিত্বের অভিমানিনী দেবতা—যাঁহার নির্মম চক্ষে নিষ্ঠুরতা দীপ্তিমান্—যাঁহার প্রদীপ্ত কোপে তুষারের কঠোরতা—বিষম বিষধর যাঁহার অঙ্গভূষণ এবং রক্তরাগ জবা যাঁহার মণ্ডন। আগ্‌মহ্‌দ ঐ কালী করালীর উপাসক। 'শ্বেত সরোজ'-গ্রন্থে দেখি আগ্‌মহ্‌দ অভীষ্ট দেবীর পদে তাহার মর্ম কথা নিবেদন করিতেছে—'I demand power—আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বঘাতী শক্তির অধিকারী হইতে চাই—বিশ্বময় আমার স্বার্থপর নির্মম প্রভাব বিস্তার করিব'। দেবী বলিলেন, 'উচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছ?' 'আছি'। 'তবে অমোঘ প্রতিজ্ঞবাণী উচ্চারণ কর।' আগ্‌মহ্‌দ তাহাই করিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডাশ হইয়া গেল--যেন পাষাণ-গঠিত মূর্তি। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি ধীরে গম্ভীরে বলিলেন—'I renounce my humanity'—'আমার মানবতা বর্জন করিলাম।'

হিট্‌লারও ঠিক এই ধরণের। তিনিও তাঁহার 'মানবতা' বর্জন করিয়াছেন।

কে জানে হয়ত তিনি পূর্বজন্মে ঐ আগ্‌মহ্‌দই ছিলেন। প্রভুত্বের মাদকতা হিট্‌লারকেও উন্মত্ত করিয়াছে। মদান্ধ হইয়া এই যোগীও (মানিয়া নেওয়া যাক্ তিনি যোগী) তাঁহার সর্বব্যাপী কঠোরতার অভিনয় করিতেছেন। নির্মম, আত্মম্ভরী, আত্মাভিমানী হিট্‌লারও তাঁহার আত্মতর্পণের ক্ষুধা মিটাইতে বসিয়াছেন—যে ক্ষুধা বিষধরের মত তাঁহার অন্তরের সহিত জড়িত। বিধ্বস্ত য়ুরোপের বক্ষে তাঁহার নির্মমতার ইহাই নিদান। এইভাবে ভাবিত হইয়াই তিনি নিষ্করুণ ও কঠোর। ক্লাণ্ডার্সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী (মেজর মহম্মদ আকবর খাঁ)-র সাক্ষ্য শুনুন:—

'জার্মানরা নিরীহ, নিরস্ত্র পলাতকদিগকে যেভাবে নিপীড়ন করিয়াছে—তাহা বর্ণনার অতীত। তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে এবং মেসিন-গানের গোলাবৃষ্টি করিয়াছে। আমি নিজ চক্ষে এই ঘটনা অন্ততঃ দুইবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃদ্ধ নর-নারী ও শিশু-সন্তান যখন অনশনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃষ্টি ও কর্দমের মধ্যে পালাইতেছে—কোথায় আশ্রয় লইবে জানে না—সেই অবস্থায় তাহাদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ কি নৃশংস ব্যাপার!'

যুবতী ও বালিকা (যাহারা সবে যৌবন সীমায় উপনীত হইয়াছে)—বিজিত দেশে তাহাদের বলাৎকার ও সতীত্ব হরণ—হিট্‌লার যে ব্যাপারের অনুমোদন করিতেছেন—উহারও মূলে ঐ মনুষ্যত্ব-বর্জন। এ সম্বন্ধে ডাঃ অ্যারাণ্ডেল তাঁহার 'Conscience'-পত্রিকায় বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত একখানি পত্র—যাহা মুদ্রিত করিয়াছেন—তৎপ্রতি পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি:—

'বিজিত জাতিকে নিঃশেষে প্রাণশক্তিহীন করিবার জন্য বিজেতা জার্মানরা স্থির নিয়ম করিয়াছে যে, ১৫ হইতে ২৫ বর্ষ বয়স্কা রমণীদিগকে জার্মান Concentration আঙ্গিনায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে কেবল যে তাহাদের দ্বারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করান হয় তাহা নহে—কিন্তু তথায় তাহাদের জার্মান রক্ষকেরা এক এক রমণীর উপর বারংবার বলাৎকার করে। যখন ঐ সকল রমণী নিঃসার হইয়া যায়—তখন একেবারে ভগ্ন শরীরে ও নির্জীব মনে প্রাণে তাহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অনেক রমণী পাগল হইয়া যায়।'

একথা সত্য বটে, এখনও জার্মান জাতি হিট্‌লারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। কিন্তু যেমন দিনের পর রাত্রি আসিবেই, সেইরূপ ইহাও সুনিশ্চিত

যে, হিট্‌লারের অগ্রবর্তী আগ্‌মহ্‌দের যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল, অচিরে হিট্‌লারেরও সেই দশা ঘটিবে। কারণ, সব লোককে সব দিন প্রবঞ্চনা করা চলে না। শক্তিশালী জার্মান জাতি—হিট্‌লার মিথ্যা স্তোকবাক্যে যাহাদিগকে প্রতারিত করিতেছে—তাহারা একদিন বিদ্রোহী হইবেই হইবে এবং ক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ দলবদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ হিট্‌লারের দুর্গদ্বারে হানা দিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগের ঘনায়িত আর্তনাদ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় গর্জিয়া উঠিবে এবং তাহারা ক্রোধে ক্ষোভে অগ্রসর হইয়া হিট্‌লারের দেহকে ধূলিলুণ্ঠিত করিবে—যেমন পুরাকালে আগ্‌মহ্‌দের দেহকে করিয়াছিল। এইরূপে হিট্‌লারের শরীরের অবসান হইবে। কিন্তু তাহার আত্মা?—প্রভাব ও দুরাকাঙ্ক্ষার দুরাশা-জর্জরিত আত্মার ত' ঐ ভাবে শেষ হইবে না। এই কু-যোগী পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করিবে এবং বামমার্গের পিচ্ছিল পথে ক্রমশঃই অধোগামী হইবে। এইরূপে হিট্‌লার পরবর্তী মন্বন্তরে রাবণের দুষ্ট 'অধিকার' বহনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে এবং ধাপে ধাপে দুষ্কৃতির চরম চূড়ায় আরোহণ করিবে। ধর্মের সারগ্রন্থ ভগবদ্-গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অবস্থা অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন—

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম-ভোগার্থমন্যায়েনার্থ-সঞ্চয়ান্॥

—গীতা, ১৬।১২

ঐরূপ ব্যক্তিরা সংখ্যাতীত আশাপাশে আবদ্ধ এবং কামের ও ক্রোধের অধীন হইয়া কামভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক বিত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করে। তাহারা ভাবে আজ ইহা লাভ হইল, কল্য আর এক লাভ হইবে—অদ্য ইহা পাইলাম, ভবিষ্যতে উহা পাইব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

—গীতা, ১৬।১৩

সঙ্কীর্ণ মোহান্ধতায় তাহারা মনে করে 'আমি জগতের প্রভু, আমার সদৃশ

অন্য কে আর আছে—আমি ঈশ্বর—আমি ভোগী—আমি সিদ্ধ—আমি বলবান্—আমি সুখী।'

ঈশ্বরোহম্ অহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া॥

—গীতা, ১৬।১৪-১৫

ঐ সব শ্লোকে গীতাকার হিট্‌লারের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেন নাই কি? তবে উদ্ধৃত শ্লোকে 'ভোগী'র স্থলে পাঠান্তরে 'যোগী' বলিলেই সঙ্গত হয়। তাই বলিতেছিলাম, হিট্‌লার যদি যোগী হন তবে সে যোগ সু-যোগ নহে—কু-যোগ।

এই কু-যোগ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে—আগামী বারে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হেতেমারা ওদের প্রতিবেশী—হেতেমা এবং তার বৌ অলিম্প। সেই অগ্নিকাণ্ড-পর্ব্বে তারা সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল, তার পর থেকে দুই পরিবারের মধ্যে মিলনের সূত্র আরো দৃঢ় হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালো মানুষ, নিতান্তই গোবেচারা। স্বামটি মিউজিয়মে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের চাকরি করে—রোজ দশটায় বেরিয়ে যায় আপিসে, ফেরে সন্ধ্যায়; হেতেমা এবং গোস্যাঁ বহুদিন এক সঙ্গেই গেছে আপিস-মুখো; আর স্ত্রীটি করে ঘর-গেরস্থালির কাজ—সারাদিন ধরেই। তারপর স্বামী আপিস থেকে ফিরলে, স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

গোস্যাঁর ভারী ভালো লাগে ওদের। স্বামী আর স্ত্রী—বিধিমতে বিবাহিত, পবিত্র দাম্পত্য-জীবন! দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে, নিমন্ত্রণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে ক্রমশ সে একটু সঙ্কুচিত বোধ করে। এরাও নিশ্চয়ই ভেবেছে যে, তারাও, তাদের মতই বিবাহিত দম্পতি—এই অনিচ্ছাকৃত ছলনা-সৃষ্টি জন্য তার বিবেক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফানিকে সে বলে দেয়, সমস্ত প্রকাশ ক'রে প্রতিবেশীদের ভুল ভেঙে দেবার জন্য।

ফানি খুব আমোদ বোধ করে গোস্যাঁর কথায়। দেখ ত' কী সরল—ছেলেমানুষ আর বলে কাকে! এই সব নিয়ে, গোস্যাঁ ছাড়া, আর কেউ মাথা ঘামায় নাকি!

'ওরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নি যে আমরা বিবাহিত!' ফানি জবাব দেয়—'এ সম্বন্ধে ভাবেই না ওরা। হেতেমার নিজের বৌ কোত্থেকে যোগাড় করা, যদি তুমি জানতে! তোমার ঐ আদর্শ সতীলক্ষ্মীটি আমার মতই খারাপ! হেতেমা, একা নিজের দখলে ওকে পাবার জন্যই, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। দেখছ ত, অতীত নিয়ে একটুও দুঃখ নেই হেতেমার!'

গোস্যাঁ এই খবরে, ভারী আঘাত পায় মনে—এ কথা ও যেন ধারণাই

করতে পারে না। সব সময়েই হাসিখুশি, পতিপরায়ণা ঐ মেয়েটি, তার উজ্জ্বল চোখ আর অকলঙ্ক মুখ নিয়ে—নাঃ, অসম্ভব! যার প্রশংসায় কবিরা শতমুখ, উপন্যাস উচ্ছ্বসিত,—যে সাধ্বী মেয়ের প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না—ওর কিছুদিন আগের স্বপ্নময়ীর এই অধঃপতন সে সহ্য করতে পারে না।

ফানি কিছু বলে না, হাসতে থাকে কেবল।

আশ্চর্য্য! স্বামীটিও তো অদ্ভুত! এতদিন একসঙ্গে তারা অপিস গেছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তো এই পারিবারিক ইতিহাসের পরিচয় সে কোনদিন পায়নি। কী সুখী, কী পরিতৃপ্ত এই হেতেমা, অথচ সে কেন কেবল ভেবে মরছে, নিষ্ফল ক্রোধ আর ঈর্ষায় পুড়ে খাক্ হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে?

'তুমিও সামলে উঠবে, প্রিয়তম!' ফানি বলে তাকে কোমল কণ্ঠে—'তুমিও একদিন, ওদের মতো, ভুলতে পারবে অতীতকে! তুমিও সুখী হবে একদিন।'

তারপর, একে একে তিন বছর কেটে গেছে—কিন্তু সে কি ভুলতে পেরেছে, সামলে উঠতে পেরেছে কি? সে কি সুখী হয়েছে—এতদিন পরেও?

হেতেমাদের জীবন তেমনি সন্তুষ্ট, তেমনি পরিতৃপ্ত—তেমনি বয়ে চলেছে একটানা; কিন্তু তাদের? আজকাল সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে নিত্যই ওদের ঝগড়া বেধে যায়—এক এক সময় তুমুল হয়ে ওঠে কোলাহল, তখন হেতেমাদের ছুটে এসে, তাদের মাঝে পড়ে থামাতে হয়।

তার জীবনে শান্তি কই, কই সুখ?

ফানি প্রস্তাব করে একদিন পিক্‌নিকে বেরনোর, এই আসছে রবিবারে ছুটির দিনে। পিক্‌নিক হবে সেই লেকের ধারে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, বনের ছায়ায়—তাদের সেই সদ্য-পরিচয়ের কথা স্মরণ ক'রে বেশ হবে প্রেমের স্মৃতি-উৎসব। প্রথম প্রেমের স্মৃতি—প্রথম চুম্বনের।

এখান থেকে হেঁটেই বেরবে তারা—হেঁটেই যাবে সারা পথ। হেতেমাদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়।

'কিন্তু দেখো, ঝগড়াঝাঁটি বাধাবে না তো?' হেতেমারা বলে। কলহ-

কচকচিতে ওদের ভারী ভীতি। শান্তিপ্রিয় লোক ওরা, স্বচ্ছন্দ জীবনের সুরের তাল কাটাতে রাজী নয়।

না, না ঝগড়া করবেনা ওরা। ফানি ওদের আশ্বস্ত করে। এমন মধুর বসন্তকাল—এমন চমৎকার দিন—একি ঝগড়া ক'রে নষ্ট করবার?

দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। হেতেমারা যায় আগে আগে। পিছনে পিছনে ফানি ও গোস্যাঁ।

গোস্যাঁর পিঠে, ব্রেক্‌ফাষ্টের ঝুড়ি, বেশ ভারীই—বোঝার ভারে, বাগানের মালীর মত, নুয়ে পড়েছে সে। এ-সব পিক্‌নিক ইত্যাদিতে তার উৎসাহ হয় না আজকাল, কেবল ফানির জন্যই এই ব্যাপারে তার যোগদান। পরিশ্রান্ত আত্মত্যাগীর ন্যায় সে পিছিয়ে প'ড়ে—চলে সবার পেছনে।

হেতেমা আর অলিম্প আগিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে:

সন্ধ্যাবেলায় শুনতে আমি চাই
ঝরনা-ঝারার
সুরের ধারা
একটি হরিণ পাগল-পারা
ভয়-চকিত
ত্রস্ত ভীত
নয়ন-তারা!—
দেখতে যদি পাই!'

আলিম্পর থলিতে এমন হাজার ছড়ার ছড়াছড়ি—এই ধরণের গানের যোগান তার অফুরান্ত, শেষ নেই। যদি কেউ ভাবে, তার এই সব সঙ্গীত কোন বিশেষ অঞ্চলের আমদানি—সমাজের নেপথ্যবর্ত্তী কোন পল্লীর, পর্দ্দা-ফেলা আবছায়া আধা-আলো আধা-অন্ধকারের অন্তরাল থেকে—সেখানে এর আগে কত পুরুষের কাছে এই সব গান সে এমনি করেই গেয়েছে, তখন তার পার্শ্ববর্ত্তী উৎসাহিত স্বামীর উচ্ছ্বসিত সুরের আতিশয্য দেখে একটু অবাকই হতে হবে তাকে। এমন দার্শনিক জনোচিত নির্ব্বিকার, গোস্যাঁকে বিস্মিত করে দেয়, সত্যিই।

'সন্ধ্যাবেলায় শুনতে আমি চাই
ঝরনা-ঝারার
সুরের ধারা
একটি হরিণ পাগল-পারা
* * *
দেখতে যদি পাই—'

শুনতে শুনতে গোস্যাঁর চোখে সুদূরের স্বপ্ন ভেসে ওঠে—বনহরিণীর স্বপ্ন। এ জীবনে, সত্যিকারের বনহরিণী সে কি দেখতে পাবে আর—তার মনোহারিণীর দেখা কি পাবে কোনদিন?

গান গাইতে গাইতে হেতেমারা সামনে পথের বাঁকের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে—তাদের সুরের রেশ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তখনো, এমন সময়ে পেছন থেকে, চাকার আওয়াজ, শিশুকণ্ঠের উচ্চহাস্য ও উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল ছুটে আসে। মুখ ফিরিয়ে সে দেখে গর্দ্দভ-তাড়িত এক চেজ-গাড়িতে চেপে একদল কিশোরী একেবারে প্রায় এসে পড়েছে তাদের ওপরে। উল্লাসিত কচিকচি মুখ—রিবন-বাঁধা তাদের বেণী উড়ছে বাতাসে; চালিকার আসন যে নিয়েছে, তাদের নেত্রী লাগাম ও চাবুক হাতে সেই মেয়েটি অন্য সকলের চেয়ে খুব সামান্য বড়ো হবে বয়সে।

সেই চালিকাটিকেই সবচেয়ে বেশি চোখে লেগে যায় গোস্যাঁর।

জনবিরল বনপথে, এই অদ্ভুত যাত্রীদের, বিশেষ ক'রে বোঝার ভারে আনত, দলের আর সবার চেয়ে পিছিয়ে-পড়া জাঁকে দেখেই, মেয়েদের আমোদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—বয়স্কা চালিকাটি সামলাবার চেষ্টা করছিল তাদের। 'চুপ কর—চুপ কর—এক মিনিটের জন্যে থাম।'

তাদের চেজের পথ ক'রে দেবার জন্যে, জাঁ সরে দাঁড়ায় রাস্তার একধারে—পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বড়ো মেয়েটি, অপ্রতিভ হয়ে একটু লজ্জিত হাসি হাসে, যেন ক্ষমা চেয়ে যায় গোস্যাঁর কাছে সঙ্গে সঙ্গেই, জাঁর সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়া মাত্র তার মুখে চমৎকৃত বিস্ময় ফুটে ওঠে—যাকে সে বোঝার-ভারে ঝুঁকে-পড়া বুড়ো মালী মনে করেছিল তার অভাবিত তারুণ্য আর

সুন্দর মিষ্টিমুখ, যেন বিদ্যুতের ধাক্কার মত মুহূর্ত্তের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে তাকে।

জাঁ ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে তার টুপি তোলে—লজ্জায় আরক্ত তখন তার মুখ। কেম যে অকস্মাৎ তার লজ্জা পায় সে বুঝতে পারে না। হুড়মুড় ক'রে চলে যায় গর্দ্দভ-বাহিত চেজ তাদের পাশ দিয়ে—দূরে, আরো দূরে—ক্রমশঃ এত দূরে যে তার চাকার শব্দও শোনা যায় না আর।

হেতেমাদের গানের রেশ ভেসে আসছে তখনো :

'সুরের ধারা
পাগল-পারা!
বনহরিণীর নয়ন তারা
দেখতে যদি পাই!'

কিন্তু জাঁ তখন যেন স্পষ্ট শুনছে, হেতেমাদের নাম ছাপিয়ে, কিশোরী মেয়েদের কলকণ্ঠ, উন্মুখর হাস্যধ্বনি, আর সেই মেয়েটির গলার বীণার সুর—'থাম, থাম, চুপ কর, এক মিনিট—!' তার চোখের সামনে তখনো যেন ভাসছে, এই সৌন্দর্য্য-সুষমার ছবি অপরূপ যৌবনের উদ্দাম ঘূর্ণি—এই সব রমণীয় কিশোরীদের কচিকচি মুখ—এক মুহূর্ত্ত আগেই, যাদের গায়ের লাবণ্যে বনপথ উদ্ভাসিত হয়েছে, অরণ্যের শাখা প্রশাখা প্রতিধ্বনিত হয়েছে যাদের কমনীয় কণ্ঠের কলধ্বনিতে।

হঠাৎ হেতেমার রামশিঙার আওয়াজে সে সচকিত হয়ে জেগে ওঠে স্বপ্ন থেকে। অদূরবর্ত্তী নেপথ্য থেকে, রামশিঙা ফুঁকে, হেতেমারা নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করছে—সেখানে, হ্রদের ধারে, জাঁ গিয়ে মিলিত হয় তাদের সঙ্গে।

হেতেমা, অলিম্প ও ফানি, আগে থেকেই, প্রকাণ্ড শুভ্র চাদর বিছিয়ে, জমিয়ে বসেছে। জাঁ যেতেই, তার কাঁধ থেকে ব্রেক্‌ফাষ্টের বাস্কেট নামানো হয়—খোলা হয়। তারপর সুরু হয় প্রাতরাশের পরিবেশন।

'বাঃ, লব্‌ষ্টার পড়েছে হে তোমার পাতে!' হেতেমা চেঁচিয়ে ওঠে। পেটুক হেতেমা।

'তোমার দেরি হচ্ছিল কেন, শুনি?' ফানির কণ্ঠ তীক্ষ্ণতর—'বোঁশেরোর ভাইঝিটার জন্যে বোধ হয়?'

তড়িৎস্পর্শের মত চমকে ওটে জাঁ—'বোঁশেরো! সেই বিখ্যাত চিকিৎসক বোঁশেরো—তার ভাইঝি!'

হেতেমা বলে—'বোঁশেরোর ভাইঝিইত! তাই আমার চেনাচেনা ঠেকছিল! ঐ লম্বা মেয়েটাই ডাক্তারের ভাইঝি! সুন্দরী বটে।'

'হ্যাঁ, সুন্দরী!' রুটি কাটতে কাটতে ফানি বলে, 'সুন্দরী না ছাই! কেবল চাল সর্ব্বস্ব।'

বলতে বলতে সে তাকায় তার প্রেমিকের দিকে—কিন্তু গোস্যাঁর উন্মনা দৃষ্টি, অসচ্ছন্দতা সঞ্চার করে তার মনে।

শ্রীমতী অলিম্প মাংসের মোড়ক খুলতে খুলতে, কঠোর মন্তব্য করে, মেয়েদের এই ভাবে পথে ঘাটে একলা ছেড়ে দেবার বিরুদ্ধে।

'তুমি বলতে পারো যে ইংরেজদের চাল-চলনই ঐ ধরণের—'সে বলে : 'এবং এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই লণ্ডনে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে, তবু এসব ঠিক নয়।'

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে থাকে অলিম্প।

'তা বটে—' বলে ফানি : 'তবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে এতে।'

'ওঃ, ফানি!'

'মাপ করো, আমি ভুলেই গেছলাম। তোমরা যে মেয়েদের সতীত্বে বিশ্বাসী!'

'এস, এস—খাওয়া সুরু করা যাক।' ব্যস্ত হয়ে বলে হেতেমা। কথা-বার্ত্তার গতিক থেকে তার আশঙ্কা হয় এখনি হয়ত ঝগড়া চেঁচামেচির ঝড় বেধে গিয়ে সব না পণ্ড করে।

কিন্তু নিরস্ত হবার মেয়ে নয় ফানি, এই সব মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই সে প্রকাশ করতে পারে—তার বক্তব্য না বলে ক্ষান্ত হবে না সে। এই সম্পর্কে প্রচুর মজার গল্পই তার মজুত; ইস্কুল, বোর্ডিং হাউস ইত্যাদির—মেয়েদের পাঠাগার খুব খাশা জায়গাই বটে এই সব। এই সব মেয়ে, যখন

বিত্তের বোঝা হয়ে, বেরয় সে সব জায়গা থেকে, তখন কি আর অবশিষ্ট থাকে তাদের!—না স্বাস্থ্য, না যৌবন, না গর্ভধারণের শক্তি, না ছেলেমানুষ করার ক্ষমতা—ধুয়ে, মুছে, নিঙড়ে নেয়া যত বস্তাপচা মাল!

'তখন এই সব মেয়েদেরই গছিয়ে দেওয়া হয় তোমাদের ঘাড়ে—যেমন আহাম্মক তোমরা! চাপিয়ে দেয়া হয় সতীকুমারী বলে! সতী মেয়ে! যেন সতী মেয়ে সত্যিই আছে পৃথিবীতে; না, ছিল কোনকালে! তা সে বাড়ির মেয়েই হোক, আর বাজারেরই হোক—যেন জন্ম থেকেই মেয়েরা জানে না কাকে কি বলে। যদি আমার কথাই বলো, বারো বছর বয়সেই, আমার জানবার আর কিছু বাকী ছিল না। এবং তোমারও নিশ্চয়ই না', অলিম্প!'

'তা ঠিক।' ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় শ্রীমতী অলিম্প—কিন্তু পিক্‌নিকের পরিণতি যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা বুঝতে তার দেরি থাকে না, কেন না গোস্যাঁ, এই এই ধরণের কথাবার্ত্তায় ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে দেখতে পায়।

গোস্যাঁ বলে ওঠে:

'সব মেয়েই কিছু সমান নয়। এখনো অনেক ভদ্র পরিবারে এমন সব মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়—'

'হ্যাঁ, ভদ্র পরিবারে!' ফানি বাধা দিয়ে ওঠে ঘৃণাবঞ্জক কণ্ঠে—'যা বলেছ! ভদ্র পরিবারের কথাই হোক তবে। ধরো, তোমাদের পরিবারেই—দিভোনের কথাই ধরা যাক না কেন—'

'থামো! চুপ করো বলছি!' চেঁচিয়ে ওঠে গোস্যাঁ!

'আহাম্মক!' ফানির গলাও তীব্র।

'একটা বেশ্যা কোথাকার! আমার বরাত ভালো যে বেশি দিন আর তোমার সঙ্গে থাকতে হচ্ছে না।'

'যাও, এক্ষুনি যাও। যেখানে খুশি—এক্ষুনি যেতে পারো তুমি। আমিই খুশি হব তাতে।'

এই ভাবে পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণ চলে, তার মধ্যে অকস্মাৎ হেতেমার রামশিঙার আওয়াজে দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে:

'কী, হোলো তোমাদের ঝগড়া? না, আরো চলবে?'

ওদের থামাবার আর কোনো উপায় না দেখে, হেতেমা, রামশিঙার কর্ণ-বিদারী শাসনদণ্ড উদ্ধত করেছে।

১১

তারপর আরো কিছুদিন কেটে গেছে।

গোস্যাঁ কি কাজে গিছলো প্যারিসের বাইরে—ফিরবার মুখে, ট্রেনে উঠতেই, একটি কিশোরী মেয়ের সঙ্গে তার দৃষ্টির মিলন হলো। হতেই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই বনপথের পূর্ব্ব-মিলনের কথা। সেই ভাস্বর মুখ, তার চোখের সামনে, প্রথম দর্শনের পর থেকে যে-সুন্দর মুখের স্মৃতি তাকে দিনরাত অস্থির করেছে—বিধুর ক'রে তুলেছে তার প্রতি মুহূর্ত্ত।

আজো তার পরণে তেমনি উজ্জ্বল রঙের পোষাক, কামরার যেখানটিতে সে বসেছে, সেখানে সূর্য্যের আলো এসে, তার পোষাকে বিস্তৃত হয়ে যেন রামধনুর মায়া বিস্তার করেছে। তার পাশে এক গাদা বই, ছোট্ট ব্যাগটি, এবং এক তোড়া ফুলের গোছা। ইস্কুলের ছুটি দেশে কাটিয়ে এখন আবার প্যারিসে ফিরছে সে—স্পষ্টই বোঝা যায়।

মেয়েটিও যে তাকে দেখেই চিনেছে, তার চোখের কোণের প্রচ্ছন্ন মৃদু হাস্যেই তা প্রকাশ পায়। সেই মুহূর্ত্তে, দু'জনের মনে, অপ্রকাশের অগোচরে, একই ভাবের ঢেউ দোলা দিতে থাকে।

'তোমার মা কেমন আছে, মর্সিয়ে দ'আরমেন্দি', বুড়ো ডাক্তার বোঁশেরো, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন জাঁকে। কামরার অন্য কোণে খবরের কাগজের মধ্যে নিহিত অধ্যায়নরত ডাক্তারকে সে দেখতে পায় নি এতক্ষণ।

জাঁর তখন মনে পড়ে যায় যে এই মেয়েটি ডাক্তার বোঁশেরোর ভাইঝি। এবং ডাক্তারকেও সে চিনতে পারে—মার একবার শক্ত অসুখের সময় ইনিই চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে ছিলেন তাঁকে। এতদিন পরেও ডাক্তার তার মাকে মনে রেখেছেন, তাকেও চিনতে পেরেছেন, ভেবে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

জাঁ মার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জানায়। তারপর আর কোন কথা হয় না।

কথা হয় না, তবু আনন্দের ফল্গুস্রোতে তার মন আপনা থেকেই ভ'রে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও, নিজের জীবনকে সে মরুভূমি বিবেচনা করেছিল, কিন্তু এখন, জানালার মধ্য দিয়ে, ধাবমান মাঠ-ঘাট গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'তে থাকে, জীবনে রহস্যের আর শেষ নেই ; কত অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারই না এর অগোচরতার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে, অকস্মাৎ নিজেকে উন্মোচিত করার অপেক্ষায়।

অনেক্ষণ ধরে লম্বা এক হুইসল্—তারা এসে পৌছল ! সে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়। আবার তার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—আর কি সে মেয়েটির দেখা পাবে ফের ?

বাহিরের ভীড়ের মধ্যে আবার বোঁশেরোদের সঙ্গে দেখা হয় তার। বোঁশেরো জাঁকে ডেকে বলেন—'আসছে বৃহস্পতিবার তুমি এসো আমাদের বাড়ি। চায়ের নিমন্ত্রণ থাক্‌ল তোমার। অবশ্য যদি তুমি ইচ্ছা কর—'

ঠিকানা ? প্লেস্ ভেনদোম্। বিখ্যাত ডাক্তার বোঁশেরোর ঠিকানা প্যারিসে কে না জানে ? জাঁর মনে হয়, মেয়েটিই কাকাকে অনুরোধ ক'রে এটি করেছে—নিজে সে নির্ব্বাক থাকলেও, এ তারই নিমন্ত্রণ।

বাসায় ফিরে অনেক ভাবে জাঁ। যাবে কি যাবে না—বহু ইতস্ততঃ করে। কেন অনর্থক দুঃখের বোঝা আরো বাড়ানো ? তার পঙ্কিল জীবনে ফুলের মত পবিত্র এই মেয়ের আসন কোথায় ? এই মেয়েটিকে তো সে পাবেনা জীবনে,—পেতে পারেনা। তবে—তবে আর কেন ?

তবু সে ফানিকে জানিয়ে রাখে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাদের সরকারী আপিসে মন্ত্রীরা সমবেত হবেন, সেই উপলক্ষে সমারোহ আছে। তাকেও উপস্থিত থাকতে হবে তখন সেখানে—অতএব সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত্রি হবে তার।

ফানি জাঁর পোষাক গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে, শাদা টাই-টা ইস্ত্রি ক'রে রাখে—কিন্তু বৃহস্পতিবার এলে, বিকেলে অপিস থেকে ফেরার পর, সন্ধ্যায় আর বাড়ির বাহির হবার ইচ্ছা হয় না জাঁর। কেবলি তার মনে হ'তে থাকে, কেন, কি জন্য ? কেন এই মরীচিকার পেছনে বৃথা ছুটে মরা ?

কিন্তু ফানি তাকে বোঝায়, তাকে পেড়াপিড়ি করে যাবার জন্য।

অপ্রীতিকর হলেও, এটা কর্ত্তব্য—তার যাওয়াই উচিত, মন্ত্রীরা খুশি হবেন—এর ওপর ভবিষ্যতের উন্নতি নির্ভর করছে তার। না ফানি অত স্বার্থপর নয় যে, নিজের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, এমন সন্ধ্যায় তাকে ধরে রাখবে—তার ভবিষ্যতের প্রতি কি ফানির দরদ নেই ? ফানি নিজেই গরজ করে তার চুল আঁচড়ে, পোষাক পরিয়ে, আদর ক'রে বুঝিয়ে সুজিয়ে, একরকম জোর করে, তাকে বাধ্য করে বেরুতে। বাড়ির বাহির পর্য্যন্ত নিজে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে।

গোস্যাঁ যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে। ফানি পড়েছে ঘুমিয়ে, সামনে বাতিদানে আলো জ্বলছে—সেই আলোর আভা পড়েছে ফানির মুখে। তিন বছর আগের এই রকম একটা দৃশ্যের কথা তার মনে পড়ে যায়। সেই, যেদিন সে ফানির অজ্ঞাত জীবনের ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে বাড়ি ফিরল। কী ভীরুতাই না সে দেখিয়েছে সেই সময়, কী কাপুরুষই না সে ছিল তখন। কী উন্মত্ত ঈর্ষার আগুনই না তখন জ্বলেছিল তার বুকে। যে-শৃঙ্খল তার সেদিন সেই মুহূর্তেই ভেঙে ফেলে, এই নারীর কবল থেকে বেরিয়ে আসবার কথা—আজ সেই শৃঙ্খলই কত ভারী হয়ে, কত বোঝা হয়ে এবং আরো কত দৃঢ়তর হয়ে না তাকে জড়িয়ে ধরেছে এখন। এ-থেকে কি সে মুক্তি পাবে কোনদিন ?

এক বিজাতীয় ঘৃণা এসে তার মন অধিকার করে। এই ঘর, এই বিছানা, ঐ নারী, সবই তার মনে দারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। আলোটা নিয়ে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে চলে যায় সে। সে থাকতে চায় একাকী, নিজের নির্জ্জনতায়, নিজের অন্তর্নিহিত চিন্তার মধ্যে—সদ্য-লব্ধ অপরূপ অনুভূতির অন্তরালে—কী আশ্চর্য্য বিস্ময়ই না ঘটেছে আজ তার জীবনে—

সে ভালোবেসেছে।

কতকগুলো এমন কথা আছে, যা আমরা সচরাচর অত্যন্ত সহজ ভাবেই ব্যবহার করি প্রত্যহ—কিন্তু তাদের মধ্যে গুপ্ত থাকে এক গোপন রহস্যের উৎস, যা হঠাৎ অকস্মাৎ একদিন উন্মুক্ত হয়ে, তাদের সত্যকার মানে আমাদের জানিয়ে দেয়। সেদিনই আমরা তার গভীরতার অর্থ উপলব্ধি করি অভিনব

বিস্ময়ে—তারপর আবার জীবনধারা গড়িয়ে চলে, আবার হারিয়ে যায় সেই সব কথার যথার্থ মানে—আবার তারা বাজার-চল্‌তি ছেঁদো কথা হয়ে দাঁড়ায়।

ভালোবাসা হচ্ছে এই ধরণের একটি কথা। যারা এর অর্থ অন্ততঃ একবারো জেনেছে জীবনে, তারাই বুঝতে পারবে, কী মধুর বেদনায় এখন পীড়িত হচ্ছে জঁার মন ;—যার অনুভূতি তাকে গত এক ঘণ্টা থেকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, অথচ যার কারণ আবিষ্কার করা তার পক্ষে কঠিন।

প্লেস্ ভেনদোমে কী চমৎকারই না কাটল আজকের সন্ধ্যাটা! সেই মেয়েটি—সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি ছিল তার কত কাছাকাছি—কতক্ষণই না তারা একসঙ্গে কত কি গল্প করেছে—

স্বপ্নের মত কেটে গেছে আজকের সন্ধ্যাটা! প্রকাণ্ড ঈগল পাখীর মত দুই বিরাট পক্ষবিস্তার করে তার জীবনের উপর দিয়ে—কয় মুহূর্ত্তের জন্য?

'হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবাসি—ভালোবাসি। হ্যাঁ, ভালোবাসি আমি তাকে।'

নিজের মনেই বারবার উচ্চারণ করতে থাকে জঁা।

'জঁা তুমি কি এই ঘরে? কি করছ তুমি?'

ফানি ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে, বিছানার পাশে গোস্যাঁকে না পেয়ে, সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ফানির পাশে এক শয্যায় আশ্রয় নিতে আজ আর ইচ্ছা করে না জঁার। সে এখানে বসে থাকবে, এই চেয়ারেই, সারারাত, তার জাগ্রত স্বপ্নের মধ্যে—সেই তার ভালো।

মিথ্যা ক'রে সে বলে :

'কাল অনেক কাজ আছে অপিসের। সেরে রাখছি।'

'ও ঘরে তো আগুন নেই। ঠাণ্ডা লাগবে তোমার।'

'না না।'

জঁা আর কিছু বলে না, বলতে চায়ও না—যে-উত্তাপ তার অন্তরে আজ উত্থিত হয়েছে, তাতে হয়ত সাইবিরিয়ার শীতও তার কাছে পরাভব মানত।

ফানি ঘুমিয়ে পড়ে আবার। জঁা অনেক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন থেকে, তারপর চিঠি লিখতে বসে। চিঠি লেখে তার কাকা কেজ্যারকে। বাড়িতে সেই তার বন্ধুর মতো, তাকেই সে সব কিছু খোলাখুলি জানাতে পারে, সমস্ত বিশদ বর্ণনা ক'রে তার কছেই সে, উপদেশ চায়—এখন কী করবে সে, এই অবস্থায়।

সমস্তই সে খুলে বলে, সেই বনপথের সাক্ষাৎ, তারপরে ট্রেনের দেখা—তারপরে আজকের তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা। কী রকম দেখতে সে মেয়েটি, আর কতখানি তার ভালো লেগেছে তাকে।

'… …যখন সে আমার সামনে বসে কথা বলছিল, গল্প করছিল আমি অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তার দিকে। এক মুহূর্ত্তেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই মেয়েই আমার মানসী, একেই আমি চাই, চেয়েছি সারাজীবনে—একে না পেলে আমি বাঁচব না। এক্ষুনি আমি একে নিয়ে চলে যেতে চাই, কোন সুদূর বিদেশে, যেখানে দু'চোখ যায়… …'

'এস শোবে এস, প্রিয়!'

চম্‌কে উঠে গোস্যাঁ চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলে। রাগত স্বরে জবাব দেয় :

'যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি।'

তারপর আবার লিখতে সুরু করে :

'কিন্তু এর সঙ্গে বিবাহ, সে কি সম্ভব! বিয়েই আমি করতে চাই—কিন্তু ফানি, ফানি কি আমাকে ছাড়তে চাইবে? ছাড়াছাড়ির কথা উঠলেই সে যে কি কাণ্ড বাধাবে সেই ভয়েই আমি মরছি। তুমি আমার জীবনের সবই জানো, যদিও এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি আমাদের মধ্যে—তবুও। তেমনি কাটছে আমাদের জীবন, যেমন তুমি দেখে গেছলে।—এখনো নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি আমি। কিন্তু আজ আমি মুক্তির জন্য পাগল হয়ে উঠেছি, মুক্তি আমার চাই-ই—কিন্তু পথ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো এসব বিষয়ে অনেক কিছু জানো, অনেক অভিজ্ঞতা তোমার—তাই তোমার উপদেশ চেয়ে এই চিঠি লিখলাম।'… ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

অলফঁস দোদে-র 'সাফো' হইতে অনূদিত

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের উল্লেখের সহিত আমরা 'গহপতিদের (গৃহপতি) উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাই। ইহারা একটি শ্রেণী নয়; ইহারা ধনী নাগরিক এবং নিজেদের বাড়ীর কর্ত্তা ছিল। তাহাদের অতি বিশিষ্ট ও অভিজাত প্রতিনিধিদের 'শেঠী' (শ্রেষ্ঠী) বলিত। ইহাদের সহিত রাজ-দরবারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিত। শেঠীর সামাজিক পদ যেমন পুরুষানুক্রমিক ছিল, তাহার পিতার পদটিও (শেঠীথান) পুত্র পাইত। হয়ত বংশের ধন ও মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শেঠী গোষ্ঠীরা নিজেদের জাতির মধ্যেই বিবাহ-প্রথা প্রচলন করিয়াছিল। সমপদমর্য্যাদাসম্পন্ন বিবাহ ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টার সহিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেষ্ঠীবংশের লোকদের অপেক্ষা নিম্ন অথবা তন্নিম্নজাতীয় লোকদের প্রতি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব উদ্ভব হইয়াছিল। এই বিদ্বেষ চণ্ডাল শ্রেণীর লোকদের উপরই বেশী প্রয়োগ হইত।

এই সময়ের একটি বিশিষ্ট অর্থনীতিক বিবর্ত্তনের স্বরূপ প্রকাশ পায় ব্যবসায়ী সংঘগুলির (Trade Associations) মধ্য দিয়া। ভারতীয় সভ্যতার গোড়া হইতেই ব্যবসায়ী সংঘের উদ্ভব হয়; অর্থনীতিক কারণে, যেমন মূলধনকে ভাল উপায়ে খাটাইবার প্রয়োজনে, ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশার জন্য, নিজেদের শ্রেণীর আইনগত স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে উক্ত হইয়াছে যে কৃষিজীবি, ব্যবসায়ী, গোপালক, কুসীদজীবি, কারিগর প্রভৃতির স্বীয় শ্রেণীর জন্য নিজেদের বিশিষ্ট আইন আছে; এই আইন রাজার নিকট গ্রাহ্য (১)। পরবর্ত্তী আইন পুস্তক

১। গৌতম সংহিতা—১১, ২১।

সমূহে 'শ্রেণী' (Guild) বিষয়ক কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে। মনুতে (৮, ৪১) উক্ত আছে—'রাজা শ্রেণীধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বকীয় ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন।' মহাকাব্যগুলিতেও ব্যবসায়ী-সংঘগুলি কেবল কারবারী জীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত আছে (২)। এই সকল ব্যবসায়ী সংঘের মধ্যে পেশা অনুযায়ী সংঘের অস্তিত্ব জাতক সমূহে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত আছে। যেসব গোষ্ঠীতে ব্যবসায় অথবা কারবার বংশপরম্পরাগত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি বৃত্তি বা পেশা অনুযায়ী সংঘ সংগঠন করে। তাহাদের শীর্ষদেশে একজন নেতা (জেটটক) থাকিত। কিন্তু এই তালিকাতে সমুদ্র গমনকারীদের সংঘের কোন উল্লেখ নাই! ব্যবসায়জীবিদের এই সংঘসমূহ বংশপরম্পরায় সভ্য সমূহ পাইয়া যখন কালক্রমে বিবাহ ও একত্র ভোজন বিষয়ে কতকগুলি আইন-কানুন বিবর্ত্তিত করে তখন যথার্থ 'জাতি' (Caste) সৃষ্টি করিয়া আধুনিক ব্যবসায়ী জাতিসমূহে পরিণত হয় (৩)।

এই সংঘ-পদ্ধতির মধ্যে ব্যবসায়ী সংঘগুলি পেশার বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরস্পর স্পষ্টভাবে বিভিন্ন ও বিভক্ত থাকিত। এই ব্যবসায়ীদের, যেমন মালাকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির—শীর্ষে একজন করিয়া 'জেঠঠক' থাকিবার রীতি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, তাহাদের নিজেদের সংঘ ছিল। 'সমুদ্দবণিজ জাতক' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একটি গ্রামে যদি এক হাজার সূত্রধর গোষ্ঠী বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক পাঁচহাজার গোষ্ঠীর শীর্ষে একজন করিয়া নেতা থাকিবে (৪)।

উপরোক্ত তিন অবস্থা—যথা, বিভিন্ন পেশার স্থানীয় বিভাগ, পেশা

২। Hopkins—Ruling Caste, P 8

৩। Fick—Die Sociale Gielderung in Nordoestlichen Zu Buddhas Zeit' (Social Organization in North-East India in Buddha's time) Translated by S. K. Maitra, Pp 275—277.

৪। ইংলণ্ডে বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় কারখানা সমূহে যে "Shop-Steward" পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা এই ব্যবস্থার কালোপযোগী রূপ বলিয়া অনুমিত হয়। এবং বঙ্গের তন্তুবায় শ্রেণীর (জাতি) মধ্যে যে "চাই" (leader) থাকার পদ্ধতি ছিল বা এখনও আছে তাহা এই 'জেঠঠক' পদ্ধতিরই বংশধর বলিয়া অনুমান হয়।

বংশগত হওয়া এবং একজন নেতা বিদ্যমান থাকা দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে হস্তশিল্প-পেশাগুলির (Handicrafts) ইউরোপের মধ্যযুগের ব্যবসায়ী সংঘগুলির (Trade Guilds) সহিত অনেক বিষয়ে তুলনা হইতে পারে। এই শ্রেণীগুলিই অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীদের অনুকরণে আহার ও বিবাহ বিষয়ে নিজদিগকে গণ্ডীভূত করতঃ নিজেদের শ্রেণীর নিম্নের লোকদের সহিত পৃথক করিয়া পরে জাতিতে পরিণত হয় বলিয়া অনুমিত হয় (৫)। এই পেশা সংঘগুলি ব্যতীত জাতকে সঙ্গীতকার, নৃত্যকার, বাদ্যকর, হস্তীবশকারী (tamer), ধানুকি প্রভৃতি পেশা ছিল। কিন্তু উহারা হয়ত 'জাতি'র ন্যায় কোন সংঘ সংগঠন করে নাই, তত্রাচ পরে মনু 'নটদের' মিশ্রিত জাতির তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

এই সংঘবিহীন পেশাগুলি অপেক্ষাও শাস্তিভোগী গোলাম (দণ্ডদাস) শ্রেণীদের সংঘবদ্ধতার বিষয় প্রাচীন পুস্তক সমূহে অনেক কমই উল্লেখ আছে। বোধ হয় যাহারা পুরুষানুক্রমিক দিনমজুরী (day-labour) করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাই চাকর হইত। অত্যন্ত স্বল্প মহিয়ানা এবং জাতির ন্যায় পেশাসংঘের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উপরে উন্নীত হওয়া অসম্ভব ছিল বলিয়া যে-সকল ভারতীয় দিন-মজুরী খাটিয়া দিন যাপন করিত তাহারা দারিদ্র্যের মধ্যেই জন্মিয়াও পালিত হইয়া তাহাদের অবস্থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান বা ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাকে (দরিদ্র অবস্থা) পুত্রদের পৈতৃক অবস্থা বলিয়া প্রদান করিয়া ইহ জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিত। ভারতীয় পতিত সাধারণের আজও সেই মনোবৃত্তি পূর্ণভাবেই রহিয়াছে। গঙ্গামালা জাতক অনুসারে (৩, ৪, ৪৫) এই দিনমজুরেরা মনিবের বাড়ীতে খাইতে পাইত; কিন্তু সন্ধ্যার সময় নিজেদের বাসায় গিয়া রাত্রি যাপন করিত (আমেরিকায় নিগ্রো গোলামদের log-house ব্যবস্থার ন্যায়)। দিন-মজুরদের এই অবস্থা কিন্তু পতিত দাসদের অপেক্ষা ভাল ছিল। প্রথমোক্তেরা অন্ততঃ যখন ইচ্ছা মনিব পরিবর্ত্তন করিতে পারিত, কিন্তু দাসদের (গোলামদের) কোন প্রকার স্বাধীনতাই ছিল না, তাহারা গরুর মতন অধিকার-বিহীন ছিল এবং

৫। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time : Translated by S. K. Maitra, Pp 284-285.

সম্পূর্ণরূপে মনিবের করুণাধীন থাকিত (৬)। দাসদের আইগত কোন অধিকার না থাকায় তাহাদের কার্য্যও মনিবদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করিত। অনেকস্থলে এই দাসদের প্রতি অতি মন্দ ব্যবহার করা হইত। চাবুকের দ্বারা প্রহৃত হওয়া, কয়েদ (আটক) হওয়া, মন্দ খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি তাহাদের ভাগ্যে প্রায়শঃই ঘটিত। ইহা সত্ত্বেও ঘৃণ্যশ্রেণী সমূহ অপেক্ষা সমাজে তাহাদের স্থান অন্য প্রকারের ছিল। তাহারা অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত না, কারণ তাহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে মনিবের খুব ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিতে হইত; তাহাদের মনিবের বস্ত্র পরিধান করিতে ও পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করিতে হইত—গাত্র প্রসাধনে সাহায্য করিতে হইত এবং মনিবদের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতে হইত। মনিবদের পরিবারে থাকিত বলিয়া তাহাদের কোন সংঘ ছিল না, তাহাদের অবস্থা গ্রীক ও রোমানদের গোলামদের অবস্থার ন্যায়ই ছিল; এবং তাহাদের ন্যায় সুবিধানুসারে স্বাধীনতাও প্রাপ্ত হইত। 'সোন-নন্দ' জাতকে আমরা এই প্রকারের মুক্ত গোলামদের কথা পাই। এই পতিতগণ ব্যতীত কতকগুলি ঘৃণ্য শ্রেণী বা জাতি ছিল। এই যুগের বৌদ্ধ পুস্তকে ঘৃণ্যদের সম্বন্ধে মনুর বর্ণনা (৭) যে ঘৃণ্যেরা নিজেদের পরিচয়ের জন্য রাজ আদেশে বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করিত—তাহা পাওয়া যায় না; তথাপি জাতকে ইহা পাওয়া যায় যে চণ্ডালেরা তাহাদের পোষাক ও ভাষার দ্বারা সাধারণের নিকট ধরা পড়িত। অস্‌সলায়ন সূত্রে চণ্ডালদের সহিত বেণ, রথকার, পুক্কসদেরও (নিষাদ) ছোট জাতি (সূত্র বিভিঙ্গ পসিত্তিয়' পুস্তকে ২, ২১ ইহাদিগকে 'হীননাম জাতি' বলা হইয়াছে) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হইয়া তাহারাও সহরের বহির্দ্দেশে বাস করিত (৮)।

ফিক্ বলেন—এই জাতিগুলি হয়ত জাতীতত্ত্বীয় জাতি' (Ethnological

৬। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time : Translated by S. K. Maitra, P 306.

৭। মনুসংহিতা—১০,৫৫।

৮। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time ; Translated by S. K. Maitra, Pp. 321—323 ; 330.

Castes) * ছিল ; অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের একটি কৌম আর্য্য সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া একটি জাতি (caste) রূপে সংগঠিত হইয়া সমাজের বর্হিদ্বারে অবস্থিত ছিল (৯)। এই সঙ্গে অনেক জনসংঘ ছিল যাহারা তথাকথিত নীচ জীবিকা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া 'ঘৃণ্য' জাতি সমূহের মধ্যে গণ্য হইত : যথা, বেত ও বংশের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, চর্ম্ম প্রস্তুতকারক, মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুতকারক, প্রভৃতি ; নাপিতও ছোট জাতি বলিয়া এই সময় গণ্য হইত (১০)।

বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের যে-চিত্র পালি প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে ব্রাহ্মণদের বর্ণিত চারিটি পৃথক জাতি (caste) ও তাহাদের বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে মিশ্রিত জাতি সমূহের বদলে আমরা কতকগুলি পৃথকীকৃত সামাজিক শ্রেণী (Class) দেখিতে পাই যাহারা জাতি ছিল না কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বর্ত্তমান কালের জাতি-ভেদের বীজ নিহিত ছিল। ফিক্ বলেন—ভারতীয় প্রাচীন 'জাতি' শব্দটির অর্থ ছিল 'শ্রেণী' (Class) (১১)। ইহা গ্রীক 'Gene'র ন্যায় অর্থ ছিল ; পরে বহুশতাব্দীর বিবর্ত্তনের পর 'জাতি' বর্ত্তমানের Caste-এর রূপ ধারণ করে (১২)।

এইযুগে প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান হইতেছে—'শ্রেণীভেদ' বিবর্ত্তন। তজ্জন্য অন্যদেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত যেসব অনুষ্ঠান সংযোজিত হইয়াছিল, ভারতেও তাহার অভাব হয় নাই। প্রথমে অভিজাতশ্রেণী বিবর্ত্তিত হইয়া নিজেদিগকে গণ্ডীভূত করিয়া নিম্নশ্রেণীকে ঘৃণা করিত এবং নিজেদের

* এইপ্রকারের অভিব্যক্তি এখনও ভারতে চলিতেছে। এতৎসম্বন্ধে Risley-র Peoples of India এবং B. S. Haikerwall—*E conomic and Social Aspects of Crime in India* পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৯। এই প্রকারের অনেক জাতি এখন 'অস্পৃশ্য' হইয়া হিন্দু সমাজের ভঙ্গ জাতিগুলির বাহিরে আছে।

১০। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time : Translated by S. K. Maitra, Pp. 321—323 ; 330.

১১। হালে Vincent Smith ও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

১২। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time : Translated by S. K. Maitra, P. 335.

রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিল। রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত ছিল বলিয়া তাহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোক বলিয়া দাবী করিত। এই সময়ে উচ্চশ্রেণী সমূহের লোকেরা নিম্ন পেশার লোকদের ঘৃণা করিত। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের সহিত একটা শ্রেণীর পদমর্য্যাদারও তারতম্য হইত। নিকৃষ্ট পেশার লোকেরা দরিদ্র ছিল বলিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। তাহাদের পেশার নিকৃষ্টতা অনুসারে শূদ্র অথবা শূদ্র অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া পতিতগণকে অভিহিত করা হইত। অধিকার-বিহীন ও নিকৃষ্ট পেশার লোকেরা রাজশক্তি-নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইত এবং কতকগুলি শ্রেণীকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। এই সময় হইতে আমরা Hypergamy বিবাহ পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পুরুষ উচ্চশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই প্রথা প্রচলিত হইতে দেখি। কোন অন্যায় বা দোষ করিলে শাস্তির সময় উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কম শাস্তি পাইত ইত্যাদি। এইসব রীতিগুলি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসেও নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। শেষতঃ আসে 'গীল্ড প্রথা'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের ন্যায় ভারতেও একই কারণে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতে দেখি। তৎপর মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যবসায়ী সংঘ হইতে যেমন 'শিল্প শ্রমজীবি সংঘ' পৃথক হইতে দেখি, ভারতেও ব্যবসায়ী সংঘের সঙ্গে শিল্পশ্রমজীবি সংঘের অস্তিত্ব উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি কি প্রকারে প্রথমটি হইতে উদ্ভব হইল বা পরে পৃথক হইল তাহার সঠিক কোন ইতিহাস নাই।

এই যুগের ইতিহাসে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে ভারতীয় সমাজ বৈদিকযুগ হইতে যত ঐতিহাসিক যুগের দিকে অগ্রসর হইতেছে শ্রেণীবৈষম্য ততই বাড়িয়া উঠিতেছে, আইনের অধিকার বিষয়ে ততই শ্রেণী সমূহের পার্থক্য হইতেছে, দরিদ্রেরা ততই বেশী নিষ্পেষিত হইতেছে এবং পতিতেরা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ঘৃণা ও বিদ্বেষভাজন হইতেছে। এতদ্বারা আমরা সমাজে একটা ঘোর অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারি। বৈদিকযুগের সাদাসিধা জীবন আর নাই। এখন শ্রেণীভেদ উদ্ভব হইয়াছে,

পেশাগত সংঘসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে, কৌমগত রাজাধীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া রাজাবিহীন অভিজাত রাষ্ট্র এবং জনপদ বিশেষে সাধারণতন্ত্র সংগঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে রাজাধীন বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহও উদ্ভূত হইয়াছে। এইসব বিবর্তন একটা অর্থনীতিক বিবর্তন সাপেক্ষ। ধর্ম্মের দিক দিয়া এই সমস্যার উত্তর জানিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে রামায়ণে তখনও বৈদিক দেবতাদের আরাধনা চলিতেছে। ধর্ম্ম জগতে তখনও একটা স্তরভেদ heirarchy সংগঠিত হয় নাই। পৌরাণিক দেবদেবীরা তখনও সৃষ্ট হয় নাই; তবে ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় প্রভৃতি তখন কৌমগত দেবতা না হইয়া সাধারণ দেবতাতে পরিণত হইয়াছে। এই যুগটা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ—একটা ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সময়। তখন অনেকস্থলে কৌমপ্রথা বিদ্যমান ছিল, আবার বড় রাষ্ট্রও ছিল; কিন্তু একটা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হয় নাই বলিয়া দেবতারা কেন্দ্রীভূত (Centralised) স্তরে বিভক্ত হয় নাই।

এইসব কারণ হইতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতীয় সমাজ সভ্যতার একটা নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছে; এবং ইহার লক্ষণ রাষ্ট্রে, সমাজে ও ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের ধর্ম্মজগতে একটি বিশিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হয়। এই বিশিষ্ট ঘটনাটি হইল গৌতম বুদ্ধের জন্ম। ইনি ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী যেধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে একটা মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে। এই ধর্ম্মবিপ্লবের পশ্চাতে কি অর্থনীতিক কারণ সমূহ লুক্কায়িত ছিল, ঐতিহাসিকেরা এখনও তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। ম্যাক্সমূলার বলেন—প্রচলিত বর্ণাশ্রমপদ্ধতি অনুযায়ী বা ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্মত যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ তাহাতে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মপদ্ধতি সাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক ছিল; ইহা সর্ব্ব বিষয়েই ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মমত বিরোধী ছিল। এই ধর্ম্ম 'সাম্য' অবলম্বন করিয়া জগতের সকলের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। বেদের কাল হইতে বুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিপক্ষে যে সংশয় ও সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে বৌদ্ধধর্ম্মে সমূর্ত্ত হইয়া ভারতে বৈদিক মতাবলম্বীদের উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়। এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উভয় দলই নিজেদের পন্থাকে 'আর্য্যমত'

ও 'আর্য্যপথ' বলিত। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য, চার্ব্বাক, কপিল, ভূতপূর্ব্ব বুদ্ধগণ ও জৈনগণ নাস্তিক্যবাদ বা বেদবিহিত মতসমূহের বিরুদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে অরিষ্টনেমী (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের পিসতুত ভাই), পরেশনাথ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মমত ও অহিংসবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই সময় সাধারণ লোক ব্রাহ্মণদের মন্ত্রশিষ্য না হইয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিত এবং তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন জনগণের মন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রাহ্মণদের দাবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। গণ-সাধারণের মন যে প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং অসংখ্য অখ্যাত অজ্ঞাত এবং খ্যাতনামা সন্ন্যাসীগণ দেশময় এক নূতন ধর্ম্মও তজ্জন্য এক নূতন সমাজ-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিল, তাহার পশ্চাতে ইতিহাসের কি অর্থনীতিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল তাহার ইতিবৃত্ত এখনও অপ্রকাশিত। কিন্তু একটা নূতন অর্থনীতিক বিবর্ত্তন ও নূতন রাষ্ট্র-পদ্ধতি এবং সমাজ সংগঠন কার্য্য সেই সময় চলিতেছিল—একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহাও দেখিয়াছি যে সমাজ যত কৌমাবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদের দাবীর মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে পতিতদের সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থাও ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইতে লাগিল। শেষে আমরা ইহাও দেখিলাম যে অভিজাতদের সহিত পুরোহিত শ্রেণীর ভীষণ সংগ্রাম এবং উপরের সকল শ্রেণীই পতিতদের শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা চড়াইতে লাগিল। এই সময়েই শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক সাম্যবাদীয় ধর্ম্ম-পদ্ধতি প্রচার করিলে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও ব্রাহ্মণদের পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন নানা শ্রেণীর লোক সমূহ নব প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই সময় দুইজন বড় ধর্ম্ম প্রচারক আবির্ভূত হন—একজন শাক্যবংশীয় গৌতম বুদ্ধ ও অপরজন মহাবীর বর্দ্ধমান। শেষোক্ত জন পরেশনাথের পর জৈন ধর্ম্মের একজন বড় প্রচারক ছিলেন। এই যুগের সকল ধর্ম্মপ্রচারক ও দার্শনিকেরা বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ ও পৌরহিত্যাধিপত্যের বিপক্ষবাদী ছিলেন। আর একটি আশ্চর্য্যের কথা যে, এই সকল বিরুদ্ধবাদী

ধর্ম্ম প্রচারকেরা ক্ষত্রিয় অভিজাত বংশের লোক ছিলেন (১৩)। অরিষ্টনেমী, পরেশনাথ, মহাবীর বর্দ্ধমান, বুদ্ধ এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত (ইনি বুদ্ধের সহিত বিবাদ করিয়া একটি পৃথক ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন—ইহা মাত্র সাত বৎসর টিকিয়াছিল), এবং অপর এক জ্ঞাতি আনন্দ প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় অভিজাতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৪)। এইসব নবধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজা (মগধের অজাতশত্রু) ও অভিজাতদের (ভঙ্জিবংশ ও মল্লকৌম প্রভৃতি) দ্বারাই সমাদৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইত।

মৌর্য্য যুগ

গৌতম বুদ্ধের পরে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবর্ত্তন হইতেছে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব। এই সময়ে মৌর্য্যদের অধীনে ভারতে একজাতীয়তা প্রাপ্ত সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সময়ে যখন মাসিডোন-বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিতে আসেন তখন স্কন্দাবারে একজন ভারতীয় যুবক পলাতকরূপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি মগধের রাজবংশের কোন লোকের জারজ সন্তান বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। মুড়া নাম্নী নীচ জাতীয়া এক স্ত্রীলোকের গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁকে 'মৌর্য্য' নামে অভিহিত করা হইত। এইজন্য তিনি শূদ্র জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতেন; কিন্তু আজকাল কেহ কেহ বলেন যে, তৎকালে 'মোরিয়া' নামে একটি ক্ষত্রিয়কুল ছিল এবং এখনও এই নামে একটি রাজপুত কুল আছে। সম্ভবতঃ এই বংশে অথবা

১৩। জৈন তীর্থঙ্করদের সকলেই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন (পুরাণ নাহারের পুস্তক সমূহ দ্রষ্টব্য)।

১৪। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম প্রচারকেরা যে অভিজাত বংশের ছিল এবং ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চর্চ্চা এই শ্রেণীর দ্বারাই পরিচালিত হইত—এই তথ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাচীন কালে "ব্রহ্মবিদ্যা" যে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর ক্ষত্রিয় রাজকুলোদ্ভব লোকেরাই নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করে। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ Weber বলিয়াছেন—"নূতন ভাবধারা অভিজাতদের দ্বারাই প্রচারিত হয় (Klasseund Gesellschaft)

প্রবর্ত্তন করিতে পারে (১৮); কিন্তু কৌটিল্য সেইমত গ্রহণ না করিয়া চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় অসভ্য শূদ্র সর্দ্দারদের (wild chiefs of Sudra origin) রাজারূপে খাড়া করেন। পুরাণ সমূহের মতে মহাপদ্ম নন্দের পর ক্ষত্রিয় কুলসমূহ নির্ব্বংশ হয়। তাহার পর 'পৃথিবীর রাজারা শূদ্র বংশীয় ছিল' (বিষ্ণুপুরাণ ৪,২৪)। এই বিষয়ে সামশাস্ত্রী বলেন,—ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, বিরুদ্ধবাদী ক্ষত্রিয় রাজাদের হাতে অত্যাচার উৎপীড়নের যন্ত্রণায় বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণেরা 'wild chiefs of Sudra descent' অর্থাৎ শূদ্র বংশীয় জঙ্গলী সর্দ্দারদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। জঙ্গলী কৌম-গুলির দলপতিরাও এই সুযোগে অনেক আর্য্যরাষ্ট্রে রাজা হইয়া বসে (১৯)। এই লেখকের মতে বিষ্ণুপুরাণে (L. V. 24). উল্লিখিত রাজা বিশ্বস্ফটিকের ব্যাপারটি এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা সমর্থন করে। এই রাজার কথা পুরাণ সমূহে এইভাবে বর্ণিত আছে: 'মগধে বীর বিশ্ব সফাণী (ভগবত পুরাণে—'বিশ্বস্ফুরজি', বিষ্ণুপুরাণে—'বিশ্বস্ফটিক') সমস্ত রাজাদের পরাজিত করিয়া ভিন্ন জাতির লোকসমূহের, যেমন কৈবর্ত্ত, পঞ্চক (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মজ্রক, বিষ্ণুপুরাণে যদু, ভাগবতে উভয় নামই আছে), পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণদের রাজা করিবে। তিনি বিভিন্নদেশে এই লোক সমূহকে রাজা করিবেন·· ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করিয়া আর একটি ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করিবেন (২০)।' পার্জিটার এই রাজার তারিখ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া বলিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে: 'মগধে বিশ্বস্ফটিক নামে একজন রাজা অন্য জাতি সমূহকে (tribes) প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তিনি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করিয়া জেলে, বর্ব্বর, যদু, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষমতায় উন্নীত করিবেন। পদ্মাবতী, কান্তিপুর ও মথুরাতে নয়জন নাগ রাজত্ব করিবেন। দেবরক্ষিত নামে একজন রাজা সমুদ্রতীরে একটি নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোশল, ওড্র, পুণ্ড্রক, ও আভিরেরা (২১) এবং শূদ্রেরা সৌরাষ্ট্রে, অবন্তী, সুর, আরকুদ

১৮। কৌটিল্য—"অর্থশাস্ত্র" ৫, ৬।

১৯। R. Samasastry—Evolution of Indian Polity, Pp 140—144.

২০। Pargiter—P 73.

২১। Vincent Smith—Early History of India.

মরুভূমি দখল করিবে। শূদ্রগণ, অন্ত্যজগণ, ও বর্ব্বরেরা সিন্ধুতীর, দ্বারিকা, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরে অবিশ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ রাজত্ব করিবে।'

পুরাণোক্ত এই তথ্যটি এতদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকদের মনোযোগ বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে নাই। তবু এবং তথাপি এতবড় পূর্ণ বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই লিপিবদ্ধ আছে। এই বিশ্বস্ফটিক রাজা কে (২২)? ইনিই কি চন্দ্রগুপ্ত?···অথবা কোন কল্পিত ব্যক্তি? ইনি যেই হউন, ইনি যে ভারতের নেপোলিয়ান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভিনসেণ্ট স্মিথ্ সমুদ্র গুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়

২১। The Journal of the Bihar and Orissa Research Society—1933: Pp 42—43 পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জয়সওয়াল তাঁহার 'History of India' C. 150 A, D—350 A. D. নামক প্রবন্ধে বলেন—"বিশ্বস্ফটিক বা বিশ্বসফানির প্রকৃত নাম বাণস্পর (Vanashpara); ইনি শক সম্রাট কনিষ্কের অধীনে বেনারস প্রদেশের শাসন কর্ত্তা (ক্ষত্রপ) ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ৯০ সাল হইতে ১৩০ সালের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ভারতীয় সমাজকে ব্রাহ্মণশূন্য করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নামাইয়া নিম্ন জাতীয় হিন্দু ও বৈদেশিকদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করিয়া একটি নূতন শাসকজাতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি কৈবর্ত্তদের মধ্য হইতে লোক লইয়া একটি নূতন শাসক অথবা রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্য পঞ্চকদের মধ্য হইতেও তদ্রূপ কর্ম্মচারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার পাঞ্জাব হইতে 'মদ্রক' (মহাভারতের মতে ইহারা ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত; ইতিহাসে ইহাদিগকে জাতিভেদ বিহীন কৌম বলে) "চক-পুলিন্দা" অর্থাৎ শক-পুলিন্দ জাতীয় লোক আনয়ন করিয়া বুন্দেলখণ্ড ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করায় বাণস্ফর কুষাণ রাজনীতিক প্রণালী তাঁহার শাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়সওয়াল বলেন—এই বাণস্পরের বংশ এখনও বুন্দেলখণ্ডে আছে; তাহারা নীচ বংশীয় বলিয়া গণ্য হয় এবং রাজপুতদের সহিত বিবাহ করিতে পারে না।" কেহ কেহ বিশ্ব-স্ফোটককেই হয় মহাপদ্ম নন্দ অথবা চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মনে করেন। জয়সওয়ালের বাণস্ফর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ কুষাণদের ন্যায় ব্রাহ্মণ বিরোধী ও বর্ণাশ্রম বিদ্বেষী ছিল না। এইজন্য বানস্ফরকে বিশ্বস্ফটিক না বলিয়া নন্দকে তাহার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রাজপুত জাতির মধ্যে 'বনাফর' নামে একটি কুল আছে। কবি চাঁদ বর্দাইয়ের এবং "আলহাগণ্ড" নামক চারণ গাথা বর্ণিত মহোবার আলহা ও উদল নামক রাজকুমারদ্বয় বনাফর কুলের লোক ছিলেন। জয়সওয়ালের উক্তির সহিত এই তথ্য মিলে না।

এই বংশের কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেইজন্যই তিনি 'মৌর্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জনশ্রুতি চন্দ্রগুপ্তকে 'শূদ্র' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। পুরাণে চন্দ্রগুপ্তের গোষ্ঠীকে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে (১৫)।

প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী-সংগ্রাম যে কিরূপ ভীষণ হইয়াছিল তাহা সাহিত্যের গুটিকতক শ্লোকের সাহায্যে অনুমান করা অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর যে ঐতিহাসিক নাটক ভারতের রাজনীতিতে অভিনীত হয় তাহা যথার্থভাবে বুঝিলেই আমরা এই তথ্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেন, যে-ভারতীয় যুবক স্বন্দাবারে আলেকজাণ্ডারের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই এই বিদেশীয় বীরকে প্রাচ্যের রাজা নন্দের বিপক্ষে অভিযান করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিলেন। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব জয় করিবার পর শুনিলেন যে প্রাচ্যের মহাক্ষমতাশালী রাজা নন্দ ছয় লক্ষ সৈন্য সহকারে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আসিতেছেন। এমন সময় ম্যাসিডনীয় সৈন্যেরা আর অধিক অগ্রসর হইতে চাহিল না। গ্রীক লেখকেরা বলেন যে তাহারা রণ-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন নিরপেক্ষ লেখক বলেন যে নন্দের সৈন্যবাহিনীর বহরের কথা শুনিয়াই তাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় এই পলাতক চন্দ্রগুপ্ত, যিনি তথায় রামায়ণের বিভীষণের ন্যায় জাতি ও স্বজাতি এবং স্বদেশদ্রোহিতার লীলাভিনয় করিতেছিলেন, আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে নন্দকে প্রজাবর্গ পছন্দ করেনা, সে নীচকুলোদ্ভব নাপিতের ঔরসজাত,—এইজন্য সকলে তাহাকে ঘৃণা করে ইত্যাদি···।

এই পরাক্রান্ত বংশীয়দের সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে: 'শূদ্রার গর্ভজাত ও মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম (নন্দ) রাজা হইবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিবে···ইহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণ শূদ্রবংশীয় হইবে···ইনি সমস্ত ক্ষত্রিয়-দের উৎপাটিত করিবেন (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের কথায় 'দ্বিতীয় পরশুরামের

১৫। Pargiter—P. 69.

ন্যায়' উৎপাটিত করিবেন)···কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইহাদের সমস্ত উৎপাটিত করিবেন···পরে রাজস্ব মৌর্য্যদের হস্তে যাইবে (১৬)।

শেষ নন্দরাজা কিংম্বা চন্দ্রগুপ্তের ধমনীতে শূদ্র রক্ত প্রবাহিত ছিল কিনা তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণা ও নির্ণেয় বিষয়বস্তু। কিন্তু মৌর্য্যেরা যে শূদ্র বংশীয় ছিল ইহাই ভারতীয় লেখকেরা বলেন (১৭)। ব্রাহ্মণদের উপর ঘৃণার জন্য ক্ষত্রিয়দের বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ ও পরে রাজা নন্দ কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া এবং শেষে শূদ্রেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতে একটা ঘোর বিপ্লবের পরিচয় পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে একটা প্রবাদ আছে যে মহারাজ নন্দের পর আর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না ! এই জনশ্রুতির মধ্যে একটি মহাসত্য নিহিত আছে বলিয়া অনুমান হয়।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংগ্রাম এবং প্রথমোক্তদের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয় আধিপত্য ধ্বংস করিবার জন্য যে সবিশেষ চেষ্টান্বিত ছিল তাহা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও তাহার কার্য্যেই সপ্রকাশ। যখন ক্ষত্রিয়েরা বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল তখন তাহা রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণেরা অন্য অস্ত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং কৌটিল্য শূদ্রদেরই সেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। সামশাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বৌদ্ধরা তাহাদের সাম্যবাদ সম্মত ন্যায়, দানশীলতা ও সৌভ্রাত্র (ভ্রাতৃত্ব) স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাহাদের 'ধম্মচক্ক আদর্শানুযায়ী যেমন প্রাচীন সাধারণ-তন্ত্রীয় অথবা মুষ্টিমেয় লোকের শাসন পদ্ধতির (Oligarchy) ধরণের গভর্ণমেণ্ট (শাসন ব্যবস্থা) পছন্দ করিত ; সেই যুগে কৌটিল্যের সময়ের ব্রাহ্মণ রাজ-নীতিকেরা এমন শাসনব্যবস্থা চাহিতেছিল যদ্দারা বৈদিক পুরোহিত সংঘ বিশিষ্ট সুবিধাভোগ করিতে পারিবে ও তজ্জন্য পূর্ব্বকালের ন্যায় কৌমগত কলহ ও ঘৃণা আর থাকিবে না। এই সময়েই ভরদ্বাজ বলেন, সুযোগ পাইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা ক্ষত্রিয় শাসন অপসারিত করিয়া ব্রাহ্মণ কবলিত শাসনব্যবস্থা

১৬। Pargiter—P. 69 ; বিষ্ণুপুরাণ—৪, ২৪।

১৭। R. Samasastry—Evolution of Indian Polity, P 144.

এই খেতাব (উপাধি) যথার্থভাবে বিশ্বস্ফটিকের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রাচীন রোমীয় হইতে নর্ম্মান পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক বিজেতারা 'গল' (ফাল্স) দেশ জয় করিয়া তথাকার অভিজাতশ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুখ সুবিধার অধিকারী হইয়া পরাজিত গল (Gall) জাতিকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অভ্যুত্থান হইয়াছিল উহাকেই 'মহা ফরাসীবিপ্লব' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লব 'সাম্যে'র নামে প্রাচীন অভিজাতশ্রেণীকে বিলুপ্ত করিয়া নেপোলিয়া-নের উত্থানের পথ সুগম করিয়া দেয়। এই অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র উকিলের ছেলে ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া কৃষককুল হইতে উদ্ভূত লোকদের দ্বারা একটা নূতন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে এবং সেই কুলের লোক দিয়া ইউরোপের চারিদিকে নিজের তাঁবেদারী রাজত্ব সংস্থাপন করে। ইহাতে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ইউরোপ ক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই মহাবিপ্লবের রাজনীতিক দিকে যতটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বিশ্বস্ফটিকের বা চন্দ্রগুপ্তের বিপ্লবের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ততটাই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। বিশ্বস্ফটিক শক ক্ষত্রপ 'বণস্পর' হইলেও তাঁহার এই মহা বৈপ্লবিক কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণদের পরিকল্পিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং পুরুষসূক্তের বর্ণসমূহের উৎপত্তি ও তাহাদের কর্ম্ম বিষয়ে ব্যবস্থাপদ্ধতি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ শেষোক্ত আর্য্যবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এই বিপ্লবের দ্বারা খুব জোর ধাক্কা পায়। আর এই বিপ্লবের কর্ত্তা শক বাণস্পর হইলেও সে বৌদ্ধ রাজা কণিষ্কের অনুচর ছিল—একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয় অভিজাত শাসকশ্রেণী বিধ্বংস হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র শূদ্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং কৌটিল্য কর্ত্তৃক একজন জারজ শূদ্র একজাতীয়তা প্রাপ্ত ভারতের প্রথম সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ভারত আন্তর্জাতিক ইতিহাসে স্থান পায়, সেই সময় হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হয় বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সম্রাট এবং হেলেনিষ্টিক পশ্চিম এসিয়ার সম্রাট সেলিউকুসের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় (২৩)। তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা

২৩। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকুশের বিবাহ সূত্রে বন্ধন ঘটনাটি আজকাল গবেষণার

Numbering Error

পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বেদোক্ত 'দস্যু, দাস' ও পরবর্ত্তী যুগের শূদ্রেরা যখন ভারতের শাসকরূপে উন্নীত হইল তখন ফ্রান্সের ন্যায় পতিতদের উত্থান (Uprise of the lowly, i.e. the depressed, oppressed & tyrranised and the down-trodden common people) হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থনীতিক ব্যাখ্যার বিবিধ factors-এর মধ্যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের কলহ একটা কারণ ছিল বলিয়া শূদ্রের এই উত্থান সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক্ষণে এই বিপ্লব পরবর্ত্তী ইতিহাসে কি প্রকারে কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

মৌর্য্যযুগে রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক গিল্ডগুলির বিশেষ সম্মান ছিল। অর্থনীতিক গিল্ডগুলির বিশিষ্ট অধিকার ছিল এবং বিশিষ্ট সুবিধাও ভোগ করিত। গিল্ডগুলি কতকটা ব্যাঙ্কের কাজ করিত; তাহারা টাকা জমা রাখিতে পারিত (২৪)। এই সময়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদের জমিদারী-বৃত্তির পরিবর্ত্তে রাজ সরকারী বৃত্তি ছিল। তাহারা রাজস্বের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহা মুসলমান যুগের 'জায়গীর প্রথা'র ন্যায় ছিল। এই সময়ে সরকারী হিসাব রক্ষক গিল্ডগুলির শুল্ক, পেশা ও

বিষয় হইয়াছে। আজকালকার ইংরেজ লেখকগণ চন্দ্রগুপ্ত যে শেষোক্তের কন্যা বিবাহ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পান না। তাহারা বলেন—গ্রীক লেখকগণ শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে একটা "matrimonial alliance" মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু কে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। অধ্যাপক মাহাফি বলেন—সেলিউকুশের অন্যান্য স্ত্রীর মধ্যে একজন ভারতীয় রমণী ছিলেন! তাহার উত্তরাধিকারী 'আন্টীওকুশ' পারস্য স্ত্রীর গর্ভজাত। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ফলে যখন সেলিউকুশ তাঁহাকে বর্ত্তমান আফগানীস্থান দান করে তখন সেলিউকুশের কন্যাদান করাই সম্ভবপর সত্য বলিতে হইবে। হালে ভিনসেণ্ট স্মিথও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে চন্দ্রগুপ্ত সুলুবের (Seleveur) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে (৩,২৬,৪২)। এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে ভবিষ্য……পুরাণের হালের রাজাদের নামের মত সেলিউকুশের নামটি কি হালেরই প্রক্ষিপ্ত নয়!

২৪। J. N. Samaddar—Lectures on the Economic Condition of Ancient India, P. 125.

কর্ম্মের হিসাব সরকারী পুস্তকে নিয়মিতরূপে লিখিয়া রাখা হইত (২৫)। এই সময়ে ব্যবসায়ী সংঘগুলি ব্যতীত যৌথকারবার সমূহ (Joint-stock Companies) ছিল; অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে (অর্থশাস্ত্র পৃঃ ২৩৫)।

মৌর্য্যযুগের প্রাক্কালের প্রধান পুস্তক হইতেছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (কেহ কেহ বলেন কৌটিল্য ও চাণক্য একই ব্যক্তি)। এই পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিত মহলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। একদিন বৈদেশিকেরা ভাবিতেন —হিন্দুগণ কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছে। অবশ্য ব্রাহ্মণদের লিখিত পুস্তক সমূহ সেই প্রকার ধারণাও জন্মাইয়া দেয়! কিন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' আবিষ্কৃত হইবার পর সভ্যজগতের পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করিতেছেন যে প্রাচীন ভারতীয়েরাও রাজনীতি-বিজ্ঞানের (Political Science) চর্চ্চা করিয়াছেন। কৌটিল্য আরিষ্টটলের (Aristotle) সমসাময়িক এবং উভয়েই দুইটি বিজয়ী সম্রাটের গুরু; উভয়েই প্রাচীনকালের বিভিন্ন দেশ সমূহের গঠনতন্ত্র (constitution) পাঠ করিয়া নিজেদের রাজনীতিক বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আরিষ্টটল প্রাচীন গ্রীক 'নগররাষ্ট্র' (City-State) আদর্শের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। অন্যদিকে কৌটিল্য ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপয়িতার মন্ত্রণাদাতা ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশে একটা গভীর রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করিয়াছিলেন। অরিষ্টটল মহাপণ্ডিত হইলেও তিনি তাঁহার গ্রীকজাতি সুলভ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আরিষ্টটলের 'On Politics' পুস্তক তদীয় গুরু প্লেটোর 'Ideal Republic' পুস্তকে প্রচারিত সাম্যবাদের (communism) বিরুদ্ধেই লিখিত হইয়াছিল, এবং উহা একটি 'মত' বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'অর্থশাস্ত্র' মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আইনরূপে গৃহীত হয়; পরে মনুও উহা উড়াইয়া দিতে পারেন নাই (২৬)।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৫। অর্থশাস্ত্র—৬৯ পৃঃ; S. K. Das—Economic History of India: Pp. 155—175.

২৬। K. P. Jayaswal—The Age of Manu and Jagnavalka.

স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন্

সুদীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করবার পর স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন্ কালগত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯১ বৎসর হয়েছিল। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর উপর ভারতীয় ভাষাসমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাকৃত অপভ্রংশ, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ আছে, সে সব বিষয়ের আলোচনায় তিনি ছিলেন অনেকাংশে পথ প্রদর্শক, এই সমস্ত আলোচনা-দ্বারাই তিনি প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হন। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কাজ হচ্ছে—Linguistic Survey of India—ভারতীয় ভাষা সমূহের ব্যাপক পরিচয়।

গ্রিয়ারসন্ ভারতবর্ষে আসেন সিবিলিয়ন হিসাবে। সে সময়ে ভারতীয়-সিবিলিয়নদের মধ্যে গভীরভাবে বিদ্যাচর্চ্চায় রেওয়াজ ছিল, ফ্লিট (Fleet), ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith), রিস্ ডেভিডস্ (Rhys Davids) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণা-মূলক কার্য্যাবলীর তালিকা দেখলে ভুলে যেতে হয় যে ভারত সরকারের শাসনতন্ত্রের দৈনিক কাজকর্মের মধ্যে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

গ্রিয়ারসন্ প্রথম জীবন হতেই ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করেন। বিহারী, ভোজপুরিয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের উপর নানা নিবন্ধ এই সময়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হতেই তাঁর Bihari folk songs, Bhojpuri folk songs নামক বিবিধ প্রবন্ধ এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—Modern Vernacular Literature of India প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির আলোচনার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক আলোচনার উপর। এ কাজ সরকারের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব ছিল না বলেই তিনি তা বহুদিন আরম্ভ করতে পারেন নি।

গ্রিয়ারসনের পূর্বে ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাসমূহের ব্যাপক পরিচয় দেবার চেষ্টা দু'একবার হয়েছিল বটে, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান তখন সীমাবদ্ধ

ছিল বলে সে পরিচয় সঠিক হয় নি। এ সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক উইলিয়ম কেরি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরি এ দেশে আসেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে New Testament-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। আরও দু'একটি ভাষায় ঐ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করবার চেষ্টা হয় বটে কিন্তু কেরি শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে ভারতীয় ভাষাসমূহের কোন স্পষ্ট জ্ঞান না থাকার জন্য সে অনুবাদ সঠিকভাবে করা অসম্ভব।

তখন এ দেশে প্রচলিত সমস্তই ভাষাকেই সংস্কৃতের dialect বা উপভাষা হিসাবে গণ্য করা হত। কেরি বুঝতে পারলেন যে এ ধারণা ভ্রমাত্মক, বস্তুতঃ ভারতীয় ভাষাগুলি ইউরোপীয় ভাষার ন্যায় ভাষা বা language, উপভাষা বা dialect নয়। কেরি এ কথা প্রমাণ করবার জন্য এবং প্রচলিত ভাষাসমূহের পরিচয় দেবার জন্য এক বিবরণী প্রকাশ করেন। এই বিবরণীতে তিনি এ দেশে প্রচলিত ৩৩টি প্রধান ভাষার নমুনা প্রকাশ করেন। এই বিবরণীতে কেরি স্পষ্ট করে বলেন—

'We imagined that the Tamul, the Kurnata, the Telinga, the Guzrattee, the Orissa, the Bengali, the Mahratta, the Punjabee and the Hindoostanee comprised nearly all the collateral branches springing from the Sungskrit language ; and that all the rest were varieties of the Hindee, and some of them, indeed, little better than jargons capable of conveying ideas. But although we entered on our work with these ideas we were ultimately constrained to relinquish them···Each of these various provinces has a language of its own, most of them nearly alike in the bulk of their words, but diffiering so widely in the grammatical terminations, as when spoken, to be scarcely intelligible to their next neighbours."

ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাই যে এক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় এ কথা কেরি বুঝতে পারেন নাই।

হজ্‌সনের (Hodgson) নাম পণ্ডিত মহলে বিশেষ পরিচিত। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কিছুকাল নেপালে অতিবাহিত করেন, সেই সময়ে বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি নেপালের ভাষা ও

সাহিত্য-অধ্যয়ন করবার সময়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক আলোচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তভাগের ভাষা—যেগুলিকে Tibeto-Burman ভাষা বলা হয়—সে গুলির তুলনামূলক বিচার করেন। হজসনের কার্য্যাবলী হতে তিনটি ভাষাগোষ্ঠির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—Indo-Aryan, Indo-Chinese এবং Dravidian। কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাকে হজসন ভুল করে দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত মনে করেন। এই সময়ে ম্যাক্সমূলর দ্রাবিড়কে একটি বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠি বলে অনুমান করেন, কিন্তু ম্যাক্সমূলরের নিকট এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুমান মূলক। এই সময়ে Caldwell নামক এক পাদ্রি দ্রাবিড় ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা ক'রে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে Comparative Grammar of the Dravidian Language নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থ এখনও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয়।

এই সমস্ত আলোচনায় ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের গণ্ডী প্রসারতা লাভ করল, এবং বিম্‌সের—Comparativr Grammar of the Aryan Languages (১৮৬৭) এবং হর্ণলের—Grammar of Eastern Hindi compared with other Gaudian Languages (১৮৮০) প্রকাশিত হবার পর Indo-Aryan ভাষাগোষ্ঠির কয়েকটি প্রধান ভাষার ব্যাকরণ সঠিকভাবে ধরা পড়ে। ভারতীয় ভাষার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতেরা সজাগ হয়ে ওঠেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা শহরে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের—International Oriental Congress-এর এক বৈঠক হয়। নানা পণ্ডিতদের প্রস্তাবে এই বৈঠক হতে ভারতীয়-ভাষাসমূহের ব্যাপক পরিচয় সংগ্রহ করবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে পাঠান হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে গ্রিয়ারসনের নাম উল্লেখযোগ্য। Congress-এর অনুরোধে ভারত সরকার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক পরিচয় গ্রহণ করবার জন্য ব্যবস্থা করেন, এবং গ্রিয়ারসনের হস্তে কর্ম্মভার ন্যস্ত হয়। গ্রিয়ারসনের জীবনের স্বপ্ন সফলতা লাভ করে।

প্রায় ৩০ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়, নানা ভাষার নমুনা ও শব্দসম্ভার সংগ্রহ করা হয় এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের

সাহায্যে ভাষাসমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিকভাবে ধরবার চেষ্টা করা হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব ২৪ খানি বিরাট গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থতালিকা হতেই গ্রিয়ারসনের এই বিরাট কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাবে—

I. (i) Introduction.
(ii) Comparative Vocabulary and Indian Languages.
(iii) Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.
II. Mon-khmer and Tai families.
III. (i) Tibeto-Burman Languages of Tibet and North Assam.
(ii) Bodo, Naga and Kachin groups of the Tibeto-Burman Languages.
(iii) Kuki-Chin and Burman groups of the Tibeto-Burman Languages.
IV. Munda and Dravidian Languages.
V. Indo-Aryan Languages, Eastern group.
(i) Bengali and Assamese
(ii) Bihari and Oriya.
VI. Indo-Aryan languages, Mediate group (Eastern Hindi)
VII. Indo-Aryan languages, Southern group (Marathi)
VIII. Indo-Aryan languages, North-western group
(i) Sindhi and Lahnda
(ii) Dardic or Pisacha languages (including Kashmir)
IX. Indo-Aryan languages, Central group.
(i) Western Hindi and Panjabi.
(ii) Rajasthani and Gujrati.
(iii) Bhil languages, Khandesi.
(iv) Pahari languages.
X. Eranian family.
XI. Gipsy languages.

এই অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়েছে যে ভারতবর্ষে মোট ১৭৯টি ভাষা বর্ত্তমানে প্রচলিত এবং উপভাষার সংখ্যা ৫৪৪টি। অনুসন্ধান করলে আরও অনেক উপভাষার খোঁজ পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে যে সব ভাষা প্রচলিত সেগুলি গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে ৬টি ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত।

এই ভাষাগোষ্ঠির সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে গ্রিয়ারসনের বিরাট পরিকল্পনার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না।

(১) অষ্ট্রিক ভাষগোষ্ঠি (Austric family)—গ্রিয়ারসনের হাতে কর্ম-ভার ন্যস্ত হবার কিছুকাল পরেই স্মিট নামক একজন জার্মান পণ্ডিত প্রমাণ করেন যে ভারতের প্রাচ্য দেশ হতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত নানা দেশে ও দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলি এক ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ভাষা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, পরে দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির চাপে এই ভাষাভাষীরা ভারতবর্ষের নানা দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, এই ভাষা-ভাষীদের নানা শাখা ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত নানা দ্বীপে আজও বসবাস করছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে এই ভাষাগোষ্ঠির যে সব ভাষা প্রচলিত তা'কে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মুণ্ডা (Munda) ও মোন-খ্মের (Mon-Khmer)। কোল, সাঁওতালী, শবর, জুয়াং, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির ভাষাসমূহ মুণ্ডা শাখার অন্তর্গত, এবং ব্রহ্মদেশের —মোন, পালং প্রভৃতি ভাষা এবং নিকোবর দ্বীপের ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সমস্ত ভাষার সঙ্গে কাম্বোডিয়া প্রদেশের খ্মের ভাষার সম্পর্ক আছে বলে এই শাখাকে মোন-খ্মের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসাম প্রদেশের খাশিয়াদের ভাষাও এই ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে এই সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

(২) ইন্দো-চীনীয় (Indo-Chinese) ভাষাগোষ্ঠি—ভারতবর্ষে এই ভাষা-গোষ্ঠির যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত সেগুলিকে Tibeto-Burman, Tibeto-Chinese প্রভৃতি আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ দুটি ইন্দোচীনীয় ভাষা-গোষ্ঠির দু'টি শাখা মাত্র। বর্ম্মী, তিব্বতী, তিব্বতীর নানা উপভাষা, আসাম প্রদেশে প্রচলিত নানা ভাষা—বোড়ো, নাগা, কাচিন, কুকী নাগা ইত্যাদি। হিমালয়ের অন্ত্যপাতী নানাস্থানে, নেপালে, লাদাক্ প্রভৃতি দেশে তিব্বতীর নানা উপভাষা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে ইন্দোচীনীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ।

(৩) ব্রহ্মদেশে কারেন (Karen) ও মান (Man) নামক দু'টি ভাষা

প্রচলিত আছে। এ দুই ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। এ দু'টি কোন্ ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত তা এখনো নির্দ্ধারিত হয় নি।

(৪) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠি—মধ্য প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থা এ ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত নানা ভাষা প্রচলিত। এই সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রায় ৬ কোটি। তামিল, তেলেগু, মালায়লম্, কানারি, হচ্ছে এই গোষ্ঠির প্রধান ভাষা। বেলুচিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে ব্রাহুই নামক একটি খণ্ড জাতির ভাষাও দ্রাবিড় ভাষা। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে আর কোথাও দ্রাবিড় ভাষার খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্রাহুইদের অবস্থান হতে মনে করা হয় যে দ্রাবিড় জাতি অতি প্রাচীনকালে বেলুচিস্তানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, কিন্তু উত্তর ভারতে অন্য জাতির প্রতিপত্তির জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে তারা পশ্চিম উপকূলের পথে দাক্ষিণাত্যে প্রসার লাভ করে। দাক্ষিণাত্য হতে পরবর্ত্তীকালে তাদের নানা শাখা মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের নানা স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ সব অঞ্চলে, কুর্কু ও গোঁড়দের ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত।

(৫) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠি—এই গোষ্ঠী তিন শাখায় বিভক্ত হয়েছে—আর্য্য, ইরাণীয় এবং দরদ (Indo Aryan, Iranian ও Dardic) প্রথম শাখার অন্তর্গত ভাষার সংখ্যায় ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৭টি ভাষা ও ৩৪৫ উপভাষা। এই সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি।

ইরাণী শাখার কয়েকটি ভাষা বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত, যথা—বালোচি, ওরমুরী, পস্তো, ইত্যাদি। গ্রিয়ারসন যে শাখাকে দরদ বা Dardic আখ্যা দিয়েছেন তাকে বিশিষ্ট শাখা হিসাবে অনেকে গ্রহণ করেন না, কাশ্মীর ও কাশ্মীরের সীমান্ত-প্রদেশ, গিলগিট, চিত্রাল প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ভাষাগুলিকে গ্রিয়ারসন এই শাখার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই অঞ্চলের সাধারণ ভৌগোলিক নাম দরদস্তান (Dardistan), কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে বহুকাল ধরে দরদ নামক জাতি বাস করত। এই দরদস্তানের ভাষাগুলিকে ইরাণী ও ভারতবর্ষে আর্য্য ভাষার ন্যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির একটি পৃথক শাখা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রিয়ারসন একে পিশাচ-ভাষা আখ্যাও দিয়েছেন। তার কারণ প্রাচীন ব্যাকরণে পৈশাচী নামক প্রাকৃত

ভাষার উল্লেখ আছে, আর সেই পৈশাচীর শব্দরূপের সঙ্গে দরদ-শাখার ভাষা-গুলির সাদৃশ্য আছে। কাফিরিস্তানের নানা ভাষা, চিত্রাল উপত্যকার পাশাই ভাষা, জেলালাবাদের নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রচলিত তিরাহী ভাষা, কাশ্মিরী ও কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে প্রচলিত নানা ভাষা এই দরদ শাখার অন্তর্গত।

ভারতীয় আর্য্য বা Indo-Aryan শাখার ভাষাসমূহকে গ্রিয়ারসন তিনটি উপশাখায় বিভক্ত করেছেন—Outer Mediate এবং Inner Sub-Branch। Outer উপশাখার অন্তর্ভুক্ত—লাহ্‌ন্দা বা পশ্চিমা পঞ্জাবী, সিন্ধী, মরাঠী, উড়িয়া, বিহারী, বাঙ্গালা, ও অসমীয়া। এবং Inner উপশাখার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—পশ্চিমা হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী, পাহাড়ী, নেপালী ইত্যাদি। Mediate উপশাখার অন্তর্গত হচ্ছে পুরবিয়া হিন্দী। এই শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে গ্রিয়ার-সনের যে ব্যক্তিগত মতামতের সম্পর্ক আছে সে কথা বারান্তরে বলব।

এ ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি ভাষার প্রচলন আছে যার উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে গ্রিয়ারসন কিংবা অন্য কোন পণ্ডিত কিছু সঠিক নির্দ্ধারণ করতে পারেন নাই। জিপ্‌সিদের ভাষা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত বুরুশাস্‌কি ভাষা এই শ্রেণীর। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সব জিপ্‌সিদের দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকগুলি উপভাষার প্রচলন আছে।

Linguistic Survey-এর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হতে গ্রিয়ারসনের বিপুল পরিশ্রম সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। ভারতীয় ভাষাসমূহের সঠিক পরিচয় দিতে গিয়েই তিনি এত স্পষ্ট ভাবে ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগ করতে পেরেছেন। তাঁর পূর্বে এ কাজ সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর আর কোন দেশের ভাষা সম্বন্ধে এ কাজ হয় নি। এ কথা অতি বিনয়ের সঙ্গেই গ্রিয়ারসন তাঁর ভূমিকায় বলে গিয়েছেন—

It is with a feeling of gratitude for having been permitted to finish a work extending over thirty years that, after writing this Preface the pen will be laid down. Without any pretended modesty I confess that no one is more than myself aware of the deficiencies of the survey, nor on the other hand, need I plead guilty to a vain boast when I claim that what has been done in it for India has not been done for any other country in the world.

এ ভূমিকা লিখবার পরেও গ্রিয়ারসনের নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে কাশ্মিরী ভাষার উপর নানা প্রবন্ধ ও কাশ্মিরী ভাষার অভিধান উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও শুধু Linguistic Survey of India গ্রিয়ারসনকে অমর করে রাখবে। ভারতবাসীও চিরকাল তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ঘটক

চৈত্রের প্রথমেই বড় গরম পড়িয়াছে। বেলা প্রায় এগারোটার সময় মাঝারি আকারের দোতলা একটি বাড়ীর একতলায় জানালা-বন্ধ ঘরের আবছা ছায়া ও ভ্যাপসা গরমে বছর ত্রিশেক বয়সের একটি লোক একটা সাধারণ বেতের চেয়ারে বসিয়া ছিল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা। পাশেই একটা কাঠের চেয়ারের হাতলে ঘামে ভেজা একটি গেঞ্জি ও আদ্দির পাঞ্জাবী পড়িয়া আছে। পায়ের লাল ধূলা-মাখা জুতার ফিতাও এখন পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই। দেখিলেই বুঝা যায় লোকটি বাহিরের রোদে হাঁটাহাঁটি করিয়া সদ্য সদ্য ভিতরে আসিয়াছে।

আঠার উনিশ বছর বয়সের একটি অবিবাহিতা মেয়ে পাখা হাতে আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া তাকে বাতাস করিতে লাগিল। রোগা লম্বা পাঁশুটে বাদামী রঙের সাদাসিদে মেয়ে। একহাত চওড়া পাড়ের সাড়ীটির সগর্ব্ব নারীত্ব-ঘোষণার সঙ্গে অর্দ্ধ পরিপুষ্ট দেহের অসামঞ্জস্য অত্যন্ত স্পষ্ট, কেবল দু'চোখের তীক্ষ্ণ ক্ষুধাতুর চাউনির সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। লোকটি হাত বাড়াইয়া মেয়েটির গাল টিপিয়া দিল। লোকটির মুখে দীর্ঘ অনাচারের ছাপ পরিষ্কার চোখে পড়ে, কিন্তু হাতটি তুলিবামাত্র কতগুলি মাংসপেশীতে যেন পূর্ব্ব-সঞ্চিত স্বাস্থ্যেরই ঢেউ খেলিয়া গেল।

মেয়েটি গদগদ হইয়া বলিল, 'ধেৎ!' তারপর একটু সামনে ঝুঁকিয়া অকারণে নীচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, 'বাবা এসে পড়বে এখুনি। ও বাড়ীতে দাবা খেলছে, ঠাকুরকে ডাকতে পাঠিয়েছি। চুলটাও কি আঁচড়াতে পারেন না? পাগলের মত চেহারা ক'রে থাকেন কেন?'

'পাগলের মত ঘুরে বেড়াই যে বাড়ী বাড়ী বিয়ের যুগ্যি ছেলে মেয়ে খুঁজে খুঁজে।'

'ক'টা বিয়ে দিলেন ফাল্গুন মাসে?'

'এগারটা।'

মেয়েটির ছেলেমানুষী ঔৎসুক্য ঝিমাইয়া পড়িল।—'মোটে।'

লোকটি যেন একটু আহত হইয়া সামলাইয়া নিল। কিছু না বলিয়া উদারতার সঙ্গে একটু অবজ্ঞাভরা হাসি হাসিল। এক মাসে এগারটি বিবাহ ঘটানো ঘটকের কতবড় প্রতিভার পরিচয় এ মেয়ে তার কি বুঝিবে।

এমন সময় একজন বুড়ো ভদ্রলোক আধভেজান দরজা খুলিয়া ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিল। ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা সাদা চুলগুলি যেন মাথায় রোপণ করা একরাশি ঘন-সন্নিবিষ্ট চকচকে পিনের চারা, বাঁধানো দাঁতে ফাঁপানো মুখ পরিষ্কার করিয়া কামানো, কপালে চিন্তার লাঙলে আঁকা কয়েকটি খাঁজ।

ঘরে ঢুকিয়াই বলিতে লাগিল, 'এসেছ বাবা? বেঁচে থাকো। খবর কি বাবা, খোঁজটোজ করেছ কিছু?' লোকটি কোন জবাব না দিয়ে নীরবে উঠিয়া প্রণাম করায় আবার বলিল, 'বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও। চিঠি পেয়েছিলে তো আমার? দু'টো একটা সন্ধান করেছ কি?'

বুড়োর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা উপভোগ করিবার জন্যই লোকটি যেন ধীরে সুস্থে দেরী করিয়া জবাব দিল। এবং জবাবটাও দিল তাচ্ছিল্যভরে।—'আমার কি আর সন্ধান করতে হয় তালুই মশায়, কত ভাল ভাল বিয়ের যুগ্যি ছেলে আমার হাতে রয়েছে। বাংলা দেশের অর্দ্ধেক ছেলেমেয়ের বিয়েই তো দিচ্ছি আমি। খোঁজ আনব কি, আজ একেবারে মেয়ে দেখতে আসবে।'

এক সেকেণ্ডের জন্য মেয়েটির দম আটকাইয়া গেল। বুড়োও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল কয়েক সেকেণ্ড।

'দেখতে আসবে? কারা দেখতে আসবে? কি করে ছেলেটি? কোথায় থাকে?—'

'বলছি, বলছি। সব বলছি। এক গেলাস জল আনো তো ভাই।'

মেয়েটি বলিল, 'সরবৎ করে দি'?'

লোকটি বলিল, 'না না, শুধু জল। জলের তেষ্টা কি সরবতে মেটে।'

এক গ্লাস জল পান করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া সে পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিতে আরম্ভ করে। বাখ্যা ও মন্তব্যে এমনভাবে ফাঁপাইয়া ফেনাইয়া তোলে সে বিবরণ যেন সহরের পথে পেটেণ্ট ওষুধের বিক্রেতা জনতাকে তার ওষুধের গুণ বুঝাইয়া দিতেছে।

'এমন ছেলে কি পথে ঘাটে মেলে তালুই মশায়! বাপের অবস্থা ভাল, কলকাতা সহরে সাড়ে চার কাঠা জমিতে দোতালা বাড়ী তুলে বাস করতে হলে পয়সা থাকা চাই। ছেলে দেড়শো টাকায় চাকরীতে ঢুকেছে, বছর বছর দশ টাকা বেড়ে তিনশো হবে। ভাবুন তো দেড়শো থেকে তিনশো, আজ-কালকার বাজারে যে-সে ছেলে কি এমন চাকরী পায় তালুই মশায়। চেহারাও ঠিক কার্ত্তিকের মত—'

বুড়ো অভিভূত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলে, 'মেয়েকে এখন পছন্দ হলে হয়।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়া বলে, 'পছন্দ হবে না! আমি এসে মেয়ে দেখাচ্ছি, পছন্দ হবে না! এমন মেয়ে ওরা পাবে কোথায়?' তারপর কথা উল্টাইয়া আবার বলে, 'তবে হ্যাঁ, ছেলেটা সত্যি ভাল। এমন পাত্র হাজারে একটা মেলে না। অন্য কেউ হলে কি আর এ পাত্রের সন্ধান দিতাম! মরবার আগে বৌদি আমার হাত ধরে বলেছিল, 'ঘটকালির আপিস তো খুলছ ঠাকুরপো, আমার বোনের জন্য একটি ভাল ছেলে জুটিয়ে দিও, বোনটা যেন আমার সুখী হয় ঠাকুরপো।' ব'লে বৌদির কি কান্না! আমি বলেছিলাম, 'দেব বৌদি দেব, খুব ভাল পাত্র খুঁজে দেব, কেঁদো না। অন্য লোক ভুলে যেত, আমি কিন্তু ভুলি নি। একবার আমি যা করব বলি তালুই মশায়, তা করি তবে ছাড়ি। বাজে কথা ব'লে ফাঁকি দেওয়ার মানুষ আমি নই।'

সমস্ত শুনিয়া বুড়ো গদগদ হইয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, 'এ যোগাযোগটা তুমি ঘটিয়ে দাও বাবা, তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকব। বাড়ীতে আর মেয়েছেলে নেই, অতবড় মেয়েকে ঘাড়ে নিয়ে যে কি করে দিন কাটাই আমিই শুধু তা জানি।'

কলিকাতা হইতে ট্রেনে এখানে পৌঁছুতে মিনিট কুড়ি লাগে। চারটের গাড়ীতে ছেলে, ছেলের কাকা ও একজন বন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিবে। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকার জন্য তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা চুকাইয়া ফেলা দরকার। বুড়ো নিজে স্নান করিতে চলিয়া গেল। দু'টি ছোট ছোট বাটিতে মাথার জন্য তিল আর গায়ের জন্য সরিষার তেল আনিয়া দিয়া দাঁতে দাঁত

ঘষিয়া মেয়েটি বলিল, 'কি মিথ্যুক আপনি! মরবার আগে দিদি আপনার হাত ধরে আমার জন্য পাত্র জুটিয়ে দিতে বলেছিল? আমি ছিলাম না দিদির কাছে তখন? আমি শুনিনি দিদি কি বলেছিল?'

লোকটি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আহা, তার মানেই তাই। আমায় বিয়ে করতে বলা মানেই—'

একটু হাসিয়া সে চুপ করিয়া গেল। দরজার বাহিরে সিমেন্ট করা রোয়াক ও উঠান রোদে ঝলসাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে তাতটা আসিয়া গায়ে লাগিতেছে অতি মৃদু আলগা একটু বাতাসে। হাতের তালুতে তেল ঢালিতে গিয়া লোকটি তেলের বাটি নামাইয়া রাখিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিবুক ধরিয়া সন্তর্পণে মেয়েটির মুখখানা একটু উঁচু করিয়া বলিল, 'যাই বল, এরূপে রাজপুত্তুর ছাড়া কি মানায়!'

মেয়েটির অসহায় ক্রোধে বিকৃত মুখভঙ্গি ছাপাইয়া ভেসলিন মেশানো ক্রীমে সৃষ্টি করা আনকোরা তেলতেলা লাবণ্যের মত সুখের ছাপ ফুটিয়া উঠিল।

'তোমার কি জ্বর হয়েছে? গা যেন গরম লাগছে?'

বোতাম-বন্ধ ব্লাউজের নীচে হাত দিয়া সে চিন্তিতমুখে গায়ের তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়া মেয়েটির চোখ বুজিয়া আসিল। হাত দিয়া হাত সরানোর ক্ষমতা বোধ হয় ছিল না, প্রাণপণ চেষ্টায় একপা পিছাইয়া গিয়া রুদ্ধশ্বাসে মেয়েটি বলিল, 'কেউ দেখবে। ঝি আসছে। জ্বর হয় নি।'

লোকটি নীরবে ধপাস্ করিয়া বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ডান হাতে তেলের বাটি তুলিয়া আন্দাজ করিয়া বাঁ হাতের তালুতে তেল ঢালিতে লাগিল। সেই সহজ নির্ব্বিকার ভঙ্গির অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দেখিবার মত চোখ সেখানে ছিল না।

'আজ এখানে থেকে যাবেন তো?' মেয়েটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

লোকটি একটু মাথা হেলাইল। জবাবটা হাঁ অথবা না ঠিক বুঝা গেল না।

'ওরা আমায় দেখে চলে যাবে, আপনি থাকবেন। কেমন?'

লোকটি এবারও মুখে জবাব দিল না। মৃদু হাসিয়া আঙুলের ডগায় একটু

তেল নিয়া মেয়েটির গালে মাখাইয়া দিল। সেই জবাবেই খুসী হইয়া আঁচলে গালের তেল মুছিতে মুছিতে হাসি মুখে মেয়েটি চলিয়া গেল।

ছড় ছড় করিয়া প্রায় এক চৌবাচ্চা জল খরচ করিয়া লোকটি স্নান করিল। কলের জলের চেয়ে কুয়ার জল অনেক ঠাণ্ডা। মেয়েটির নিজের হাতে বোনা কার্পেটের আসনে ভাত খাইতে বসিবার সময় তাকে রীতিমত ভালোমানুষ ঘরোয়া গৃহস্থের মত মনে হইতে লাগিল। গায়ে তেল মাখায় মানুষটাই যেন মোলায়েম হইয়া গিয়াছে, মাথায় ওখানে একটু বেশী ওখানে একটু কম তেল পড়িয়াছে বটে, তবু মেয়েটির চিরুনীতে টেরি কাটায় তার মধ্যেই যেন শৃঙ্খলা আসিয়াছে। মুখে দুরন্ত অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের স্থায়ী ছাপটা যেন পড়িয়াছে সংসারের চিন্তায় রাত্রে না ঘুমাইয়া।

বুড়ো বলিল, 'আচ্ছা, আজকে তো শনিবার, কাল রবিবার ছুটির দিন ছিল। কাল না এসে ওরা আজকে আসছে কেন?'

লোকটি বলিল, 'কাল ওরা আরেক যায়গায় মেয়ে দেখতে যাবে। বৈশাখের গোড়াতেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চায় কিনা, তাই তাড়াতাড়ি সব মেয়ে দেখে ফেলছে। কি মুস্কিল, অত ভড়ঘে যাচ্ছেন কেন? দেখুক না, এদেশে যত মেয়ে আছে ওরা দেখুক না সব কটাকে, আমাদের কি এল গেল! আমার পছন্দ তো ওদের পছন্দ, নইলে আমি ঘটক কিসের? আমি যার সঙ্গে যার বিয়ে দেব ভেবেছি তালুই মশায়, তার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই হবে।'

এতক্ষণে বুড়ো বোধ হয় এইবার প্রথম একটু হাসিল। 'তুমি যে স্বয়ং প্রজাপতি হয়ে উঠেছ বাবা। তা শুধু পরের বিয়ে না দিয়ে, নিজে একটা বিয়েথা করে সংসারী হও না এবার?'

'ও বাবা, বিয়ে! অন্যের বিয়ে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়, নিজে বিয়ে করব! যত সব বোকা হাঁদা ছেলে আর ন্যাকা আহ্লাদী মেয়ে—' মেয়েটি মাছের ঝোল পরিবেশন করিতেছিল, তার মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল,—'ময়না কি নিজে কখনো সন্দেশ খায়, তালুই মশায়?' বলিয়া হো হো হাসির শব্দে ঘর বোঝাই করিয়া দিল।

খাওয়ার পর বুড়ো কাছেই এক বাড়ীতে গেল, মেয়েটিকে সাজাইয়া দেওয়ার জন্য বাড়ীর মেয়েদের পাঠাইয়া দেওয়ার অনুরোধ জানাইতে।

লোকটি দোতালায় শুইতে গেল। বিছানা করাই ছিল। ঘুমে লোকটির চোখ ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিয়াছে, পান চিবানোর পরিশ্রমেও যেন কষ্ট হইতেছিল। সযত্নে বিছানা পাতিয়া বালিশের কোণে মেয়েটি বুঝি একটু এসেন্সও মাখাইয়া দিয়াছিল, গন্ধে ঘরের বাতাস ভুর ভুর করিতেছে। মেয়েটি জল আনিয়া দিল, আধ চিবানো পান কুলকুচা করিয়া বন্ধ জানালার খিড়কিরি ফাঁক করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া লোকটি শুইয়া পড়িল, শুইয়াই বুঝিল চোখ। মেয়েটি আহত বিস্ময়ে মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এখনো তার স্নান হয় নাই, আঁচলটা কোমরে জড়ানো, বেপরোয়া কুঁদলী মেয়ের মত দেখাইতেছিল তাকে; কোঁদল করার জন্যই সে যেন বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, যত কাছে যাওয়া যায়, চৌকীর প্রান্ত হাঁটুর নীচে ঠেকিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত।

'আর কিছু চাই না তো আপনার? দরকার হলে বলবেন।'

নিঃশব্দে দরকার জানানোর মত করিয়াই সে হাত বাড়াইয়া তাকে একেবারে বুকে টানিয়া জড়াইয়া ধরিল। মেয়েটি মড়ার মত অবশ হইয়া পড়িয়া রহিল তার বুকে। তার বুকের ধুক ধুকানি যেন কাণে শোনা যায়। তারপর লোকটি নিজে সরিয়া পাশে জায়গা করিয়া তাকে শোয়াইয়া দিতে, সে কোনরকমে উঠিয়া বসিল। মিনতি করিয়া বলিল, 'রাগ কোরো না। এখুনি চান করতে ডাকতে আসবে কি না তাই। নইলে—'

'ভাল করে সাবান টাবান মেখে চান কোরো।'

মেয়েটি নীচে নামিয়া দাঁড়াইল।—'রাত্রে থেকো। বাবা দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।'

স্নান করিয়া খাইয়া উঠিয়া একবার সে-ঘরে উঁকি দিয়া মেয়েটি দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। শুধু ঘুম নয়, নাক-ডাকানো ঘুম। তার প্রচণ্ড হাসির শব্দের মত নাক ডাকার শব্দটাও গম্ভীর ও মর্ম্মভেদী। তবু বাহির হইতে ঘুমের কোন প্রমাণই বোধ হয় যথেষ্ট ছিল না, তাই একবার ঘরে উঁকি দিতে হইল।

এটা তার নিজের ঘর। বিবাহের পর তার স্বামীও শ্বশুর বাড়ী আসিলে এই ঘরেই ঘুমাইবে।

অন্য একটি ছোট ঘরে বসিয়া মেয়েটি এই সব কথা ভাবিতেছিল, পাড়ার চার পাঁচটি মেয়ে আসিয়া পড়িল। দেখানোর জন্যে মেয়ে সাজাইতে এখনো ঢের দেরী, কিন্তু তারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না।

তাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনটা বাজিয়া গেল। বুড়ো মিনিট শুনিতেছিল, তিনটা বাজামাত্র লোকটিকে ডাকিয়া তুলিল। ষ্টেসনে যাইতে হইবে। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া লোকটি উঠিয়া বসিল, ঠাণ্ডা জলে চোখ মুখ ধুইয়া জামা গায়ে দিল। তখনও চোখ তার ঘুমে ভারি হইয়া আছে, মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে বুঝি সে অত্যন্ত ভোঁতা।

যাওয়ার আগে বুড়ো পাড়ার মেয়েদের বলিল, 'তোমরা তা'হলে ওকে সাজিয়ে ফেল মা?'

একটি বৌ বলিল, 'এত আগে কেন? এখন সাজালে ঘামে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

সুড়কি বাঁধানো পথ আগুন হইয়া আছে। দু'পাশের পাকা বাড়ীগুলি ঘিরিয়া যেন খেলা করিতেছে গরম হলকা। ষ্টেশন মিনিট দশেকের পথ। ঘরছুয়ার রেলিং কিছুই ভাঙ্গাচোরা নয়, তবু যেন সমস্ত ষ্টেসনটাই পরিত্যক্ত পুরাণো ভাঙ্গা বাড়ীর মত, প্ল্যাটফর্ম্মের অঙ্গনে শালপাতার ঠোঙ্গা আর অন্যান্য কয়েকটি জঞ্জাল যেন অনেককাল আগেকার ভোজ-উৎসবের চিহ্ন।

চারটের গাড়ীর বদলে পাত্রপক্ষ পৌণে পাঁচটার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। আগের গাড়ীটা তারা ধরিতে পারে নাই। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যা হয় দেরীতে, দিনের আলো থাকিতে থাকিতে মেয়ে দেখিবার যথেষ্ট সময় আছে।

লোকটি পরিচয় করাইয়া দিল। পাত্র সত্যই কার্ত্তিকের মত দেখিতে, ঘোগা ও ফর্সা এবং লাবণ্যবতী মেয়ের মত কোমল। দেখিয়াই বুড়োর পছন্দ হইয়া গেল। ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ীর দিকে যাওয়ার সময় বার বার সে তাকাইতে লাগিল ছেলেটির দিকে। পাত্রের বন্ধুটি একটু স্থূলকায়, কিন্তু বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। বাড়ী পৌঁছিয়া বাহিরের ঘরে জাঁকিয়া বসিয়া সেই সকলের হইয়া

দাবী জানাইল, মেয়ে যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় তাকে দেখানো হোক, একটু পাউডারও যেন মাখানো না হয়।

কিন্তু মেয়েরাও তো বোকা নয়, মেয়েটিকে সকলের সামনে হাজির করিলে দেখা গেল তাকে তারা এমন কৌশলে সাজাইয়াছে যে দেখিলে বলিবার উপায় নাই এটা মেয়েটির নিত্যকার প্রসাধন নয়। মিলের ধোপদুরস্ত রঙীন শাড়ী, নকল সিল্কের ছাপা কাপড়ের ব্লাউজ, সযত্নে আঁচড়ানো এলোমেলোভাবে পিঠে ছড়ানো তৈলচিকন চুল, পাউডার মুছিয়া ফেলা মুখের গাল ও ঠোঁটে স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম ধরা চলে না এমন একটু লালিমার আভাস, পায়ে পুরাণো ব্যবহার করা স্যাণ্ডেল।

লোকটি এতক্ষণ অনর্গল কথা বলিতেছিল, এবার একেবারে চুপ হইয়া গেল। একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়াই সে মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল। কতগুলি তুচ্ছ খুঁটিনাটির সাহায্যেই মেয়েদের রূপলাবণ্য যে এতখানি বাড়িয়া যায় এই রকম আবেষ্টনীতে কয়েকশ' মেয়ে দেখিয়াও এ পর্য্যন্ত সে যেন তা জানিত না। হয় তো সেই মেয়েগুলিকে আগে দেখে নাই বলিয়া।

মেয়েটি যথারীতি প্রশ্নের জবাব দিল, কয়েক লাইন গান গাহিল, একখানা বাংলা বই আর সেদিনকার ইংরাজী খবরের কাগজ হইতে কয়েক লাইন পড়িয়া শুনাইল, দাঁত সম্বন্ধে পাত্রের বন্ধুর সন্দেহ জাগায় ভেংচি দেওয়ার মত মুখভঙ্গি করিয়া দাঁত দেখাইল তারপর ছুটি পাইয়া ভিতরের দিকে পা বাড়াইল। ঘরে ঢুকিবার সময় সলজ্জ মন্থর গতিতে টিপি টিপি পা ফেলিয়া আসিয়াছিল, এখনও দরজা পর্য্যন্ত তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া গেল। পাঁচ সাতটি মেয়েলি মুখ দরজা জানালার ফাঁকে উঁকি দিতেছিল, মেয়েটি দরজার কাছে পৌঁছানো মাত্র জলে ডোবা মানুষকে টানিয়া তোলার মত তিন চারটি মেয়েলি হাত তাকে টানিয়া ভিতরে নিয়া গেল।

আলোর তেজ কমিয়া যাওয়ার ভয়ে আগেই মেয়ে দেখানো হইয়াছিল, এবার ব্যবস্থা হইল জলযোগের। গল্প চলিতে লাগিল নানা বিষয়ে, বর্ত্তমান বিষয়টি ছাড়া। লোকটির মুখ আবার খুলিয়া গেল। তারপর বুড়ো আর সে সঙ্গে গিয়া পাত্রপক্ষকে সাড়ে সাতটার গাড়ী ধরাইয়া দিয়া আসিল। তারা তাদের মতামত জানাইবে দু'চার দিন পরে।

গাড়ী ছাড়িয়া গেলে লোকটি বলিল, 'মতামত! আরে ব্যাটারা, আমি ইচ্ছে করেছি এ মেয়েকে তোরা পছন্দ করবি, তোদের আবার মতামত কিরে!'

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল, একটু অমায়িক হাসির সঙ্গে, 'হ্যাঁ ভাল কথা, একটা কথা তো আপনাকে বলতে হচ্ছে তালুই মশায়! বলতে বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে কিন্তু না বলেও উপায় নেই। এটা হল গিয়ে আমার প্রফেসন্—এতে তো আপন পর মানলে চলে না! মানে, খরচের টাকাটা যদি—' বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'দেব বৈকি বাবা, নিশ্চয় দেব। আজ তো থাকবে এখানে, কাল সকালে যাবার সময় নিয়ে যেও। আগাম যদি দরকার হয় কিছু—'

পাঁচ সাত জন প্রতিবেশী বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছিল। বুড়ো তাদের কাছে আটকাইয়া গেল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক শীতল হইতে আরম্ভ করিতেছে, বেশ উপভোগ্য হাওয়াই এতক্ষণে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লোকটি ভিতরে চলিয়া গেল। পাড়ার মেয়ে-বৌরা বিদায় নিয়াছে। ইতিমধ্যে চুল বাঁধিয়া কাপড় বদলাইয়া মেয়েটি অনেকটা আগের অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে,—বেশে এবং মনে।

'এক কাপ চা করে দেবে?'

'দিই। ঠাকুর, উননে কি চাপিয়েছ নামিয়ে—'

লোকটি বাধা বলিল, 'না, তুমি ষ্টোভ ধরিয়ে করে দাও।'

মেয়েটি খুসী হইয়া বলিল, 'দিই—এখুনি দিচ্ছি। ঠাকুর জল গরম করে দিলে আমিই অবিশ্যি চা তৈরী করতাম।'

বারান্দার একপাশে ষ্টোভ ধরাইয়া সে চা করিতে লাগিল আর লোকটি কাছে একটা মোড়াতে বসিয়া উসথুস করিতে লাগিল। মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলটা হাতে নিয়া লেবেলের উপর লাল রঙে ছাপা তাড়াতাড়ি ভাবে বসানো দু'টি হাড় ও মড়ার মাথাটা মাঝে মাঝে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি চা করিয়া চায়ের কাপ আগাইয়া দিলে সে কাপ হাতে নিয়া অর্দ্ধেক চা অন্য একটা কাপে ঢালিয়া দিল। তারপর স্পিরিটের বোতল হইতে খানিকটা স্পিরিট কাপে ঢালিয়া নাড়িতে লাগিল চামচ দিয়া।

'খাবেন?'

এক চুমুকে কাপের পদার্থটি অর্দ্ধেক শেষ করিয়া সে সায় দিয়া বলিল 'খাব বৈকি! গরম চা আর ঠাণ্ডা স্পিরিট—চমৎকার।' বলিয়া সে মুখ বিকৃত করিল।

'কিন্তু ওযে বিষ! মরে যাবে যে তুমি!'

আরেক চুমুকে লোকটি কাপ খালি করিয়া ফেলিল। এবার মুখটা বিকৃত করিল প্রথমে।—'আমরা হলাম নীলকণ্ঠ, ওতে আমাদের কি হবে। তুমি খেলে মরে যেতে, আমার শুধু নেশা হবে একটু।'

স্পিরিটের বোতলটা কাছে টানিয়া মেয়েটি সেটা একটু তফাতে লোকটার হাতের নাগালের বাহিরে সরাইয়া রাখিল। লণ্ঠনের আলোতে তার মুখের বাদামী রঙ আরও গাঢ় দেখাইতেছে। উত্তেজনায় সে ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল।

'মাঝে মাঝে খান বুঝি?'

'খাই বৈকি—হাতে যখন পয়সা থাকে না, তখন খাই। সস্তা দেশী খেতে পারি না, আমার বিলিতি চাই।'

'বাবাকে বলব আনিয়ে দিতে?'

'থাক্, বুড়োমানুষকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই।'

মেয়েটি বারান্দার সিমেন্টে বসিয়াছিল, এখন আর সিমেন্ট গরম নয় কিন্তু ঠাণ্ডাও হয় নাই। পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া গান শিখিতেছে, রান্নাঘরে ঠাকুর হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ করিয়া কি যেন সাঁতলাইতেছে।

'আমার জন্যে বাবার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, পাত্রটিও ভাল।'

'দেড়শো টাকা মাইনে পায়, ওর কোন কাজে লাগবে না, নগদে গয়নায় আমার বাবার কতগুলো টাকা খসানো চাই।' গুরুজনকে যেন অপমান করিয়াছে এমনি ভাবে ভয়ে ভয়ে মেয়েটি তার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কিন্তু লোকটি কোন জবাব দিল না, একটু হাসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

স্পিরিটের বোতলটি হাতে তুলিয়া মেয়েটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। মড়ার মাথাটা দেখিয়া একটু শিহরিয়া উঠিল।

'আচ্ছা, বেশী খেলে তো মানুষ মরে যায় ?'

'যায় বৈকি। কাগজে প'ড়ো না খবর বেরোয় মাঝে মাঝে ? বেশীর ভাগ মরে যারা। তবে সে আর কটা। কত কোটি বউ আছে দেশে, তাদের মধ্যে দু'দশটা মোটে। একেবারে অসহ্য না হলে তো আর কেউ মরে না। দু'চারটে এমন লোকও আছে, যারা বিপদ ঘটবার আগেই মরে যায়। কেন রে বাবু, আগে ছাখ বিপদটা সত্যি বিপদ কি না, কিরকম হয় বিপদ ঘটলে, তারপর না হয় মরিস। মরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, দু'দিন পরে মরলে কি আসে যায়।'

শুনিতে শুনিতে মেয়েটির মুখের ভাব বদলাইয়া যাইতেছিল। কথার শেষে তার দু'চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

'ভয় নেই, আমি মরব না। তেমন হাল্কা মেয়ে আমি নই।'

'তোমার কথা বলছি নাকি ?'

তারপর দূরে থানায় ঢং করিয়া সাড়ে আটটা বাজিল। লোকটি উসখুস করিতে লাগিল। মেয়েটি নিজের হাতে মাছ রাঁধিতে গিয়াছে। একবার আসিয়া সে চুপি চুপি বলিয়া গেল, 'আজ একটু রাত হবে খেতে। দশটার আগে রান্নাই হবে না। তোমার জন্যে অনেক রকম রান্না হচ্ছে কি না।'

লোকটি ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। রোয়াকে দু'তিন জন প্রতিবেশী বুড়োর সঙ্গে গল্প করিতেছে। চেনা অচেনা কোন আসরে কোন আলোচনাতেই যোগ দিতে তার বাধে না। যোগ দিয়া একাই সে আসর জমাইয়া রাখে। এখন একরকম চুপচাপ একপাশে বসিয়া সে উসখুস করিতে লাগিল। রাস্তায় দু'চারজন লোক চলিতেছে, আধখানা চাঁদের আলোয় ঝাপ্‌সা জগতে রাস্তার তেলের আলোগুলি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিক শান্ত, স্তব্ধ—শব্দ নাই, ভিড় নাই, হৈ চৈ নাই উত্তেজনা নাই।

হঠাৎ লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কি সর্ব্বনাশ, আমায় এখুনি যেতে হয় তালুই মশায়।'

বুড়ো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'এখুনি যাবে ? খেয়ে দেয়ে রাতটা এখানে থাকবে বলেছিলে যে ?'

লোকটি বলিল, 'একেবারে ভুলেই গেছলাম। কাল রবিবার, কাল এক

গণ্ডা মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একজনের বাড়ীতে আজ রাত্রে খবর দিতেই হবে। এটা হল বিয়ের সময়, আমার কি একটা রাত কোথাও থাকবার উপায় আছে, তালুই মশায়! সাড়ে নটার ট্রেনটা আমার ধরতেই হবে।'

একটু থামিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'একটু এদিকে শুনবেন তালুই মশাই ? একটা দরকারী কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী মেয়ে

১

বিজলি বাতির তীব্র আলোর নিচে
সিনেমার হলে দেখতে পেলুম।
শত শত নারীর ভিড় এড়িয়ে
গেল নজর তার দিকে।
ফুরফুরে জর্জেট লতিয়ে উঠেছে তন্বীর দেহ বেয়ে,
মুখখানা পটের মতো নিপুণভাবে রং দিয়ে আঁকা,
মণিমুক্তো করে ঝলমল।
এ সব কিছু নজরে পড়ে না,
কেবল দেখি তার চলা, প্রতি পদক্ষেপ দর্পে ভরা;
দেখি তার গ্রীবার ভঙ্গী, দুনিয়াকে হেলায় দেখে নয়ন কোণে।
আপনাকে সে তীরের মতো হানে সবার চোখে
ক্ষণিকের সেই চমক দেওয়া মেয়ে।

২

বাঁশের বনে লুকিয়ে আছে জীর্ণ কুটীর।
আধ ঘুমোনো শিশুর মুখে স্তন দিয়ে
দাওয়ায় পা মেলে বসে আছে
তার ষোলো বছরের মা।
পরণে মোটা কালো পাড়ের শাড়ি,
হাত দুখানিতে আছে শাঁখা,
আর কিছু নেই তার ভূষণ।
সেই ভাঙ্গা ঘর, সেই ময়লা কাপড়, নগ্ন শিশু
এ সব কিছু নজরে পড়ে না।
কেবল দেখি তার শ্যামল কান্তি,
দেখি তার স্নেহসিক্ত চাহনি, সহজ স্নিগ্ধ ভাব।
গ্রামের কোণে আলো করে ঘর
এই যে বাঙালী মেয়ে, সে চিরদিনের॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাকে

একদিন মনে হ'ত জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চ'লে যায়—জলের প্রতিভা।

মনে হ'ত তীরের উপরে ব'সে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ কেউ তুলে নিয়ে চ'লে গেলে—নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জ্জন জলের রং তাকায়ে র'য়েছে;
স্থানান্তরিত হয়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় ব'লে
রঙীন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয়;
অপরাহ্ণে আকাশের রং ফিকে হ'লে।

তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত:
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

জীবনানন্দ দাশ

সময়

রাত্রির কালো কঠিন তিমির ভেদ করে
দীপ্ত ময়ূখে সন্ধানী দিন আসে কী ?
গোধূলিলগ্নে শেষ দেখাদেখি লাল ঝড়ে
সম্ভাবী দিন রাত্রিরই মোহে ভাসে কী ?

কবরের কালো পথ ঘিরে ঘিরে
মমিদের শোভাযাত্রা :
মূক যাত্রীরা পাছে পাছে চলি আমরা—;
সেই যাত্রার বিশেষ অংশ হয়তো নই,
দেরী বেশী তবু নয় সেদিন।

দুরূহ হয়তো বীজ-বপনের কার্যটাই
নিরীহ রাত্রি বিধুর স্বপ্নে তাই মুখর।

ভবিষ্যতের আশা তবু রাখি চিত্তে—,
সেই আশাতেই তাই আজ নির্লিপ্ত।

নূতন আলোর সেতু বেয়ে আসে দীপ্ত দিন
কবরের পাশে মমিদের শোভাযাত্রা।
রাত্রি-তিমিরে পথগুলি আজো তবু মলিন
কবরের পাশে আমাদের মূক যাত্রা।

শ্রীপরিতোষ খাঁ

পরিক্রমা

স্তম্ভিত প্রাসাদগুলি। কূটনীর্ঘে তার
গলিত সোণার মত রবি-রশ্মি-জাল—
গড়িতেছে কতকাল মৃত্যুর পাহাড়।
যবনিকা-অন্তরালে হাসে মহাকাল।

উন্মুক্ত প্রান্তর। নয়নের লাভা স্রোতে
ঘর্মাক্ত মানব-দেহে শ্রমের নিশানা ;
পরিপুষ্ট পরভৃত এলো কোথা হ'তে—
আহরিত শস্যে দিল অতর্কিত হানা।

যান্ত্রিক নগর। অন্ধকার পথগুলি,
নাগরিক প্রাসাদের দলবদ্ধ সারি,
রোগবীজ-পরিব্যাপ্ত ওড়ে পথধূলি
ক্ষীণকায় ছায়ামূর্ত্তি নগর-সঞ্চারী।

বিদ্রোহী মানব। তন্দ্রা ভেঙে অকস্মাৎ
চেতনার বজ্র-শিখা পেল কি ইন্ধন ?
রক্তিম উদয়াচলে কাঁদে অন্ধরাত—
অন্ধকারে শোনা যায় প্রাণের স্পন্দন।

গোপাল ভৌমিক

প্রাচীন-সিংহলীয় সংস্কৃতির এক অধ্যায়

(অষ্টম ও নবম শতাব্দী)

এই সেদিন সিংহলের ষ্টেট্-কাউন্সিলে একটি বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, এ-দেশের যথার্থ নাম শ্রীলঙ্কা। সিলোন অথবা শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাসের একটা গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের সম্বন্ধ।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই শ্রীলঙ্কায় কাব্যচর্চা চলে আসছিল। বিদ্যোৎসাহী রাজার আমলে কবিরা যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর পেতেন। নিদর্শন স্বরূপ আমরা জানতে পারি, Aggabodhi I (circa 564-597) রাজার সভাকে দ্বাদশ কবি অলঙ্কৃত করতেন। এঁরা সিংহলী ভাষায় কাব্য রচনা ক'রে যশস্বী হয়েছিলেন।

এই সিংহলেই একটা পাহাড়ের উপর সিগিরিয়ো (Sigiriya) প্রাসাদ অবস্থিত। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আঘাতে সে প্রাসাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু। তবু সেই প্রাসাদ গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে সিংহলী অক্ষরে অনেক কবিতা এবং অঙ্কিত আছে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ও অনেক নারীমূর্তি। লিখনসমূহের অক্ষরগুলো জীর্ণ হয়ে এসেছে কিন্তু তবু এদের পাঠোদ্ধার ক'রে পণ্ডিতেরা কবিতাগুলোকে সাধারণ্যে এনেছেন। সংক্ষেপে, সুন্দর কথায়, সরল ক'রে ছোট ছোট অনেক কবিতা সেখানে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। এগুলির লেখক বহু। অনেকেই তাঁদের নাম সেখানে লিখে গেছেন। এই সব নামের মধ্যে জড়িত আছে অনেক রাজার নামও। রাজা মহেন্দ্র এবং Dappula Adipada, ইত্যাদি রাজার নামের পরিচয় থেকে এরূপ অনুমিত হয় যে কবিতাগুলির লিখন সময় অষ্টম বা নবম শতাব্দী।

একদা এই আশ্চর্য্য প্রাসাদ অনেকটা তীর্থক্ষেত্রের মতো জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর ভারতের নাগরী অক্ষরের (৮ম বা ৯ম শতাব্দীর) সন্ধানও সেখানে পাওয়া গেছে। নাগমল্ল নামে একজন লেখকের লেখা থেকে বুঝা যায়, উত্তর ভারতের লোকও কোন কারণে এই প্রাসাদ পর্য্যন্ত এসেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের লোকও যে সেখানে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীর পল্লব গ্রন্থে যে সংস্কৃত অক্ষরের পরিচয় আছে, সেরূপ অক্ষরের লিখনও প্রাচীরগাত্রে আছে।

দেশীয় ও বিদেশীয়ের, রাজা আর প্রজার, কবি এবং অকবির লেখার এমন সমাবেশ যেখানে, সে-স্থান সম্বন্ধে সহজেই মনে হয়, এ স্থান কোনোকালে অতিদ্রষ্টব্য আর জনপ্রিয় ছিল।

প্রাচীরগাত্রে গদ্য লিখনও কিছু আছে কিন্তু আমরা কাব্যলিখন নিয়েই যা বলবার বলবো। ছন্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেছেন। নানা ছন্দে লেখা। সেকালে যাঁরা নানা জায়গা থেকে সেখানে যেতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই রসবোধে বিচক্ষণ ছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁরা নিজ নিজ দেশের কাব্য-সংস্কৃতি বহন করেছেন।

নিজ নিজ সৌন্দর্য্যবোধকে এঁরা খুব কম কথায়ই রূপ দিয়ে গেছেন। এই হিসাবে যদি ভারতবর্ষীয়েরা কালিদাসকে সেখানে ভাবের দিক থেকে অনুকরণ করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

কাব্য-বিচারে অনেক কিছুর প্রয়োজন। সে সব বিচার করতে হলে মৌলিক উপাদান চাই। মৌলিক উপাদান অর্থাৎ সিংহলী অক্ষরের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় কম। আধুনিক যুগে কাব্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদ্‌লে গেছে। তবু মোটামুটি আমরা সকলেই কালিদাস, ভাস ইত্যাদি পড়েছি। কালিদাসের শকুন্তলার তৃতীয় সর্গের যিনি রসগ্রহণ করতে পারেন, তিনিই এমন কবিতার রসগ্রহণ করতে পারবেন।

সিগিরিয়ো প্রাসাদ আজ ধ্বংসোন্মুখ। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বলেই নাতিদূরে রয়েছে অরণ্য। একটি কবিতা থেকে আমরা জেনেছি যে অনেক কষ্টে এই প্রাসাদে আরোহণ করতে হতো। একজন লিখেছেন, অতি কষ্টে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে প্রাসাদ পর্য্যন্ত এলেন। যেই তিনি প্রাচীর তনু-গাত্রে সুন্দরীদের দেখলেন, অমনি তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার অন্তর্দ্ধান হলো।

পণ্ডিতদের মতে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীর কয়েকটি কবিতাও আছে। তবে সেগুলি সংখ্যায় অল্প। বেশীর ভাগ কবিতাই অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর। হাজার বছরেরও উপর এরা টিঁকে আছে। প্রাচীরের সুরক্ষিত অবস্থাই বোধ

হয় এদেরকে সংরক্ষণ করেছে। কতকগুলি কবিতা দেখে মনে হয় সেগুলির উপর কারো হাত পড়ে হয়তো পুরাণো অক্ষরকে নতুন করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল।

এই অক্ষরগুলি, এই কবিতাগুলি কেন এতকাল সমাদৃত হয় নি—এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগবে। কিন্তু সমাদৃত কি করে হবে—৫ম থেকে ৯ম শতাব্দীর এই অক্ষরগুলোর সঙ্গে আধুনিক যুগের পরিচয় ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক, কারণ কাল ইতিমধ্যেই দীর্ঘ ব্যবধান রচনা করে রেখেছে। প্রাচীর পৃষ্ঠে অক্ষর কোথাও সযত্নে উৎকীর্ণ, কোথাও বা বাঁকা চোরা লিখন।

সিংহলের সাহিত্যের ইতিহাসে যে সব অক্ষরের মোটামুটি পরিচয় মিলেছে তার চাইতেও পুরাণো এই সব অক্ষর। অনেক অক্ষর দুর্বোধ্য ঝাপ্‌সা—কোনো রকমে তাদের অর্থ-সঙ্গতি করতে হয়। এ ছাড়া যে উপায় নেই, এ কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে, কারণ সহস্র বৎসর এদের উপর দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। কোনো কোনো শব্দ অথবা তৎকালীন ব্যাকরণগত বাক্য-বন্ধনের সঙ্গে হয়তো এ যুগের পরিচয়ই নেই। যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের উপর দিয়ে সে সব স্থল পেরিয়ে যেতে হয়।

সুতরাং, শুধু সারমর্ম্ম অথবা কাব্যরস গ্রহণ ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় নেই। প্রাচীর-উৎকীর্ণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমাদের সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ হতে হবে—অনুভব করতে হবে, সে কালের লেখকদের বেদনাবোধ কি রকম করে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।

প্রাচীরগাত্রের লিখনের ভাষা দেখে ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন যে প্রাকৃত ও প্রাচীন সিংহলী ভাষার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় এসব লিখন উৎকীর্ণ। অক্ষরবিৎ পণ্ডিতেরও অনেক বক্তব্য সে বিষয়ে আছে।

আগেই বলেছি, লিখন আছে অনেক কিছু সম্বন্ধে। সিগিরিয়ো প্রাসাদে যে অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর সঙ্গে দর্শকের সাক্ষাৎ হলো, তার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতিই মোটামুটি লিখ্য বিষয়। প্রাচীরগাত্রে রূপসী তরুণীদের মূর্ত্তি দর্শন করে বেশীর ভাগ কবিতাই লেখা হয়েছে। সমস্ত প্রাসাদকে নিয়েও কেউ প্রশস্তি রচনা করেছেন। একটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তিকে নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে।

নারীমূর্ত্তি দু'রকমের আছে। কতকগুলি মূর্ত্তি শাদা আর কতকগুলি কালো। সমস্ত কবিতায় এদের দু'ভাগ করে দেখা হয়েছে। শাদাগুলোকে বলা হয়েছে সোনালী বর্ণের, আর নীল-সাঁপলা রঙের বলা হয়েছে কালোগুলিকে। কবিরা কেউ সোনালী রঙের রূপসীকে বন্দনা করেছেন, কেউ নীলবর্ণের রূপসীকে। এমনও হয়েছে যে কেউ সোনালী রঙের সুন্দরীদেরকে তুলনায় বড়ো করে কবিতা লিখেছেন ব'লে অন্য লেখক, যিনি নীলবর্ণের রূপসীতে মুগ্ধ, তিনি চ্যালেঞ্জ (কবিতার মধ্যেই) জানিয়েছেন।

কেউ কবিতায় জানিয়েছেন যে, সমস্ত রূপসীরা রাজা কাশ্যপের পত্নী যার প্রাসাদ ছিল এই পাহাড় চূড়ায়। পিয়াল বলে একজন লিখে গেছেন :

> পিয়াল এসে দেখলো গুহায় হরিণ-নয়নারা
> রাজ বিরহে কাটায় কাল ব্যথায়।
> চিকুর তাদের মলিন হলো, মলিন হলো নয়ন—
> নীলকুমুদীর মতন এমন নয়ন পটলচেরা।

কাহিনী হয়তো সত্য নয়—এ কথা কবিও শেষে লিখে গেছেন। কিন্তু কবিকল্পনায় রূপ নিয়েছে বিরহিণীদের বেদনা—যখন রাজা হয়তো মৃত অথবা পরদেশে আছেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও লিখবার চেষ্টা করেছেন। রাজা প্রজা ভিক্ষু সকলেই কাব্যের আসরে এসে এখানে জড় হয়েছেন।

প্রায় ১৫০টি লিখনের অর্থবোধ হয়েছে। বাকীগুলো বোঝবার জন্যে পণ্ডিতেরা চেষ্টা করছেন। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের এ অধ্যায় সত্যিই গৌরবময় ছিল। শিল্পী প্রতিষ্ঠা করেছে রূপের মধ্যে প্রাণ, আর সেই প্রাণকে ঘিরে কবিরা বন্দনাগীতি গেয়েছেন। একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, সমস্ত কবিতার মধ্যেই এমন একটা আকুতি আছে, যাতে মনে হয় কবিরা এদেরকে রক্তমাংসের মূর্ত্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

আমরা যখন অনুবাদ ক'রে যাবো, তখন দেখবো, লেখকরা এই মূর্ত্তিদের নিয়েই বিরহ-অভিমান-বেদনা অনুভব করেছেন।

একটা সংস্কৃত লিখন সেই সব কবিতার মধ্যে পাওয়া গেছে—সেটা হলো এই :

পীন পয়োধর ভারা ললিত সরস তনুমধ্যা
নীলেন্দীবরনয়না কেয়ং মনোরমা রামা ?

(এটা সিংহলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছ থেকে পেয়েছি—লেখক।)

কবিরা প্রশ্ন করতেন, মূর্ত্তিরা কেন কথা কয় না ? মহারাজ মহেন্দ্রের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বোধদেব লিখে গেলেন :

রূপসীর করপুট সুন্দর রক্তিম
যেন চাঁপা ফুল।
মোহিনী হয়েছে মন—হয়েছে আমার ;
অথচ কহে না কথা—এ কি অবিচার।

মূর্ত্তিরা কেন কথা কয় না—এ নিয়ে অনেক কবি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ বলেছেন এদের একমাত্র প্রিয়তম মারা গেছেন বলে এরা দুঃখে মৌন হয়ে আছে। কেউ এই কারণ অনুমান করে এদের নিষ্ঠার প্রশংসা করে গেছেন। আবার কেউ চেয়েছেন, মূর্ত্তিরা আবার কথা বলুক :

এ কথা সত্য, প্রিয়তম মৃত তোমাদের,
ভুলে গেছ কেন—হৃদয় তো আছে আমাদের।

কেউ একটি কবিতায় লিখেছেন : রাজা যাবার আগে সুন্দরীদের শপথ করিয়ে নিয়েছেন, যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে এরা আর কারো দিকে চেয়ে স্মিত হাস্য না করে অথবা কারো সঙ্গে কথা না বলে। এই জন্যেই এই পাষাণ সুন্দরীরা কথা আর কইবে না। অন্য একজন এ কথা মিথ্যা বলেছেন, তাঁর মতে সুন্দরীরা এই জন্য চুপচাপ নয়। তারা অপেক্ষা করছে : তাদের প্রিয়তমের মতো আর একজন পুরুষ আসুক—তবে তারা কথা বলবে।

কোনো কেউ মানভঞ্জনের মতো, অনেকটা হয়তো জয়দেবের মতো কবিতা লিখেছেন। তাঁরা যেন সুন্দরীদের মানকে নিবারণ করতে চাইছেন, 'মানিনী, মান নিবার'।

কারো মতে, নারীরা কথা কয় না, কিন্তু ওদের সমস্ত কথা আছে ওদের আলগোছে-মুঠোয়-ধরা ফুলের ভেতর। একজন বলেছেন, তিনি ফুলের ভাষা জানেন, কিন্তু তা তিনি অন্যের কাছে প্রকাশ করতে অক্ষম, কারণ, তাহলে তাঁর মন এই রূপসীদের ছেড়ে, বলা-শুনার অতি সাধারণ জগতে নেমে আসবে। একজন বুদ্ধদাস লিখেছেন :

রমণী জানে না বলিতে মধুর কথা,
তথাপি দেখেছি, ফুল আছে তারে ঘিরে,
আমার হৃদয় ঘিরেছে রূপসীটিরে,
মেঘের উপমা কুঞ্চিত কেশে যার।

কেউ হয়তো পাষাণ সুন্দরীদের নীরবতা ভাঙ্‌বার জন্য চিঠি লিখতে সঙ্কল্প করেছেন এদেরকে,—তবু যদি মৌনতা ভাঙ্গে।

একটী কবিতা আছে চমৎকার। কবি এতকাল পরে একটী সুন্দরীর কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছেন। কবির আনন্দ অপরিমিত। লিখছেন :

রাজহংসরা সরসী দেখেছে যেন
তেমনি আবেগে তোমার কথাটী শুনি,
ভ্রমর পেয়েছে পূর্ণ-কমল হেন
আমার পরাণ শুনে সান্ত্বনা-বাণী।

আরো দু'টী কবিতা চমৎকার।

উন্মাদ ভ্রমরের অপরূপ গুঞ্জন,
উন্মুখ-কমলেরে শিহরায়,
কিংশুক-রেণুরে যে কী শুনায়।
রূপালী কিরণে ভাঙে শাদা সাঁপ্‌লার ঘুম
শরতের মহাকাশে সুন্দর চাঁদ।
ক্ষীণ কটি আছে শুধু, ওদের যে মন নাই,
না-পাওয়ার-ব্যথা ভুলে, অতএব ঘরে যাই।

সিগিরিয়ো পাহাড়ে পুরুষ মূর্ত্তি নেই। সেইজন্য এ সব রমণীদের বেদনাকে বিরহ বেদনার পর্য্যায়ে, চমৎকার করে অনেক কবিই ফেলে গেছেন। কোনো

কবি তাঁর গাথা-বন্ধনের মধ্যে অনুমান করেছেন, হয়তো কোনো সাধু পুরুষকে এঁরা এককালে যৌবন-চাঞ্চল্যে অথবা বুদ্ধির চাপল্যে, নীল চোখের শরাঘাত করেছিলেন, এবং সেই থেকেই গুরুতর অপরাধের জন্য, সব চাইতে ক্লেশদায়ক, অর্থাৎ বিরহের যন্ত্রণা ভোগ করার এই শাস্তি হয়েছে।

একটি কবিতায় জানা যায়, সোনালী রঙের পাঁচশ সুন্দরীর আকৃতি এই পাহাড়ে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তত সুন্দরীর অস্তিত্ব এখানে মেলে না। এমনও কবিতা পাওয়া যায়, যেখানে একটি নারীমূর্ত্তির যেরূপ বর্ণনা আছে, সেরূপ নারীমূর্ত্তির অস্তিত্ব সেখানে নেই। তা হলে বুঝতে হয়, এককালে অন্য রকমের মূর্ত্তিও ছিল, এখন যা নেই। একটি বর্ণনা এরূপ পাওয়া গেছে যে, একটি সুন্দরী বসে আছে আর তার গান গাইবার খুব ইচ্ছে হয়েছে বলে বীণাযন্ত্র কাঁধ থেকে কোল অবধি ধরে রেখেছে। অথচ সে বীণা বাজাচ্ছে না—বীণার তারগুলো ছেঁড়া। বীণার তারগুলো সেই হয়তো ছিঁড়ে ফেলেছে, কারণ তার মনে হয়েছে প্রিয়তম এখানে নেই—চিরকালের বিরহিণী সে এখন, কেননা তার প্রিয়তম মৃত।

প্রাচীর গাত্রে এই সমস্ত অঙ্কন ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে—এই দুঃখে কোনো কবি বেদনা জানিয়েছেন :

চিত্রণ-সুন্দরীদের ম্লান দেহগাত্র,
অঙ্গরাগ বিবর্ণ যে,—নয় কি বিচিত্র ?
নেই কি এমনো কেউ কোনোকালে যারা,
এদের সমীপে হলো মনপ্রাণ হারা ?

নীলরঙের নারীমূর্ত্তিকে আবার কেউ স্বতন্ত্র করে বন্দনা জানিয়েছেন। যেগুলোর কথা আমরা এতক্ষণ বলে এলাম, সেগুলি সোনালী রঙের মূর্ত্তির উদ্দেশে রচিত হয়েছিল। এখন একটি নীলরঙের উদ্দেশে :

নীল সাঁপলার মতো সুন্দরীর রঙ,
গূঢ় হাসিটুকু তার কুয়াসার মতো,
আর দেহরেখা তার বড়ো মনোরম।

এর লাগি' রাজা তার ছাড়ে রাজধানী,
লঙ্কাদ্বীপ তুলনায় কিছু নয় নয়,
রাজা ধন্য হবে পেলে প্রেয়সীর পাণি।

আবার কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে এই সব প্রেমিক কবির কবিতায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। এদের গরম মস্তিষ্ক বলে অভিহিত করেছেন। *

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

* সাহায্য-সূত্র হলো—S. Parnavitna, Journal, R. A. S. C- B. vol. XXXN No 92—1939.

পুস্তক-পরিচয়

দল ও নেতা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় (জয়শ্রী কার্য্যালয়) —।০ আনা।

নেতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে দলের সম্বন্ধে কৌতূহল স্বভাবতঃই যখন বেড়েছে এমন সময় এই পুস্তিকাটি হাতে এল। ফরওয়ার্ড ব্লকের চালক মস্তিষ্ক শক্তি অনেকখানি অনিলবাবুরই দৌলতে একথাও শুনেছি, সুতরাং বইখানি খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়লাম।

ছোট্ট বইখানির পাতায় পাতায় বিপ্লবী কথাবার্ত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। 'আজকের দিনে বুভুক্ষু গণসমাজ দল বাঁধছে' (৪)। 'বিপ্লবের উদ্দেশ্য হ'ল নতুন সমাজ গড়া' (১৯)। 'গণসাধারণই আসল বিপ্লবী' (২০)। 'পার্টি বা দল হচ্ছে জনতাশক্তির পিসটন্' (২১)। 'সংখ্যায় নূন্য হলে পার্টির ভয় পাবার কিছু নেই, কেন না আসল কথা হ'ল correct line বা 'নির্ভুল দিশা' (২৫)। 'গান্ধীজি এককালে বিপ্লবী ছিলেন, এখন আর 'গণসংযোগী' নন' (২৮)। 'আজকের দিনের বিভিন্ন দলগুলিকে ইতিহাস কাজ দিয়ে বিচার করবে, কথা দিয়ে নয়' (৩০)। 'পার্লামেন্টীয় দ্বৈত প্রথা বিপ্লবের যুগে অচল' (৪৮)। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতি বইখানির পাতাগুলিকে কণ্টকিত করেছে। বার্ক্, হাক্স্‌লি, রাসেল্, কোল, পারেটো, লেনিন্, ষ্টালিন্, ট্রট্স্কি, মার্টভ্ কেউই বাদ পড়েন নি'—সকলের থেকেই বাণী উদ্ধার করে লেখক প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও তাঁর লেখার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বহু পাঠক এতে হয়ত স্তম্ভিত হয়ে পড়বেন; যদিও অনেক ক্ষেত্রে লেখক পণ্ডিত-প্রবচনের context দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক মনে করেন নি।

কিন্তু এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সাধারণ ফ্যাক্টের প্রতি অমনোযোগ পুস্তিকাটির পাঠকদের চোখে সহজেই পড়বে। পার্লামেন্টীয় শাসনপদ্ধতিতে একই দল নির্দ্দিষ্ট একটা কালের বেশী কি গদিতে থাকতে পারে না (৪৭)? বর্ত্তমান যুগের সব চাইতে বড় আবিষ্কার কি সঙ্ঘশক্তি (২)? সকল পার্টি বা দলই কি

গণসাধারণের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও দাবীর সংহত রূপ (৪)? এছাড়া নানাদেশের বিভিন্ন দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু (৬-৭) পড়লে হাস্যসম্বরণ কঠিন হয়ে পড়বে।

কিন্তু এসব হ'ল সামান্য ত্রুটি। বইটির প্রধান প্রতিপাদ্যের খুবই গুরুত্ব রয়েছে এবং বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিলবাবুর লেখার ব্যাপক প্রচলন সন্তবপর বলে' এ সম্বন্ধে ধীরভাবে আলোচনার সার্থকতা আছে। নতুন সমাজগঠন প্রচেষ্টাকে অনিলবাবু প্রেরণা বলে' স্বীকার করেছেন এবং বিপ্লবোন্মুখ মতামতকে লক্ষ্য করে'ই বইখানি লেখা হয়েছে—সুতরাং বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই এর বিচার হওয়া উচিত।

আজকের দিনে বামপন্থার মূল উৎস হ'ল মার্ক্সবাদ—সারা পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতাকে ফরওয়ার্ড ব্লকও অগ্রাহ্য করবে না। ভারতে শ্রমিক বিপ্লব আসন্ন কি সুদূর পরাহত—এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বামপন্থীরা ভারতীয় সমস্যাকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিশ্লেষণ করবে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর গুণেই রুষবিপ্লবের কুড়ি বছর আগেকার লেনিনের রচনাগুলি পর্য্যন্ত মার্ক্সীয় সাহিত্যের ভূষণ। অনিলবাবু লেলিন্ ষ্টালিনের দোহাই দিয়েছেন কিন্তু তাঁর বইএ মার্ক্সবাদের প্রাণবস্তুর অভাব, তার যেটুকু ছায়া এ-লেখায় পড়েছে তা' অতিবিকৃত রূপান্তর মাত্র।

'দল ও নেতার' বহুস্থানে গণসাধারণ, গণশক্তি, জনতা, গণদেবতার স্তুতি আছে। উদাহরণ স্বরূপ ২০ পৃষ্ঠার উল্লেখ করা যায়। সমাজগঠনে class বা শ্রেণীর যে প্রাধান্য মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের গোড়ার কথা, তার চিহ্নমাত্র এখানে নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীপ্রত্যয়কে বাদ দিয়ে জনতার এই আরাধনা নতুন কথা নয়—মার্ক্সের সাহিত্যে একে বরাবরই পেটিবুর্জোয়া ভ্রান্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার রাষ্ট্রনীতিতে উগ্র চরমপন্থা যে বহুদিন পর্য্যন্ত পেটিবুর্জোয়া মনস্তত্ত্বে আচ্ছন্ন ছিল, একথা আজ বহুস্বীকৃত। অনিল বাবু তথা ফরওয়ার্ড ব্লক কি এখনও সেই মনোভাবকে আঁকড়ে থাকবেন ও মার্ক্স ও লেনিনের পন্থার থেকে অভিন্ন বলে চালাবার চেষ্টা করবেন? তা নয়ত গান্ধীবাদের 'একমাত্র প্রতিপক্ষ' সুভাষচন্দ্রের (৩৩) তরফ থেকে ভারতীয় সমস্যার যে আলোচনা অনিলবাবু আমাদের উপহার দিলেন, তাতে মার্ক্সের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার স্থান মাত্র নেই কেন? 'দল ও নেতা'

ও' চিন্তাশীল লোকদের লক্ষ্য করে'ই লেখা, এতে চিন্তাশক্তির এই দৈন্য এবং মার্ক্সতত্ত্ব সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞতার কারণ কি? Context বিবর্জ্জিত অবান্তর উদ্ধৃতিতে প্রশ্নের কোনও সমাধান হয় না। ২৫ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় যে-পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই Workers' পার্টির সঙ্গে অনিলবাবুর দলের সাদৃশ্য বা সম্পর্ক কতটুকু?

জনতা, দল ও নেতার মোহ অনিলবাবুকে পেয়ে বসেছে। তাই জনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, সার্থক দলের বৈশিষ্ট্য কোথায়, নেতার কর্ত্তব্য কোনখানে—এ সব বিষয়ে তাঁর নির্দ্ধারণ বামপন্থীদের তৃপ্তি দিতে পারবে না। মানুষের ইতিহাসে নানা মত এবং নানা পথের উদ্ভাবনের উৎস তিনি দেখছেন 'চির অতৃপ্তি মননার এই অফুরন্ত বৈচিত্র্যে'র মধ্যে (৩৯-৪০)। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে নাকি 'একটা চিরদহনশীল চিঙ্গারী আছে, যা কেবলি হাউইবাজীর মত ক্ষণে ক্ষণে সহস্র আকারে ফেটে পড়ছে (৩৮-৩৯)। একেই কি বাংলাদেশের বামপন্থী বলে' মেনে নিতে হবে? শুধু এই নয়। বৈচিত্র্যের অবসান হলে জীবন জীবনই নয়, 'জীবনধর্ম্মের নিশ্চিত প্রকাশ হলো এই বাহুল্য এবং এই পার্থক্য। দলগুলোর সামঞ্জস্য ও সমবায়েই মানবসমাজ হলো একটি বিচিত্র শতদল। সব দলকে একটি মাত্র একঘেয়ে দলে পরিণত করলে শতদলের হবে মৃত্যু এবং সব সৌন্দর্য্য পড়বে মারা' (১০)। টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন, তবুও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় যে ভারতের 'দুইটি প্রধান দলের' অন্যতর (৫৪), 'সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' (৩৬) 'একমাত্র বিপ্লবী দল' (৩৫). ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্যে কি তাহলে নূতন সমাজ গঠন নয়, কেবলমাত্র দলাদলির সৌন্দর্য্য উপভোগ?

এই মনোভাবের ফলে বিপ্লবী অনিলবাবুর চোখে মার্ক্স ও বাকুনিন্ সমান শ্রদ্ধার পাত্র (৫০), এবং সম্ভবতঃ কমিউনিজ্‌ম্ ও ফাশিজ্‌ম্ একই দরের বস্তু (২০,৪৯)। অন্ততঃ পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা পর্য্যন্ত এই বামপন্থী লেখকের প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। ইতিহাসকেও অবশ্য অনিলবাবু নতুন ক'রে দেখছেন। 'বিপ্লবযুগে তাই যতো বামপন্থী হবে দল, ততো প্রাধান্য বাড়বে দলের' (২৪)। বৃথাই লেনিন্ বাক্-সর্ব্বস্ব leftwing communism সম্বন্ধে উপহাস করেছিলেন। অনিলবাবুর পাণ্ডিত্য গুরুস্থানীয়দের ছাড়িয়ে গেছে।

মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টিক্ যে অনিলবাবুকে স্পর্শ করে নি, তার আরও অনেক প্রমাণ এই বইখানি থেকে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে তিনি কতকগুলি abstract মূলনীতির সন্ধান খুঁজেছেন। তাই বল-শেভিকদের সাফল্যের কারণ নির্দ্ধারণে তিনি রুষদেশের অবস্থা বুঝতে পারা বা শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন নি, তিনি দেখেছেন শুধু 'দলগঠন পদ্ধতির নিখুঁত প্রয়োগ' (৭)। লেনিনের নেতৃত্বে তিনি সাম্যবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান ও মার্ক্স-পন্থার নির্ভুল অনুসরণ না দেখে দেখেছেন 'শৃঙ্খলাপ্রীতি' (১০)। ইতিহাসে প্রতিভার প্রাধান্য ও Personality'র প্রভাব দেখাতে গিয়ে অনিলবাবু রাসেল্ ও ট্রট্স্কির পদানুসরণ করে' বলছেন যে বিস্‌মার্ক বা লেনিন্ না জন্মালে ইয়োরোপের ইতিহাস অন্য রূপ নিত। এই প্রসঙ্গে এই সহজ কথাটুকু তিনি স্মরণে রাখেন নি যে উক্ত মহাপুরুষেরা মধ্যযুগে জন্মালে কিম্বা তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র আফ্রিকায় হ'লে তাঁরা কখনই অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। ডায়ালেক্‌টিকের অভাবে যে অবান্তর একদেশদর্শিতার উদ্ভব হয় আলোচ্য বইখানি এক কথায় তার সুন্দর নিদর্শন।

অনিলবাবুর থিওরিতে দল যেমন জনসাধারণের মুখপাত্র, অগ্রণী বা চালক, তেমনি পার্টির চালক, অগ্রণী বা মুখপাত্র হলেন নেতা (১৩)। বর্ণিত বিবিধ গুণের আধার যিনি তিনিই 'নেতৃত্বের অধিকারী'। এখানেও সেই abstract ব্যাখ্যার আশ্রয় ও কতকগুলি চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখা যায়। যে-থিওরি ও যার প্র্যাক্‌টিসে পারদর্শিতা আজকের দিনে বামপন্থী নেতার পক্ষে অপরিহার্য্য, অনিলবাবুর লেখায় তার কোনও নির্দ্দেশ নেই। না থাকবারই কথা, কারণ তাঁর নেতা সুভাষচন্দ্রের ঠিক এই জ্ঞান ও এই শক্তিরই অভাব। জনতা ও নেতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এ অভাব পূর্ণ করবে না। ফরওয়ার্ড্ ব্লকের কর্ম্মীদের বরং স্মরণ রাখা উচিত যে সাম্প্রতিক ইতিহাসে এরই অনুরূপ পেটি-বুর্জোয়া উচ্ছ্বাস ফাশিজ্‌মেরই সূচনা করেছে।

অনিলবাবু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে বারবার রুষবিপ্লবের নেতাদের স্মরণ করেছেন। কিন্তু যে-নারোদ্‌নিক্ মতবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম লেনিনের প্রথম কীর্ত্তি, সেই মতামতের সঙ্গে ফরওয়ার্ড্ ব্লকের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কথা কি

অনিলবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা কখনও ভেবে দেখেছেন? সম্প্রতি নারোদ্‌নিক্ বৈশিষ্ট্যগুলির ষ্টালিন্ যে-বিশ্লেষণ করেছেন, তার মধ্যেও দু'টির এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, তারা জনসাধারণের নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত অথচ জনসমাজের গড়নে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাদের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। বর্ত্তমান যুগে ধনতন্ত্রের নিষ্পেষণের ফলে শ্রমিক-শ্রেণীই যে প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে ওঠে এবং নিয়তন কৃষক শ্রেণীকে যে বাধ্য হয়ে ক্রমশঃ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়, বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌দের এই ব্যাখ্যা নারোদ্‌নিক্ দল কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস সম্বন্ধে নারোদ্‌নিক্‌দের ধারণাও মার্ক্সীয় মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা অনুসারে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ হ'ল সামাজিক বিবর্ত্তনের মূলসূত্র। গণসাধারণকে বিপ্লবের পথে চালনা করার উদ্যমে নারোদ্‌নিকেরা কিন্তু শ্রেণীপ্রত্যয়ের সাহায্যে দল গঠনের চেষ্টা করে নি, তারা জনতাকে উত্তেজিত করবার জন্য বীরপূজার আশ্রয় নিয়েছিল। নেতৃস্থানীয় 'বীরেরা' নিজেদের উদাহরণ দিয়ে জনগণকে উন্মাদিত করবে, নারোদ্‌নিক্‌দের এই ছিল ভরসা। নারোদ্‌নিক্ রাষ্ট্রচিন্তায় তাই জনতা ও ব্যক্তিত্বের মোহ ও বন্দনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই individual terrorism-এর ভাবোচ্ছ্বাস রাশিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিল। প্রথমে প্লেকানভ্ ও পরে লেনিন্ এই নারোদ্‌নিক ধারণাগুলিকে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে' প্রকৃত বিপ্লবী মার্ক্সীয় দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে ফর্‌ওয়ার্ড্ ব্লক কি এখনও সেই নারোদ্‌নিক্ মতের অনুসরণ করে' তৃপ্ত থাকবে?

শ্রীঅজয় সেন

"THE THIBAULTS"—Roger Martin du Gard. Translated by Stuart Gilbert (The Bodley Head).

প্রতিভার এমন একটা ধ্বংসময়ী শক্তি আছে যে মানুষকে অবাংমনস-গোচরের স্বপ্ন দিয়ে লুব্ধ ক'রে, চিরদিনের মতন এ জগতের সুখের আশা হরণ করে। বাঁপাপি যা'কে আশ্রয় করেন জন্মাবধি সে অশান্তির সঙ্গে বাস করে। অনেক কথা এই ফরাসী কাহিনীর ইংরাজী অনুবাদটি পড়ে মনে হয়। গল্পটি সহজ, সুললিত অথচ বৈশিষ্ট্যহীন ভাষায় ফ্রান্সের একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েক বৎসরের ঘটনার বিবরণী। বাইরের বৃহৎ জগতের প্রায় কোন উল্লেখই নেই; নিতান্তই পারিবারিক ইতিহাস; কিন্তু নিদারুণ দ্বন্দ্বের উপাখ্যান; সর্ব্বত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিন্তু কোথাও সামঞ্জস্য নেই। সর্ব্বাপেক্ষা পীড়া দেয় অধিকাংশ চরিত্রের যুক্তিবিহীন ও বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ।

বইখানির ছয়টি বিভাগ ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৯ সাল অবধি নানান্ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের আরম্ভটির বেশ কৌশল। কিশোর জাক্ ও তার বন্ধু ডানিয়েল স্কুলের ক্লাসে শিক্ষক মহাশয়ের অগোচরে আবেগপূর্ণ এক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ক'রে ঘোর সন্দেহ ও কোপানলের পাত্র হয়, এবং আত্মগোপনার্থে পলায়ন করে ও দু'দিন পরে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়। উপসংহার জাকের রিফর্মেটরি যাত্রা। দুঃখ পাবার জাকের অদ্ভুত ক্ষমতা। দুঃখ ডেকে আনবার অপরূপ কৌশল। যেখানে কোন বন্ধন নেই সেখানে বৃথা ডানা ঝাপ্‌টান, পিতার প্রতি ইচ্ছাকৃত ও অকারণ কঠিন ব্যবহার, ভ্রাতা আঁতোয়ানের অপূর্ব্ব স্নেহের বিরুদ্ধাচার! পাছে সে কোনক্রমে সুখী হ'য়ে যায় এ যেন তার বিষম ভাবনা! কিন্তু জাকের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ তার মধ্যে ছিল অপূর্ব্ব প্রতিভা, যা'র জন্য মানব জীবন আপনা থেকেই মরুভূমি হ'য়ে যায়। পরে জাক্ জেনির প্রেমে আবদ্ধ হ'ল, কিন্তু নিউরটিক জাকের ভালোবাসা জেনিকে আকর্ষণও করছে, অথচ তা'র অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব তাকে সে ভালোবাসা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না, মাঝ থেকে তার হৃদয়খানা ভগ্ন হ'য়ে গেল। এ যেন এক অর্থহীন, যুক্তিহীন ব্যথার কাহিনী। এই অতৃপ্ত ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে জাকের অন্তরে সহোদরা-সদৃশা গীজের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, যেটাকে সে নিজে বল্‌ছে—"No flame leaps in your all too

docile flesh. Short-lived desire. Love without mystery, depth, horizons. With no tomorrow."—কারণ জাকের জীবনে যেখানে তৃপ্তি, সেইখানেই অবসান। কাজেই এই দুইটি অযোগ্য ভালোবাসাকে ত্যাগ ক'রে জাক সোজা সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্থান ক'রে, তিন বৎসর অজ্ঞাত বাস করলো। অবশেষে পিতার মৃত্যুশয্যায় আঁতোয়ান কর্ত্তৃক আনয়ন। অর্থহীন ব্যথার যুক্তিহীন পরিণতি।

উজ্জ্বল-চরিত্র আঁতোয়ানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিপুণ হাত; নবীন সুদর্শন আঁতোয়ান অল্প বয়সে ডাক্তারিতে নাম করেছে। তার মধ্যে আছে পিতার কর্ম্মকৌশল ও জাকের আদর্শবাদ এবং নিজের অগাধ সহানুভূতি। সে কোমল ক্ষমাশীল পুত্র, স্নেহপূর্ণ ভ্রাতা ও প্রণয়ী, ধীর বুদ্ধিমান পুরুষচিত্র। এই কাহিনীতে রক্তসম্বন্ধ নিদারুণ নাগপাশে অনিচ্ছাপূর্ণ প্রাণীদের বাঁধছে অপরিহার্য্য বন্ধনে, তার ভীষণ প্রাথমিক আলিঙ্গন থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। মধ্যবিত্ত আবহাওয়া, তা'র অন্ধকূপে শান্ত সংযত আঁতোয়ান স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সন্ধ্যাদীপের মতন জ্বল্‌ছে, করুণা ও সুবুদ্ধি দিয়ে উদ্ভাসিত। আর জাক্ দুর্ব্বল পক্ষস্পন্দনে উড়ে পালাতে চেষ্টা করছে, আদর্শবাদীর ব্যর্থ প্রয়াসে। প্রথমে সে মনে করেছিল যে স্নেহবন্ধন কর্ত্তব্যবাধা ত্যাগ ক'রে কীর্ত্তি স্থাপন করলে মনে শান্তি পাবে; পরে মনে হ'ল ঐ কীর্ত্তিটা কিছু নয়, শাস্তিই সব। হ্যামলেটের সেই প্রাচীন ব্যাধি জাকের মনে, যা'র জন্য তা'র জীবন প্রায় নিষ্ফল হ'য়ে যাচ্ছে। কস্তুরীগন্ধে আকুল মৃগ নিজের জ্বালা নিজের বুকে নিয়ে বৃথাই পলায়ন করে। যে শান্তির জন্য জাক্ কীর্ত্তি ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সে তাকে চিরদিন এড়িয়ে গেল। যার জন্য সে গৃহ, শিক্ষাদীক্ষা, দু' দু'জন প্রেয়সী প্রত্যাখ্যান করল সে তার লুব্ধ নয়নের গোচর হোল না। যাকে সে বাইরের নির্য্যাতন মনে করেছিল সে যখন থেমে গেল, অন্তরের নিগূঢ় নির্য্যাতনে তার বিনিদ্র রজনী প্রভাত হ'ল। সমগ্র সুখের উপাদানকে শান্তির পথের বাধা মনে ক'রে অপসারিত ক'রে তবে বুঝলো বাধা তার মনের মাঝে, বাধা সে নিজে; হৃদয়স্পন্দন না থাম্‌লে সে বাধা যাবে না।

চরিত্রাঙ্কনে লেখকের নিপুণ হাত, কিন্তু কাহিনী দুর্ব্বল। গল্পের গতি পদে পদে আহত হয়; একখানা গল্প ছেড়ে চারখানা হয়ে দাঁড়ায়। জাকের আত্মা-

ভিমানী পিতার গোপন ক্ষুধার কাহিনী, জাকের নৈরাশ্যের কাহিনী, ডানিয়েলের পিতামাতার বিরোধের কাহিনী, আঁতোয়ানের গভীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্বন্ধ রক্ষা হচ্ছে না। অকিঞ্চিৎকরকে স্থানে স্থানে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে ছন্দ ভেঙ্গে যাচ্ছে ও পাঠকেরও অস্বস্তি বোধ হয়। রিফর্মে টরির কথা এমন একটা হিংস্র প্রতিবাদের সঙ্গে বর্ণিত যে পাঠক উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে, কিন্তু আবার মনে হয় জাকের উপকারই হয়েছিল তাতে। রেচেলের প্রেমের জন্য আঁতোয়ানের গভীর দুঃখ মর্ম্মস্পর্শ করে, আবার রেচেলের অন্তর্দ্ধানে পাঠক মাত্রেই নিশ্চিন্ত বোধ করে, কারণ তার কুটন্ত রূপরাশি, তার বিরাট অভিজ্ঞতা ও তার দ্বিধাহীন, বিচারবিহীন ভালোবাসাসমূহের এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী ভাব যে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে।

আঁতোয়ানের ব্যক্তিগত জীবনের, তার ডাক্তারখানার দুএকটি কাহিনী এমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুনিপুণভাবে বর্ণিত আছে যে সে সকল সেখানে উপস্থিত থাকার মতনই ক্লেশকর ও প্রশংসনীয়। কাহিনীর অঙ্গগুলি সুন্দর কিন্তু বাঁধনের অভাব,—অসংযত ও অসম্বলিত। অবশেষে বলা বাকী রইলো কেন জানি এই উপন্যাসখানা ১৯৩৭ নোবেল প্রাইজের জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছিল।

লীলা মজুমদার

THE PROSPECTS OF CIVILISATION—By Alfred Zimmern (No 1); Mein Kampf—By R. C. K. Ensor (No. 3); Race in Europe—By Julian Huxley (No. 5); The Dual Policy—By Arthur Salter (No. II)—Oxford Pamphlets.

সভ্যতার সঙ্কট মানে আধুনিক সভ্যতার সঙ্কট। জার্মানী তার নবদর্শন নিয়ে বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাকে সঙ্কটাপন্ন করেছে—তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। জার্মানী, ইতালী ও জাপান—তারা পৃথিবীকে নতুনভাবে বিভক্ত করতে চায় এবং নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করতে চায়। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা এই নব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। রাশিয়া প্রধানতঃ দর্শক; দ্বিতীয়তঃ, তার

নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ। একথা জানতে এবং মানতে হবে যে, সব মানুষ এক নয় এবং সবার মনোবৃত্তি এক নয়। আমাদের সকলের চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য নেই এবং নানাদেশের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ভিতর বিভিন্নতা আছে। তাই যে-ব্যবস্থা এক দেশে ভাল লাগে, সেই ব্যবস্থা অন্যদেশে মঙ্গলকর নয়। এই বিবিধ ও বিরুদ্ধ রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গী নানাবিধ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদের প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা আগে শিখি—তারপর অভিজ্ঞতা লাভ করি। তাই সেখানে বিরোধ স্বল্প। জাতির জীবনে অভিজ্ঞতা আসে প্রথম এবং তারই সাহায্যে আমরা শিক্ষালাভ করি। ফলে, জাতি আঘাত পায় বেশি—কারণ নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন শিক্ষা লাভ করি।

আধুনিক সভ্যতার বিচারের ও প্রণিধানের প্রথম কথা :—The public affairs of the twentieth century are world-affairs।' কোন জাতি বা দেশ সঙ্গীহীন নয়—তার কার্যাবলীর সঙ্গে পৃথিবীর আন্তর যোগ আছে। তাই আমাদের রাজনীতিজ্ঞের দৃষ্টি বিশ্বমুখী থাকা প্রয়োজন। যে-জাতি শুধু নিজের কথাই ভাবে—সে পৃথিবীর শান্তির পক্ষে কণ্টক এবং যে যুদ্ধের সাহায্যে শুধু নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে পৃথিবীর সভ্যতার বিঘ্ন। এই দুটি কথা মানলে, জার্মানীর দায়িত্ব সহজেই বুঝা যাবে।

হিটলার যে দর্শন প্রচার করেছেন তার গোড়ার কথা হল যে জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তার বেঁচে থাকার অধিকার সব চেয়ে প্রথম। এবং দ্বিতীয় কথা হল যে, পৃথিবীতে প্রথম যুদ্ধ—তারপর, হয়ত শান্তি। হিটলার প্রচার করেছেন—

প্রথম দফা—'The National Socialist Movement must endeavour to remove the disproportion between the number of our population and the extent of our soil, considering the latter alike as the source of our sustenance and the fulcrum for our power policy.··· The powers of states are man-made, and men may alter them.'

দ্বিতীয় দফা—'If any one wants to live, let him accordingly fight ; and if any one in this world of everlasting strife is loath to struggle,

he does not deserve to live. . An alliance, whose aim does not involve looking forward to a war, is senseless and valueless'.

জার্মানীর নবদর্শন 'racial principle'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা প্রকৃত জার্মান অর্থাৎ অবিমিশ্র আর্যরক্ত যাদের দেহে প্রবাহিত, জার্মানীর নতুন ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা তাদের জন্য রচিত হবে। সাধারণ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে পিতার বা মাতার রক্ত সন্তানে বর্তে অতএব নিজেদের গোষ্ঠীর ভিতর বিবাহাদি সীমাবদ্ধ থাকলে জাতির রক্ত অন্য জাতির রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হবার সুযোগ থাকবে না। প্রথম কথা, জাতির শুদ্ধতা উন্নত জাতি সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়। দ্বিতীয় কথা, রক্তের সঙ্গে জাতির কোন সম্পর্ক নেই এবং মাতার একফোঁটা রক্তও সন্তানে প্রবেশ করে না ('In fact there is no continuity of blood between the parent and offspring, for no drop of blood passes from the mother to the child in her womb—Julian Huxley)। প্রকৃত পক্ষে জাতির বিভেদ প্রজননের উপর নির্ভর করে না—তা' নির্ভর করে সংস্কৃতির উপর। একই প্রতিবেশ ও সংস্কৃতি দ্বারা যাঁরা পরিচালিত হন তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতিবিভাগের পক্ষে জনন-কোষের চেয়ে সংস্কৃতিগত বৈষম্য প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু জার্মানীর 'racial principle' রাজনৈতিক কারণে প্রচারিত—জাতির মহিমা আখ্যানে পরিব্যাপ্ত ও দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠায় সংযুক্ত। তাঁদের নাকি বেঁচে থাকবার পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের মত্ততায় অন্যপক্ষ যদি পিষ্ট হয়, তাতে নাকি কোন অপরাধ নেই। নিজের জাতির এই আত্ম-গরিমা এবং পৃথিবীর অন্য জাতির দিকে এই ঘৃণার দৃষ্টি পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। এবং পৃথিবীর শান্তি মানবসভ্যতার বিকাশকে সাহায্য করে—হিটলার-দর্শন তা বিশ্বাস করে না। তাই জার্মানীর নবদর্শন সবার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং জার্মান জাতির প্রাণে উল্লাস সৃষ্টি করেছে। সেই উল্লাসে যে-বিকটতা আছে, আজকের যুদ্ধে তা' প্রকট হয়েছে। জার্মানীকে কেউ আঘাত করেনি—অথচ নিজে আত্মাভিমানের গরিমায় সে আজ পৃথিবীতে হিটলারী শান্তি আনতে চায় সমস্ত জাতির শান্তি ভঙ্গ করে।

ইতিহাসে যুদ্ধ নতুন নয় এবং বহু যুদ্ধ হয়ে গেছে যার ফল মানবজাতির

মঙ্গল সৃষ্টি করেছে। শান্তি যখন মানবের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেই আপনা হতেই এমন সব শক্তি সৃষ্টি করে যার প্রভাবে সংঘর্ষ ঘটে এবং নবদর্শন শান্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করে। তাই সব সংঘর্ষকে নিন্দার চোখে দেখবার প্রয়োজন নেই। এবারকার যুদ্ধের প্রধান কথা যে, যুদ্ধ যে-দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে প্রসূত হয়েছে—তা মানব সভ্যতার সহায়ক নয়; দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুদ্ধ হল সমগ্র জাতির যুদ্ধ—তাই যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ চালনায় জাতির সর্ববিধ মঙ্গল প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যাহত হয়, তা' নয়—কল্যাণপ্রসূ কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আধুনিক যুদ্ধের এই দিকটাই ভয়াবহ—তাই এই যুদ্ধের জন্য যাঁরা দায়ী—অর্থাৎ হিটলারের জার্মানী, ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না।

প্রথম নম্বর গ্রন্থে আলফ্রেড জিম্মার্ণ সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সহজ ভাষায় সভ্যতার অন্তরায় কি—তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর রাজনৈতিক সমস্যা হল 'political immaturity of the German people।' তৃতীয় নম্বর গ্রন্থে মিঃ এনসর হিটলার-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই দর্শনের সঙ্গে পরিচিতি না ঘটলে আধুনিক যুদ্ধের কোন রহস্যই আমাদের কাছে ধরা দেবে না। পঞ্চম নম্বর গ্রন্থে মিঃ জুলিয়ান হাক্সলি য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং হিটলার-দর্শনের 'racial principle'-এর যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তা' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

এগার নম্বর গ্রন্থে আর্থার সল্টার বৃটিশ রাজনীতি ও যুদ্ধ ব্যাপারে বৃটিশের দায়িত্ব কতখানি, তা আলোচনা করেছেন। এবং গ্রন্থকারের মতে শান্তি স্থাপনের প্রথম সূত্র হল—'Our peace aims should be identical with our war aims. We don't want again to lose a peace even if we win a war।' গ্রন্থকারের উক্ত মতের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বাভাবিক সহযোগিতা আছে। কিন্তু যে-কথা যুদ্ধের পূর্বে বলা হয়, সে-কথা যুদ্ধের পরে স্বীকৃত হবে কি-না, সে-প্রশ্ন আলাদা এবং তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

য়ুরোপের আধুনিক যুদ্ধের দায়িত্ব জার্মানীর—এই স্বীকৃতির সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে, যে-সভ্যতাকে আমরা জার্মানীর হাত থেকে বাঁচিয়ে

রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, তার ভিতরও গলদ আছে। সেই গলদের বিরুদ্ধে উক্ত গ্রন্থসমূহে কোন অভিযোগ নেই। যে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৃটিশ-জাতি আজ দাঁড়িয়েছে, তা যদি কোন আবরণে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রবেশ করে, সে-সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের কোন মত নেই এবং মত থাকলেও অসমর্থন নেই। তাই পুস্তিকাগুলির ভিতর জার্মানীর বিরুদ্ধে তথ্যগুলির যত সহজ সমাবেশ আছে—নিজেদের বা বৃটিশ সভ্যতার ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্দেশ নেই। পরাধীন জাতিকে এবংবিধ আলোচনার অসঙ্গতি পীড়া দেয় সব চেয়ে বেশি। কিন্তু উক্ত পুস্তিকাসমূহের লিখনের সরসতা ও সরলতা পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করবে।

শচীন সেন

মৈত্রী-সাধনা—শ্রীসুনিতকুমার মুখোপাধ্যায়, চীন-ভবন, বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য—আট আনা।

লেখক পূর্বাভাসে 'মৈত্রী' শব্দের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিদ্ ধাতু হইতে মৈত্রীর উৎপত্তি, মিদ্ ধাতুর অর্থ স্নেহ করা, অতএব মৈত্রীর মৌলিক অর্থ স্নেহশীলতা। সংস্কৃতে, বিশেষ বৌদ্ধ সাহিত্যে, এই মৌলিক এবং ব্যাপক অর্থেই মৈত্রীর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এই মৈত্রী পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল কথা। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারাও মৈত্রীর আদর্শ শুধু স্বীকার করেন নাই বেশি করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ স্বরূপ লেখক বৌদ্ধ ধর্ম ও চীন দেশের কন্‌ফ্যুসিয়াসবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি যাঁহারা ধর্মবিরোধী ঘোর নাস্তিক তাঁহারাও সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ শুধু ইতিহাসে নয় বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়। সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত মৈত্রীর আদর্শ প্রাচীন ভারতের সাধনায় কি ভাবে মূর্ত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত সুনিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক শূন্যবাদী বৌদ্ধ

সম্প্রদায়ের মৈত্রী সাধনার যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন সেইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য, বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধনার পরস্পর বিরোধ সত্ত্বেও কি ভাবে উভয় মতবাদই বিশ্বমৈত্রীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহার পরিচয়। 'শূন্যবাদীদের মৈত্রী সাধনার তুলনা নাই'—লেখকের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

নানা তত্ত্বে, ধর্মসাধনার নানা বিকৃতিতে আমাদের জীবন পীড়িত। বহু-বিভক্ত ভারতবর্ষে একদা মৈত্রীসাধনা কিরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল তাহার স্মরণও আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই মৈত্রীসাধনার চরম পরিচয় পাওয়া যায় লেখক কর্তৃক বর্ণিত রন্তিদেবের ইতিহাসে। দীন-দরিদ্রের অভাব মোচনে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য নিঃশেষিত হয়। এমন কি তাঁহার নিজের আহার্যের অনটন ঘটিল। এমন অবস্থাতেও তিনি শ্রদ্ধার সহিত এক চণ্ডাল ও তৎসঙ্গী কুক্কুরদের ভোজন করাইলেন। অবশেষে যখন সামান্য পানের জল ব্যতীত আর কিছু নাই তখন এক অতিথি আসিল যে চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট জাতির। এই তৃষ্ণার্ত অতিথিকে তাঁহার শেষ সম্বল পানীয় জল দান করিয়া রাজা রন্তিদেব বলিলেন :

'আমি স্বর্গ চাহি না। মুক্তি চাহি না। অনিমাদি অষ্ট ঋদ্ধিযুক্ত কোনোরূপ উচ্চপদ, বা শ্রেষ্ঠ লোকও আমি চাহি না। জগতের সমস্ত জীবের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশকেই আমি বরণ করিতে চাই। যতদিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত বারবার এই বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিতে চাই। এই ভাবে বারবার, সকলের দুঃখ স্বয়ং স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া, সকলকে সুখী করিতে চাই।

'আমার ক্ষুধা দূর হইল, তৃষ্ণা দূর হইল, শ্রম দূর হইল। জীবনাকাঙ্ক্ষী আতুর জীবকে জল দান করিয়া, দেহের কম্প, ক্লান্তি, বিষাদ, মোহ, শোক, সমস্ত একেবারে দূর হইয়া গেল।'

বহু ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা এই বাণীর সার্থকতা অধিক।

যাঁহারা বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী তাঁহারা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময়ে সুনিতবাবুর এই পুস্তকটির কথা আশা করি স্মরণ রাখিবেন। সাম্প্রদায়িকতায় দীক্ষার সম্ভাবনা ধর্ম শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি।

কিন্তু 'মৈত্রী-সাধনা' পুস্তকে ধর্মের যে আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা শুধু সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত নহে, সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী। বইখানির সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির লেখক যে-অনুবাদ করিয়াছেন তাহা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। তাই বইখানি শুধু নীতিশিক্ষার উপযোগী নহে, ইহার রচনাও উপভোগ্য। এই জাতীয় পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বিশ্বভারতীর উপযুক্ত কাজ।

বিশ্বামিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সাহিত্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। ভারতী-ভবন, কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা বোধ হয় সংক্রামক হ'য়ে উঠেছে। আজকাল বহু লেখকের সযত্ন প্রয়াস এ-দিকে প্রবাহিত হ'তে দেখা যাচ্ছে এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেমন অসংখ্য, যুগবিশেষের বা প্রসঙ্গবিশেষের আলোচনাও তেমনি অবিরল। তাই এই গ্রন্থবাহুল্যের দিনে এই জাতীয় বই সম্পর্কে একটা যাচাই-বাছাই-এর কথা ওঠা স্বাভাবিক। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের 'আমাদের সাহিত্য' কুশাগ্র, অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাস-সুলভ দৈহিক স্থূলতা এর নেই। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, 'হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাঙ্গলা সাহিত্য যে কোথায় আরম্ভ করিয়া কোন দিকে চলিতেছে, এই পুস্তকে মোটা-মুটি ভাবে তাহার একটা ধারাবাহিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।' কিন্তু মোটামুটি পরিচয়ের মামুলি সংস্করণ এখানি নয়। 'আমাদের সাহিত্য' পড়বার আগে আশঙ্কা ছিলো, হয়তো কোটেশন-কণ্টকিত, পাণ্ডুলিপি-চিত্রিত এবং সন-তারিখ-খচিত কোনো এক ঐতিহাসিক অধিত্যকারোহণের গুরু দায়িত্ব বহন করতে হবে। কিন্তু বইখানি পড়বার পরে এর অকপট সারল্যের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

দীনেশবাবুর 'সরল বাংলা সাহিত্যের' উল্লেখ ভূমিকায় দেখা গেলো। বড় আকারের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ছাড়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়েরও

ঐ বিষয়ে আর একখানি বই আছে। এই সব বইএর পাশে বর্তমান আলোচ্য বইখানির নিঃসন্দেহে স্থান হবে। শিশুদের উপযোগী একখানি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করাই ছিলো গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এবং এ বই-এর অনেক অংশ 'শিশুভারতীতে' প্রকাশিতও হ'য়েছিলো। তাই এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী করে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হ'চ্ছে এর মনোজ্ঞ রীতি বা ষ্টাইল। বস্তুতঃ 'সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখকের-ও যে ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার, এই সহজ কথাটি সাধারণতঃ অনেক লেখক-ই ভুলে যান ব'লে এই ধরণের বইগুলি পাঠকের সভয় অবজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই দাবী করতে পারে না।

সকলেই জানেন বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের প্রাচীনত্ব স্মরণ ক'রে আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু এখন থেকে মাত্র কয়েক শত বৎসর পিছিয়ে গেলেই যে সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় তা'র গুরুত্ব অবিসংবাদিত। চণ্ডীদাস-সমস্যা, বিদ্যাপতির কাল, বাংলা গদ্যের আবির্ভাব, কৃত্তিবাসের সময়—প্রভৃতি প্রসঙ্গ মত ও মতান্তরের আবর্ত সৃষ্টি করে। প্রিয়রঞ্জনবাবু আশ্চর্য্য কৌশলে এই জটিলতা অতিক্রম ক'রে গেছেন। অথচ অনুল্লেখ কোথাও ফাঁকি বলে ধরা পড়ে না। তাছাড়া প্রধান প্রধান কয়েকখানি বই-এর গল্পাংশের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রকাশ করেছেন, সেগুলিও পাঠকের প্রশংসা ও ধন্যবাদ দাবী করে।

অসন্তোষ প্রকাশের সহায়ক দু'একটি ফাঁক অবশ্য এ বই-এ র'য়ে গেছে। পরবর্তী সংস্করণের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলির উল্লেখ করা ভালো :—

(১) লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অধ্যায় এ বই-এ থাকা উচিত। পূর্ববঙ্গগীতিকার অনুল্লেখ অশোভন।

(২) ভাগবতের অনুবাদ-প্রসঙ্গে মালাধরবসু, চণ্ডীমঙ্গল-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য, করিগান-টপ্পা পাঁচালী জাতীয় ছড়ার প্রসঙ্গে নিধুবাবুর নাম অবশ্য স্মরণীয়। এই নামগুলির অনুল্লেখও অনুচিত।

(৩) চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে অন্ততঃ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য।

(৪) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল অবধি আলোচনায় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র—এই তিন মনীষীর প্রতি বিশেষ

মনোযোগ দিয়েছেন। অবশ্য গদ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কাব্যে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন ও বিহারীলালের দানও তিনি স্মরণ ক'রেছেন। কিন্তু বিস্মরণ তবুও ব্যাপক ব'লতে হবে। অক্ষয়কুমার বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি কবিদের নাম না হয় স্থানাভাবের অজুহাতে কাটা যেতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রে যে বই-এর আলোচনা শেষ হয়, সে বই-এ প্রমথ চৌধুরীর নাম পর্যন্ত না থাকা বিস্ময়কর। কারণ, চৌধুরী মহাশয় শুধু যে উচ্চাঙ্গের গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন, তাই নয়, বাংলা গদ্যের রীতিগঠনেও তাঁর বিশেষ দান স্বীকৃত হ'য়েছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

ধর্ম্মরায়—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড। মূল্য দুই টাকা।

আমাদের দেশে ছোট গল্পের বই সহজে বিক্রি হয় না তাই প্রকাশকবর্গ লেখকদের উৎসাহ দিতে নারাজ। তবু ছোট গল্পের সৃষ্টি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, তার দু'টি কারণ দেখতে পাই। একটি হচ্ছে যে ছোট গল্প লেখা সহজ এবং সাময়িক পত্রিকাগুলির সেজন্যে দোষ গুণ নির্বিশেষে প্রকাশ করা কঠিন নয়। মোটামুটি কৌতুকাবহ কোন কাহিনী যেমন তেমন ক'রে বিবৃত ক'রে গেলে অর্থ উপার্জ্জন হোক বা না হোক বন্ধু মহলে সাহিত্যিক আখ্যা পাওয়ার মোহ চরিতার্থ হয়। আর একটি কারণ হচ্ছে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা। আলোচ্য গল্পগুলির রচয়িতা হচ্ছেন সেই মুষ্টিমেয় শিল্পীদের অন্যতম যাঁরা ছোট গল্প রচনা করেন নিছক মনের আনন্দে। ফলে লিপিভঙ্গী এমন একটি স্বচ্ছন্দ ও সংযম আয়ত্ত করেছে যে যে-কোনো গল্প হয় মনোরঞ্জক।

এগারটি গল্পের মধ্যে প্রথমটির নামে গ্রন্থখানির নামকরণ হয়েছে। এখানির আখ্যানবস্তু হচ্ছে হাল্কা কিন্তু রচনার নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়েছে তাতে

কোন সন্দেহ নাই, তবে প্রমথ বাবুর 'চারইয়ারী কথা'র প্রভাব রয়েছে স্পষ্ট। উভয় রচনার ঘটনা ও পরিবেশ ভিন্ন কিন্তু মিল রয়েছে আঙ্গিকের দিক দিয়ে। সে ছিল প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বাবস্থায় প্রকৃতির আতঙ্কিত রূপে উচাটন বন্ধু চতুষ্টয়ের স্মৃতিমন্দিরে জাগরিত চারটি প্রেমের কাহিনী আর সেই গল্পের নায়িকারা ইয়ারদের সুরাতপ্ত মগজের উদ্ভাবনায় হয়ে উঠেছিল রূপে গুণে অপ্সরী ও রিদুষী। এও এক তাসের আড্ডার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতি অবিশ্রান্ত বারিপাতে ম্রিয়মাণ। বন্ধু তিন জন আর গল্প মাত্র একটি। চতুর্থ বন্ধুর বাড়ীতে তার দাদার শালী এসেছিল তাই সে অনুপস্থিত। তাসখেলা জমলো না। প্রশ্ন উঠলো ভালবাসা জিনিষটার সত্যটা কি? তারপর একজন একটি গল্প বলে প্রমাণ করলো যে প্রেম ব্যাপারটি হচ্ছে শাশ্বত। একটি নগণ্যা ষোড়শীর প্রতি সাত আট বছর বয়সের গ্রাম্য বালকের আসক্তি হচ্ছে আখ্যান-বস্তু কিন্তু বর্ণনার গুণে কৌতুকের আবহ ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর তারই মধ্যে প্রমথ বাবুর প্রভাব অনুভূত হয়।

বিভূতিবাবুর বিশেষত্ব হচ্ছে রচনার বৈচিত্র্যে। 'উপবাসী', 'স্বয়ংবর' চাড়ু-শিল্প', 'মদন গোপালের বিরহ' প্রভৃতি গল্পগুলি হাল্কা হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে অর্দ্ধ-শিক্ষিত, অপরিণত-বুদ্ধি ছেলে ছোকরাদের মানসিক অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়েছে অদ্ভুত হৃদয়গ্রাহী ভাবে। বর্ণনার নৈপুণ্যে পাঠকের মনে যুগপৎ সহানুভূতি ও কৌতুকের সৃষ্টি হয়।

'পীতু' ও 'গোলাপী রেশম' গল্পে শিশু চরিত্রের নক্সা রচয়িতার দৃষ্টির ব্যাপকতা প্রমাণ করে। 'বৈরিগীর ভিটেয়' গল্পটি ভয়াবহ ভৌতিক আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধির নেশার হাস্যকর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। 'ল্যান্ডাউন ও বিপিন পাল' ও 'রায়ট' হচ্ছে ইঙ্গবঙ্গ চরিত্র ও রাষ্ট্রনৈতিক চক্রান্তকারীদের প্রতিপক্ষে বিস্তারিত টিপ্পনী বিশেষ। 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি' গল্পটির কথা উল্লেখ করলাম সব চেয়ে শেষে কারণ এখানির পরিচয় একটু বিশদভাবে দেওয়া দরকার।

তার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলে রাখি। গোড়ায় বলেছি যে ছোট গল্প রচনা করা সহজ কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে সাহিত্যের কোঠায় উন্নত করা সহজ নয়। অল্প কথায় ও অস্পষ্ট কাঠামোর মধ্যে এমন

একটি ব্যঞ্জনা বা ঝঙ্কার সৃষ্টি করতে হয় যাতে ঘটনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হয়েও কোন বৃহত্তর বক্তব্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কথিত আছে যে ছোট গল্প শিল্পবস্তুতে পরিণত হয় তখন যখন তার ব্যঞ্জনা বর্তুলাকার ধারণ করে। বর্তুল বস্তুটি এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিরাকার এবং রসজ্ঞ পাঠকের অনুভবসাপেক্ষ কিন্তু এই আপ্ত বাক্যটির যথার্থতা খুব সহজেই উপলব্ধি হয় বিভূতিবাবুর রচনায়। তিনি কাঠামোকে আল্গা করে বাঁধেন এবং অনেক সময় না বেঁধেই রচনা শেষ ক'রে বসেন তবুও তাঁর গল্প 'সম্পূর্ণ' প্রতীয়মান হয়।

মুরারি ডাক্তারের চরিত্র-বর্ণনায় বলা হয়েছে—'বেশ গোল গাল চেহারা, মুখে প্রসন্ন হাসি। কথাবার্ত্তা চলাফেরার মধ্যে সকলের সঙ্গে একটি নিবিড় আত্মীয়তার ভাব মাখান এবং সেইজন্য গলার আওয়াজটা খুব মুক্ত। আর সব অবস্থাতেই এক ভাব, নিমন্ত্রণ বাড়িতেই হোক বা রোগীর ঘরেই হোক; রোগের প্রথম অবস্থাতেই হোক, মাঝ অবস্থাতেই হোক আর শ্বাসের সময়েই হোক—গলার সেই এক রকম স্বর, সেই অকৃপণ হাস্য, সেই নির্ব্বাক মুখরতা—'

এ হেন মাইডিয়ার ব্যক্তি যদিচ বিন্দুবাসিনীর পিতাকে মেরে ফেললো তথাপি পরিবারের মধ্যে শোক প্রবেশ করতে দিল না। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্বার প্রভাবে সকলকে তাক্ লাগিয়ে মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ কার্য্য চালিয়ে দিল। তার বিকট প্রফুল্লতার সামনে একটি দীর্ঘশ্বাসও ঠেলে উঠতে সাহস করলো না কিন্তু পাঠকের চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এমনি নিবিড় বিষাদে কথার দ্বারা যাকে সৃষ্টি করা হতো দুঃসাধ্য। শুধু বাংলার নয়, সমগ্র বিশ্বের নিরপরাধ, অসহায় ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীর বেদনা অলক্ষ্যে থেকে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো। 'বর্ষায়' গল্পটির সৌন্দর্য্য এই রচনাটিতে নাই কিন্তু এর শক্তি প্রবলতর। বিভূতিবাবুর সকল গল্প সমান ভাবে শক্তিসম্পন্ন নয়। 'ল্যান্ডাউন ও বিপিন পাল' এবং 'রায়ট্' এই দু'টির অনেকাংশ উপভোগ্য হলেও দানা বেঁধে গল্প হয়ে ওঠেনি। প্রচারমূলক গল্পে আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায় না তাই ক্লান্তি আসে, তাছাড়া মতামতের অনৈক্য ত' থাকেই। আশা করি বিভূতিবাবু শিল্পরচনা ছেড়ে প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

কালিন্দী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কাত্যায়নী বুক ষ্টল।

মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হয়, আবার মিটিয়া যায়; পুরুষানুক্রমে দুই পরিবারে বিবাদ চলে, আবার সময় সময় উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি এ সকল মিলন-বিরোধের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না; অথবা, মানুষের এ সকল চেষ্টা যে নিরর্থক তাহাই বুঝি ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে। জর্জ এলিয়টের The Mill on the Floss-এ নদী প্রকৃতি অবশেষে টম ও ম্যাগি দুই ভাই বোনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল, নিজেদের মধ্যে যত মনোমালিন্য ছিল তাহা সব ফ্লসের জলে ধুইয়া গেল, তাহাদের চিহ্নও লোপ পাইল, ফ্লসের উপরে যে কল তাহা দেখিতে লাগিল—নির্মম সাক্ষী রূপে।

রায়হাটের কালিন্দী বা কালী নদীও তেমনই। তাহার মায়া মমতা নাই,—পরিবারে পরিবারে মিলনের চেষ্টা নাই,—আছে শুধু একটু কৌতুক করিবার চেষ্টা, মানুষে মানুষে মিলনের চেষ্টাকে, উন্নতি করিবার চেষ্টাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রূরতা আছে তাহাকে প্রকট করিবার চেষ্টা।

মানুষের প্রকৃতিও কি ঐ তটগ্রাসিনী কালিন্দীর মতো নয়? সোমেশ্বর-শৈবলিনী-সংবাদ যেন এই উপন্যাসটির সুর বাঁধিয়া দিতেছে। তখনকার দিন হইতে মহী-অহীর সময় পর্যন্ত অদৃষ্টের ক্রূর হাস্য তো একই প্রকারের! কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন বিমলবাবু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার তেজ ও বর্বরতা লইয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান। সেকালের সাঁওতাল হাঙ্গামা আর একালের যান্ত্রিক সভ্যতা—উপদ্রবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়—মাটির উপরেই সকলের কোপ, মাটি লইয়াই সকলের বিড়ম্বনা।

সাঁওতাল মেয়েদের নাচে, ইন্দ্ররায়ের গম্ভীর ও ক্রূর প্রকৃতির রূপান্তরে, অহীন্দ্রের পূর্বপুরুষগত বৈপ্লবিক সংস্কারে, গ্রামের চাষীদের মনোভাবে তারাশঙ্কর বাবুর বর্ণনাকুশলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধাত্রী দেবতায় তিনি যেমন শিবনাথকে দাঁড় করাইয়া বর্তমান যুগের তরুণ বাঙ্গালী মনের একটা ইতিহাস লিখিয়াছেন, মানুষের বিপ্লবী মনের পরিবর্তনের দিক দিয়া, এখানে কিছু করেন নাই, এখানে পূর্বপুরুষ লব্ধ সংস্কারকেই যেন ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন,—অবশ্য সে সংস্কারও নব কলেবর ধারণ করিয়াছে; একটা প্রশ্ন জাগে, ইন্দ্র রায় অহীন্দ্রের চেষ্টাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সমধর্মীর মত,—সকল কালের বিপ্লবী মন কি সেই ভাবে দেখে?

যাহা হউক, 'কালিন্দী'র মধ্যে অহী-মহী সব চেয়ে বড় ছবি নয়, তরুণী তপস্বিনী উমাও নয়, দুর্দান্ত বিমলবাবুও নয়,—কালো নদীই স্পষ্ট, তাহার পাশে হাসি-কান্না সবই অনিত্য।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

'প্রবাসী'

'প্রবাসী'র চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। ১৩০৮ সালের বৈশাখে 'প্রবাসী' প্রথম প্রকাশিত হয়—কলকাতা থেকে নয়, এলাহাবাদ থেকে, কেননা 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন প্রয়াগে থাকতেন। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটির কার্যালয়ও কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু 'প্রবাসী'র নামের আর কোনো বদল হয় নি।

বাঙলাদেশে চল্লিশ বৎসর ধ'রে একটি পত্রিকা চলা স্মরণীয় ব্যাপার। এই দীর্ঘকাল সার্থকতার সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদন ও পরিচালন ক'রে 'প্রবাসী'-সম্পাদক যে গৌরব অর্জন করেছেন তা' অতুলনীয়। বাঙলা পত্রিকার ইতিহাসে 'প্রবাসী' এক নতুন অধ্যায়ের সৃজন করেছে। এই জাতীয় সর্বংসহ পত্রিকা ইতিপূর্বে আর কিছু ছিল না, পরে যেগুলি হয়েছে কোনোটিই 'প্রবাসী'র সমকক্ষ হ'তে পারে নি।

বাঙলাদেশের বিশিষ্ট লেখক সকলেই কোনো না কোনো সময়ে 'প্রবাসী'তে লেখা দিয়েছেন—বোধ হয় এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া। 'প্রবাসী'র সব চাইতে বিশিষ্ট ও সব চাইতে নিয়মিত লেখক রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লেখকদের বৈশিষ্ট্য 'প্রবাসী'র শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র, এমনকি প্রধান, কারণ না। পত্রিকা জগতে 'প্রবাসী' যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছে তার মূল কারণ সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় 'প্রবাসী'র বিস্তৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যে। সময়ে সময়ে এই পরিচয় অবশ্য এমন উগ্র-মূর্তি ধারণ করে যে পাঠকের বিরক্তি হয় ততোধিক উগ্র। কিন্তু তা' হওয়া অনিবার্য, কেননা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শুধু স্পষ্ট বক্তা নয়, অপ্রিয়ভাষণে অত্যন্ত উৎসাহী। এই উৎসাহ কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই 'প্রবাসী' এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সাহিত্যিক নয়, সাংবাদিক। কেননা সমসাময়িক প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ করা সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শন,' 'ভারতী,' 'সাধনা,' 'সাহিত্য' বা 'সবুজপত্র' পত্রিকার তুল্য সাহিত্যিক মর্যাদা 'প্রবাসী' লাভ করেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে 'প্রবাসী'-সম্পাদক সাহিত্যিক নন। বর্তমান (চৈত্র) সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি নিজে এই কথার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন: 'অতএব যাঁহারা সাহিত্যিক প্রতিভাহীনতায় 'প্রবাসী'র সম্পাদকের মত, তাঁহারাও ইচ্ছা বা যথোপযুক্ত চেষ্টা করিলে মাসিকপত্র সম্পাদনে কৃতকার্য হইতে পারিবেন বিশ্বাস করিয়া উৎসাহিত হইতে

পারেন।' এই যুক্তির যাথার্থ্য সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না, কেননা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকলেও নিশ্চয়ই এমন দুর্লভ শক্তি আছে যার ফলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ব'লে গণ্য হয়েছেন। সাহিত্যিক প্রতিভা থাকুক বা না থাকুক, সার্থক সাংবাদিক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য 'প্রবাসী'-সম্পাদকের অদ্ভুতপূর্ব সাফল্যের এক কারণ তাঁর অক্লান্ত সাধনা। এই সাধনার দৃষ্টান্তে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্যান্য সাংবাদিক অনুপ্রাণিত হবেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বোধ হয় এই কথাই বলতে চেয়েছেন। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের এই আশা সফল হোক।

'নাচঘর' ও 'শতদল'

'নাচঘর' কিছুদিন 'যবনিকাগ্রস্ত' ছিলো (সম্পাদকীয় বিবৃতি থেকে উদ্ধার করছি), সম্প্রতি সম্পাদক মহাশয় মঞ্চ থেকে নমস্কার জানিয়েছেন। ফলে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যার অর্থাৎ ১৩৪৭ সালের মাঘ মাসের 'নাচঘর' আমাদের হস্তগত হয়েছে। যদিও এই পত্রিকাটির নাম সাহিত্যিক মর্যাদার পরিচায়ক না, তবু একাধিক ভালো সাহিত্যিক রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত। এইগুলির মধ্যে নাচ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ তিনটি—বোধ হয় নামকরণের সার্থকতা প্রমাণের জন্যে। তা'ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লিখিত গ্রন্থ-পরিচয় ও সৌরীন্দ্র মিত্র লিখিত 'বীরবল' প্রবন্ধ।

'বীরবল' সম্বন্ধে আর একটি অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা-হল বার্ষিকী 'শতদল' পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষীয় (১৩৪৭) সংখ্যায়। প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা গদ্য ও প্রমথ চৌধুরী,' লেখক, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এই পত্রিকার আরো দুটি প্রবন্ধ উল্লেখ-যোগ্য : অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসু লিখিত 'আধুনিক বাঙলা কাব্য' এবং অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার লিখিত 'বঙ্কিম সাহিত্যের মূল প্রেরণা'। দুঃখের বিষয় কবিতা-গুলির একটিও উল্লেখযোগ্য নয়। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি-প্রতিভার এতই অনটন হয়েছে? মোহিতবাবুই বা নীরব কেন?

'পরিচয়ে'র আগামী সংখ্যা রবীন্দ্র-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে। বিশিষ্ট লেখকগণ রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

পরিচয়

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ৮১ বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এযুগের বাঙ্গালীর আয়ুঃ-পরিমাণ স্মরণ করিলে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘায়ুঃ বলা যায়—কারণ, ইহুদীদিগের গণিত-সপ্ততি বর্ষ(Three score years and ten) তিনি অনেকদিন অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে আমরা শতায়ুঃ না হইলে সন্তুষ্ট হই না। বৈদিক যুগে দেখা যায় আর্য মানব প্রার্থনা করিতেছেন—পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ এবং বৈদিক ঋষি যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া বলিতেছেন—'বয়ং জীবেম শরদঃ সবীরাঃ'। দাতা সম্বন্ধে ঐ যুগে তাঁহাদের আশীর্বচন ছিল—দাতা শতং জীবতু। রবীন্দ্রনাথও দাতা—শুধু দাতা নন প্রদাতা (প্রকৃষ্ট দাতা)। তিনি নিজের প্রতিভাভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে জগৎকে অজস্র দান করিয়াছেন। অতএব আমাদের সমবেত প্রার্থনা এই—এ বরণীয় দাতা শতায়ুঃ হোন—দাতা শতং জীবতু জীবতু জীবতু।

বিগত মাঘ মাসে আমার ৭৩ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা মাত্র সাত বছরের বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ। সাধারণতঃ সাত বছরের তারতম্যে বড় আসে যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহাতে ও আমাতে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! এই ৭৩ বৎসর বয়সে আমাকে ইতিমধ্যেই 'ভীমরথি' আশ্রয় করিয়াছে। শরীর ত' জীর্ণ বটেই, মনও নিস্তেজ ও নীরস। আর রবীন্দ্রনাথ? যদিও বিগত ২।৩ বৎসরের নানা ব্যাধিতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়াছে এবং

জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে—কিন্তু তাঁহার চিত্ত এখনও পরিপূর্ণ সরস, মন বেশ সতেজ ও সবল, বুদ্ধি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, এবং প্রতিভা প্রায় অম্লান ও অনলস। বিগত তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এ 'গৌরীপুর ভবনে' গ্রীষ্মনিবাসে কাটাইয়াছিলেন। কালিম্পং-এ আমারও একটি কুটীর আছে এবং ঐখানে আমি প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া নিয়মিত গিয়া থাকি। কাজেই কালিম্পং-এ রবীন্দ্রনাথকে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটি অপরাহ্ণ আমি তাঁহার সহিত 'গৌরীপুর নিবাসে' কাটাইতাম। অন্য যাত্রীও উপস্থিত থাকিতেন এবং আমরা নানাবিধ প্রশ্ন তুলিয়া কবির ভাবধারা উৎসারিত করিয়া দিতাম। তাঁহার মুখে নানা প্রসঙ্গের ব্যাখ্যান শুনিতাম। শুধু কাব্য ও কবিতা ও রসমাধুর্য নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রসমস্যা, ধর্মসমস্যা ইত্যাদি প্রভৃতিরও কথা উঠিত। কোন কোন দিন শ্রোতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেন। একদিন আমার এক বন্ধু কবির 'মেঘদূত' কবিতা শুনিবার প্রার্থী হন এবং কবি কার্পণ্য না করিয়া তাঁহার যাচঞা পূর্ণ করেন। সে কী আবৃত্তি! আমি পূর্বে পূর্বে তাঁহার অনেক আবৃত্তি শুনিয়াছি। ঐ দিন বিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম তাঁহার পূর্ব আবৃত্তিশক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ।

কোনদিন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর কথা উঠিত ও রবীন্দ্রনাথ তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতেন; এবং প্রসঙ্গতঃ জলদগম্ভীরে কোন পদ আবৃত্তি করিতেন। একদিন তাঁহার প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভ্রমণকাহিনীর প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল এবং কি সুন্দরভাবে তিনি তাহার বিবৃতি করিয়াছিলেন—আর (ইংলণ্ড ব্যতীত) সমস্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভূখণ্ড কি ভাবে তাঁহার 'ভারতীয়' প্রতিভার সম্বর্ধনা করিয়াছিল কবি তাহারও পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা সকলে মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম যে, যদি কোন সটর্হ্যাণ্ড-চতুর সে গৃহে তখন উপস্থিত থাকিত তবে কবির একটি বিশিষ্ট কাহিনী চিরদিনের জন্য রক্ষিত হইতে পারিত।

আমি লক্ষ্য করিতাম কেহ দর্শনের কূট সমস্যা উত্থাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ তাহাতে যোগ দিতেন না। তিনি বলিতেন, 'আমি কবি—দার্শনিক নই।' তিনি যে কবি একথা তিনি চিরদিনই মনে রাখিয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভে

রচিত 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তিনি কয়েকবার লিখিয়াছিলেন—'কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়।' যখন সন্ধ্যা-সঙ্গীত প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি বালক—তবে এঁচোড়ে পক্ক বালক। তখনই পাঠ্য ছাড়া কাব্যাদির কিছু কিছু আলোচনা করি। মনে আছে তখনও আমি রবীন্দ্রের ভক্ত হই নাই—ঐ 'কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়' লইয়া আমাদের মহলে বেশ বিদ্রূপ চলিত; এমন কি এক দিন আমাদের মধ্যে এক অতিদুষ্ট বালক 'ব'-স্থানে 'প'-আদেশ করিয়াছিল। তখন কে জানিত যে এই বাল-রবিই একদিন পূর্ণ মার্তণ্ড মূর্তিতে বিশ্বকে বিস্মিত করিবে।

আর একদিনের কথা বলি। চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন। আমি সভাপতি বৃত হইয়াছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া সভার 'উদ্বোধন' না করিলে সভার কার্য আরম্ভ হইবে না। সেদিন বসন্ত পঞ্চমী—অচিরে রবীন্দ্রনাথ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সর্বত্র আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল। কবির পরিধানে বাসন্তী রঙের ধুতি, আঙরাখা ও চাদর। তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমার পরণে সাদা মলমলের ধুতি-চাদর ও পাঞ্জাবী। রবীন্দ্রনাথের পক্ক কেশ ও শ্মশ্রু কিন্তু অঙ্গে বসন্তের বাহার। কবি বোধ হয় একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি আমাকে চুপি চুপি বলিলেন—'আপনারা যে যাই করুন, আমি কবি, বসন্তের সম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য।' আমি বলিলাম, নিশ্চয়। তারপর সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৈব-প্রেরিত জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ ও আমরা সকলে দেশমাতৃকার প্রতি সম্মান দেখাইতে দণ্ডায়মান হইলাম। বন্দে মাতরম্ গান চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিলেন—'দেখুন এ বন্দেমাতরম্ গানের এক সময় বেশ উপযোগিতা ছিল কিন্তু এখন বোধ হয় অন্যবিধ জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজন।' আমি বলিলাম, 'তা বটে, কিন্তু এই বন্দেমাতরমের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে মূল্য আমরা কোনদিনই শোধ করিতে পারিব না—এ সঙ্গীত দৈব-প্রেরিত।' রবীন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিলেন না। আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে বহু বৎসর পূর্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরাট অধিবেশনে তিনি স্বয়ং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গান

করিয়াছিলেন এবং সেই বিশাল জনতা সেই সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত, উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত হইয়াছিল।

তার পর রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরের সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে এক সময় আমি তাঁহার অনেক বক্তৃতায় সভাপতি হইতাম এবং আমি সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে কবি নিজেকে 'নিরাপদ' মনে করিতেন। অবশ্য ইহার অনেকটাই স্নেহোক্তি—তবে একথা ঠিক যে, পূর্বে পূর্বে আমি তাঁহার অনেক সভাতেই সভাপতিত্ব করিয়াছি। আজ তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতার কথা মনে পড়িতেছে। চমৎকার প্রবন্ধ এবং রচয়িতার কী সুললিত আবৃত্তিভঙ্গী! প্রথম দিনের সভায় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু এত জনতা হইয়াছিল যে, অনেক শ্রোতাকে স্থানাভাবে ফিরিতে হইয়াছিল। সেইজন্য দ্বিতীয়বার সভা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে ঐ প্রবন্ধ পুনঃ পাঠ করিতে হয়। দ্বিতীয় সভায় আমি সভাপতি হইয়াছিলাম এবং একজন সমালোচক-বক্তার অবিমৃষ্যকারিতায় কিছু গোল-যোগের সম্ভাবনা হইলে আমি সুকৌশলে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আর একটা বক্তৃতার কথা মনে পড়িতেছে। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ব্রাহ্মণ'—আমি সভাপতি। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর এক 'বিজ্ঞ' সমালোচক জাতিভেদের অবৈদিকতার কথা তুলেন, আমি তাহার জবাব দিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বের কথা বলিলাম। এ প্রসঙ্গে তাঁহার আর একটা সভাপতিত্বের কথা মনে পড়িতেছে। General Assembly Institution-এর হলে বৃহৎ সভা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বক্তৃতা করিবেন—বক্তৃতার বিষয় 'অরণ্যে রোদন'। রামেন্দ্রবাবু ঐ দিনে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন—সভাস্থলে কষ্টে উপস্থিত হন কিন্তু তাঁহার রচিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার আমার উপর পড়ে। বোধ হয় পাঠ ভালোই হইয়াছিল—কারণ, সে সময় আমার স্বর বেশ উদাত্ত ছিল এবং (রবীন্দ্রনাথের তুলনায় না হইলেও) শ্রুতিমধুর ছিল। সভাপতি রমেশচন্দ্র ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন্তব্যে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যদি প্রকাশ্য সভায় কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতে হয় তবে তিনি যেন বক্তৃতার দিন অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং প্রবন্ধ পাঠের ভার হীরেন্দ্রবাবুর উপর অর্পিত হয়।

General Assembly Hall-এ, ওভারটুন হলে এবং থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে আমি সে যুগে রবীন্দ্রনাথের অনেক বক্তৃতাই শুনিয়াছি। সে সময় একটি কুপ্রথা গড়িয়া উঠিতেছিল যে, শ্রোতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইবার পরই 'সঙ্গীত' 'সঙ্গীত' করিয়া চীৎকার করিত, এবং বাধ্য হইয়া রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা পাঠের শ্রম সত্ত্বেও সঙ্গীত করিতেন। কখনও কখনও তিনি শ্রোতাদের ভবিতব্য অত্যাচার মনে করিয়া পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেন। ঐ উপলক্ষে একটি গানের কথা আমার বেশ স্মরণ হইতেছে—

'আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা
একি শুধু হাসি-খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ইত্যাদি—

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার এত কথা বলিলাম কারণ, সে যুগে তাঁহার বক্তৃতা আমাদের একটা উপভোগের সামগ্রী ছিল। এইবার তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে দুই চার কথা বলি।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজারাণী'তে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা। ঐ অভিনয় দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে সে সময় শুনিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছিল। একজন বন্ধুর কথা বলি। 'রাজারাণী'র অনেকাংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। অনুযোগ করিয়া আমি বন্ধুকে বলি ঐ অমিত্রাক্ষরে তেমন আরাব তেমন মন্দ্র নাই। তদুত্তরে বন্ধুবর বলিয়াছিলেন, 'বিক্রমদেবের অভিনয় দেখেন নাই—তাই একথা বলিলেন।'

ইহার কয়েক বৎসর পরে সঙ্গীত সমাজের ষ্টেজে 'বিসর্জ্জন' নাটকের অভিনয় দেখি। আমার এক আত্মীয় জয়সিংহ এবং রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের গুরু রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। জয়সিংহ দেবীর উদ্দেশ্যে নিজের বলিদানের রক্ত নিবেদন জন্য আত্মঘাতী হইলে রঘুপতির মোহ ভঙ্গ হয় এবং তিনি দেবী প্রতিমাকে 'বিসর্জ্জন' দেন। এই বিসর্জ্জনের অভিনয় উদ্দেশ করিয়া আমি সেই সময়ে এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম—'At this point Raghupati rose to choral greatness'। সেই অভিনয়ের ছবি এখনও আমার

মনে মুদ্রিত আছে। আর একবার রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়াছিলাম—'ডাকঘরে'। 'ডাকঘর' গল্প তিনি স্বয়ং 'নাটকিত' করিয়াছিলেন এবং অভিনয়ের সময় একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিনয় ৬নং বাড়ীর মণ্ডপ গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার সঙ্গে—দুইজন মার্কিন মহিলা ঐ দিন অভিনয় দেখিতে যান। তাঁহারা আদৌ বাংলা জানিতেন না—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শনে এত বিমুগ্ধ হন যে অভিনয়ের পর অনেকক্ষণ শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জন কলমের খোঁচায় বঙ্গমাতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত করিলে বাংলায় একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন উত্থিত হয়। ঐ তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ঐ সময় আমরা ঘন ঘন তাঁহার কাছে যাইতাম এবং নানা উপদেশ ও উদ্দীপনা আনিতাম। ঐ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এক নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং 'তাদের বাধন যত শক্ত হবে' ইত্যাদি কয়েকটি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতে আকারিত হয়। অবশ্য কবি একেবারে সে আন্দোলনে নিমজ্জিত হইয়া যান নাই, কিন্তু 'নীর না ছুঁইবি'—তাঁহার সে অবস্থাও ছিল না। তারপর পাঞ্জাবে ও'ডায়ারের অত্যাহিত ও অত্যাচার সমগ্র ভারতবর্ষকে কম্পিত করে। সে কথা অনেকেই জানেন। জালিন্‌ওয়ালাবাগের কাহিনী আমরা হঠাৎ বিস্মৃত হইব না। ইতিপূর্বে সরকার বাহাদুর কবিকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ জালিন্‌ওয়ালাবাগের ব্যাপারে এতই ক্ষুভিত হন যে তিনি স্বেচ্ছায় সেই Knighthood প্রত্যর্পণ করেন। উহার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাদের ৬নং বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও নানা কথা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আলোচনার স্থান এ নহে।

আর একটি রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি কবির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসি। সেটা মিসেস বেশান্তের National Congress-এর সভাপতিত্ব লইয়া। কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা, অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইতেছে এবং ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইতেছেন। নরমদল ও গরমদলের মধ্যে ইতিপূর্বেই মনোবাদ বাধিয়াছে—আমি গরমদলভুক্ত। আমরা চাই মিসেস বেসেণ্টকে সভামেত্রীর আসন দিতে—নরমদলের তাহাতে বিশেষ আপত্তি।

Indian Association-হলে সভা বসিয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতি করিবার প্রস্তাব পেশ হইল। আমি উঠিয়া আপত্তি করিলাম। বলা উচিত, তখন আমার ত' 'দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা' ছিলই না (এখনও যে বিশেষ আছে একথা বলি না)—দ্বন্দ্বপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। তাহার ফলে এবং গরম-পক্ষীয় বন্ধুদের সহযোগিতায় মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল। অবশ্য নরমদলেরা বিলক্ষণ চটিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক করিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিলাম। তাঁহার মত নিরীহলোকের এ বিবাদে না যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে এবং ভারত-জননীর একান্ত সেবিকা মিসেস বেসাণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথ 'মদরত'দিগের অশেষ অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে আমাদের দল বেশ প্রবল হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণ দলে দলে ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যভুক্ত হইল। অবস্থা বুঝিয়া মদরতেরা মিসেস্ বেসাণ্টকেই কন্‌গ্রেস্-এর সভানেত্রীত্বে বরণ করিলেন। কাজেই সাময়িক বিবাদ মিটিয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিষয় আমি অনেক কথাই জানি। কাজেই আরও অনেক কথা বলিতে পারি। কিন্তু 'পরিচয়ের' এই রবীন্দ্র সংখ্যায় অনেক কৃতী লেখক নিজের নিজের কথা লিখিবেন। অতএব আমার কথা এখানেই শেষ করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্র কাব্য আধুনিক কেন ?

আধুনিকতা সময়ের বেড়া-জালে আবদ্ধ নয়—তার বিশিষ্টতা নতুন মর্জ্জি নিয়ে। সাধারণতঃ কবির রচনার ভিতর তার দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার পরিচয় পাই। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার অভিধা পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ কালের গণ্ডীদ্বারা আমরা কাব্যের আধুনিকতা বিচার করি। সে কারণেই আমাদের দেশে আধুনিকতার উপাসক সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্র-কাব্যকে সেকেলে ব'লে প্রচার করেন। তাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মকোষে প্রবেশ করেন নি—শুধু রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার আত্মলীন ভাববিভোরতাকে উনিশ শতকের রোমান্টিক পর্যায়ে ফেলে এবং ঐকান্তিক আদর্শপ্রধান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় মনোজগৎকে বস্তুতন্ত্রহীন ভেবে রবীন্দ্র-কাব্যে আধুনিকতার মাল মশলার অভাব অনুভব করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য যে চিরকালের আধুনিক—সে-কথা আমাদের জানা ও মানা উচিত।

রাজনীতি বা অর্থনীতিক্ষেত্রে আধুনিকতার বিশেষ অর্থ আছে—সেখানে বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষে নবদর্শন উপস্থাপিত হয় এবং তা' আবার কালক্রমে সেকেলে হয়ে যায়। এই পরিবর্তনশীল জগৎ নানা সমন্বয় সাধন ক'রে এগিয়ে যায়—সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে নতুন চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করে এবং নতুন ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। আবার তা' বদলে যায়। কাব্য-সাহিত্য যতখানি আধুনিক বিধি-ব্যবস্থার গণ্ডীদ্বারা পিষ্ট এবং কোন বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরি-পোষক—ততখানি সে কালের দরবারে অমর নয়। এই 'dialectical' ভঙ্গীকে মেনে নিলে দেখা যাবে যে, যাঁরা কোন বিশেষ ভাবধারা প্রচারণে বা ব্যাখ্যানে আবদ্ধ, বর্তমান সমাজে বা রাষ্ট্রে উক্ত ভাবধারা গৃহীত বা জনপ্রিয় হলেও, তাঁদের সাহিত্যই আধুনিক এবং তাঁদের বিরুদ্ধ চিন্তাবহনকারী সাহিত্য সেকেলে—এবংবিধ চিন্তন কাব্য-সাহিত্য বিচারে অনুকূল নয়। অর্থাৎ কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতা বিচার করতে হলে মতের আশ্রয় নেওয়া অসঙ্গত। তাই কে কি মতবাদ প্রচার করলেন, তা বিচার্য নয়—প্রশ্ন হল, যে-সাহিত্য

আধুনিক, তার ভিতর গতি আছে কি না। এই গতি যাঁর থাকে, তিনি নানা বাঁক ফেরেন এবং নানা মর্জ্জির পরিচয় দেন। কাব্য-সাধনের পক্ষে এই গতিই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং যে সাহিত্যে গতি আছে এবং যে সাহিত্য কোন বিশিষ্ট নীতি বা ধর্ম প্রচার করতে চায় না, সে-সাহিত্য চিরকালের আধুনিক। গতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি নয়—গতি সাহিত্যকে সজীব ও সজাগ রাখে। তার মানে, কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতার মাপকাঠি কোন রাষ্ট্র বা সমাজ বিধানের আধুনিকতম প্রচেষ্টা নয়; যে-সাহিত্য কালকে জয় ক'রে কালের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে, সে-সাহিত্যই হল প্রকৃত আধুনিক। রবীন্দ্র-কাব্যে আধুনিকতার অভাব অভিযোগ করবার পূর্বে কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-কাব্যের গতিধর্মের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হলে দেখা যায় যে, তিনি কোন বিশিষ্ট রীতি বা নীতি বা সাধনের পরিপোষক হন নি। উপনিষদের প্রভাব তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট কিন্তু তাঁর কাব্যে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করবার নির্দেশ দেন নি—তিনি বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের মাধুর্য ও তন্ময়তা গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি বৈষ্ণবিক মহামিলনের জন্য ব্যাকুলতা দেখান নি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়নি—তা' রূপরসের দাবিকে স্বীকার করেছে। রবীন্দ্র-কাব্যে তত্ত্বের চেয়ে জীবন প্রাধান্য লাভ করেছে—তাই তাঁর কাব্য-সাধনা ধর্মসাধনার বিরতিদ্বারা ব্যাহত হয়নি। তিনি যুগ ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি কিন্তু পথের প্রভাবকে মেনে নিয়েছেন—সমস্ত সাধনাকে এড়িয়ে গিয়ে গতির সাধনাকে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।"

যেমন প্রবাহমাণ নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হতে বিমুক্ত হয়ে পরাৎপর দিব্যপুরুষে প্রবেশ করেন—উপনিষদের এই শিক্ষা এবং বৈষ্ণবের এই মহামিলন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ

করেন নি। ঔপনিষদ দর্শনের প্রধান কথা হল—বাক্‌কে জানতে চেষ্টা করবে না, বক্তাকে জানতে চেষ্টা করবে; গন্ধকে জানতে চেষ্টা করবে না, আঘ্রাতাকে জানতে চেষ্টা করবে; রূপকে জানতে চেষ্টা করবে না, রূপবিৎকে জানতে চেষ্টা করবে; শব্দকে জানতে চেষ্টা করবে না, শ্রোতাকে জানতে চেষ্টা করবে; অন্নরসকে জানতে চেষ্টা করবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানতে চেষ্টা করবে; কর্মকে জানতে চেষ্টা করবে না, কর্তাকে জানতে চেষ্টা করবে; সুখ-দুঃখকে জানতে চেষ্টা করবে না, সুখ-দুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানতে চেষ্টা করবে; আনন্দ, রতি বা প্রজাতিকে জানতে চেষ্টা করবে না, তাদের বিজ্ঞাতাকে জানতে চেষ্টা করবে; মনকে জানতে চেষ্টা করবে না, মন্তাকে জানতে চেষ্টা করবে; গতিকে জানতে চেষ্টা করবে না, গন্তাকে জানতে চেষ্টা করবে। সমস্ত ধর্ম-সাধনার এটাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার রূপ আলাদা। তিনি অবসর চান না—গানের পর গান শোনাতে চান। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাধক—ধর্ম-সাধক নন। তিনি সুখ দুঃখকে এড়াতে চান নি, রূপ রস গন্ধকে অস্বীকার করতে চান নি, আনন্দ ও রতিকে বরণ করেছেন, পথ-চলার বিরাম প্রার্থনা করেন নি, তাঁর সন্ধানের শেষ কামনা করেন নি। তাই তাঁর নিঃশেষে আত্মদান নেই, কেবলি আত্মগ্রহণ আছে এবং উৎকণ্ঠাহীন আনন্দের সুরে তিনি বলতে পেরেছেন—

"সেই তো আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।
এমনি করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য-নূতন সাধনাতে
নিত্য-নূতন ব্যথা।

পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু'হাত মেলি;
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই।" (গীতালি)

গতিধর্মে বিশ্বাসী বলে রবীন্দ্রনাথের মনন জমিতে নানাবিধ ফসল ফলছে—কোথাও জমাট বেঁধে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়েছি, তা' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর চিন্তায় স্রোত আছে ব'লে কোথাও মলিনতা ও রুদ্ধতা আসে নি এবং পথ-চলায় আনন্দ আছে বলে কোন ঘাটে তা' বাঁধা পড়েনি। রবীন্দ্র-কাব্যের ধর্মবোধে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নেই—কারণ মানবজীবনকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিশ্বমানবতাকে তিনি স্বীকার করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলাময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।"

রবীন্দ্র-কাব্যে যে চিন্তার মুক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে, তার ভিতর সন্ধান করলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। স্রোতের বেগ তাঁর চিন্তাকে নানাঘাটে বহন করে নিয়েছে—যুগমনের খোরাক জুটিয়েছে এবং মানবজাতির অগ্রসরণকে সাহায্য করেছে।

প্রথম—রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বানুভূতির সন্ধান না জানলে তাঁর কাব্যের প্রকৃত সুর ধরা যাবে না। ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে পাবার আকুলতা, অবিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর অনন্তের সুর অনুভব করা—রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, যে-আমি নিজের ভিতর থাকে, সে মুক্তও নয়, সে তৃপ্তও নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন—

"আকাশ-ভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

দ্বিতীয়—জীবনের অনন্ত অনাদি প্রবাহ বোধ তিনি স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ও মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করে দেখেন নি। বৃষ্টি মেঘের অবসান নয়, মেঘের পূর্ণ প্রকাশ। তাই মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, জীবনের প্রকৃত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, জীবনের পিছনে মরণ, আশার পিছনে ভয়, দিবসের পিছনে রজনী, আলোকের পিছনে ছায়া আছে। কোথাও বিলয় নেই; যাহা দেখি, তাহা পরিবর্তন মাত্র। তাই মৃত্যুকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"সে এলে সব আগল যাবে ছুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে—"।

তৃতীয়—রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমসাধনা দেহের দেউড়ি পার হয়ে নর-নারীর অন্তর স্পর্শ ক'রে এবং সেই আন্তর ভেলার সাহায্যে দেহহীন প্রেম, এবং মূর্তিহীন মানস-সুন্দরীকে অবলম্বন করে নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন প্রেমের স্রোতে যুক্ত হয়েছে। এই প্রেম-সম্পদে ধনী হয়ে কবি বলতে পেরেছেন—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।"

চতুর্থ—রবীন্দ্র-কাব্যে স্বাদেশিকতা সর্বমানবের সর্বকালের ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কৃপায় আজ বাহুবল নিদারুণ দুর্জয়—তাই দুর্বল অতি ভয়ংকর দুর্বল। দুর্বলের কান্নায় তিনি আঁতকে উঠেছেন, শক্তির বীভৎসতাকে তিনি নিন্দা করেছেন, দুর্গতদের মঙ্গল তিনি কামনা করেছেন, স্বার্থোদ্ধত অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি অন্যায়কে অন্যায় বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, স্বার্থের লোভে মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করতে সমর্থন করেন নি এবং দেশের দুর্দশা নিয়ে ব্যবসা করতে ঘৃণা বোধ করেছেন। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—

"যদি দুঃখ দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।"

উক্ত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে একথা সহজেই বলা যায় যে রবীন্দ্র-কাব্য অনাধুনিক অপবাদে দুষ্ট হতে পারে না। যে কাব্য-সাহিত্যের ঘোষণাপত্রে মানবজীবন প্রাধান্য লাভ করেছে, বিশ্বানুভূতি ব্যাখ্যাত হয়েছে, জীবন-মৃত্যুর বিবাহ বন্ধন প্রখ্যাত হয়েছে এবং জাগ্রত চিত্তের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সাহিত্য চিরকালের আধুনিক। কাব্যসাহিত্যের আধুনিকতা প্রমাণ নতুন ছন্দে নয় অথবা ছন্দহীনতায় নয়; নতুন মতবাদে নয় অথবা রাজনৈতিক প্রচারণে নয়। নতুন কাব্যকৌশল বা নতুন বিষয় নির্বাচন কাব্যসাহিত্যের আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। কাব্যে যদি কাব্যত্ব থাকে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী যদি জাতির ও জগতের গতি বা প্রগতিকে বাধা না দেয়, তাহ'লেই তা আধুনিক কাব্য-সাহিত্য। যুগে যুগে সমস্যার রূপ বদলায় এবং সমাধান নতুন পথ অনুসরণ করে এবং কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতার বিচারে সে-সমস্যা উক্ত কাব্যে কতখানি স্থান পেল এবং সে-সমাধান কতখানি সমর্থিত হল, তা' বড় কথা নয়। নতুন সমস্যা সমাধানে আমাদের যে নতুন দৃষ্টি বা মর্জির প্রয়োজন, তার পথে যদি কাব্য-সাহিত্য অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাকে সেকেলে ব'লে বর্জন করলে অন্যায় হবে না। রবীন্দ্র-কাব্য মানুষের দৃষ্টিকে সজাগ রাখে এবং চিত্তকে জাগ্রত করে, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ায় এবং বিশ্বের প্রতি দরদ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র-কাব্যে অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের দুর্নিবার কামনা ও ভাবনা এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা ঋংকৃত হয়ে ওঠে। 'সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা ও কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা' রবীন্দ্র-কাব্যকে ধনী করেছে। রবীন্দ্র-কাব্য মনের দৃষ্টি প্রসারিত করে, চিন্তার সংকীর্ণতা দূর করে, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগায়। রাজনীতিক্ষেত্রে কোন বিশেষ মতবাদকে সেকেলে বলে

আমরা পরিহাস করতে পারি কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে মোহমুক্ত দৃষ্টি আধুনিকতার প্রথম লক্ষণ। কারণ জাতি বা জগতের প্রগতির পথে যত সব বাঁক আছে, তাকে অতিক্রম করতে হলে এই মোহমুক্ত দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টির সাহায্যেই গতির তালের সঙ্গে পা ফেলে এগুনো যায়। রাজনৈতিক প্রোগ্রামের বিচারনীতি নিয়ে কাব্য-সাহিত্য বিচার অসঙ্গত। রবীন্দ্র-কাব্যে সমাজ-বোধ বা সমাজ-চেতনার অভাব নেই—অভাব আছে শুধু কোন বিশিষ্ট নীতি, দর্শন বা ব্যবস্থার পরিপোষণ। এবং সে-অভাব আছে ব'লেই রবীন্দ্র-কাব্য চিরকালের আধুনিক। অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যে অমরতার দাবি আছে।

যাঁরা রাজনীতির মত ও পথ নিয়ে কাব্য-সাহিত্যের আলোচনার প্রাঙ্গণে ভিড় করেন—তাঁদের কলরবে রাজনীতি থাকতে পারে, কিন্তু কাব্য-বিচারের নীতি নেই। অথচ বাংলার কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় তাঁরাই মুখর। তাই কাব্য-সাহিত্যের বিচারে গণনীতির ব্যাখ্যা শুনতে পাই, কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রচারিত হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার নন্দন কাননের সৌন্দর্য আখ্যাত হয়—হয় না শুধু কাব্য-বিচার। রবীন্দ্র-কাব্যে মার্কসিজ্‌ম খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না—হাটের হট্টগোল বা সাময়িক ফ্যাশন মিলবে না। তবুও রবীন্দ্র-কাব্য সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। জীবনের আঘাতে জীবন জেগে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের মত রূপদক্ষ একথা বিশ্বাস করেন এবং তিনি তা কাব্যে প্রচার করেছেন। এই দৃষ্টি আধুনিক দৃষ্টি—এই দৃষ্টি চিরকালের এবং সর্বলোকের সম্পদ।

শচীন সেন

গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ

মোপাসাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁস ছোটো একটি ছড়ার উল্লেখ ক'রেছিলেন :

And the little dolls
Run, run, run
Three times round
And then they are gone.

মোপাসাঁর গল্পগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব্যর্থ কয়েকটি প্রাণী—ভাগ্যের হাতে পুতুলের মতো তারা অসহায়; তারা আমাদের চোখের সামনে দু'দিনের জন্য দেখা দেয়, তাদের ব্যর্থতায়, তা'দের গভীর হতাশায় আমাদের অভিভূত ক'রে নিমিখেই তারা শেষ হয়। মোপাসাঁ সুনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন না, অন্ধ-আতুরের জন্য সঙ্কটত্রাণ সমিতি খোলবার পরামর্শও দেন না। ক্ষণিকের জন্য একটি ছবি দেখিয়েই তিনি অন্য ছবিতে মন দেন। তারপর···তারপর আর কি? আনাতোল ব'লেছেন "His indifference is equal to that of nature, it astonishes me, it irritates me."

গল্পগুচ্ছের পাঠকদেরও মনের কথাটি হ'চ্ছে এই। গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের শেষে স্বতই বলতে হয়, "it astonishes me, it irritates me।" সাধারণ মেয়ের মুখ দিয়ে শরৎবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদনটি মনে পড়ে। কিন্তু সাধারণ মেয়ে অসামান্যা নয়; তাই তার জিৎ হোক ভাবলেই জিৎ হয় না। অনেক পরাজয়ের ইতিহাস তা'র চোখে-মুখে, তাইতেই তার সৌন্দর্য্য। সে যা, সে তাই।

ছোট গল্পের আঙ্গিকের প্রধান দু'টি বিশেষত্বের একটি হ'লো এই objective বা নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গি; দ্বিতীয়টি গল্পের বক্তব্য ও পরিমাপ নির্দেশক। Edgar Allan Poe লিখেছিলেন, আধ ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায়, এমন একটি কাহিনী-ই ছোটো গল্পের উপযোগী। জীবনের বিশেষ

একটি ঘটনা, মনের বিশেষ একটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে নাটকীয় রীতিতে—এই হ'লো ছোটো গল্পের আদর্শ।

'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলির মধ্যে এই আদর্শের নিখুঁৎ প্রকাশ চোখে পড়ে। কিন্তু সেইটেই বড়ো কথা নয়। মনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার মননে, তার সৃষ্টিতে। সেই শক্তিতেই সৈন্যের চেয়ে সম্রাট বড়ো, তোতাপাখীর চেয়ে মানুষ এবং সাধারণের চেয়ে প্রতিভাবান। এই সব গল্পে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আশ্চর্য প্রসার আমাদের মুগ্ধ করে। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ভাঙ্গা ইস্কুলের নগণ্য পণ্ডিত যে গল্পের নায়ক হ'তে পারে, এমন অদ্ভুত কথা গল্পগুচ্ছ পড়বার আগে কে-ই বা বিশ্বাস ক'রতো? নিতান্ত সাধারণ, এবং অতিশয় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখা গেলো। 'একরাত্রি,' 'পোষ্ট-মাষ্টার,' 'মাষ্টার মশায়'—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এই লেখাগুলি অতীতের একটা বিদ্রোহের মতোই আকস্মিক। ধ্বংসোন্মুখ জমিদারি অথবা প্রাচীন ইতিহাসের অর্ধ-কল্পিত পরিবেশ থেকে বাঙালী পাঠকের মনকে একেবারে নীচের তলায় টেনে আনা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই,—'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই,' তারই মাঝে সমতল, মসৃণ, উর্বর এই পল্লীশ্রী আমাদের একমাত্র সম্পদ—এমন একটি অভিযোগ আজও শুনতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। গ্রামের মাটি এবং মায়ের স্নেহেই আমরা মানুষ হই; সুতরাং গুরুতর রোগের ঝোঁকে প্রলাপের মধ্যে ফটিকচরণ যখন কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরবার জন্য ছুটি চায়, তখন তার মানে বুঝতে পাঠকের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। তবু উত্তেজনাও কি এ জীবনে কম? বৈদ্যনাথের মতো নিস্পৃহ, শান্তশিষ্ট লোকটিকেও শেষ পর্যন্ত 'স্বর্ণমৃগের' সন্ধানে বেরুতে হয়। ছড়ি এবং ছিপ তৈরী ক'রে জীবনের যে নিরুপদ্রব ধারাটি ব'য়ে চলেছিলো তা' থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে একদিন ছিটকে পড়লো দৈবধন-লাভের উচ্চাশায়। কাশীর পোড়ো বাড়ীর নীচে গঙ্গার স্রোত, সেখানে শিকলে বাঁধা শূন্য তামার হাড়ির অবিরাম আর্তনাদ, জলের নীচে মড়ার মাথা। বৈদ্যনাথের এই অভিযান কি তুচ্ছ? এতো বড়ো হতাশা কি ফিকে? আমাদের জীবনের এই চাঞ্চল্য, এই সংঘাতের পরিচয় পাওয়া গেলো রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

Stevenson গল্পের তিনটি শ্রেণীবিভাগ ক'রেছিলেন—আখ্যান-প্রধান, আবহ-প্রধান এবং মনস্তত্ত্ব-প্রধান। রবীন্দ্রনাথ নিছক আখ্যানের জন্য অবশ্য কোনো গল্প লেখেন নি। (কোনো লেখকই বোধ হয় লেখেন না)। যে সব গল্পে আখ্যান দীর্ঘ, যেমন ধরা যায় 'রাসমণির ছেলে,' 'নষ্টনীড়,' 'স্ত্রীর পত্র,'—সেখানেও মনস্তত্ত্বের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। কাহিনীর চেয়ে চরিত্র-ই বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। শানিয়াড়ির চৌধুরী বংশের উত্থান-পতনের পটের উপর দু'একটি মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি ফোটে। কালিপদ এবং ভবাণীচরণ, শৈলেন এবং রাসমণি আমাদের মনে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে যায়। 'স্ত্রীর-পত্র' শুধু অভিনব আঙ্গিকের জন্যই স্মরণীয় নয়। মেজবৌ শ্রীক্ষেত্র থেকে স্বামীর কাছে চিঠি লিখেছেন; সাতাশ-নম্বর মাখন বড়াল লেনের একটি রূপ-হীনা মেয়ের সহিষ্ণুতা থেকে সকলের অগোচরে মেজ-বৌ-এরই মনে লেগেছে বিদ্রোহের আগুন। বাংলা দেশের এই নিতান্ত সাধারণ অন্তঃপুরের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই একটি মাত্র প্রদেশেই পাওয়া যায়—তাঁর ছোটো গল্পে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন 'পোড়াকাঠ,' রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমনি 'বিন্দু'। বিন্দুর শাড়ীতে শেষ পর্যন্ত আগুন লাগে, আমরা অভিভূত হই। আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে বলি, 'হায় রে পুতুল'; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলি,

'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!'

বাংলা সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র ভালো ফোটেনি,—কথাটি রবিবাবুই একবার ব'লেছিলেন। 'গল্পগুচ্ছে' চোখ-ঝলসানো মেয়ের সংখ্যাই বেশী। এর কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙালী পুরুষের মন প্রায়শঃই শিশু মনের হ্রস্ব-দীর্ঘ সংস্করণ—কর্ম বিমুখ এবং পরমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে এ দেশে অন্তঃপুরের হাজার নিগড়-বেষ্টিত হ'য়েও মেয়েরাই ছিলেন জীবনের প্রস্রবণ। অন্তঃপুর-কে কেন্দ্রে রেখেই এ দেশের সমস্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' দেখেছি ননীবালার নিষ্ঠা, দামিনীর বিদ্রোহ; 'স্ত্রীর পত্রে' দেখলাম বিন্দুর সহিষ্ণুতা, মেজবৌ-এর বিদ্রোহ; 'ক্ষুধিত পাষাণ'-গল্পে দেখেছি আর এক বিদ্রোহিনীকে, নিস্বার্থ আত্মদানে যার অনাস্থা। 'বিচারক' এবং 'পুত্রযজ্ঞের' মধ্যে অবৈধ প্রেমের

কথা আছে। বাংলা দেশে পতিতাদের নিয়ে গল্প লেখার শরৎচন্দ্রেই সূত্রপাত—এমন একটি সহজ বিশ্বাস আজকাল অনেকেই পোষণ করেন, দেখেছি। অবশ্য শরৎচন্দ্র উপন্যাসের সম্রাট। কিন্তু বিষয়বস্তুরই যদি কথা ওঠে, তা'হলে এই প্রসঙ্গে, শরৎচন্দ্রের পূর্বগামীদের মধ্যে অনেককেই স্মরণ করতে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে যে দরদ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার যে নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি যে নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছে শরৎচন্দ্রের একাধিক পতিতা-জীবনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে তা তুলনীয়, এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। শরৎবাবুর গল্পে উপন্যাসে অবশ্য খুঁটিনাটির বাহুল্য আছে—এই অর্থে তিনি রিয়্যালিষ্ট; প্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের মতো অবিমিশ্র আবেগধর্মী নন, তিনি চতুর অথচ হৃদয়বান; রবীন্দ্রনাথের গল্পে চাতুর্য আছে, হৃদয় আছে এবং কবিত্ব আছে। মোপাসাঁ সম্বন্ধে ব্রোচে লিখেছিলেন, "He distinguishes himself and emerges from the company of his contemporaries and compatriots, the Zolas, Daudets and their like, themselves endowed with noteworthy qualities and possessors of certain artistic forms but not fundamentally and essentially poetical like him।" রবীন্দ্রনাথের গল্পেও গীতিকাব্যের হাওয়া বয়।

"Religion of Man"-এ কবি এক জায়গায় প্রশ্ন করেছেন, আর্ট বলি কা'কে? উত্তরে লিখেছেন, It is the response of Man's creative soul to the call of the Real. আন্তরিকতাকে কবি কী মূল্য দেন, এ থেকেই তা বোঝা যায়। অননুভূত সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের তাগিদে বঙ্গদেশে সম্প্রতি নতুনতম যে লেখক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হ'য়েছে, তাঁরা এখানকার কোলাহলমুখর গোধূলির স্বল্পালোকে দাঁড়িয়ে একবার দিগন্তের অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে দেখুন। কর্তব্যজ্ঞানটা ছোটো কথা। সে আছে পুলিস-কন্‌ষ্টেবলের। পক্ষান্তরে কর্তব্যবোধ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল, তাতে কর্তব্যের ভার নেই, অথচ মধুর নিষ্ঠা এবং পরম আত্মসমর্পণ—দুই-ই আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার আন্তরিকতার অভাব কোথাও নেই। তিনি সমাজের যে স্তরের অধিবাসী, তার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি চলে, এবং সে দৃষ্টি

এতোটুকু ঝাপসা নয়। এবং প্রসঙ্গবিশেষে অতি-মনোযোগ বা obsession-এর দোষ-ও তাঁর নেই। তাঁর মন সজীব, সুতরাং তাঁর কৌতূহলও ব্যাপক। গল্পগুচ্ছে বালকের চাপল্য এবং প্রৌঢ়ের জল্পনা, দরিদ্রের অশ্রু এবং ধনবানের অপব্যয়, কুমারীর অনুরাগ এবং বিধবার প্রেম,—সবই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোথাও অতিনিবদ্ধ নয়,—যে দোষের প্রকাশ দেখি শৈলজানন্দের মাতৃত্ব-চিত্রণে এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিকতা-প্রীতিতে। তবে বিশেষের চেয়ে সাধারণ এবং প্রাদেশিকতার চেয়ে বিশ্বমানব মনের ছবিই তাঁর কয়েকটি গল্পে ফুটে উঠেছে। 'কাবুলিওয়ালা' নিগ্রো হ'লেও ক্ষতি ছিলো না এবং ভূটানী হ'লেও গল্প ঠিক থাকতো। কারণ, ওর মধ্যে কাবুলের ভূবৃত্তান্ত, সামাজিক রীতি-নীতি, জীবনধারণের পদ্ধতি প্রভৃতি গৌণতম, মুখ্য বিষয় হ'চ্ছে একটি শিশুর মনে সুদূরের কৌতূহল এবং একটি সন্তানবৎসল প্রবাসীর পিতৃত্ববোধ। চেকভের স্মৃতি-সঞ্চয়ে দেখা যায় গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তিনি খুঁৎখুঁতে ছিলেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পটি তাঁর হাতে পড়লে, তিনি ওর শিরোনামা কেটে লিখতেন 'পিতা'। 'একটা আষাঢ়ে গল্পে'-ও এই সর্বজনীনতার নিদর্শন মেলে। তাসের দেশ প্রাদেশিক সীমানায় বাঁধা নেই, বিপুলা পৃথিবীর একাধিক ভূখণ্ডে এর দর্শন লাভ ঘটে। নামের অপপ্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—'দৃষ্টিদান'। দৃষ্টি-দানের সিদ্ধান্ত ব'লতে যা বুঝি, সে হ'চ্ছে এই যে,—যে মেয়েকে ভালোবাসো, মনে রেখো সে দেবী নয়, সে মানবী। নিজের দৃষ্টি যে মেয়ে স্বামীকে দান করলো, অপরের সঙ্গে স্বামীর শুভদৃষ্টি-বিনিময়ের বাধা ঘটালো সে-ই। প্রেমের জন্যই সে দান ক'রেছিলো, প্রেমের জন্যই সে স্বার্থপর। সে দেবী নয়, মানবী। চেকভ বোধ হয় ও গল্পের নাম রাখতেন 'দেবী না মানবী?' অথবা 'পরিচয়' অথবা ঐ রকম অন্য একটা কিছু।

মানুষের মনের অতলে কতো অতৃপ্তি, কী বিচিত্র বুভুক্ষা! অনেক জিনিস আমাদের চোখেই পড়ে না। হঠাৎ কিছু একটা ঘটে, আর এক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন সত্য। 'দিদি' গল্পটিতে এমনি একটি কাহিনী আছে। 'আপদ' আর একটি উদাহরণ। একটা ভবঘুরে ছেলে প্রথমে আশ্রয় পেলো, তারপর গৃহিণীর কাছে মায়ের মতো স্নেহ পেলো—এবং তারপর, কী আশ্চর্য,

সেই নির্বোধ অভিমান ক'রে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিলো।—এই হ'চ্ছে 'আপদের' মোট কথা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ডবল, ডেকারে' 'অপূর্ণ' নামে যে গল্পটি প্রকাশ ক'রেছেন, প্রসঙ্গক্রমে সেটি মনে পড়ছে। 'অপূর্ণ' 'আপদের'ই অন্য সংস্করণ। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম 'পয়লা নম্বর'। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মধ্যে আমরা ঋজু, সংযত, উদ্দীপ্ত যে ভাষাবিন্যাসের পরিচয় পাই এবং যা'তে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব শীলমোহরের ছাপ প'ড়েছে, সেই লিখনরীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'পয়লা নম্বরে'। আর মনে হয় সিতাংশু মৌলি একেবারে এ কালের লোক—এই 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'দুই বোন'-এর যুগের মানুষ।

কিন্তু গল্পগুচ্ছের সব চেয়ে চমকপ্রদ গল্পগুলি কোন শ্রেণীতে পড়ে, এ প্রশ্ন আমাকে যদি কেউ করেন, আমি স্পষ্ট গলায় বলবো,—আবহপ্রধান। 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্পে ছাড়া আর কোথাও কি পাওয়া যায়? এই আবহসৃষ্টির নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পে দেখা যায়। এমন কি 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কাহিনী, প্রভৃতি নতুন ধরণের চিত্রধর্মী গল্পগুলিতেও এই ঝোঁকটা র'য়ে গেছে। এদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে লিপিকার কয়েকটি রচনার। দৃষ্টান্তের জন্য 'পুরোনো বাড়ি'-র উল্লেখ করা চলে। কিন্তু 'পুরোনো বাড়ি'-তে কবিকেই বেশী চোখে পড়ে, গল্পলেখককে কম। 'ঘাটের কথায়' কবি এবং গল্পলেখকের সমবেত প্রচেষ্টায় একখানি ছবি আঁকা হ'য়েছে। পরবর্তী কালে এই ধারাটির প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেব বসুর 'রেখাচিত্রে'। বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলেও 'রেখাচিত্রে' এই আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটেছে এবং বহির্জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি অনেকটা সরে গিয়ে অন্তর্মুখী হ'য়েছে। তাঁর 'জ্বর', 'মেজাজ' প্রভৃতি গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আঙ্গিক অনুসরণ করলেও মৌলিক এবং উপাদেয় এবং তাতে বুদ্ধদেব বসুর-ই ছাপ আছে।

অবিমিশ্র গুরু বিষয়ের পক্ষপাতী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি হাসির গল্পও লিখেছেন এবং অন্য ধরণের গল্পেও প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। 'মুক্তির উপায়'-এর comedy of errors আমাদের নির্মল আনন্দ দেয়। 'অধ্যাপক'-গল্পটিতে অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে মহীন্দ্রকুমারের বিতর্ক-বুভুক্ষা অথবা

'ভাইফোঁটা'-য় ডিরোজিও-র ছাত্র সনাতন দত্তের সত্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ গভীর বেদনার মধ্যেও আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে।

চেকভের গল্প পড়ে গর্কি বলেছিলেন, এ যেন শরৎকালের এক বিষণ্ণ বিকেল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আমি দেখলাম পরিপূর্ণ একটি পৃথিবী,—হাসিতে-কান্নায়, শোকে-আনন্দে, কথায়-নীরবতায়, ত্যাগে-স্বার্থপরতায়, মৃত্যুতে-অমরতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মানুষ; তাদের চারিদিকে দিনরাত্রির সনাতন লীলা, তাদের মাথার উপর অনন্ত আকাশের নীল, সেখানে কিছুই দেখা যায় না, শুধু অদৃশ্য এক বিধাতার অক্লান্ত হাত নিরন্তর তাদের জীবনের পট পরিবর্তন করে,—সেই হাত ঋজু আর বলিষ্ঠ, সেই বিধাতা রসিক এবং নির্মম—গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ।

হরপ্রসাদ মিত্র

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্মৃতি

১৮৯৪ সাল। বয়স তখন সবে পাঁচ কি ছয় হইবে। জন্মদিনে ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি 'ছবি ও গল্প' উপহার পাইয়াছিলাম। তাহাতে একটি কবিতায় ছিল

আকাশজুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।

আমার শিশুচিত্ত ইহার মধ্যে যে কি অপরূপ কাব্যরসের সন্ধান পাইল এখন তাহা বলিতে পারিব না; কিন্তু যাহাদের 'কেউ করে না মানা' সেই যাযাবর মেঘের দলের সঙ্গে মনটা উধাও হইয়া গিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি আজও আমার মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। ছন্দ ও বাণীর অনুপম স্পর্শে শিশুর অন্তরলোকে রসের উৎসকে উৎসারিত করিয়া দিয়া একমুহূর্ত্তেই তিনি আমার চিত্তকে জয় করিয়াছিলেন। তারপর কেমন করিয়া দিনে দিনে কাব্য ও সঙ্গীতের রহস্যলোকের পথে তিনি অলক্ষ্যে আমার মনোহরণ করিয়াছেন—ভাবিলে অবাক হইয়া যাই।

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শন করিলাম তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে। দিগন্তপ্রসারিত তরঙ্গায়িত প্রান্তরের ক্রোড়ে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে না দেখিলে বোধহয় তাঁহার আনন্দস্ফুরিত মহান আত্মার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অন্ততঃ সেদিন আমার সেই কথাটিই বার বার মনে হইতেছিল। আমার শিশুহৃদয়ের মানস-রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনে আর কোথাও দেখিলে বোধহয় এমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না।

বন্ধুবর প্রশান্ত মহলানবীশ ছিলেন অতিথিসৎকারের কোনো একটি বিশেষ বিভাগের কর্ত্তা। অল্পবয়সেই নিজগুণে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স মাত্র সতের। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, পরিপক্ক বুদ্ধি এবং সর্ব্বজনবিদিত অকালপক্কতা তাঁহাকে বয়স্কের মর্য্যাদায় উত্তীর্ণ

করিয়াছিল। তাঁহারই সাহায্যে সহজেই রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলাম।

সেবার 'রাজা' অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয় দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে মনে মনে কবির অর্ঘ্য দিয়া চিরদিন বন্দনা করিয়াছি, তাঁহার অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম। কি আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর, প্রত্যেকটি ভঙ্গীর কি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সেই অভিনয় জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। সুবিখ্যাত এ্যানা পাভ্‌লোভা রবীন্দ্রনাথের হস্তভঙ্গীকে music বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাংলার নট-গৌরব শিশিরকুমার একদিন বলিয়াছিলেন, 'হাতটা নিয়েই অভিনয়ের সময় আমরা পড়ি মুস্কিলে, ওঁর (রবীন্দ্রনাথের) আবৃত্তির সময় আমি বসে বসে শুধু ওঁর হাতের ভঙ্গীটাই দেখি।'

তাঁহার পর ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিয়াছি। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন—তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অভিনয়ের কৃতিত্ব অনন্য-সাধারণ ছিল। বিশেষ করিয়া দিনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কথা মনে হইতেছে। তাঁহার পাগলের অভিনয় ও গান 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই' এখনো ভুলিতে পারি নাই। গানের মধ্যে সঙ্গীতের স্বরূপটিকে সুরের নয় স্বরের ব্যঞ্জনায় এমন করিয়া প্রকাশ করিতে তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও মনে পড়ে না। আরো একটি (ছোট খাট রাজার) অংশও তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। এখনো তাঁহার আয়ত চোখের অকস্মাৎ উদ্বিগ্ন ও আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার একটি বিস্ফারিত ভঙ্গী ছবির মত আমার মনে আঁকা রহিয়াছে।

সেদিন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আজ ইহজগতে নাই। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, জগদানন্দ রায়, হীরালাল সেন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ, যাঁহারা শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ হইয়া আছেন তাঁহারাও এই অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে অল্প কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই।

রাজার কয়েকটি বিখ্যাত গান সেদিন অভিনয় বাসরে বাদ পড়িয়াছিল। শুনিলাম লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি কল্পনা করিয়া কবি সেগুলিকে বাদ দিয়াছিলেন।

দিনুবাবু বাহির হইতেই আমরা তাঁহাকে লইয়া পড়িলাম। সুকবি ও সঙ্গীতরসিক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এই উদ্যোগে অগ্রণী ছিলেন। একটি এস্রাজ লইয়া খোলা মাঠের মধ্যে একটি জীর্ণ তক্তপোষে বসিয়া দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠে সেই গানগুলি আমাদের গাহিয়া শুনাইলেন 'আজি দখিন দুয়ার খোলা,' 'খোলো—খোলো দ্বার', 'ভোর হ'ল বিভাবরী পথ হ'ল অবসান,' 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে।' আরো কতবার দিনুবাবুর মুখেই ঐ গান পরে শুনিয়াছি। কিন্তু সেদিন যেমন করিয়া গানগুলি আমাদের মুগ্ধ করিয়াছিল তেমন করিয়া আর শুনি নাই। গানের পর গান চলিয়াছে—আমরা উৎকর্ণ পিপাসু হইয়া শুনিতেছি, রাত্রি গভীর হইতে চলিল কিন্তু সে কথা গায়ক বা শ্রোতা কাহারও খেয়াল রহিল না। সেদিন অনেক রাত্রে শুইতে গিয়াছিলাম কিন্তু ঘুমাইতে পারি নাই। অভিনয় ও সঙ্গীতের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মোহ ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তর ও আকাশের বিরাট ব্যাপ্তি আমাকে এক পরমানন্দময় রসলোকের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

ইহার পরেই প্রশান্তের সাহায্যে আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হইয়া যাই।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা স্বপ্নপ্রয়াণের কবি ও মহা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিচু বাংলায় বাস করিতেন। এখনো মনে পড়ে সাদা ফ্ল্যানেলের লম্বা জামা ও পাজামা পরিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনি নিচু বাংলার বাগানের মধ্যে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার পর একটু বেলা হইলেই তিনি তাঁহার লেখার সরঞ্জাম লইয়া বারান্দায় যাইয়া বসিতেন। তাঁহার প্রিয় কাঠবিড়ালী ও চড়ুইরা এইখানেই নিঃসঙ্কোচ অধিকারে তাঁহার হাত হইতে আসিয়া খাবার আদায় করিয়া লইত। তিনি যেন এই আশ্রমের শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীকস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেন। সামান্যমাত্র কৌতুকের আঘাতে উদ্ভাসিত তাঁহার শিশুসুলভ প্রাণের উচ্চহাস্য যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা এই মহান পুরুষের অন্তরাত্মার শুভ্র স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এই গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের মধ্যে কৌতুকের উৎস ও তাহার প্রকাশ যে কিরূপ স্বাভাবিক ছিল স্বপ্নপ্রয়াণের অতুল্য চিত্রকাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। বিচিত্র ছন্দ অনায়াসে মুখে মুখে রচনা

করিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শিশুদের ভুলাইবার জন্য চট্ করিয়া অদ্ভুত রসের কবিতা বানাইয়া হাতমুখের ভঙ্গীসহ আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের একেবারে হতভম্ব করিয়া দিতেন। এইরূপ একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একটি উৎকট ক্রন্দনশীল শিশুকে কিছুতেই থামাইতে পারা যাইতেছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ কোথা হইতে আসিয়া হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—সাপ বলছে কি!

ব্যাং তোমায় খাব। বলছে—

জিউভা লিড়ি-বিড়ি-সিড়ি কিচিড়ি-মিচিড়ি-করি কুপ্—আর ব্যাং পুকুরে লাফিয়ে পড়ে বলছে—

যব পানিমে বুড়গিয়া ভুসম-ভুসড়ি খায়া গুজুড়ি-মুজুড়ি করি গুপ্—

বলেই ডুব মেরেছে। গুপ্ বলিয়া জলে ডোবার মত গলা দিয়া একটা আওয়াজ বাহির করিলেন। ইহার পর সুকুমার রায়ের 'বুথ সাহেবের বাচ্চা'র কান্নাও যত সাচ্চা হোক্ আর কি টেঁকে।

এক একটি লেখা শেষ হইলেই অধ্যাপক ও বয়স্ক ছাত্রদের ঢাকিয়া সভা করিয়া বসিয়া তাহা শুনাইতেন। অত্যন্ত নীরস ও কঠিন দার্শনিক তথ্য সকল তাহার লিখিবার বিষয় ছিল কিন্তু সকল বিষয়কেই তিনি সহজে তাঁহার আপন অন্তরের অফুরন্ত কাব্য ও কৌতুক রসের অভিসিঞ্চনে সরস ও প্রাণবান করিয়া তুলিতেন। আমরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহার ভাষার অপূর্ব্ব প্রকাশ-ভঙ্গী ও বিষয়-বস্তুর বিচিত্র জটিলতার মধ্যে নিজেদের হারাইয়া ফেলিতাম।

প্রতিপক্ষের সহিত যেন তর্কের আসরে নামিয়াছেন এইভাবে তাঁহার কণ্ঠের স্বরে মোচড় খাইয়া যুক্তির পর যুক্তির প্রবাহ নামিত—'তবেই দেখা যাইতেছে,' 'অসবর্ণ বিবাহও ত বিবাহই, তা বই তাহা ত অবিবাহ নহে' ইত্যাদি। এই সব রচনায় বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষার অর্থটিকে তিনি যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করিতেন। একটি মনে পড়িতেছে, কে একজন—বোধ হয় অজিত দা (চক্রবর্ত্তী) struggle for existence-এর বাংলা কি হইতে পারে জিজ্ঞাসা করায় তৎক্ষণাৎ কৌতুকে উদ্ভাসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'সত্তারক্ষার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি'; এবং উচ্চারণভঙ্গীতে ঐ ধ্বস্তাধ্বস্তির চেহারাটা যেন

প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিলেন। বলিবার কথাকে সুস্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং ভাষায় ও শব্দবিন্যাসে তাকে চলচ্চিত্রের মত প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। স্বপ্নপ্রয়াণের প্রত্যেকটি পংক্তি সেই চলচ্চিত্রের ব্যঞ্জনায় প্রাণবান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণধারা দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হইত এবং আশ্রমটিকে একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদায় মহিমান্বিত করিয়া রাখিত।

উৎসাহের সহিত অধ্যাপনার কাজে লাগিয়া গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন গাছের কম্বলাসনে বসিয়া আমাদের ক্লাশ চলিত। অধ্যাপকগণ আপন আপন গাছের ছায়া নির্ব্বাচিত করিয়া লইতেন এবং তাঁহার বিভিন্ন ক্লাশ দল বাঁধিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া যাইত। অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের যায়গাটি তিনি কখনও বদল করেন নাই। আমি নূতন গিয়াছিলাম। সুতরাং আজ আমলকীতলা, কাল শালতলা, পরশু ছাতিমতলায় আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। একদিন ৺কবি সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' নামক পুরাকালের আশ্রমচিত্রের সুমধুর গদ্যকাব্যখানি পড়াইতেছি। পড়াইতে পড়াইতে সেই ভাষাচিত্রের মধ্যে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। অকস্মাৎ কি একটা অনুভব করিয়া তাকাইয়া দেখি ছেলেরা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। কবি কখন নিঃশব্দে আসিয়া একখানি কম্বলাসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। আমি বই বন্ধ করিতেই তিনি বইখানি লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সে কি আশ্চর্য্য অধ্যাপনা। অধ্যাপনা নয় সে যেন আর একটা নূতন দৃষ্টি। কখনও পুস্তকে বর্ণিত চিত্রগুলিকে ভাষান্তরিত করিয়া শুনাইতেছেন, কখন নবীনতর কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিতেছেন, কখনো নূতন নূতন পথে বালকদিগের কল্পনা ও রচনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। শব্দ ও প্রতিশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৌতুকপথে বালকদিগের শব্দসম্ভার বাড়াইতেছেন। সে যেন একটা পড়ানোর ম্যাজিক। তাহার বহু বৎসর পরে বি. টি. পড়িবার সময় আমাদের অধ্যক্ষ Stark সাহেবের কাছে ঐ অধ্যাপনার কথা বলিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

তখনকার আশ্রমে যাঁহারা বাস করিয়াছেন কবির এই নিঃশব্দ সঞ্চরণ এবং

আকস্মিক আবির্ভাবের চিত্রগুলি তাঁহাদের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া আছে। দৌড়িয়া চলাই আমার তখনকার অভ্যাস। জগদানন্দবাবুর বাড়ী হইতে শালবীথি অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি হঠাৎ সম্মুখে অল্পদূরেই দেখি দীর্ঘ শালশ্রেণীর অন্যতম হইয়া পশ্চাৎনিবদ্ধহস্তে ধীরে ধীরে কবি পায়চারি করিতেছেন। চপল চরণযুগলকে সংযত করিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গের আশঙ্কাতেই বোধ করি গাছের আড়ালে লুকাইয়া সরিয়া পড়িলাম। এমন কতদিন হইয়াছে।

এখন যে বাড়ীটায় অতিথিশালা সেখানে তখন মহর্ষির পৌত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ থাকিতেন। রক্তকরবীর রাজার মত আড়ালে অথচ একটি বিরাট মশারি খাটাইয়া, তাহারই ভিতরে পরিষদবর্গ ও বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া তিনি মশগুল থাকিতেন। এইটুকু মনে আছে যে সেই ঘরজোড়া মশারির ভিতরে দিবারাত্র তাঁহার টানা পাখা চলিত। আমি দূর হইতে দেখিতাম ও মাঝে মাঝে তাঁহাদের উচ্চহাস্য আমাকে উতলা করিত; কিন্তু কেন জানি না, সাহস করিয়া কোনো দিন তাঁহার কাছে ঘেঁসি নাই।

অথচ তাঁহারই পুত্র দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজেই এমন হৃদ্যতা হইয়া গিয়াছিল যে এক সময় নিদ্রা ও অধ্যাপনার সময়টুকু বাদে প্রায় অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছি। তিনিও মজলিসী মানুষ ছিলেন। তবে তাঁহার মজলিস ছিল আমাদের মধ্যে জুটিয়া সকলকে লইয়া একাকার হইয়া গিয়া। এমন সহজ হৃদ্য মানুষ সংসারে বিরল। প্রাক্তন ও সমসাময়িক সকল শিক্ষক এবং ছাত্রই তাঁহার একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিতে একটুও বাধা বোধ করিত না। তাঁহারই বাড়ীতে নিরন্তর চায়ের মজলিস, গানের মজলিস, গল্পের আড্ডা, তাসের আড্ডা, সাহিত্যের কচ্‌কচি, অজস্র উৎপাত, কোনো কিছুতেই তাঁহার প্রসন্নতা ম্লান হইত না। শান্তিনিকেতনের নানা আকর্ষণের মধ্যে তাঁহার আকর্ষণ শান্তিনিকেতন ও বাহিরের বহু লোকের নিকট একান্ত লোভনীয় ছিল। শারদোৎসবের ঠাকুর্দ্দার মতই শিশুপালে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা উৎসবে তাঁহার গানের আসর জমিয়া উঠিত। তাহাদের এমন বদ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাহাদের 'দিনদা'কে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া যেন তাহারা গান গাহিতে পারিত না।

প্রত্যেক সময় হয় হারমোনিয়ম না হয় এস্রাজ লইয়া তাহাদের সঙ্গে জোর দিয়া গান করিতে করিতে অনেক বেতাল ও অসুরের দলকে তাঁহার সুরের পথে সায়েস্তা রাখিতে হইত।

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় দলই তাঁহাকে প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া মনে করিত। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ঠাকুর্দ্দার চরিত্রটির সঙ্গে দিনুবাবুর কোথায় একটা মিল ছিল।

আমাদের ফুটবল খেলার মাঠের পাশে দিনুবাবু বেণুকুঞ্জ বলিয়া একটি কুটীর বানাইয়াছিলেন। সেখানেই আমাদের জমায়েৎ আড্ডা বসিত। বর্ষার দিনে গল্পে গানে চায়ে চানাচুরে তাসে ক্যারমে ঘর একেবারে সরগরম থাকিত। অনেক রাত্রে আড্ডা ভাঙিলেও ধোঁয়াড় ভাঙিতে চাহিত না। দিনুবাবু শুইতেন লাইব্রেরীর ঘরে। বন্ধুবর অধ্যাপক নগেন আইচ মহাশয় বর্ষার গানের নেশায় সেদিন বোধকরি একটু মত্ত হইয়া থাকিবেন। রাত বারোটা কি একটাই হইবে। ঝোড়ো হাওয়া শালবীথির মধ্য দিয়া গর্জ্জিয়া চলিয়াছে—বর্ষণ যেন কিছুতেই শান্তি মানিতেছে না। আর সমস্ত প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত শব্দকে বিদীর্ণ করিয়া যেন প্রেতলোকের একটা আর্ত্তনাদ উঠিতেছে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে পাক খাইয়া—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
বাতাস কাঁদে হুতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
আমি চাই যে বারেবার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

বন্ধুবরের কণ্ঠস্বর—থাক তাহার ব্যাখ্যানে আর কাজ নাই। তবে তিনি ভাবুক লোক সন্দেহ নাই। দিনুবাবু—ঘুমের উপর নয় গানের উপর—এই অত্যাচার বোধ হয় সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, দরজা খুলিয়া তিনি পাল্টা গান সুরু করিলেন—

আজি গভীর রাতে তোমার অত্যাচার
নগেন আইচ শত্রু হে আমার

তোমার গান কান্নাসম ঘুম যে ভাগে দু চোখে মম
দুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায় খেদাই বারে বার।

নগেনবাবু প্রচুর হাসিতে লাগিলেন।

বর্ষার দিনের কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাকে বলিতাম আমরা কবি কালিদাস। কবিতা তিনি বেশ ভাল লিখিতেন এবং লিখিতেন অতি স্বাভাবিক প্রেরণায়। কিন্তু এত স্তব্ধ নীরব মানুষ ছিলেন যে নিজেকে কোনো মতেই তিনি প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার অজস্র কবিতার মধ্যে বোধহয় কোনোটি ছাপাইয়া বাহির হয় নাই। বর্ষার দিনে তাঁহার বিপুল বলিষ্ঠ বপু কোঁচার খুঁটে আবৃত করিয়া খোলা মাঠের মধ্যে একলাই বাহির হইয়া পড়িতেন। তাঁহার শান্ত আয়ত চক্ষু দুটি আনন্দের আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিত। ইঁহার নাম ছিল কালিদাস বসু।

হীরালাল সেন মহাশয়ের দেহও ছিল বিশাল। শারীরিক শক্তিতে যদিও তিনি কালিদাস বাবুর সমকক্ষ ছিলেন না কিন্তু তাঁহার পেশীপুষ্ট দেহ একটা দেখিবার বস্তু ছিল। তিনি স্বভাবত সুরসিক ও অভিনয়-নিপুণ ছিলেন। হাসিতে গল্পে রসিকতায় তিনি আসর জমকাইয়া রাখিতেন। একবার ঠিক হইল বাংলার সঙ্গে ইংরাজি কথা আমরা ব্যবহার করিব না, করিলে জরিমানা আদায় করা হইবে। আর কোথা যায়, টেনিস খেলিতে খেলিতে হীরালাল বাবু হাঁকিতে লাগিলেন, 'প্রেম পোনেরো' 'চাকরি' ইত্যাদি; অদ্ভুত পরিভাষার সৃষ্টি করিয়া কয়েক দিন তিনি সকলকে-খুব হাসাইয়াছিলেন। সবচেয়ে কৌতুকের কথা, অবিমিশ্র বাংলা ব্যবহারে, যতদূর মনে পড়ে, কবিই সব চেয়ে বেশী জরিমানার দায়িক হইয়াছিলেন।

অভিনয়-নৈপুণ্যে অধ্যাপকদিগের মধ্যে জগদানন্দবাবুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা। তাঁহার 'লক্ষেশ্বর' 'দাদা' প্রভৃতির অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মনে হইত তাহা যেন অভিনয় নয়; যেন তাঁহার নিজের স্বভাবেরই একটা দিক লোকের সামনে মেলিয়া ধরিতেছেন।

তাঁহার ছাত্রদের নিকট শুনিয়াছি গণিতের শিক্ষক হিসাবে তাঁহার তুলনা মেলা কঠিন। তাহা অপেক্ষাও অধিক ছিল ছাত্রদের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা। রুক্ষ বহিরাবরণের মধ্যে এমন ভালবাসা অল্পই দেখা যায়। এক-সময় তাঁহার পুরাতন গানগুলি শিখাইবার জন্য কিছুদিন ধরিয়া কবি ও তাঁহার সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাবেলা আমাদের লইয়া বসিতেন দিনুবাবুরই বাংলোর বারান্দায়, প্রায় প্রতিদিন। একদিন আমি 'কবে তুমি আসবে ব'লে' এই গানটি শিখাইতে অনুরোধ করিলাম। এই গানটি অচলায়তনে পঞ্চকের উক্তির মধ্যে ছিল। কিন্তু পরে ইহা পরিত্যক্ত হয় এবং কবি গানটির কথা বিস্মৃত হন। আমার অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন, 'কই! এ গান কি আমার লেখা?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, অচলায়তনের গান—পরে বাদ দিয়েছিলেন।' মনে করিতে চেষ্টা করিয়া একটু নিশ্চয়ের সুরেই কবি বলিলেন, 'কই, আমার ত মনে পড়ে না।' বলিবামাত্র দু তিন জন একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন একটু ব্যঙ্গের সুরে। একজন ব্যঙ্গটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'কার গান এনে ওঁর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন? আপনার নিজের বুঝি?' আর একজন আর একটু দরদ দেখাইয়া বলিলেন, 'ও একটু ভুল হ'য়ে গেছে।' কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বক্তাদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম কবির 'লেখা' সম্বন্ধে আমার ভুল হয় নি, কারণ আমার মুখস্থ আছে। আপনাদেরও ভুল হয় নি, কারণ, জান্‌লে ত ভুলবেন।' রাগ হইবার কারণ আমার ছিল। অচলায়তন রচনার পর ও প্রকাশের পূর্ব্বে পঞ্চকের ভূমিকার সূত্রে অন্যান্য গানের সহিত এ গানটিও আমাকে শিখাইয়াছিলেন। সে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার রাগ হইয়াছে বুঝিয়া কবি আমাকে স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, 'গানটা তোমার মনে আছে?' বলিলাম, 'হাঁ'। 'গাওত?' বেপরোয়া হইয়া গাহিতে লাগিলাম। এবং যখন

'আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রাহারা শশী
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'—

এই পংক্তি কয়টি গাহিলাম তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রবীন্দ্রনাথ

ব্যতীত এ লাইনগুলি আর কাহারো হাত হইতে বাহির হইবার নয়। তাঁহার আদেশে গানটি আমি তাঁহার নিজস্ব গীতিমাল্য বইখানির পিছনে লিখিয়া দিলাম এবং পরদিন কথায় ও সুরে সামান্য রূপান্তরিত হইয়া গানটি আমাদের আসরে ফিরিয়া আসিল।

সীতা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি গানটির কথা জানিতেন। গোলমাল থামিলে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সে কথা বলেন এবং শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু সম্পাদিত সুপ্রভাত নামক কাগজে তাহা যে ছাপাও হইয়াছে রবীন্দ্রনাথকে তাহাও দেখান।

নিজের রচনা লইয়াই কবি নিশ্চিন্ত ছিলেন। যৌবনকাল হইতেই বাংলা ভাষা ও তাহার লেখক সম্প্রদায়কে গড়িয়া তুলিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। সাধনা সম্পাদনের যুগে কত লেখকের রচনা তিনি আগা-গোড়া সংশোধন করিয়া ছাপিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মধ্যে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির লেখা সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছে। যখন লেখা সংশোধন করিতেন তখন নির্ম্মম হইয়াই তাহা করিতেন। একবার ৺প্রমথনাথ রায়চৌধুরী একটা সনেট লিখিয়া কবির নিকট গেলেন। একটু সংশোধন করিয়া কবি কবিতাটি পড়িলেন। তাহার পর প্রথম লাইনটি কাটিয়া পাশে একটি লাইন লিখিয়া দিলেন, তাহার-পর দ্বিতীয়টি কাটিয়া পাশে আর একটি লাইন লিখিলেন, তাহার পর তৃতীয়, চতুর্থ করিতে করিতে চৌদ্দটি লাইনই বদল হইলে কবিতাটি প্রমথবাবুর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি এতক্ষণ বিস্মিত তাঁহার কবিতার এই রূপান্তর দেখিতেছিলেন। কবিতাটি হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি নিচে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাটিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়া দিলেন।

শান্তিনিকেতনে আমাদের লেখাও অনেক সময় ঐরূপ দীর্ঘ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়াই বাহির হইয়া আসিত। তবে সেগুলি কবিতা নয়, এই যা রক্ষা। প্রবাসীর 'পঞ্চশস্য' তখন শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিক ফসলে পূর্ণ থাকিত এবং তাহার কত অংশ যে রবীন্দ্রনাথের নিজের তাহা এখন নির্ণয় করা শক্ত।

ইহার মধ্যে অজিতদা'র (চক্রবর্ত্তী) লেখাই ছিল শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের

প্রতি অপরাজেয় প্রীতি ও শ্রদ্ধায় তাঁহার ভাব চিন্তা ভাষা ও মুদ্রাগুলি তিনি নিজস্ব করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই লইয়া সাধারণের স্নেহপূর্ণ উপহাস তিনি আনন্দেই গ্রহণ করিতেন, এমন কি গর্ব্ব বোধ করিতেন। অজিতদার মনটি ছিল বালকের মত সহজ সুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রেমে পর-অসহিষ্ণু। অজিত দাকে উত্যক্ত করিতে হইলে আর কিছু আবশ্যক হইত না—কবির গান বা কবিতা সামান্য একটু বিকৃত করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেই হইত—আর রক্ষা থাকিত না। অল্প বয়সেই তিনি বহু জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে আশ্রমের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আরো একজনের কথা মনে হইতেছে; সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া যিনি নিজেকে আশ্রমের সেবায় দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সতীশচন্দ্র রায়ের কবিত্ব-শক্তি ও সাহিত্যবোধ ছিল 'অনন্যসাধারণ।' কবি কীটসের মত তিনি স্বাভাবিক শক্তি লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। কীটসের মতই অল্প বয়সেই তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করেন। কিন্তু অল্প যে কয়েকটি লেখায় তিনি তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনাগত ভবিষ্যতের চিত্র তাহার মধ্যে কালজয়ী হইয়া ফুটিয়াছে।

'পঞ্চশস্যে'র লেখকদিগের অন্যতম ছিলেন ৺কালীমোহন ঘোষ। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চ হইতে শান্ত আশ্রম জীবনের মধ্যে তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহারই সেবায় তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত ছিল। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি ও মধুরালাপ তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল।

যখন প্রথম যাই, শান্তিনিকেতনের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ তখন ৺শরৎকুমার রায়। প্রথম দিন সকালে গিয়া দেখিলাম সুবৃহৎ চায়ের কেটলী লইয়া ছোটখাট বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোকটি চা-রসপিপাসু অধ্যাপকগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে প্রথম দিনই আমি তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। আশ্রমবাসীর আহারের পরিকল্পনা ও পরিবেশনে অক্লান্ত-ভাবে তিনি পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার সতেজ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইতে থাকিত এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টির অভিভাবকতায় আমাদের আহার ও আহার্য্যের ত্রুটি ঘটিতে পারিত না। কণ্ঠস্বর যেমন তাহার সতেজ

ছিল তেমনি ভাষাও তাঁহার ছিল জড়তাবিহীন সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। তিনিও স্বদেশী যুগে একজন সুবক্তা ছিলেন এবং ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব তাঁহার জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। উত্তরকালে বহু পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনের বর্ষার দিনগুলির বিপুল সমারোহ অনন্য। নিবিড় মেঘের পুঞ্জীভূত সমারোহ, দেখিতে দেখিতে, অবাধ প্রান্তর ও অনন্তপ্রসারী আকাশে বিচিত্র রূপ ও রঙের নেশায় মাতাল হইয়া ওঠে। পুঁথিপত্র বন্ধ করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকদল রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান গাহিতে গাহিতে দলে দলে সেই খরবর্ষণ বৃষ্টি ধারার মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাই। চঞ্চল অজগর শিশুর মত খোয়াইয়ের সহস্র সুপ্তধারা কলহাস্যে জাগিয়া ওঠে। পা ডুবাইয়া ডুবাইয়া আমরাও তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই মিতালিতে প্রাণ এক সরস সুন্দর কল্পলোকের মায়ায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি। বাণী ও ছন্দে সমুজ্জ্বল লক্ষধারা মুখরিত নিকুঞ্জদেশ প্রান্তরের উপর বর্ষাপ্রকৃতির এই উৎসবের সম্ভার যে সম্ভোগ না করিয়াছে কবির বর্ষার কবিতা ও গানের প্রকৃতি তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য।

কবি তাঁহার গান রচনা করিবামাত্র দিনুবাবুর ডাক পড়িত। তারপর সন্ধ্যায় সেই সকল গান সকলে মিলিয়া শিখিতাম। গানের আসর জমিয়া উঠিত। কবি আমাদের সঙ্গে সমানে গাহিয়া চলিতেন। এক একদিন গানে গানে নেশা জমিয়া উঠিত, গান আর থামিতে চাহিত না। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকিত। কবি, দিনুবাবু ও অজিতবাবু কবির পুরাতন গান একটির পর একটি করিয়া গাহিয়া চলিতেন। বর্ষার ধারাবর্ষণের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুরে সুরে আমাদের মগজ ফুকরে ফুকরে যেন মৌচাকের মত ভরিয়া উঠিত। নিজেদের অনবধানেই আমরা গুণগুণ করিয়া তাঁহাদের গানে যোগ দিতাম।

একবার পূজার ছুটির সময় দিনুবাবু ও অজিতদা কেহই আশ্রমে ছিলেন না। সতীশকুটীর কি সত্যকুটীর ঠিক মনে নাই—তখন নূতন তৈরী হইয়াছে। একটা অর্দ্ধজীর্ণ বৃহৎ টেবল হারমোনিয়াম সেখানে কেন জানি না পড়িয়া ছিল। শুভপ্রাতঃকাল, আশ্রম জনবিরল জানিয়া নিশ্চিন্তমনে সেইটারই উপর আমার

অপটুহস্তে কদর্য্য অত্যাচার চালাইতেছিলাম। হঠাৎ দেখি কবি প্রবেশ করিলেন, হাতে একখানি ছোট খাতা। আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সেই চেয়ারে আসিয়া বসিলেন এবং সেই হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন—

'প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি তাই ভোরে উঠেছি' বারংবার গাহিয়া গানটি আমার শেখা হইলে আমাকে বার বার করিয়া গাওয়াইলেন।

তারপরেও ছুটী পাইলাম না।

'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা'—গানটি ধরিলেন। এই দুইটি গানই সেদিনকার নূতন রচনা। এ গানটিও নয় দশবার আমার সহিত গাহিয়া এবং বারংবার গাওয়াইয়া তবে নিষ্কৃতি দিলেন। ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও আমার সঙ্গে ছিলেন।

এমনি করিয়া কখনো কবির নির্লিপ্ত সুদূরতা এবং কখনো তাঁহার সহজ সান্নিধ্যের মধ্যে ক্ষণেক্ষণে আমাদের চিত্ত দোল খাইয়াছে।

একবার পূজার সময় থাকিয়া সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল। আজো সেই সুস্থ সবল সদাহাস্যোজ্জ্বল সেবাপরায়ণ ব্যক্তিটির আতিথ্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ বহুলোকের স্মৃতিপটে তিনি সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁহার হৃদ্যতা হইয়াছিল অন্য ব্যাপারে। শান্তিনিকেতনে তিনিই ছিলেন খেলার পাণ্ডা। এই সূত্রে আমাকে তাঁহার সহকারীরূপে পাইয়া তিনি খুসী হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের ফুটবল টিম ছিল বীরভূমে অজেয়। দৌড়-ঝাঁপের সবগুলি ট্রফিই প্রায় শান্তিনিকেতনের ছেলেরা জয় করিয়া আনিত।

তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি ছিল শান্তিনিকেতনের গোশালা। ইহাতে গোরু মহিষ লইয়া অনেকগুলি পরিজন ছিল। এবং ইহাদিগের প্রতি যত্ন তাহার আপন পরিজন অপেক্ষা অল্প ছিল না।

মনে পড়ে একবার ৭ই পৌষের উৎসবে ঐতিহাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন। সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সন্তোষবাবুর সতেরোটি দুগ্ধবতী মুলতানী মহিষী আছে।' ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি হইয়াছিল।

কবি এক সময় প্রতি সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে লইয়া বসিয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়া ও ইংরাজি কবিতার তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতেন। কবির নিজের 'বর্ষশেষ' এবং শেলির West Wind কবিতার আবৃত্তি এখনো কাণে বাজিতেছে।

কিন্তু গানই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের সহজ প্রকাশ। গান আরম্ভ হইলে আর সমস্ত কিছুই তাহার অন্তরালে চাপা পড়িয়া যাইত।

গানে গানে আমাদের সন্ধ্যাগুলি নেশায় ভরপুর হইয়া উঠিত। গানের আসর ভাঙিয়া গেলেও মনের মধ্যে তাহার রেশ যেন থামিতে চাহিত না। তখন গীত পঞ্চাশিকার রচনা কালে এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। কবির কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহা অমর হইয়া রহিয়াছে। দিনেন্দ্রনাথ একটি হরিণ পুষিয়াছিলেন। তাহার খেলার সঙ্গী ছিল দার্জিলিং হইতে আনীত ঘন রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুর ছানা। হরিণটি হঠাৎ একদিন উধাও হইয়া গেল। কুকুর ছানাটির ব্যাকুল ক্রন্দন সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। কবির চিত্তে যে-বেদনা বাজিয়াছিল তাহা

সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধলে অকারণে।

গানটির সুরে ও কথায় চিরদিনের মত গাঁথা রহিয়া গেল। তখনো আমরা জানিতাম না, পরে টের পাইলাম যে সাঁওতালেরা তাহাকে বন্য হরিণ ভাবিয়া শিকার করিয়াছে। ইহারই উদ্দেশ্যে 'পলাতকা' কবিতাটি লিখিত হয়।

গল্প বলিতে বলিতে পুঁথি বাড়িয়াই চলিতে থাকে। কতদিনের কত ঘটনার সমাবেশে, কত মহান ও মধুর চরিত্রের উৎসর্গে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আজ নাই। এই ব্রহ্ম-বিদ্যালয় মন্দিরের দেহলীতে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রাণের অর্ঘ্য দিয়া শান্তিনিকেতনকে আজ তাঁহারা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সকলের মধ্যেই কবির জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাদের সকলকে লইয়াই রবীন্দ্রনাথ আজ সম্পূর্ণ। যাঁহারা গিয়াছেন ও যাঁহারা রহিয়াছেন শান্তিনিকেতনের মাতৃক্রোড়ে তাঁহারা আজ সহজেই পরস্পরের পরমাত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যে গান তখন আমরা আত্মহারা হইয়া গাহিতাম

আজও সেই গান শান্তিনিকেতন-বাসীর দেহে মনে তেমনি পরিপূর্ণ আনন্দকে সঞ্চারিত করে—

আমাদের শান্তি নিকেতন
সে যে সব হতে আপন।

* * *

আমরা যেথায় মরি ঘুরে—সে যে যায়না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন।

জীবনময় রায়

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি

রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনার প্রারম্ভেই আমার দুটি গল্প মনে পড়ে। সেবার দার্জিলিঙে চিত্তরঞ্জন ছিলেন। সন্ধ্যা-বেলায় তিনি ক্যালকাটা রোডে বেড়াতেন, সঙ্গে অনেকে থাকতেন, নানা রকমের গল্প, সল্লা-পরামর্শ চলত। একদিন আমিও ছিলাম। সেদিন কথা উঠল রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা নিয়ে। সকলেই প্রশংসা করলেন, চিত্তরঞ্জনেরও ভাল লেগেছিল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর চিত্তরঞ্জন বল্লেন, 'কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি।' রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম ম্যানেজার-বাবু এসে বল্লেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবের থাকবার কষ্ট হচ্ছে অন্যত্র, আমার ঘরে যদি স্থান হয় তবে খুব সুবিধা হয়। ভূপেনবাবু বহুবৎসর বিদেশবাসের পর সদ্য দেশে ফিরেছেন, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, যুগান্তরের ভূপেন দত্ত, বিবেকানন্দের ভাই, সানন্দে সম্মতি দিলাম। ভূপেন-বাবুর সঙ্গে ভাব শীঘ্রই জমে গেল, রোজই একত্রে ঘুরতাম, খাবার পর গল্প চলত, আমি রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেতাম, তিনি ঘোড়-তোলা জুতো পরে হাঁড়ির মতন পাইপ মুখে পুরে, জার্ম্মাণ-মিশ্রিত বাঙলাভাষায় বিশ্বের তত্ত্ব আলোচনা করতেন। মনে পড়ে, এক গভীর রাতে তাঁর বিছানা থেকে একটা শব্দ উত্থিত হল। নিজে বুঝলাম গান, এবং তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাঙলা গান, রবীন্দ্র-নাথেরই, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া···রী।' গান থামাবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'রবিবাবু আর এই ধরণের স্বদেশী গান টান লেখেন?' উত্তর দিলাম, 'ঝোঁক একটু বদলেছে সন্দেহ হয়। কিন্তু ওটা কি স্বদেশী গান?' একটু মৃদু হেসে বল্লেন, 'আগে আমিও ভাবতাম, না—কিন্তু, একদিন রাত্রে বের্লিনে—হঠাৎ গানটার noumenonটি প্রকট হল।' খুব উদগ্রীব হয়ে গানটিকে phenomenon-এ পরিণত করতে ধরে বসলাম। লম্বা ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সব কথা মনে নেই, তবে তাৎপর্য্যটা এই: 'তরুণী ধরুন প্রথমে, তরুণী হল ship of state—'অমল ধবল পাল' হল গিয়ে আমাদের political

conciousness, feudal যুগেরই পাল-তোলা জাহাজ; তবেই, 'মন্দ মধুর হাওয়া', কিনা moderate, liberal movement এই দাঁড়াল; 'দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু'···খুব খাঁটি কথা—কে বুঝবে বলুন যে কাল মার্ক্স না পড়েছে!' আমি বল্লাম, 'কবিতার জন্য কার্ল মার্ক্সের প্রয়োজন আছে কি?' 'কে বল্লে নেই। পলিটিক্যাল কবিতার জন্য কার্ল মার্ক্স না হলে চলেই না। আপনারা একটা মস্ত ভুল করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফৎ আমাদেরই কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন। একটু যদি কার্ল মার্ক্স পড়তেন মনোযোগ দিয়ে তবে রক্ষা ছিল না।' 'তা ত' হল, কিন্তু 'হাওয়া···রী' বল্লেন কেন?' 'রী-টা হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের টান, নববিধানের রে।' সে রাত্রে ভেবেছিলাম কার কথা সত্য—চিত্তরঞ্জনের, না ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। এই সেদিন 'আরোগ্য' নামে কবিতার বইটা এল, চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছিলেন, নচেৎ রোগশয্যাতেও এত ভাল কবিতা বেরোয়! আবার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে জন্মতিথি উৎসবে তিনি যে বাণী দিয়েছেন তাও পড়লাম···তবে কি ভূপেন বাবুই ঠিক বুঝেছেন! আজ এই সংশয়ের সমাধান করতে চেষ্টা করব। ভেবে দেখলে পলিটিক্স ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমাধানের ওপর ভারতের সংস্কৃতি নির্ভর করছে অনেকটা।

দ্বন্দ্ব কি ভাবে ওঠে বিশ্লেষণ করা যাক। কবির যদি জীবন-ছাড়া, সমাজ ছাড়া একটা পৃথক শক্তি হয়, যদি জীবতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যানুসারে সেটা জীবন-ধারণের পর যতটুকু বাকি থাকে, অর্থাৎ উদ্বৃত্তাংশের খেলা হয়, তবে এই শক্তির প্রকাশের জন্য জীবনিশক্তির মূলধনে টান পড়ে—এবং তখনই ভাগাভাগির কথা ওঠে। তার ওপর যদি জীবনটাকে স্রোতের জল না ভেবে কলসীর জল ভাবি তখন সঞ্চয়ই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, কৃপণের মতন তাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করি। আমি জানি এই ধরণের মতামত অনেকেই পোষণ করেন। কারণ সোজা; পাটিগণিতটাই সোজা মানুষের পক্ষে, তার ওপর আমরা দায়ভাগের বাঙালী। আবার যদি রাজনীতি অর্থে দলাদলি, পার্টি চালান হয়, যদি বিরুদ্ধাচরণটাই রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রথম ও শেষ কথা হয় তবে কাজটা যে-কোনো কবির পক্ষে শক্ত। কিন্তু রাজনীতির এই অর্থটাও সোজা, কারণ আমরা বহুকাল ধরে পরাধীন, কারণ আমরা সমাজে শাসিতই

হয়ে এসেছি, কারণ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অন্তর্শক্তির স্ফুরণ নয়, শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধাচরণ, কারণ আমাদের মনে ইংরাজী বুকুনি, পলিটিক্যাল চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ছাপ পড়েছে, কারণ আমরা বাঙালীরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে কোঁদলই করি। ব্যাপারটা এই, আমাদের মানসিক ও কর্ম্মপদ্ধতির মূল যুক্তিটা হল—হয় এটা, না হয় একেবারেই এটা নয়, অর্থাৎ যান্ত্রিক, বনাম-মূলক। বিশেষত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের জন্মস্থানে এই বনাম-কীর্ত্তন একটু অদ্ভুত লাগে। প্রকৃত পক্ষে এটা অদ্ভুত নয়—কারণ মনে মনে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, আর আমরা, যাঁরা তিনি কবি না পলিটিশিয়ান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি, এখনও তাতে অভিভূত আছি। এইগুলো হল কালচার ও পলিটিকসের মধ্যেকার বিরোধের হেতু। অপরপক্ষে, কবিও মানুষ, মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীব, তার স্ফুরণের জন্য চলিষ্ণু সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক—অন্যদিকে, স্বাধীন মানুষই শক্তি থাকলে কবি হতে পারে, কবিতা উপভোগ করতে পারে—এই প্রকার অর্গ্যানিক ধারণা সত্যই কঠিন, এবং ইংরেজ-দ্রোহিতার চিহ্ন একপ্রকারের। কিন্তু ধারণাটি সত্য, সাধারণভাবে, অতএব রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিচারেও। আমার একান্ত বিশ্বাস যে রবীন্দ্র-কল্পিত ও আচরিত কবির ধর্ম্ম ঐ প্রকারের আদিম প্রতিজ্ঞারই ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের মোদ্দা কথা হল এই যে পরাধীন দেশে ও আবদ্ধ সমাজে জনগণের অন্তর্নিহিত সৃষ্টির চরম বিকাশ, অর্থাৎ কাব্য-রচনা, এমন কি কাব্যোপভোগও একপ্রকার অসম্ভব। আপনারা যদি বলেন যে তিনি এমন কথা কোথাও খোলাখুলি লেখেন নি, তবে আমি উত্তর দেব যে তিনি রাজনীতির পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি ঠিক এই কথাই তাঁর প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাপারটা বিশদ করে বলছি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি বিদেশী ধরতাই বুলিগুলো মন থেকে প্রথমেই তাড়িয়ে দিন। যত ভুলের মূল ঐখানে, 'বনাম'-যুক্তিরও একটা গলদ ঐ। ইংলণ্ডে ব্যক্তিত্ববাদ জন্মায় একটি আবহাওয়ায়—নিউটনী মেকানিক্‌সের, এবং দুটি প্রয়োজনের সংযোগে। বেনথাম, যিনি ব্যক্তিত্ববাদের জন্মদাতা—তাঁর

লেখা পড়ে দেখলেই মনে হয় যেন তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিউটনের তিনটি নিয়মের প্রয়োগ করতেই ব্যগ্র। এধারে, ইংরেজ রাজা পার্লামেণ্টের হাতে ক্ষমতা না যায় দেখতে গিয়ে নিজের একটা দল খাড়া করলেন—নাম তার কিংস্ পার্টি। পার্লামেণ্ট সেই দল ভাঙতে চেষ্টা করল, অবশ্য রক্তকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ক'রে। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, অথচ আইন কাননের বাধায় মুনাফায় টান পড়ছে। এরা ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টের সভ্য হয়ে চেয়ে বসল বাধাগুলো তুলে দেওয়া হোক। অতএব দ্বন্দ্ব বাধল স্পষ্ট দুটি দলে, একধারে রাজার দল ও যারা ডিউটি বসিয়ে তহবিল ভরতে ও জমিদারী স্বার্থ বজায় রাখতে চায়, এবং অন্যধারে পার্লামেণ্টের নতুন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সভ্য যারা বলে অবাধ বানিজ্যে ইংরেজ আরো ধনী হবে। এই হল ইংরেজ পলিটিক্সের 'বনামে'র প্রথম দফা। শুধু এইখানে ক্ষান্ত হল না ব্যাপারটা। বণিকেরা সেই সঙ্গে উপনিবেশের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের বাজার অধিকার করে যাচ্ছিল। সেই বাজারকে বশে আনবার স্বাধীনতাকে তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলা হল না—তখন বড় বেশী কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু, ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান বাজারে নেমে পড়ল, তখন তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইংরেজের অনুকরণে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার স্বার্থের বিপক্ষে। মুনাফাবৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতাই হল উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। এরই নাম ইংরেজী লিবারেলিজিম।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ও তাঁর যুবাবয়সে যে আন্দোলন চলছিল সেটা হল নকল লিবারেলিজম। বই পড়ে যে মতবাদ জন্মায় কিংবা যে আন্দোলন চালান সম্ভব তার দাম কম। অনেকে বলেন যে আমরা যে সময় অনেক কিছু পড়ে ফেলি—বার্ক, মিল, বেনথাম, কোঁৎ, যাদের চিন্তাধারার প্রসার কেরাণী তৈরী করবার জন্য নিয়মমাত্র শিকার বহির্ভূত ছিল। এক কথায় এঁদের মতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছিল। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। জমি তৈরী থাকলেই গাছপালা সতেজ হয়, নচেৎ কাচের ঘরের ফুলের চারা দেখতে মজার, কিন্তু উপকারে লাগে না। বাস্তবিকই আমাদের ঐ সময়কার আন্দোলন একটু অবাস্তবই ছিল। কি করে বাস্তব হবে! ভারতবর্ষে কিংস্ পার্টি কোথায়! অবশ্য, এক হিসেবে লাট সাহেব থেকে

কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সকলেই ঐ দলের সভ্য। কিন্তু পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষে বিলেতী ধরণের state-ও নেই, গবর্ণমেণ্টও নেই, আছে administration—যেটা একদল প্রবল পরাক্রম আমলা দলের হাতে—তাঁরা যা হুকুম দেবেন তাই হল গবর্ণমেণ্ট। রাজা বলতে তখন লোকে কি বুঝত আপনারা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। আমার একটু একটু মনে আছে। রাণী ভিক্টোরীয়ার ছেলের পায়ের তলায় একজন বিশিষ্ট সদ্ ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়েন, আরেকজন মস্ত নেতা এক রাজপুত্রের কাছে ভারতবর্ষের প্রতি করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হাঁটু গেড়ে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানান। অতএব Crown-এর বিপক্ষে কোনো আপত্তিই ওঠে নি ভারতবর্ষে, কোনো কারণেই। বরঞ্চ আমরা বলতাম যে, মহারাণীর প্রোক্লেমেশন মানা হচ্ছে না বলেই যা কিছু গোলমাল। সেইজন্য আন্দোলনটা চলল, বুরোক্রাসীরই বিপক্ষে। আমরা চাইলাম তাঁদেরই দলভুক্ত হতে, যেমন প্রিবীয়ানরা প্যাট্রিশিয়ান হতে গিয়েছিল। অন্যধারে ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীর তখনও অভ্যুদয় হয় নি, যে অবাধ বাণিজ্য চেয়ে বসবে, কিংবা জাপান, জার্মানী, আমেরিকার মতনও স্বদেশী ব্যবসা বাঁচাবার অজুহাতে প্রোটেক্শন নিয়ে সোরগোলটা জমাবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য দেশে, যেখানে ব্যাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল, প্রোটেক্শনের মারফৎ লিবারেলিজম আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইংরেজী লিবারেলিজম আর কনটিনেন্টাল লিবারেলিজম এতই পৃথক। কনটিনেণ্টে উদার মতের পরিণতি রাষ্ট্রে আত্মবিসর্জ্জন, কারণ, রাষ্ট্র ভিন্ন কে দেশী ব্যবসা বাঁচাবে? ভারতবর্ষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, কারণ ইংরেজ ব্যবসা আর দেশী ব্যবসা অহি-নকুল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের লিবারেলিজম যে ঝুটো হবে সে আর বিচিত্র কি! অতএব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের এ-দেশে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই, অর্থ নেই। থাকত, যদি সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি আমরা বুঝতাম। ঐ যুগে বুঝতে পারার সুবিধাও ছিল না অবশ্য। কিন্তু যে সব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব্ব অনুভব করি তাঁরা কি সত্যই এমন বড় ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়! সে যাই হোক—পূর্ব্বোক্ত কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি মারাত্মক দুর্ব্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন-

নিবেদনের পালা, এবং সর্ব্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন।

রাজনীতির ত ঐ দশা। সমাজ-সংস্কারও যে পাকা ভিতের ওপর ছিল তাও বলতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায়, অন্ন-সমস্যার নিরাকরণে এমন কোনো বিপ্লব বাধে নি যার জোরে সমাজের বনেদ ভেঙে যায়। নতুন জমিদার তৈরী হয়েছে, তাঁরা নিয়মমত রাজস্ব দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা যা হয় করে দিন গুজরান করছে—নতুন ফ্যাকটরী এত বেশী সংখ্যায় খোলা হয় নি যে তাদের আকর্ষণে গ্রামের লোক হুড়মুড় করে সহরে হয়। অর্থাৎ যা ছিল তাই চলছিল। কিন্তু সামান্য একটু গোল বাধল ঐ নতুন সহরে ভদ্রলোকদের জন্য। তাঁরা সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন, আইডীয়ার তাড়নায়। ইতিমধ্যে ভিক্ষার ঝুলি খালিই রইল, জনকয়েক ঝুলি ঝেড়ে দেখলেন এক কুটো চালও পড়ে নি। বিরক্তিটা স্বাভাবিক—তাই বিরক্তির মুখ ঘুরল প্রাচীন ভারতের দিকে—যখন ইংরেজ আসে নি। সেটা হল স্বর্ণযুগ; আমরা হলাম আর্য; আমাদের দর্শন পরিশীলন শ্রেষ্ঠ···ইত্যাদি। শিক্ষিত সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হলেন—তাঁদের চেঁচামেচির নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলা বাহুল্য এটাও অবাস্তব, রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশী—কারণ, জন সাধারণকে বাদ দিয়ে, তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজ সংস্কার করতে যাওয়ার অর্থ ই হল জীবনকে প্রত্যাখ্যান।

এখন রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে লিখতে সুরু করেই দুটি কথা বল্লেন—ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়, এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য যে-সে সমাজ নয় নয়, স্বদেশী সমাজ, পল্লী সমাজ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয়, সকল সৃষ্টির বীজক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির উপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জ্বলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকার বাহাদুরেরও সর্ব্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবরা extremist বলতেন। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম', ছোট ও বড়, নাইটহুড পরিত্যাগের চিঠি, এমন কি সেদিনকার শান্তিনিকেতনের বক্তৃতা পড়ে সাহেবদের মনে তাঁর প্রতি অনুরাগ না আসাটিই স্বাভাবিক। এ-পোড়া দেশে

ভিখিরীদেরই খাতির হয়। কিন্তু এইখানে দুটি জিনিষ স্মরণ রাখা উচিত। ১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে যে extremism সুরু হয় তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনটাই তাঁর সমাজ-ধর্ম্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্য্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্ম্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্ম্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারীতে সমবায়-সমিতি, পাঠশালা হাঁসপাতাল খোলা, পুকুর কাটান, গাছ বসান, পল্লী-সংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা বানিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভ. ত্যাগ করে কর্ম্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশকে জানতেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ ছিল না, যেমন শরৎচন্দ্রেরও ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও হতাশও হন নি। তা ছাড়া, কি জানি কেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে বরাবরই বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন যে এই ভূখণ্ডে নানা জাত এসে বসবাস করেছে, মিলেজুলে একটা সভ্যতাও খাড়া করেছে, তার ভাল খানিকটা মন্দ খানিকটা, ফলে সেই সঙ্গে সে সভ্যতার একটা বিশেষ রূপও ফুটেছে, যে-রূপ গ্রামের সমবেত জীবনে, জীবনের ত্যাগে ও অধ্যাত্মবোধের প্রাধান্যে ধরা পড়ে। আজ সে-রূপ নেই অবশ্য, কিন্তু নতুন জীবন এলে সে-রূপে জলুস খুলবে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রক্রিয়ার মানসিক সাধনারও ইঙ্গিত দিয়েছেন—বিজ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি। চরখা চালান ছাড়া প্রক্রিয়ার অধুনা প্রচারের অন্য সব অঙ্গেরই নির্দ্দেশ আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও কর্ম্মে। তাই আবার বলি, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক··· অধিকারসর্ব্বস্ব নয়, ত্যাগধর্ম্মী। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে

স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরণের—অতএব, তিনি ঢের বেশী রিয়ালিষ্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিষ্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রাধান্য থাকলে কি হয়! ভাগ্যচক্রের ঘোরে সে এসে পড়ল এমন একটা প্রাঙ্গণে যেখানে ন্যাশনালিজমের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের Nationalism নামে বইখানি আবার পড়তে অনুরোধ করছি। ফ্যাসিজমের জন্ম তারিখের বহু পূর্ব্বে লেখা। আজকাল যাকে totalitarianism বলা হয়, তারই পূর্ব্বাভাষ, statism-এরই বিপক্ষে প্রতিবাদ ঐ বইখানিতে পাবেন। অবশ্য ইকনমিক ব্যাখ্যা নেই তাতে, কিন্তু তাতে প্রতিবাদের তীব্রতা কমেনি তিলমাত্র। বইখানি বেশী জনপ্রিয় হয় নি, দেশোয়ালীরা ভাবলে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, এবং বিদেশীরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে বাইরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, স্বপ্ন-বিলাস। এখন তাঁরা বুঝছেন স্বপ্নবিলাস কি আর কিছু। সে যাই হোক—রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এ-দেশে রাষ্ট্র-সর্ব্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এই সেদিনও যে সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখালেন তারও সংযোগ ঐ statism-এর সম্বন্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় রয়েছে ঐ রাষ্ট্রবাদ—সেটি কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটে সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মতে একই বস্তু, অর্থাৎ লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ। আত্মসম্মানবোধে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই লোভের প্রকৃতি কি? উত্তরের ভাষা রুচিসাপেক্ষ। মানুষের দিক থেকে প্রকৃতিটা মানসিক, মানুষ বাদ দিলে প্রকৃতিটা ইকনমিক। মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে যার কারবার, সে বলবে লোভের জন্যই যত অত্যাচার। যে আবার ইতিহাসের রীতিনীতি খুঁজতে ও কাজে লাগাতে ব্যগ্র তার মতে অত্যাচার ধনোৎপাদন ও তার নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত, অতএব মানুষের দোষ কই যখন মানুষের প্রবৃত্তি ঐ সব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানেরই প্রতিবিম্ব। প্রথম দল অত্যাচারের নিঃশেষ করবার জন্য আত্মশক্তি, চিত্তশুদ্ধির ওপর জোর দেন, দ্বিতীয় দল বলেন নির্য্যাতিত শ্রেণীকে বিপ্লবী করে তোলো।

এটা কর্ত্তব্যের ভাগ, উদ্দেশ্য এক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনুষ্যধর্ম্মেরই নামে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনিপাত বলে অভিসম্পাত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি স্বধর্ম্মই পালন করেছেন। অতএব চিত্তরঞ্জনের মতে অনেকটা সত্য পাচ্ছি। অন্য দিকে, জীবনের সমগ্রতা সাধনই কবির ধর্ম্মতত্ত্ব। পরাধীন, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজ-বহির্ভূত না হয়, যদি তাদের প্রাণবান করা না পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আনা পলিটিক্সের প্রাণবস্তু হয়, তবে নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথ পলিটিশিয়ান—যেমন ভূপেন দত্ত দার্জ্জিলিঙে আমাকে বলেছিলেন।

আমি একটি প্রশ্ন তুলে আমার বক্তৃতা শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ যে কবি সকলেই স্বীকার করছেন, পলিটিক্স ও সমাজ-নীতিতে তাঁর দান মূল্যবান অনেকেই এই কাণাঘুষো শুনেছেন—তাঁর দু চারটে স্বদেশী গানও আপনাদের জানা আছে। কিন্তু যে-ব্যক্তি বজ্রকণ্ঠে বলতে পারেন 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা' তাঁকে অভিধানে কি বলে? আমার অভিধানে বলে মহামানব। নতুন জগতে যদি তিনি সাধারণ মানুষ বলেই অভিহিত হন, তবে তিনি Saint Simon-এর মতনই বলবেন 'খুশী হলুম, খুশী হলুম, এরই জন্যে বসেছিলাম।'*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতার অনুলিখন। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

মনের মানসপটে প্রতিনিয়তই অসংখ্য ভাবতরঙ্গ ও রূপকল্পনা উত্থিত হচ্ছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বহু বিচিত্র সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব অবাস্তব, লৌকিক অলৌকিকের মধ্যে দিয়েই চলেছে তার অবিশ্রাম গতিবিধি। কোথাও সে খণ্ডিত, পারম্পর্য্যবর্জ্জিত, সঙ্কল ; আবার কোথাও বা সাবলীল, সুসংলগ্ন ও ঘনীভূত। পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ ও অদৃশ্য অন্তর্জগতের গ্রহণ-বর্জ্জনের মধ্যে দিয়েই এই পরম্পরাগত প্রক্রিয়া নিরন্তর অন্তরেন্দ্রিয়ে সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই ক্রমায়িত সংঘটনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সকল মনোজ্ঞ ভাবতরঙ্গ সুসংবদ্ধ ও অনিবার্য্যভাবে রূপিত হচ্ছে অরূপের রূপচিন্তনে, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মুখর হচ্ছে সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে। বহির্জগতে এই সুসংহত আনন্দের রূপস্ফুরণই প্রকটিত হচ্ছে কবির কাব্যে, শিল্পীর চিত্রে, সঙ্গীতরঙ্গের সুর-মূর্চ্ছনায়। ঐশীশক্তির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ একত্রে এই ত্রিগুণেরই গুণাধিকারী।

কবি মুখ্যত শব্দগুচ্ছকে ছন্দবদ্ধ ও রসায়িত ক'রে পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রামে যেমন এক অপূর্ব্ব রসসঞ্চার করেন, তেমনি গৌণত তার চিত্তপটে কতকগুলি খণ্ডচিত্রও চিত্রিত ক'রে তোলেন কম না। এ ক্ষেত্রে কবির মধ্যে চিত্রকরের সূক্ষ্মানুভূতিও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু তত্রাপি কাব্যাপেক্ষা চিত্রশিল্প প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও গণ্ডিবদ্ধ হওয়ায় বহুক্ষেত্রেই কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলা অপেক্ষা চিত্রশিল্পের বিভাব্য বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই অনৈকান্তিকতা দেখা যায়। কারণ তাঁরা বলেন, চিত্রকলা কাব্য ও সঙ্গীতের ন্যায় অসীম, লোকোত্তর, গভীর বা সুদূরপ্রসারী নয়—ইহা আংশিক জ্ঞানময় ও আংশিক চিন্ময় ; অতএব কাব্যের ন্যায় চিত্রশিল্পের রসোপভোগের জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন কোথা। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও হয়ত আংশিক সত্য হ'তে পারে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টি একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই যে বিচার্য্যের তুরীয় অবস্থায় উপনীত হবার সম্ভাবনা আছে, তা বোধ হয় না। চিন্ময় ও সসীমের উপলব্ধি ও অনুভূতিসাপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমন বিশ্বতোমুখী, তাঁর শিল্পীমনের পরিধি যেমন বিশাল ও ব্যাপক, তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ যেমন সূক্ষ্ম, লোকোত্তর ও সার্ব্বকালিক, আমার মনে হয় তাঁর চিত্রকলাও সেইরূপ রসানুভূতিসাপেক্ষ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-দ্যোতক ও অত্যাধুনিক। যদিও এ সম্বন্ধে অনেকের মতানৈক্য দেখা যায়, এবং অনেকে অনেকপ্রকার রুচিবিগর্হিত সমালোচনা পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু সেগুলি দূরদৃষ্টির অভাবজনিত অরসিক মনেরই পরিচায়ক মাত্র। যাই হোক এস্থলে আমি তর্কবিতর্কের জটিল পন্থা ত্যাগ ক'রে, যে সত্য সুন্দরের প্রেরণা ও স্বতঃবৃত্তি তাঁর চিত্রশিল্পের মধ্যে উপস্থিত, সেই সম্বন্ধে এবং পরে বাহ্যদৃষ্ট গুণাবলী, পদ্ধতিতত্ত্ব ও তৌলনিক বিচার্য্যে জগতের আধুনিক চিত্রাকলার সহিত তাঁর চিত্রকলার সম্বন্ধবাদ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে সত্যপ্রেরণা ও আনন্দ উদ্ভাবক শক্তি বিদ্যমান। সত্যপ্রেরণা বিদ্যমান এই কারণে যে, তাঁর কাব্যেরই মত এই চিত্তাকর্ষক চিত্রগুলিও অপরিহার্য্য ও স্বতঃ উৎসারিত ভাবেই মনের চিত্রপটে চিত্রার্পিত হয়েছে বিভিন্ন চিন্তাবেশ অবলম্বন ক'রে। এর মধ্যে কোন কষ্টার্জ্জিত শিক্ষানবিসির প্রতিফলন নেই, এরা কোন চিরাচরিত পদ্ধতি আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে নি—মুক্ত স্বাধীন উদ্দামভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মতই সত্য-সুন্দরের প্রেরণায় যেন রূপ নিয়েছে ভাষাহীন কাব্যে। তাই প্রথম দিকে এই সকল চিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে যখন তাঁর কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল, তখন বোধ হয় (সঠিক তাঁর ভাষা স্মরণ নেই) এই বলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে : প্রকৃতির বুকে বহু বিচিত্র গাছপালা, ফল ফুল, নদ নদী যেমন বিভিন্নভাবে আপন ভঙ্গিমায় আপনি রূপায়িত হয়ে উঠেছে, এই রূপের স্বরূপ বর্ণনের জন্য রূপীয়সী পৃথিবীর কাছে যেমন তার কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া যায় না,—কেন এটা এমন হ'ল, কেন ওটা এমন হ'ল না এর যেমন কোন উত্তর নেই ; এরাও (অর্থাৎ আমার চিত্রফলাও) তেমনি আপন খুশির খেয়ালে আপনি প্রকাশিত হয়েছে—এদের কাছে সত্যিকারের কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া একান্তই নিরর্থক। কিন্তু তবুও প্রেরণার উৎসমূল উদ্ঘাটন ও বিভিন্নভাবে চিত্রগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে কবি-শিল্পী যে সেগুলিকে যথাযথ সংজ্ঞিত করতে পারেন নি, তা

তাঁর অধুনা প্রকাশিত 'চিত্রলিপি'র ১৬নং চিত্র সম্পর্কে লিখিত একটি কবিতা থেকে সুন্দর উপমা পাওয়া যায়।

উক্ত চিত্রটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টিতে দর্শক সহজে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ এর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ এতই অস্পষ্ট যে, আপাতদৃষ্টিতে চিত্রখানিকে খানিকটা রঙ্-এর ব্যর্থ অপচয় বা বিভিন্ন এলোমেলো ভাব-দ্বন্দ্বের চিত্ররূপী একটা বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। কিন্তু পরে একটু মনোনিবেশ সহকারে অবলোকন করলে, ক্রমশ চিত্রিত পটের মধ্যে গভীর বনানীর ছায়া চোখে পড়ে, উর্দ্ধে প্রশস্ত আকাশও দেখা যায়, কিন্তু নিম্নের খানিকটা অংশ জলাশয় কি উন্মুক্ত সমতলভুমি তার সংশয় কিছুতেই দূর হতে চায় না। এ ছাড়া চিত্রের মধ্যস্থলে চিত্রিত অংশের তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও অনুসন্ধিৎসু দর্শককে বিশেষ সংশয়াগ্রস্ত হতে হয়। কারণ ঠিক ঐ বস্তুটি যে কি, কর্ত্তিত কোন মহীরুহের অংশ, মৃত্তিকাস্তূপ বা সেতু-কল্পনা তা নির্দ্ধারণ করা সত্যিই দুরূহ হয়ে ওঠে। শিল্পী এই চিত্রটির রূপ-পরিচিতি দিতে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নামোল্লেখ না ক'রে লিখেছেন :

'টুক্‌রো যত রূপের রেখা
সঞ্চিত রয় মনের চিত্রশালে।
কখন ছবির আকার নিয়ে
জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে॥'

কবিতাটির এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি থেকেই এ সিদ্ধান্তে নিশ্চিত উপনীত হওয়া যায় যে, তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যবাদ নেই ; পরন্ত সেগুলি নিছক সত্য-সুন্দরের অবশ্যম্ভাবী প্রেরণাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র।

এইভাবে তাঁর অঙ্কনপদ্ধতির মধ্যে যথাযথ ভাববস্তুর বাহ্যিক ও হার্দ্দিক তাৎপর্য্য বহুক্ষেত্রেই উপলব্ধি করতে না পেরে জনসাধারণ তাঁর চিত্রগুলিকে বিকৃত ও অবাস্তব কতকগুলি রূপরেখার বৈচিত্র্য বলে অভিহিত ক'রে থাকেন। লৌকিক দেহ অথচ সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা অলৌকিক অস্বাভাবিকতা, অবয়বে শরীরস্থান অনুপাতবৈষম্যদুষ্ট,—রক্ত-মাংসের দেহের সে লাবণ্য, সে অঙ্গসুষ্ঠুতার চিহ্ন

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

নেই—দৃশ্যমান জগতের জীব ও জড়বস্তু যেন কোন বিচিত্র পরিকল্পনায় গঠিত হয়েছে—অনম্নুভাবিত খামখেয়ালে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, মধ্যে মধ্যে মানুষের মন, বিশেষ ক'রে কবি ও শিল্পীর মন বহুক্ষেত্রেই সাধারণ দৃশ্যজগতের বহির্ভূত অনৈসর্গিক ও অপাঞ্চভৌতিক স্তরেও বিচরণ ক'রে থাকে ; অতএব সেক্ষেত্রে, তদবস্থিত মনের রূপকল্পনা সাধারণ্যে ঠিক সহজাত দৃশ্যবস্তুর রূপসদৃশ না হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিষয়জগৎ ও ব্যবহারিকজগৎ ছাড়াও একটি অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতিক জগতের আমরা সন্ধান পাই। ইহা সীমাহীন ও স্বাপ্নিক। ভৌতিক ও বাহ্যবিষয় সম্পর্কে ব্যাপ্রিয়মান মন সব সময় সে প্লেনে উপস্থিত হতে চায়ও না, গিয়ে পৌঁছায়ও না। কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে শিল্পী, কবি প্রভৃতি স্রষ্টাদের মন, জাগতিক স্থূল রিষয়কে অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্মবিষয় বা দিব্যবিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং তখনই সাধারণ সংস্কারের আচ্ছাদন মুক্তিলাভ ক'রে চিত্তের অপূর্ব্ব ক্রিয়ায় প্রকটিত হয় বহু অলৌকিক ভাবাভাস ও রেখাভাসের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মরমী কবিমনের বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁর চিত্রগুলির অন্তস্তলে প্রবেশ করলে ঐ ভাবের ভাবাবেগেই প্রধান বলে মনে হয়। সাহিত্যে রূপকোপাখ্যান, মিথ, পুরাণ, অর্দ্ধৈতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উপাখ্যানাবলীর মত এগুলিরও কতকগুলি বিশেষ ভাব ও রূপগুণ আছে, ভাষা আছে ; এরা সাধারণ চক্ষে বিকৃত ও অবাস্তব বলে মনে হলেও তাঁর কাব্যেরই মত রসোত্তীর্ণ ও গভীর অনুভূতিসাপেক্ষ।

অনুকৃতি বা অভিব্যক্তি আর্টের দুটি প্রধান ধর্ম্ম হলেও, কেবলমাত্র অনুকৃতির মধ্যে আর্টকে কিছুতেই সীমাবদ্ধ করা যায় না—সে উদার, বন্ধহীন ও বহুরূপী। আধুনিকরা আর্টে এই অনুকৃতি বা আলোকচিত্রের মত বস্তুর হুবহু বহিঃপ্রকাশকে মোটেই অনুমোদন করে না, তারা অপেক্ষাকৃত অবাস্তব চিত্রের পক্ষপাতী। চিত্রশিল্পে বাস্তবতা বা প্রকৃতিনিষ্ঠা আজকের দিনে তাদের কাছে অত্যন্ত প্রাচীন ও অবান্তর কথা। এই সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর চিত্রালোচনার কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন : 'আর্টের ক্রিয়া অনুসরণ নয়, সৃষ্টি করা। বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে

যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকল পরানো।' এছাড়া অপর একস্থানে তিনি লিখেছেন: 'যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মনসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী।' চিত্রের মূলীভূত কারণ সম্পর্কে বীরবলের কথা কয়েকটি অত্যন্ত সারগর্ভ এবং বিশেষ ক'রে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রলিপি'র মধ্যে প্রকাশিত ১২নং প্লেটে তিনি যে বায়সদেহ ও ৬নং প্লেটে যে বিহঙ্গের রূপকল্পনা চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর কবিতাগুলির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করলে সর্ব্বক্ষেত্রেই এই অনুকৃতির কত উর্দ্ধে যে তাঁর অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে তার স্পষ্ট প্রতিকৃতি উপলব্ধি করা যায়। উক্ত বায়স সম্পর্কে তিনি লিখছেন:

'অসীম সাদায় কালো যবে পড়ে
সৃষ্টিসীমায় বাঁধা
তখন তো সেই কালোর রূপেই
আপনাকে পায় সাদা।'

বিষয়বস্তুকে অতিক্রম ক'রে ভাব যে কোথায় এগিয়ে গিয়েছে, কত ব্যাপক সুদূরপ্রসারী যে এর অর্থ তা সাধারণ objective বিচারে ধরা পড়ার কোন উপায় নেই। ৬নং চিত্রটির অর্থ আরো নিগূঢ়। সেই চিত্রটি সম্পর্কে তিনি লিখছেন:

'যে রূপকথার বিহঙ্গ তুমি
রেখার তাহার বাসা।
অগোচরে ছিলে স্বপ্নে আমার
নাই কোন তার ভাষা॥'

একেবারে স্বাপ্নিক ব্যাপার। অবচেতনার মধ্যে থেকে আকস্মিক ভাবে যেন চিত্রিত হয়েছে বহু বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে—একেবারে supra sensitive অবস্থার surrealism-এর প্রকাশ।

অনেকে তাঁর এই চিত্রগুলিকে আদিম শিল্পের আধুনিক প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। প্রাইমিভ্যাল ধাঁচায় ছবি এঁকে ইউরোপে যে আধুনিক একদল প্রিমিটিভিষ্ট নামে খ্যাত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যেও নাকি সেই আদিম অপ্রাকৃতিকতার সন্ধান পাওয়া যায়,—অথচ তার পেছনে থাকে অন্তর্বেগের গভীর আবেদন। এ-সম্বন্ধে শিল্প-সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেন: * * 'drawing by Rabindranath Tagore is of particular interest because it puts before us, almost for the first time, genuine examples of modern primitive art.' অবশ্য form-এর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মধ্যে খানিকটা আদিমতার ছাঁচ বা কোথাও কোথাও symbolistic touch থাকলেও তার প্রধান গুণ হচ্ছে তা আদৌ বস্তুসর্ব্বস্ব নয়—তার প্রাণ হচ্ছে ভাববস্তু। এই হিসাবে আঁতিমিজ্মি (Intimism) পন্থীদের সঙ্গে এর কোথায় যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পী নন্দলাল বসু বলেন: 'রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির কাজই আরম্ভ করেন সর্ব্বাগ্রে, তখন হয়ত ছবির বিষয়বস্তু তার মনের কোণেও ভাসে নি; এ থেকে দর্শকের মনে এ-ধারণা হ'তে পারে যে তাঁর লক্ষ্য ছিল বিষয়বস্তুহীন শুধু অঙ্কননৈপুণ্য বা নিছক রূপদান অথবা কেবল রঙের খেলা। কিন্তু ছবিটি যখন সম্পূর্ণ হয় তখন আমরা দেখতে পাই তাতে সকল গুণই আছে, অধিকন্তু তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলছে প্রাণের ছন্দ যা কেবলমাত্র প্রতিভার তুলিই চিত্রকে দিতে পারে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি সকলক্ষেত্রেই সত্যকার ছবি—যদিও বস্তুতন্ত্র বা বাস্তবতা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে।'

শিল্পের মধ্যে জাতীয়তা খোঁজার প্রাচীন পদ্ধতি আজ আর তার গোঁড়ামী নিয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকে নি—সে আজ সর্ব্বদেশের। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মধ্যে সেই অত্যাধুনিক, এমনকি অনাগত আধুনিক গুণ ও সার্ব্বদেশিক লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণত মানুষের মনের দাম intellect দিয়ে ধার্য্য ক'রে যখন আমরা কবির ছবির মধ্যে

আখ্যানবস্তুর প্রাধান্য ও চিরাচরিত সনাতন অঙ্কন ভঙ্গীকে না পেয়ে সাধারণকে হতাশ হতে দেখি, তখন আশাবাদীর মত এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, মানুষের মন ক্রমশই বৃহত্তর সত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, অতএব আজ যেখানে সে যথাযথ মননশক্তির অভাবে উপস্থিত হতে পাচ্ছে না, বুদ্ধিবৃত্তির পরোৎকর্ষের ফলে দু'দিন পরে তা সে পারবে। অর্থাৎ আসল কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মধ্যে sentimentalism-এর বদলে নিগূঢ় ভাবে রয়েছে high intellectualism এবং অত্যাধুনিক সর্ব্বত্রবাসীয় চিত্রশিল্পীর গুণ। এক্ষেত্রে তিনি মোটেই একদেশদর্শী নন, আর্টের ক্ষেত্রে তিনি দেশাচারের সনাতনী পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন নি। স্বর্গত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবে একদিন ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত ক'রে গিছলেন। W. H. Wright বলেন: 'There is no nationality in art. Those who plead for a national art are ignorant.' (The Creative Will). রবীন্দ্রনাথ যে অঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে একান্তই প্রেরণার ইচ্ছায় বা ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়। দার্শনিক সোপেনহায়ার যে ইচ্ছাশক্তিকে সমগ্র দর্শনের মূল ব'লে গেছেন: নীটসে যে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অতিমানব সৃষ্টি করেছেন, এও হচ্ছে সেই ইচ্ছাশক্তি যা রঙ, তুলি, কাগজ, পেনসিল, form, technic কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না—আপন ভঙ্গিমার রূপ নেয় আপনার মধ্যে। একে অন্য কোন দিক থেকে দেখতে গেলে ক্রোচের ভাষায় সৌন্দর্য্যের ও রসের বিচ্যুতি ঘটবে বলেই বলতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথও তাঁর চিত্রে যা চিত্রিত করেছেন তার ইতিহাস কেবলমাত্র রেখা ও রঙের বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়,—সে ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আরও বহু দূরে গিয়ে। তারা কখনও নর-নারী, পশু পক্ষী; কখনও নদ নদী, ফল ফুল কখনও বা আরও অন্য কিছুকে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। নর-নারীর চিত্রগুলির মধ্যে বহু সময় ইম্‌প্রেসানিষ্ট ও এক্সপ্রেসানিষ্টদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু গোড়ার দিকে উক্ত স্কুলের ভ্যান গগ, পল গোগাঁ, সিজানী প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যে যে নিস্তেজ অনাধুনিক-ভাব দৃষ্ট হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার কোন আভাস নেই—তাঁর চিত্রগুলি সে তুলনায় দৃঢ়, শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ম্যাটিস ও পিকাসো স্কুলের

কিউবিজমের ধারাও তাঁর চিত্রের মধ্যে আবিষ্কৃত দেখা যায়। প্রাচীন যুগের গুহাবাসীদের মন যে ছবি তাদের ভিতের কোণে এঁকে রাখত, সেই জীব-জন্তুদের চিত্র ও আরও কয়েকখানি চিত্র তিনি কিউবিষ্টিক্ ধারায় চিত্রিত করেছেন। অন্যান্য চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর অনুভূতি-পরতন্ত্রতার চরম প্রকাশ নজরে পড়ে এবং সকলগুলির মধ্যে soul-expression-এর নিদর্শনই বিশেষ-ভাবে ব্যক্ত দেখা যায়।

মোটের উপর রূপ-রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রেতিহাসে সর্ব্ব সময়ের যে অপূর্ব্ব ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন, তাকে নির্ব্বিশঙ্কে নূতন রেণেসাঁসের সূত্রপাত ব'লে অভিহিত করা যায়। তার সৃজনীশক্তির প্রভাব বর্ত্তমানকে অতিক্রম ক'রে সুদূর ভবিষ্যৎকেও নূতন রূপের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি

পরশমণি বস্তুটা রূপক হিসেবে মিথ্যে নয় : রূপ ও রসের জগতে রবীন্দ্র-প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করেছে তা-ই অভিনব সার্থকতায় ঝলকে উঠেছে। আনাচ-কানাচ খুঁজে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেলেন সব কিছুই—সরস্বতীর ঝুটো মুক্তোটি থেকে রাঙ্‌তাটুকু অবধি সাঁচ্চা হয়ে আজ ঝিকিরমিকির করছে। বাগদেবীর চার-লহরী মূল কণ্ঠহারের মধ্যে চিত্রকলার লহরটিতে হাত দিয়েছেন তিনি শেষ বয়সে।

চিত্রকলায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাবের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্যটুকু লক্ষ্য করবার মতো বলেই আমার মনে হয়। যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বে মনের যে-বাসনাগুলোর জোর বেশী, দাবিয়ে রাখবার জোরও তাদের বেশি থাকে। বার্দ্ধক্যে দাবির জোরটা যেমন ক'মে আসে তেমনি দমনের শক্তিটাও হয়ে পড়ে ক্ষীণ। তাই অবদমিত অনেক বাসনা অনেক সময় বার্দ্ধক্যে এসে উঁকিঝুঁকি দেয়, এমন কি মাথা তুলে দাঁড়ায় শিশুসুলভ ভঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভা নানা দিক দিয়ে যখন পরম প্রবীণ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সবে তখন জন্ম নিলেন। আজ রবীন্দ্রনাথের চিত্র দেখে এ-কথাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে মনে দেখা দেয় যে তাঁর সৃজনী-শক্তির তুলনায় একশো বছরের একটা জীবন অতি হ্রস্ব। তাঁর মনের মহা-বিরাট, অতি-বিরাট ও বিরাটের যোগান্ শেষ না হতেই দেহধর্ম্মে জীবন তাঁর শেষের সীমায় গড়িয়ে পড়লো। 'নাই নাই নাই যে সময়'—রঙ-এ ও রেখায় বিকশিত হবার জন্যে উন্মুখ তাঁর অবদমিত প্রাণ-ছন্দ অবচেতনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু সঙ্কোচের সান্ত্রী ঝিমিয়ে এসেছে, ঘুমিয়ে পড়েনি—সদরে তখনও বিরাটের বিরাট ভিড় ; তাই তাঁর অনাদৃত ভীরু শিল্পী প্রথম পথ ক'রে নিল খিড়কী দুয়োর দিয়ে। কবি তাঁর কলমকে আখরের বিধিবদ্ধ গতির বাইরে কাটাকুটির খেয়াল-খুসীতে যখনই মুক্ত ক'রে দিতেন, অনবধান মুহূর্ত্তের সুযোগে তারই মধ্যে দিয়ে সে দেখা দিতে লাগলো। খেয়ালের স্রোতের টানে নেবে আসা কাটাকুটির কাদামাটিতে সে চিকমিক

ক'রে উঠতেই কবি থমকে দাঁড়ালেন—তিনি চিনলেন, সেদিন থেকে সুরু হলো শোধনের কাজ। কাদায় মেশা ফিকে সোনা খাঁটি হয়ে হলো শেষে আভরণ।

দুয়োরাণীর মতো রবীন্দ্রনাথের এই দুয়োপ্রতিভার ভাগ্যে জুটলো শিল-নোড়া ধোয়া জল। দৈহিক ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার তলানিটুকু নিয়েই সে সার্থক হ'য়ে উঠলো। 'নাই নাই নাই যে সময়'—শিক্ষা ও সাধনার সবগুলো ধাপ ডিঙিয়ে আয়োজন উপকরণের অপেক্ষা না রেখে, নিজ মহিমায় সে আসর আলো ক'রে দাঁড়ালো। শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের রসজ্ঞ লোক বিস্ময় মানলো।

রসজ্ঞ যাঁরা, যাঁরা চক্ষুষ্মান, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই থাকতে পারে না ; বলতে হয় তাঁদের কাছে যাঁরা এর বিশ্লেষণ দাবি করেন। বেশির ভাগ লোককে দেখেছি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কবির খেয়াল হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছেন, কিন্তু ছবি হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখলেই হাত চেপে ধরেন। চোখ তাঁদেরও আছে, অতএব দেখিয়ে দিতে হবে শ্রদ্ধেয় কোনখানটা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অধিকারী ভেদটা সব ক্ষেত্রেই আমরা মেনে নিয়েছি, মানতে শিখলাম না শুধু ছবির বেলায়। কোনো একটা স্তরের গান শোনবার জন্যে কানকে রীতিমত একটা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মানুভূতি অর্জ্জন করতে হয়, সেটা তাঁরা মানেন, কিন্তু ছবি দেখবার জন্যে চোখেরও যে মস্ত একটা শিক্ষা থাকা দরকার এটা আজও উপলব্ধিতে আসেনি ব'লেই চোখ মেলে ভালো না লাগলেই তার অর্থ তলব ক'রে বসেন। মিষ্টি একটা গান শুনে বা সুন্দর একখানা ছবি দেখে তাঁরা তারিফ করেন ; দলে তাঁরা ভারী থাকেন ব'লে কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু উঠলেই টের পেতেন মিষ্টত্ব বা সুন্দরত্বটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। গতানুগতিকের বাইরে রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক শিল্পীদের ছবি দেখে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের উপলব্ধিটা আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম স্তরের, তাই মৌন ভাবটা সেখানে ফাঁকির নামান্তর নয়। সাধারণের চোখের সামনে জুড়ে ব'সে আছে মোটা জমিদার পুত্তুরের মতো স্থূল অনুভূতির বিলাসী দৃষ্টি, তার উপজীব্য হলো সহজ আমোদ—আড়ম্বরহীন কঠোর-কাঠিন্যের আনন্দকে ছুঁতে হলে দৃষ্টিতে চাই ঋষির নিষ্ঠা, চাই বাহুল্যকে বর্জ্জন

ক'রে এগিয়ে চলবার ক্ষমতা। চিত্রকলায় চোখের এ বিলাসের মতো এক সময়ে সাহিত্যেও মনের আরামপ্রিয় একটা স্থূল বিলাসী ভঙ্গী ছিল; যার খোরাক যোগাতো অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় ভেজা সুন্দর সুন্দর সব সুখ-দুঃখের কথা। সাহিত্য যেদিন পরিবর্ত্তনের পথে পা বাড়িয়েছিল, সেদিনও উঠেছিল এই একই নালিশ। সাহিত্যের দিক দিয়ে সাধারণ স্তরটাই আজ অনেক উন্নত, তাই অতি-আধুনিক কবিতাকে গাল দিতে গিয়ে গলার সুরটা একটু নেবে আসে, চরমে জেমস জয়েস-এর কাণ্ড বোধগম্য না হলেও, না হেসে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এসঙ্গে এটাও স্বীকার করতেই হবে যে পুরাতনের মজ্জাগত মোহ ঝেড়ে ফেলে 'নতুন' যখন দেখা দেয় তখন তার আবির্ভাবকে খানিকটা উৎকট ক'রে তোলে ঝেড়ে ফেলার ঝাকুনির বাড়াবাড়িতে। সেই বাড়াবাড়ি নিয়ে বিচার করাই ভুল, মোহ কাটলে আতিশয্য আপনা থেকেই খসে পড়ে।

আধুনিক চিত্র বা রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথার উল্লেখ ক'রেই বলতে হয় 'It is for them to express 'and not to explain.' এর বেশি ছবি নিয়ে কিছু বলতে হলে সুরু করতে হয় উল্টো দিক থেকে—কি কি হলেই ছবি হয় না, তারই ভেতর দিয়ে পথ খোঁজা যেতে পারে, কি হলে ছবি হয়। সুন্দর হলেই যে ছবি হয় না কলেজস্কোয়ারের রেলিঙ-এর সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো সামান্য রুচিবান লোকই তা স্বীকার করবে। ছবি সুন্দর চেহারা নিয়ে গল্পের মূকাভিনয় করতে পারলেই যদি উন্নত পর্য্যায়ে স্থান পেত তা হলে চিত্র-জগতে গল্প-চিত্রই (illustration) জাঁকিয়ে বসতো সব চাইতে বড় মানীর আসন। চিত্রের চিত্রত্ব কেবল মাত্র চোখ-খুসী-করা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বা গল্প বলায় নয়, তার সার্থকতা নির্ভর করে বাস্তবের সত্যিকারের রূপ ও ছন্দকে অঙ্গীভূত করার মধ্যে। সেই রূপ ও ছন্দ যখন ঐশ্বর্য্যের মুকুট মালা প'রে চিত্রের দরবারে আবির্ভূত হন, তখন দর্শকদের কাছে তাঁর পরিচয় ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না—নিরাভরণ হয়ে নেবে এলেই সংশয়ের অন্ত থাকে না: এ আবার কে! পরিচিতেরা প্রণাম জানায়, অপরিচিতেরা অবাক হয়ে যায়। সত্যের এই সূক্ষ্ম-সত্তায় চিত্র নিয়ে আজ সংশয় দেখা দিয়েছে। সূক্ষ্ম কথাটা চিত্রে ফাঁকির আবিষ্কার নয়। এমন কি ব্যক্তিগত চেহারার মধ্যেও যে একটা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে তার প্রমাণ পাওয়া

যায় ব্যঙ্গচিত্রে। সেই বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে মুখাবয়বের রেখাকে নিয়ে শিল্পী যেমন ইচ্ছা খেলা করেন—বিকট বিকৃতিতেও পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্যক্তিগত চেহারার এই সূক্ষ্ম বিশেষত্বটুকু চিনে নেবার এবং চরিত্রের নির্দ্দিষ্ট একটা দিককে ব্যঙ্গ করবার জন্যে কোন বিশেষ অংশকে কি ভাবে বিকৃত করা দরকার সেটা বুঝবার ক্ষমতা বেশির ভাগ শিল্পীর মধ্যে থাকে না ব'লেই সার্থক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর সংখ্যা এত কম—আমাদের দেশে তো নেইই। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ধরার চেয়ে অনেক বেশি বড় কথা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর সূক্ষ্মতম রূপ ও ছন্দের উপলব্ধি। রঙ ও রেখার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের এই মূক অভিব্যক্তি, বিবিধ ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে তার রূপ ও ছন্দের বিকাশ যাঁর প্রাণের প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে স্পন্দিত হয়ে ওঠে সেই হয় সত্যিকারের শিল্পী।

সাহিত্যের উৎস যেমন মনে তেমনি চিত্রের উৎস প্রাণে। সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র চেতনায় চিত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে প্রাণ-শক্তির অবচেতনায়। বহির্জগত সাহিত্যে রূপ নেয় ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে, কিন্তু চিত্র মনের মধ্যস্থতার সামান্যই অপেক্ষা রাখে। সাহিত্যিকের কারবার পরিবর্ত্তনশীল সমাজ-জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে চিরন্তন মানবসত্যে, চিত্রকরের সঙ্গে আত্মীয়তা বিশ্বপ্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপ ও ছন্দের। ঠিক এই রূপ ও ছন্দের সঙ্গে সাহিত্যের যে অংশটুকুর সংযোগ তারও উৎস প্রাণে, তাই সাহিত্যের সুরু হয়েছিল ছন্দে। গান ও চিত্রের জন্ম প্রাণের ঔরসে, অবচেতনার গর্ভে, সাহিত্যের জন্ম প্রাণের ঔরসে, চেতনার গর্ভে। গান ও চিত্র মানুষের প্রাগৈতিহাসিক প্রথম পক্ষের সন্তান, তাদের জন্ম সাহিত্যের আগে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে এসে প্রাণের অনুভূতি সূক্ষ্মতর হয়েছে তাই চিত্রকেও আসতে হয়েছে অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু প্রাণের স্পন্দনে ধরা দেওয়া সেই গুহাবাসীর চিত্রের সঙ্গে বাহুল্যবর্জ্জিত খাঁটি রূপ ও ছন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আজ সব দেশের প্রতিভাবান শিল্পীরাই মেনে নিচ্ছেন। তাই তাঁরা আজ বাহুল্যকে সুরু করেছেন ছাঁটতে। বাহুল্যের বাহ্যিক রূপ আপাতদৃষ্টিকে খুসি ক'রে তার ক্ষুদ্রায়তনকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা দর্শকের নষ্ট ক'রে দেয়। অবিশ্যি দর্শকের কথা ভেবে চিত্রী ছবি আঁকেন না, ছবি তাঁর হাতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। যাঁর হাত দিয়ে ছবি এমনি ক'রে

দেখা দেয়, বাস্তবের আবর্জ্জনায় রেডিয়ামের মতো সত্যের সূক্ষ্ম সত্তা তাঁর অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে, তাই তিনি যদি শোধনের দিকে ঝুঁকে পড়েন তো আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আধুনিক প্রতিভাবান চিত্রীদের অনেকেই আজ আঁকছেন এই শোধিত চিত্র—যার মধ্যে আদিম সহজ অনুভূতিতে ধরা দেওয়া রূপ ও ছন্দের কাঠামোতে মিশেছে চরম পরিণত অনুভূতির সহজ অভিব্যক্তি। বহুকাল কর্ষণে অর্জ্জিত আঙ্গিককে তাঁরা হালাফ্যালায় অতিক্রম ক'রে যাচ্ছেন —অবিশ্যি এ প্রচেষ্টা অতিআধুনিক নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাবানদের মধ্যেও বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশের পথ খুঁজেছে।

য়ুরোপের শিক্ষিত-প্রতিভা এক আঙ্গিক অস্বীকার ক'রে অন্য আঙ্গিক সৃষ্টি করছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় অস্বীকৃতির কোনো প্রশ্ন ওঠে না, তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব আঙ্গিককে আয়ত্ত করবারই অবসর পায় নি—পেলে বিশ্বের চিত্রকলায় ভারতের নামটা সাহিত্যেরই মতো বড় অক্ষরে নতুন ক'রে লিখে যেতেন। চিত্রে তাঁর প্রাণের রূপ ও ছন্দ সুরুতে অবিমিশ্র আদিমতা নিয়েই দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু অভূতপূর্ব্ব প্রতিভার সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তির রূপায়ন ওতে সম্ভব নয়, তিনি তাই আশ্রয় নিলেন আধুনিক য়ুরোপীয় আঙ্গিকের। সে-আঙ্গিকের ছায়া অবলম্বনেই সব ছবি তাঁর আঁকা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার ছবিতে (যা নিয়ে ১৯৩২ সালে কলকাতায় প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল) যে-সব মূর্ত্তি দেখা যায় তার কোনো কোনো চেহারায় য়ুরোপীয় ভাবটা খুবই স্পষ্ট (যদিও মূর্ত্তির জাতীয়তাটা কোনো প্রশ্নই নয় ; শুধু প্রভাবের ইঙ্গিত হিসেবেই তার উল্লেখ)। রবীন্দ্রনাথের এ আঙ্গিক তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুর মতোই আকস্মিক। আঙ্গিক আয়ত্তে নয় ব'লেই তিনি মনের বা চোখের প্রতিবিম্বকে প্রতিফলিত করতে প্রয়াস পান নি, তাঁর চিত্রগুলো হলো অনুভূত রূপ ও ছন্দের অবাধ অভিব্যক্তি। স্বভাবকবির মতো তিনি হলেন স্বভাব-চিত্রী ; তাঁর এই অশিক্ষিতপটুত্বে রয়ে গেল অনাদৃত প্রতিভার খাঁটি স্বাক্ষর।

যে-সব অদ্ভুৎ-উদ্ভট-খাপছাড়া ছায়ামূর্ত্তি তাঁর চেতনার কড়া পাহাড়ায় অবচেতনার অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দু'একটা কবিতায় বা গল্পে যারা শুধু ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেছে মাত্র, চিত্রী রবীন্দ্রনাথ এসে তাদের সামনে কলমের মোহনা মুক্ত ক'রে দিলেন। পিলপিল ক'রে তারা সব

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

কলমের ডগা বেয়ে নেবে এল কাগজের বুকে। খাপছাড়া হয়েও এরা ছন্দ-ছাড়া বা ছন্নছাড়া হলো না, চিত্রী এদের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করলেন। এই উদ্ভট-খাপছাড়াদের কথা বলতে গিয়ে Comtesse de Noailles বলেছেন, 'But how not to dread the mighty profiles, gluttonous and sensual? How not to be disquieted by the diabolical, lean-faced, crimson and pale masks, aslant and keen as knives, faces incarnating cunning and intrigue? How charming it is, and how skillfully portrayed the mocking poise of the two doves! How pleasingly hallucinating in its coquettish attitude is the antelope which, to our eyes, seems to fly!' প্রথম যখন এই খাপছাড়ার দলকে চিত্রী রবীন্দ্রনাথ টেনে এনে আসরে নাবালেন, প্রবীণ কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন বৈমাত্রেয় অনুজের ছেলে-খেলায় গুণগ্রাহীদের কাছে সঙ্কুচিত। কিন্তু দেখতে দেখতে চিত্রী এমন কাণ্ড ক'রে বসলেন যে অগ্রজের কাব্যপ্রতিভা বাধ্য হলো ছন্দোবন্ধে তার বন্দনা করতে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগতে খাপছাড়াদের ভীড়ের মধ্যে বাস্তব রূপ ও ছন্দের সুষ্ঠু প্রকাশও বিরল নয়। এই খাপছাড়া ছায়ামূর্ত্তির বাইরে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাঁর আর একটা দিকের পরিচয় যেন আমরা পাই যা তাঁর সাহিত্যে ব্যাপ্তভাবে প্রকাশের পথ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী পরিক্রমণ ক'রে এসেছেন, চিঠি-পত্রে ছাড়া গল্পে বা কবিতায় তার তেমন কোনো ছাপ আমরা পাইনে—কবিতায় তো নেই বললেই চলে; এদিক দিয়ে তিনি খাঁটি বাঙালী। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন পরিবেশ তাঁর মতো স্পর্শকাতর মনে যে ছায়া এঁকে দিয়েছে, আভাষে ইঙ্গিতে তারাই যেন রূপ নিয়েছে তার বিভিন্ন চিত্রে। সে পরিচয় পোষাক-পরিচ্ছদ বা বস্তু বৈশিষ্ট্যে নয়, চিত্রের আবহাওয়ায় ব্যপ্ত হয়ে আছে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে—কোনো কোনো ছবি যেন পৃথিবীর বিশেষ কোনো অংশকে গোপন ক'রে রেখেছে তার মধ্যে, তা অদৃশ্য হলেও অনধিগম্য নয়। এ বিষয়টা খুবই স্পষ্ট, নদী আর প্রান্তর যেমন সম্মান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে তেমনি পৃথিবীর কঠোর-কঠিন তুঙ্গ শিরের মহিমার প্রকাশ তাঁর চিত্রে—প্রকৃতির এই মহিমা শুধু গাছ বা পাথর নয়, চিত্রের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে অবলম্বন ক'রে পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জামও একান্ত ক'রেই তাঁর নিজস্ব।

এমন কি বিভিন্ন ফুলের পাঁপড়ি নিংড়ে তিনি তা ছবিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবি সম্পর্কে শিল্পী মুকুল দে লিখেছেন, 'As regards the composition of his paintings, our Poet-painter displays masterly skill···There is not the slightest faltering and indecision. The work progresses with a series of sweeping movements and the balanced composition remains intact. The lines are drawn with a sure hand and the spacing is so accurate as is only possible from the most experienced artists with years of practice behind them. I have often marvelled at the supreme ease with which he spaces the composition and carries the work through.' রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিষয়বস্তুর সংস্থান ও রচনাভঙ্গীটাই যে সবচেয়ে বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্ণ-প্রয়োগ আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বল, বর্ণে ও রেখায় সংশয়ের লেশমাত্র নেই—সুষ্ঠু সবল ভঙ্গীতে বস্তুর স্থূলত্ব ও গুরুত্ব মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর চিত্রের বহুবিধত্ব, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যও খুবই লক্ষ্য করবার মতো—এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য ছবি তিনি এঁকেছেন। কালি-কলমের ছবি বা রেখাচিত্র ও বহু শিশুদের জন্যে লেখা বই তিনি চিত্রিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী ছবির সংগ্রহ 'চিত্রলিপি'র প্রত্যেকটি ছবি তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করবে। প্রচ্ছদপটের ছবিটি দেখবার পর তার বিশ্লেষণের দাবি উঠতে পারে ভাবা যায় না। সামান্য কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ রেখার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সীমাহীনতায় নরনারীর মিলন-মাধুর্য্যটুকু একটা বিরাট স্তব্ধতা নিয়ে মনকে এসে স্পর্শ করে। বাঁ দিকের সামান্য ফাঁকা পশ্চাৎপট যেন নিঃসীম নৈশব্দ্যের প্রাতীক, তার মধ্যে প্রাণের উদ্ভব ও প্রাণীর মিলন। বেশির ভাগ চিত্রেই এই রকম মনে কোনো-না-কোনো একটা 'মুড্'-এর সৃষ্টি করে—এখানেই তাদের সার্থকতা, এখানেই তারা সত্য। তেরো নম্বর চিত্রের বর্ণ প্রয়োগ অনবদ্য; লাল রঙ্-এর বলিষ্ঠ ব্যবহারের ভিতর দিয়ে একটি অদ্ভুত পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিন নম্বর চিত্রে অরণ্যের গভীরতা যেন গা দিয়ে অনুভব করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবিরই সার্থকতা তাদের নিজ সত্তায়—বাস্তবের প্রতিকৃতি হিসেবে নয়, তারা সত্য হয়ে থাকবে আত্ম রূপ ও ছন্দের অপূর্ব্ব

মহিমায়। কবি তাই বলেছেন: 'In a picture the artist creates the languages of undoubted reality, and we are satisfied that we see. It may not be the representation of a beautiful woman but that of a commonplace donkey, or of something that has no external credential of truth in nature but only in its own inner artistic significance.'

রবীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতীয় চিত্রকলার ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব সম্পদ; সর্ব্ব-সাধারণ তা যে ভাবেই গ্রহণ করুক, প্রতিভাবান শিল্পী এবং রসজ্ঞদের কাছে তাঁর চিত্র পরম সম্মান ও সমাদরের বস্তু হ'য়েই থাকবে।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াধর্মী ; দৃষ্টি তাঁর যুগোপযোগী অগ্রসর নয়, সৃষ্টি তাঁর বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপোষক—কাহারও কাহারও এই মত দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠচে, ভবিষ্যতের জাতীয় সভায় তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থকতা অম্লান থাকবে বলে মনে করচেন না। মার্ক্সিজমের গোরস্থানে সমাধিস্থ হবার সম্ভাবনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েচে।

অনুমান হয় যে, যে-সমানাধিকারমূলক সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলচে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মত গড়ে' উঠচে, শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভব হবে যে ভাবধারার অনুবর্তিতায়, রবীন্দ্রনাথকে তার সমর্থক ব'লে মনে করা গেল না। সে ভাবধারাকে এক কথায় সাম্যবাদ বলা হ'য়ে থাকে।

কিন্তু মার্কসবাদ বলে যে জিনিষ অভিহিত তার আদিঅন্ত সাম্যবাদ নয়। প্রাণ তার অবশ্য দ্বন্দ্বসমন্বয়ী জড়বাদ—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ডায়েলেকটিকেল মেটিরিয়েলিজম।' দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন যে, যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ যখন সম্বন্ধজনের সম্মুখবিকাশের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন তারই ভেতর থেকে নব সম্বন্ধের উদ্ভব হয়—পুরোনো সম্বন্ধে চিড় খেতে খেতে ক্রমে রূপান্তর হ'য়ে একসময় তার সবটাই বদলে যায়, নূতন সম্বন্ধ স্থানপরিগ্রহ করে: আবার একসময় আসে যখন এই নূতন সম্বন্ধও আরও বিকাশের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন তারই ভেতর থেকে আবার নূতনের উদ্ভব হ'তে থাকে। কিন্তু হেগেলের মতে এই বিকাশ স্বাধীন, স্বতস্ফূর্ত নয়, ঐশী ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঐশী ইচ্ছাধীনতায় বিশ্বাস থাকার দরুণ হেগেলের মতবাদ কার্যত এই দাঁড়িয়েছিল যে, যে ভাবে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজবিকাশ আপনি হ'য়ে আসচে, তাই ঠিক: জোর ক'রে মানুষের কিছু করবার নেই। তাই হেগেল ছিলেন তাঁর স্বদেশ প্রুশিয়ার বুর্জোয়ারাষ্ট্রের প্রগাঢ় সমর্থক: রাষ্ট্রকে তিনি সব শক্তি ও গুণের আধাররূপে দেখেছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্চে, তাঁর এই মতবাদ বিপ্লবের পরিপন্থী ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রভাবে যখন মানুষ আত্মশক্তি অনুভব করলে, ঐশী ইচ্ছার কার্যকারিতা যখন আর অবিসম্বাদিত রইল না, প্রাচীন ধর্ম ও বিজ্ঞানের সেই অপূর্ব সংঘাতের প্রেরণায় মার্কস অস্বীকার করলেন ঐশী ইচ্ছাকে, বললেন যে কোনো অদৃশ্য, অরূপ মন থেকে বাস্তবের উদ্ভব এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই: নিজ প্রয়োজনে চলার গতিবেগে মানুষ আপন পথ আপনি ক'রে নেয়। এক অবস্থা যখন গতিপথের প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন তারই ভেতর থেকে তাকে বিনাশ ক'রে দেবার অবস্থার উদ্ভব হয়। চলার পথের পথিকের পক্ষে তখন দরকার সে অবস্থাকে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে কাজ করবার, কেননা তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতা কিছু নেই; নির্দেশ ও সম্ভাবনা শুধু রয়েচে; কাজের দ্বারা তাকে সত্য ক'রে তুলতে হ'বে। এর থেকেই বিপ্লবের সৃষ্টি।

মার্কসীয় নীতি অনুসারে অদৃশ্য শক্তির কল্পনা সামন্ততান্ত্রিক জীবনবিধির সঙ্গে জড়িত। যে বিরাট ব্রহ্ম দ্বারা এ সৃষ্টি চালিত, তাঁরই লীলাময় এ জীবন: সামন্তপ্রভুতেও তাঁরই প্রকাশ। সকল সৌন্দর্য্য, সকল মহত্বের আধার তিনি; অনির্বচনীয়, কল্পনাতীত তিনি; তাঁরই ইচ্ছায় প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত; আমরা তাঁর আশ্রিত—এবং তারই প্রতিনিধি যারা আমাদের অস্থিস্বরূপ, তাদের অধীনতাও আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

এই জীবন-দর্শনেরই আওতায় আমরা দিনশেষে তরণী সেইখানে ভিড়াই যেখানে

রাজার প্রাসাদ হ'তে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবী গীতি আকাশে।
ধরণী সমুখ পানে
চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে।
ভালো নাহি লাগে আর
আসা যাওয়া বার বার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে,
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।

যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি,
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি' নত আঁখে
ভরা দুটি ল'য়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥

সেই ব্রহ্মময় জগতে আমাদের স্থিতি; জীবনে মরণে আমাদের তাতেই আশ্রয়। তা'তেই আমাদের গতি, তা'তেই আমাদের মানসসন্ধান। সেই অরূপসুন্দর জগৎ থেকে এই কবিতার উদ্ভব:

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিগন্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চ'লে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি,'
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করেনা প্রচার
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চ'লে তার স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপার॥
জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লয়ে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলেনা
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

অদ্ভুত, অনবদ্য; মানুষের শেষ আশ্রয় এখানে। সেই অদৃশ্য, অবোধ্য জগতে এর অধিষ্ঠান। মাটির পৃথিবীর জিনিষ এ নয়, কিন্তু পৃথিবীও সে জগতেরই অংশ, সে সুন্দরের এক অংশ। তাই এর ভেতর মানুষের যে দুঃখ, কষ্ট, হাহাকার রবীন্দ্রনাথের মনকে তা' বিচলিত করে, সুর ও সংগতির পরিপন্থী ব'লে তিনি তাকে সহ্য করতে অপারগ।

তাই তাঁর মন গতিধর্মী। মানুষের গতিপথে জমে উঠেচে যত দুঃখ, যত গ্লানি তাঁর প্রাণে তা' আবেদন জাগিয়েচে—কিন্তু সে গতিতে আছে যে তেজ যে বীর্য রবীন্দ্রনাথ তা'কেও স্বীকার করতে ভোলেন নি। 'বলাকা' কাব্যে সে স্বীকৃতি অনবদ্য ছন্দমহিমায় রূপ ধ'রে উঠেচে, ইতিহাসের গতির দুরন্ত আবেগ আমরা তার ছত্রে ছত্রে অনুভব করি।

বের্গ্‌সোঁর 'প্রাণপ্রবাহের' লীলা 'বলাকা' কাব্যে জেগেচে ব'লে সুধীজনের অভিমত। বের্গ্‌সোঁর প্রাণপ্রবাহে যন্ত্রশিল্পস্থিত বুর্জোয়াধর্ম পরিণত রূপলাভ করেচে। তবে কি রবীন্দ্রনাথেরও এই চরম রূপ? সুর ও ছন্দের, বাণী ও ভাবনার যে বিরাট জগৎ তিনি আপনি সৃষ্টি করেচেন, স্থিতি কি তার সামন্তলোকে, গতি কি তার বুর্জোয়াপথের? এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে মার্কসবাদীর দৃষ্টি জীবনকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে না; কাব্য ও সাহিত্য রাজনীতির বাইরের জিনিষ এমন কথা স্বীকার করে না। বেঁচে থাকার জন্যে যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা তাই হ'লো জীবনের গতিবিধায়ক; সেই গতিবেগে মানুষ যে সমস্ত জীবনাদর্শ সৃষ্টি করে তাদের অবশ্য নিজস্ব মূল আছে, সেগুলিও পরে গতিপথের নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়ায় এমন কি, যখন আবার নূতন অর্থনৈতিক

ধারায় চলবার প্রয়োজন হয় তখনও পূর্বকার চলার বেগে মানুষ যে সমস্ত জীবনাদর্শ সৃষ্টি ও গ্রহণ করেচে, তাদেরই ভাবধারায় আচ্ছন্ন তার মন নূতন পথ গ্রহণের প্রতিকূল হয়, বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। তা'তে কিন্তু এ কথা অপ্রমাণিত হয় না যে সে সব ভাবধারারও জন্ম হয়েছিল এক বিশেষ অর্থনৈতিক জীবনপদ্ধতি থেকে। সাহিত্যিকের সৃষ্টির পিছনেও তাই থাকে তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কবির কাব্যের উৎসরূপে আছে জাগতিক বিধান সম্বন্ধে তার ধারণা কল্পনা। মার্কসবাদী দেখতে চায় কবিসাহিত্যিকের মানস-লোকের উৎপত্তি হয়েচে সমাজনীতি সম্বন্ধে কোন্ পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ঐশী ইচ্ছার বন্ধন থেকে কি মানুষকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েচেন, সকল মানুষের অন্তর্মূল্য সমান ব'লে কি তিনি স্বীকার করেন—সাম্যবাদী সমাজে কি তিনি বিশ্বাসী ?

পূর্বেই বলেচি, মন তাঁর গতিধর্মী : কিন্তু সে কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানায় এসে ঠেকল ? তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব যার দ্বারা মানুষ অশান্তি জর্জরিত হ'লো—তাকে কি তিনি কেবল ধর্মের প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলতে চান ? ধর্মের সংহতিকারী শক্তি কি আর আছে, রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে আর কোনো আমূল পরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নয় ? দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ জগৎ সৃষ্টি করেচে। দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা। যে মানুষ আজ বুঝেচে যে এ জগৎ তারই আপন হাতের সৃষ্টি, সে নেবে অধিকার—অনুকম্পাকে সে অপমান জ্ঞান করে। রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী ; কিন্তু সামন্তপ্রথা থেকে বুর্জোয়াতন্ত্রের গতিমুখে ধনশক্তি প্রতিভূদের নায়কতায় রাষ্ট্র ও সমাজবিধানেই কি ইতিহাসের পথে তাঁর দৃষ্টি থেমে গেলো ?

তবু তো চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেচে : অবিরত চলার বেগে তাঁর জীবন উদ্বেল। সে গতির বন্দনা ফুটে উঠেচে তাঁর অসংখ্য কবিতায়, প্রেমের সাধনায়ও সে গতির স্বীকৃতি আমরা বহুস্থলে দেখতে পাই। প্রেমেরও যে কোনো অচল, অনড় অবস্থা নেই, জীবনগতির সাথে সাথে তা'তেও যে আছে জোয়ার-ভাঁটা, সে-ও যে প্রতি মানুষের অফুরন্ত চলার প্রয়োজনের অধীন, এ'কথাটা রবীন্দ্রকাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেচে—প্রেমের বন্ধনে

জীবনকে পীড়িত না করার প্রয়োজনও তিনি বার বার ঘোষণা করেচেন, বলেচেন যে প্রেম যখন জীবনের সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা' হয় বন্ধন, কর্মহীন অর্থহীনতায় সে জীবনকে আবদ্ধ করে :

চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল,
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল,
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেও সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাতে ক্ষতি নেই,
তবু ভালবাসো যদি বেসো॥

বন্ধু, তোমার পথ সমুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী,
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখি জলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতি তলে॥

দূরে চ'লে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখো ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা করো যদি পাবে তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,

সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই
দিবে লাজ তার বেশ দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোশোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে মোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যে পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয়
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি জয়।'

চিরগতিবন্ত জীবনের চরম বন্দনা এইখানে, ডায়েলেকটিকেল জীবনবিধির এই স্বীকৃতি। মার্ক্সীয় ডায়েলেকটিক এ নয় তবু এখানে আমরা পেলুম এই যে শুধু যা' হবার হচ্চে আপনি হবে, এই ভেবে বসে থাকা নয়—যখন যে চলার পথ আসে তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া চাই। তাইতো রবীন্দ্রনাথ এ জীবনকে এত ভালোবেসেচেন, জীবনকে বরণ ক'রে নেবার দুরন্ত আগ্রহকে সর্ববিধ বৈরাগ্য থেকে মুক্তি দিয়েচেন। এ যদি বুর্জোয়া প্রাণশক্তি হয়, দেশের জীবনে এরই বা সঞ্চার কোথায় হয়েচে? ইতিহাসের অর্থনৈতিক পথেও তো আমরা এখনও তা' সৃষ্টি করতে পারিনি।

সেই তো ভারতবর্ষের ব্যাহত বিপ্লব, সামন্তনিশ্চিন্ততা থেকে যা' দেশকে মুক্তি দেবে। তার পরে দেশের জীবন যে গণশক্তিতে কেন্দ্রায়িত হবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি তার স্বীকৃতি আমরা গাই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানে রবীন্দ্রনাথের বহুবার প্রচারিত বিশ্বাসে। সে নয় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী, নয় মানুষের বৈপ্লবিক পথ কেটে চলার মনোভাব। তবু তো পাই এ'তে পথের ইঙ্গিত, যে পথের কোনো সীমানির্দেশ রবীন্দ্রনাথ করেন নি, কোনো সম্ভাবনাকে তিনি

অস্বীকার করেন না, গণজাগরণের বিরোধিতা কখনো তাঁর দ্বারা হ'তে দেখা যায়নি, প্রতিক্রিয়াশীল তিনি নন। রাশিয়ায় মানুষের নতুন জীবনসৃষ্টির চেষ্টাকে তিনি মনেপ্রাণে অভিনন্দিত করেচেন। মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতে জগতের ও জীবনের যে রূপ, রবীন্দ্রনাথের ভাবরূপ তা' নয়: কিন্তু যে অফুরন্ত প্রাণ রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মর্মবস্তু, ভারতবর্ষে আজও তা' সত্য হয় নি। বৈরাগ্য সংসারৌদাস্য, আধো আধ্যাত্মিকতার আকারে আজও অবনত সামন্ত-প্রথার নি:শ্চেষ্টতা জনচিত্ত অধিকার ক'রে আছে। যে ত্যাগবাদে আমাদের মন নিবদ্ধ, যে সেবাধর্ম আমাদের রাজনীতিরও প্রাণ, রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তিতে তাঁর বৈপ্লবিক অগ্রগতি, এ কথা তাঁর কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় দুরূহ তত্ত্বসন্ধানের চেষ্টা না ক'রেও বলা যেতে পারে। আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল যে কার্যপন্থার কথা স্বদেশীযুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ ব'লে আসচেন তার মধ্যে সামন্ত পরমুখাপেক্ষিতার চিহ্ন কোথাও নেই। বলিষ্ঠ, অন্তর্মুখী তাঁর রাজনীতি: তাই অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট ভাবব্যার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি চরকায় জাতীয় শক্তির অপচয়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, 'আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা-' রই প্রতিধ্বনি তাঁর জাতীয় প্রচেষ্টায় সবাইর সব শক্তি নিয়ে আসার আহ্বানে জেগে উঠেছিল। মার্ক্সবাদী জানেন যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার অভ্যন্তরে যে বিপ্লব সঞ্চারিত হ'তে থাকে, তার চেতনার পূর্বে যাঁদের মনে জাগে, তারাই বৈপ্লবিক আন্দোলনে অগ্রগামী হন—বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজের অনুভূতির স্থলে তাঁরা ভাবী সমাজের আদর্শকে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেই দিক দিয়ে কি আজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথে রবীন্দ্রনাথেরই স্থান নয়? তাঁকে যদি দেশ গ্রহণ করতে পারত তবে কি বোঝা যেত না যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা এখানে জেগেচে? মার্ক্সপন্থীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ চরম নন, কিন্তু সামন্ততন্ত্র থেকে বুর্জোয়া পথে তাঁকে এড়িয়ে যাবার কী উপায় আছে বিশেষত যখন রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান ঘটাতেও এখনও বাকী রয়েচে?

জানি, সে বুর্জোয়া গণতন্ত্র শেষ কথা নয়: মার্ক্সবাদী বিশ্বাস করেনা যে ভারতের সর্বব্যাপী রিক্ততাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ক্ষণেকের তরেও পূর্ণ করতে পারবে। সঙ্কট এখানে চরম, তার অনুভূতি একবার সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন

মুক্ত হ'লে পর আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অকেজো গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না সাম্যবাদী। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ক'রে ছাড়বে, যেমন রাশিয়া করেছিলো। সেই বন্ধন মুক্তিরই জন্যে কি রবীন্দ্রনাথের বাণী অতীব প্রয়োজনীয় নয়? এই পৃথিবীকে ভালোবাসবার, এই জীবন সত্য করবার, বাঁচার মতো ক'রে বাঁচবার যে ডাক আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, রাজতন্ত্রের মানসভূমিতে সামন্ত-তান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তি কি আমরা তাতেই সাড়া দিয়ে পেতে পারিনে? প্রাণোজ্জ্বল জীবনের বেগবান গতিপথ আমরা লাভ করব বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, আগে নয়: কিন্তু অতীতের চড়া থেকে নৌকো ছাড়বার যে প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথের নিকটে আমরা তা' পেতে পারি। তারপর পথ যখন শেষ হবে না, মার্ক্সবাদী সমাজ রূপ নেবার বেলায় আমরা নিরীক্ষণ করব রবীন্দ্রনাথে বুর্জোয়া সংস্কৃতির এক পরম বিকাশ। তার যা ভাবসম্পদ সে সব তখন জনগণের সামগ্রী হবে, বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্যাহত জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীগণ্ডীতে তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেই তো মার্ক্সবাদীর পরম অভীপ্সা: মানুষের সব সুন্দর সৃষ্টিকে রক্ষা করা ও জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। ধনিকের আভিজাত্য সে শেষ ক'রে দেবে, বুদ্ধিজীবীর আভিজাত্যও সে সহ্য করবে না: সর্ববিধ 'স্নবারির' সে অবসান ঘটাবে। শ্রেণীস্বার্থের মোহান্ধ বুর্জোয়া ধনিক ও রাষ্ট্রশক্তি নিজ স্বার্থের খাতিরে স্বাধীন চিন্তা ও ভাবনাকে রুদ্ধ করে, বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা দেয়। কায়েমী স্বার্থের বশে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চরম নিপীড়ণ ও বিকৃতি আমরা ধনিক স্বার্থের শেষ আশ্রয় ফ্যাসিজমের আওতায় দেখতে পাই। সভ্যতার আদি হ'তে জীবনের যাত্রাপথে মানুষ যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেচে, তার প্রতি মার্ক্সবাদীর অসীম শ্রদ্ধা; সে জানে বুর্জোয়া বা প্রলিটেরিয়ান কালচার ব'লে বাস্তবিক কোনো পদার্থ নেই; যে সংস্কৃতি শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক, তা' সত্যিকার, সার্বজনীন সংস্কৃতি নয়; যে সংস্কৃতিতে গণশ্রেণীর অংশ নেই, যা'তে গণজীবন প্রতিফলিত হয়না তাকেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি বলা হ'য়ে থাকে। সত্যিকার গণসংস্কৃতি তাই যার শ্রেণী নির্বিশেষ সার্থকতা: শ্রেণীহীন সমাজের সকল সভ্য তার রসাস্বাদন করবে। মার্ক্সপন্থী সমাজের সাহিত্যের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের ভাবরূপের যে অনেকাংশেই অমিল দেখা যাবে, এ অস্বীকার

করবার উপায় নেই; ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের ফলে কাব্যের পটভূমিকা বদলে যাবে—কল্পনার বর্তমান রূপও বদলাবে, কাব্য হবে বিজ্ঞানোন্মুখ। তা'তে কবিতার মৃত্যু হবে না, দখিন হাওয়ার মর্মর ধ্বনি মানুষের প্রাণে তখনও লীলায়িত হবে: বিজ্ঞানের পথে প্রকৃতির অসীম রহস্য সন্ধানের সঙ্গে কাব্য চলবে সমতালে। সেই হবে প্রকৃত সাহিত্য—অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অসত্য বিধাতার ইচ্ছার ভারমুক্ত। তারই জন্যে চাই আত্মপথ বিরচন ও গ্রহণ, চাই সাম্যবাদী সমাজ। তারই পথ রচনার জন্যে বেরোচ্চে লাল ইস্তাহার, উঠচে মজুরের গান; মজুরের গান গেয়ে শ্রেণীহারা সমাজপত্তন করতে হবে, তার থেকে জন্ম নেবে সত্যিকার গণসাহিত্য, যা'তে মানুষের সাংস্কৃতিক যাত্রার অব্যাহত গতি। রাশিয়ায় মার্ক্সবাদী নূতন ক'রে জনচিত্তে সেক্সপীয়র ও টলষ্টয়ের আসন গ'ড়ে দিচ্চে, ভারতের মার্ক্সবাদীও কখনো সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের দান অস্বীকার করবে না—জনগণের মধ্যে বিপুল সার্থকতায় তাকে ভ'রে দেবে। সে আজ নয়; কিন্তু সেদিনে উত্তীর্ণ হ'বার পথেও কি বন্ধন মুক্তিতে অবিরত যাত্রাধর্মী বুর্জোয়া প্রাণশক্তির রবীন্দ্রনাথের সে বাণীর প্রয়োজন নেই?

বসুধা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও গান

এক রকম মানুষ পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের চারিপাশে এমন কিছু বিকীর্ণ হয়, যে সে আবরণ সরিয়ে কোন কাজ বা সৃষ্টির বিচার প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিকে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এইপ্রকার ব্যক্তির মাঝে ইয়োরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী নানা অসঙ্গতি থাকলেও এই শ্রেণীর লোক বরাবর ভারতে পূজা ও সম্মান পেয়ে আসছেন। গড়পড়তা ভারতবাসী খুব উচ্চস্পর্শী না হ'লেও এই ব্যক্তিত্ব (এরই বিশিষ্ট রূপকে ভারতীয় পরিভাষায় আধ্যাত্মিকতা বলা হয়) অস্ফুটভাবে তার রয়েছে এবং পূজ্যের নির্ব্বাচন সে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই করে। অরবিন্দ, গান্ধি বা রবীন্দ্রনাথ এই দুর্ব্বোধ স্তরের মানুষ। তাঁদের অবধারণে ইয়োরোপীয় মাপজোকের কার্য্যকারিতা কম, অথচ বড়োকে স্বীকার না করেও অব্যাহতি পাই না। হয়ত ভারতীয় বোধ, যা এখনও অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট, আরও ব্যাপক ও জীবনের নানা বৈষম্যের সামঞ্জস্য গভীরতর স্তরে নিষ্পাদন করে। নিজেদের যেদিন বুঝতে পারব, এই অস্পষ্টতা নিরাকৃত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য স্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু এই আভাস-গ্রাহ্য ভারতীয় পরিণতি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী দুর্দ্দিনে ইয়োরোপকে জানা দরকার, পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করে প্রাচ্য কোনদিন তাকে অপসৃত বা নিজস্ব করতে পারবে না। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রষ্টা; ইয়োরোপীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিঞ্চিৎ নৈর্য্যক্তিক বলে তার মূল্য রয়েছে এবং তা আয়ত্তে নিয়ে আসা বিচ্ছিন্নতা ও নীতিসাপেক্ষ।

কোন বিষয়ের ঐকান্তিক চর্চ্চাকে পেশা বলে এবং পৃথিবীতে একটা ধারণা ও সুনিয়ম আছে যে সুজ্ঞাত বিষয়ে পেশাদার পরম সৃজনে সক্ষম। অর্থোপার্জ্জন বা উপাধিলাভ অধিকাংশ স্থলে অপ্রতিবিধেয় হলেও গৌণ ব্যাপার এবং বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জীবিকা-অতিরিক্ত নানা অপথে মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন নজির সংসারে দুর্লভ নয়। নব নব উন্মেষের উদ্দীপনায় পেশাদারের প্রতিভা ও আপেক্ষিক মূল্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পেশা হিসাবে

নিয়েছিলেন অর্থাৎ সাহিত্যে সর্ব্বাঙ্গীন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি ছিল বলে তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিক। কিন্তু রাগসঙ্গীতে তিনি আগন্তুক এবং রাগের আলাপ, বিস্তার, তার নানা কারু-গতিপথের তিনি সন্ধানী ছিলেন না। কম্র ও সুষম অনুভূতি দিয়ে অপর্য্যাপ্ত গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গীতের যে অংশে তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টি নিবদ্ধ, সেখানে তারা লাবণ্যে ও মাধুর্য্যে শ্রীমান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে সমগ্র সঙ্গীতে সঞ্চারিত হবে, তবু রাগসঙ্গীতে তার প্রভাব সুদূরগামী নয়। আব্দুল করিমকে হাজার চেষ্টা করলেও রাগ-সঙ্গীতে অস্বীকার করা চলে না, সেখানে তিনি অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত ও স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে একথা বললে যে শুধু অশোভন ও অন্যায় হয় তা নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য স্বল্প ও পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ভারত দরিদ্র নয়, কারু-প্রতিভা তার নানামুখী ও প্রদেশ, কাল ও জাতিনিরপেক্ষ।

বাংলা গান তাঁর পরে রচনা করতে কুণ্ঠা বোধ হয়। মাত্র বাংলায় নয়, ভবিষ্য ভারতবর্ষে গানের কথা ও সুরের ঢং রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বারা বিশেষ অনুরঞ্জিত হওয়া অদূরভাবী। তার মানে নয় যে গানের সব কথা শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু গানের গীতকালীন কথা সব ধরতে না পেরেও কথা ও সুরের সমন্বয়ের দুর্দ্দান্ত পক্ষাবলম্বীর সঙ্গে কলহে স্পৃহা আজ নেই (তাঁরা 'পরিচয়ে'র ভাদ্র, ১৩৪৫, সংখ্যা পড়ে দেখতে পারেন)। কথা ও সুরের ঝগড়ায় রবীন্দ্র-নাথের সুরের কাজ কত অবলীল, সুঠাম ও মিষ্টি একথা প্রায় ভুলে যাই। বিশিষ্ট গানগুলি এত সুসম্বদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ যে সেগুলির প্রসারণে যে কোন সঙ্গীতীর লজ্জিত হওয়া উচিত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রগীতিতে বিদেশী ছায়া খুঁজেছি, পাইনি কিছু তা নয়, কোন কোন স্থানে আশ্চর্য্যরকম আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। যে কোন স্বর ও শব্দাংশের আশ্রয়ে সুরের অবাধ প্রসরণ অল্পাধিক ভারতীয় সর্ব্ববিধ গীতির ধর্ম্ম। এইখান থেকে রবীন্দ্রনাথ স'রে এসেছেন, কিন্তু দায়িত্ব বিদেশী হার্মনির চেয়ে সর্ব্বদেশী কবির শব্দমমত্বরই বেশী। সুসৃষ্ট ছন্দগুলিকে ওস্তাদী আট মাত্রা, ষোল মাত্রা ইত্যাদির আবর্ত্তনে বাঁধতে গিয়ে কথার সমাপন কোন কোন স্থলে অকারণ বিলম্বিত হয়েছে; ভিন্নধর্ম্মী গানে মাত্র চতুর্মাত্রিক ছন্দ এখানে বজায় রেখে ওস্তাদদের অবজ্ঞা করলেই ভালো হ'ত।

সৃষ্টি দিয়ে সমগ্র মানুষ মাপবার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত র'য়ে যায়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন ইয়োরোপের তুলনায় কিছু অসাধারণ নয়, তা সত্ত্বেও তাঁর মাঝে এমন কিছু ছিল যে তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীতের গান্ধি' এই অদ্ভুত আখ্যা পেয়েছিলেন। ভারতীয় ব'লেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বড়ো, কারণ পৃথিবীতে এখনও সাহিত্য বা গান আধ্যাত্মিকতার প্রকৃষ্ট বাহন হয়নি।

হেমেন্দ্রলাল রায়

কবির চিঠি

গত পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ আশির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। সেই শুভদিনের কথা স্মরণ করে দুটি ঘটনা বলি।

স্বপ্নরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু ১৩৪ সালে আমার ভাগ্যের একটু বিশিষ্টতা ছিল। দেখলুম স্বপ্নে যেন তিনি আমাদের বাড়ীতে কোনো একটা ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ সাদা—উড়ানী পাট করে গলার দুদিকে ঝোলানো। জলযোগের পর তাঁর হাতে নিজেই জল ঢেলে দিচ্ছি; তিনি স্মিতমুখে সলজ্জভাবে এই প্রাক্-ঐতিহাসিক আতিথেয়তা স্বীকার করেছেন। কিছু কথাবার্তাও হ'ল, কিন্তু মনে নেই কী বিষয়ে। তারপর তাঁকে গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখলুম, গাড়ীটা মোটর নয়, অশ্বযান—'পাল্কী-গাড়ী' ও একটি কাষ্ট্রিব্রেড ঘোড়া, পাটকিলে রঙের; কোচমানটিও প্রাচীন। স্বপন দেখার পরদিন সকালে বেড়াতে গিয়েছি হাতীবাগানে—বন্ধুবর 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্র দত্তের বাড়ীতে দেখি সেখানে উপস্থিত আছেন আমার বাল্যবন্ধু প্রোফেসর নীরেন রায়। স্বপ্ন-কাহিনী শুনে নীরেন বললে: 'কাল স্বপ্ন দেখেছেন? কাল তো ছিল ২৫ বৈশাখ—রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন!' তারিখটা তখন আমার মনে ছিল না, বাংলা ক্যালেণ্ডার পাই নি তো! নীরেনের কথা সুধীন্দ্র সমর্থন করাতে আমার ইচ্ছে হ'ল, রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নের সারমর্ম্ম জানাই. পত্রযোগে। উত্তরে তাঁর এই চিঠি পেলুম:

কল্যাণীয়েষু

হারীত, তোমার স্বপ্নে আমার জন্মদিনকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে মোটরযান যুগের পূর্ব্বে। তখন, রবীন্দ্রনাথের ছিল একটা কম্পাস গাড়ী, তার ঘোড়া ছিল পাট্‌কিলে রঙের, খুব কুলীনজাতের নয়।

তখন ছিলেম ঘরের মানুষ। জন্মদিন বছরে বছরেই আসত—আত্মীয়েরা ফুলে ফলে মিষ্টান্নে আদর জানাত, মনে সন্দেহ ছিল না যে আমি সংসারে

আসাতে তারা সকলেই খুসি। গৃহসীমার বাইরে জাতকের খবর নিত না কেউ এবং পঁচিশে বৈশাখ তারিখটাকে আণ্ডারলাইন করা হয় নি। তখন সোনার তরী পর্যন্ত লেখা শেষ হয়েচে। গানের আওয়াজ সভাস্থলে ধ্বনিত হয়েছে, ওস্তাদেরা তার বর্ণসঙ্করতায় ভ্রুকুঞ্চিত করেছিল।

অসম্ভব নয়, তোমাদের বাড়িতে সেই কম্পাস গাড়িতে করে কোনো একদিন গিয়েছিলুম। সেই গাড়িটা আর একবার স্বপ্নে দাঁড়ালো তোমাদের দ্বারে। আমার পথে সেদিন ভিড় ছিল কম, সহজ ছিল আমার গতিবিধি, কাব্যছন্দ গুঞ্জরিত ছিল মাথার মধ্যে যত বেশি পাঠকসমাজে তত ছিল না, কিন্তু গানমন্দের দীক্ষা তার পূর্ব্বেই সুরু হয়েছিল। অর্থাৎ তখন আমার কুষ্ঠিতে বৃহস্পতি ছিলেন গোপনে, শনি এসে বসেছিলেন সদর বৈঠকে। অভাগার ভাগ্যে তাঁর আসন এখনো শূন্য হয় নি।

সেই অখ্যাতদিনের জন্মদিন তোমার স্বপ্নে দেখা দিয়েছে কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের বিশেষ অভিজ্ঞান নিয়ে যায় নি এটাও সেদিনের বিশেষত্ব।

ইতি ৩০শে বেশাখ ১৩৪০
শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় ঘটনাটি তিন বছরের পুরোনো। কবিবর তখন শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশের অতিথি বেলঘরিয়ায়। আমার এক ভাগ্নী, কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিনী, রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করতে অভিলাষিণী হওয়ায় তাকে নিয়ে বেলঘরিয়ায় যাওয়া গেল। কবি প্রথম কুশলপ্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি বিনা-যন্ত্রে গাইতে পারো ?' উমা উত্তর দিতে বিলম্ব করছে দেখে আমি বললুম : 'যদি ব-এ দীর্ঘ-ঈ মূর্দ্ধন্য-ণ-এ আকার হয়, তাহলে উত্তর হবে 'না'; কিন্তু যদি ব-এ হ্রস্ব-ই আর দন্ত্য-ন-এ-আকার হয়, তাহলে উত্তর হবে 'হ্যাঁ'।' কবি তৎক্ষণাৎ বললেন : 'আমি ঐ-উত্তরই তো চেয়েছিলুম ; এ বাড়ীতে যন্ত্রের একটু অভাব।' একটি ভৈরবী প্রধান ঠুংরি শুনে উনি অত্যন্ত প্রীত হলেন ও শান্তিনিকেতনে যেতে অনুরোধ করলেন। এত খাতির সত্ত্বেও আমার ভাগ্নীটির ভৎর্সনা আমায় পেতে হ'ল। তার চোখের সামনে একটি ছেলে কবির কাছে

অটোগ্রাফ নিয়ে গেল, অথচ অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যায় নি বলে সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দায়ী যে আমি, এ কথা সাভিমানে অন্তরালে ব্যক্ত করায়, আমার দায়িত্ব মেনে নিয়ে বললুম কবিকে : 'উমা অটোগ্রাফের খাতা আনতে চেয়েছিল, কিন্তু আমিই আনতে দিই-নি। তা, আমি বলছি কি, যে আপনি তো কালিম্পঙে যাচ্ছেন, সেখানে এ যদি আপনাকে পত্র লেখে আপনি তো তার জবাব দেবেন-ই ?' রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন : 'সেই তো অটোগ্রাফ পাবার প্রকৃষ্ট উপায়!'

উপায় সম্বন্ধে এ ইঙ্গিতটিকে ফলবান করতে বিলম্ব হয় নি। কবির জন্মদিন তখন আগতপ্রায়। একই খামের মধ্যে দুজনের পত্র পাঠানোর পিছনে কৃপণতা ছিল না, এ-কথা আমি খামকা দিব্যি গেলে বলতে পারি না। কিন্তু কবি দুজনকেই এক ডাকে আলাদা লেফাফায় জবাব দিলেন। এরকম ডবল-ব্যারেল্ড বন্দুকের ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথের হাত কতো সাফ, অথচ দিল কতো খুস, সেই-টা দেখাবার জন্যে আমাদের চিঠিরও নকল দিচ্ছি :—

(উমার চিঠি)

২৩শে বৈশাখ ১৩৪৫

পূজনীয়েষু—

গুপ্তনিবাসে আপনার শৈলশিখরে আরোহণ করার দুদিন পূর্ব্বে যখন আপনার প্রথম দর্শন লাভ করি তখন মনে বড়ই দুঃখু হচ্ছিল, কেন অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যাই নি। কিন্তু দুঃখু রইল না যখন আপনি অটোগ্রাফের চেয়ে বড় জিনিষের প্রতিশ্রুতি আমায় দিলেন। চিঠি লিখলে আপনি উত্তর দেবেন-ই দেবেন—আপনার এ রীতির কথা হারীত মামা উল্লেখ করায় আপনি বলেছিলেন 'তথাস্তু।' বর চাইলেই পাওয়া যায়, যদি অন্তরের চাওয়া থাকে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসে ভর কোরে আজ আমি এই চিঠি লিখছি। আমার চিঠিতে কোন প্রশ্ন নেই, তথাপি উত্তরের আশা রাখি। ভূগোলে বলে কালিম্পং কলকাতার উত্তরে।

আপনার শুভ জন্মদিনে উপলক্ষ্যে ভগবানের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

উমা মিত্র

(আমার চিঠি—সংক্ষিপ্ত) ৮-৮-৩৮

পূজনীয়েষু—

পর্ব্বত যাত্রার দুদিন পূর্ব্বে আপনি উমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সাক্ষী আমি। উমারই অনুরোধে তার পত্রের সঙ্গে আমার পত্র যোগ ক'রে পাঠাচ্ছি, অর্থাৎ এ-টি হচ্ছে স্মারক লিপি। সময়ের অন্তরাল আপনার স্মৃতিকে বিস্মৃত করে না এ-কথা আমি জানি। তবু উমার আমন্ত্রণ আমার মনকে আকর্ষণ করেচে, কারণ পত্রযোগে আপনার হস্তাক্ষর হস্তগত করার লোভ উমার মতোই আমারও আছে।

স্নেহপাত্র

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব।

(কবির চিঠি উমাকে)

কল্যাণীয়াসু—

তোমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তা পালন করা কঠিন নয়। মহাভারতে লেখে অর্জ্জুন একদিন গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি—কলম ধরতে পারব না এমন দিন হয়তো আসবে—তার আগেই সত্যরক্ষা করলুম। কিন্তু গাণ্ডীব কাঁপচে, তাই হাতের অক্ষর দেখে কেউ যদি জাল বলে সন্দেহ করে, তাহলে তার প্রমাণ হবে যে সাবেক কালের রবি ঠাকুর আর এই হাল আমলের রবি ঠাকুর দুই ভিন্ন মাপের মানুষ। আমার ৭৮ বছরের জন্মদিনে তোমরা সকলে মিলে যদি আমার নতুন নামকরণ করতে পারতে তাহলে আজ নাম সই নিয়ে ভাবীকালের প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারা ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটবার আশঙ্কা থাকত না। তোমার মামাকে বলে এই নিয়ে একটা আন্দোলন উত্থাপন করতে চেষ্টা কোরো। ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কবির চিঠি)

কল্যাণীয়েষু—

হারীত, তোমার ভায়ীর সঙ্গে পত্রযোগে একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। আমার মতে পঁচিশ বছর অন্তর মানুষের জন্মান্তর ঘটে সেই অনুসারে তার নাম বদল করলে তার পরিচয়টা জটিল হয় না। কতবার শুনেছি সোনার তরীর পরে রবি ঠাকুর আর কবিতা লেখেন নি, তা-যদি হয় তাহলে ঘটা করে টাউন হলে সেই রবি ঠাকুরের একটা শ্রাদ্ধ যথা-সময়ে করা উচিত ছিল। তারপরে ক্ষণিকার যুগে তার নতুন জন্মদিনের পর্যায় সুরু করে তার পারিবারিক নামটা ঘুচিয়ে একটা সর্বজনীন নাম দিলে ইতিহাস বিশুদ্ধ থাকত। নামকরণ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। একেজন মানুষের পাঁচ দশটা করে নাম চলত—সেই ঋষিযুগের মানুষরা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখেছিলেন একজন মানুষ একজন নয়, বহুজনের সমষ্টি, অতএব দুটো কানকে একটা কুণ্ডল পরাবার চেষ্টা অসঙ্গত। কথাটা আলোচ্য যদি মনে করো তাহলে এই নিয়ে আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'প্রচেষ্টা' কোমর বেঁধে তাতে লেগে যাও। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিবরের ইচ্ছানুযায়ী 'প্রচেষ্টা' করার যোগ্যতা আমার নেই। তাই কেবল তাঁবাদি বাঁচিয়ে তিন বছরের মাথায় মাথায় তাঁর ইচ্ছাটি প্রকাশ করলুম সুধীজন সমাজে। তিনি 'বহুজনের সমষ্টি,' সুতরাং তাঁর প্রাপ্য বহু-নাম ও বহু-মান। আর আশি বছরের এই মানুষটির মধ্যে একটি যে সরল ও সবল শিশু লুকিয়ে আছে, তার কাছে আজ আমি নত-শির।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এজ্‌রা পাউণ্ড্‌

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতাবলীর প্রকাশ আমার মতে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। জানি না পাঠকদের একথা বোঝাতে পারব কি না। আমার কথার প্রমাণ অবশ্য কবিতাগুলিই। এ কবিতা পড়তে হবে আস্তে আস্তে, নিস্তব্ধ শান্তিতে এবং চেঁচিয়ে। কারণ এই ইংরেজি অনুবাদ লিখেছেন একজন বিরাট সঙ্গীতকার, একজন ওস্তাদ শিল্পী যাঁর কারবার আমাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার সঙ্গীত নিয়ে।

একমাস হয়ে গেল, শ্রীযুক্ত ইএট্‌সের ঘরে গিয়ে দেখলুম তাঁকে মহা উত্তেজিত এক মহাকবির আবির্ভাবে, আমাদের সকলের চেয়ে মহত্তর এক কবি।

কোথায় আরম্ভ করব ভাবছি। বাংলা দেশে পাঁচ কোটি লোক। বাইরে থেকে মনে হয় রেলগাড়ীতে আর গ্রামোফোনে এ জাতটা বুঝি ডুবেছে। কিন্তু এর তলায় তলায় আছে একটা সংস্কৃতি যার সঙ্গে তুলনীয় বিংশ শতাব্দীর প্রভঁস্‌।

ঠাকুর মশায় এদের মহাকবি আর মহাসঙ্গীতকারও বটে। ইনি এদের জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছেন, মার্সেইএস্‌-এর সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্য-শোভন গান। তাঁর সোনার বাংলা আমি শুনেছি। তার সুর সম্পূর্ণ প্রাচ্য, কিন্তু অদ্ভুত তার জাদু, ভিড়কে মাতাবার মতো। এ গানটা জাতে সীমাবদ্ধ, ঠুংরীজাতের, ব্যক্তিগত, কিন্তু কর্ম্মোদ্দীপনায় পূর্ণ।

প্রসঙ্গত ও কথাটা বললুম। এতে এই প্রমাণ হয় যে দান্তে কথিত তিনটি মহাকাব্যের বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে, প্রেম, জাতীয়তা বা যুদ্ধ আর আত্মিক মাহাত্ম্য।

মধ্যযুগের আরেকটা গুণও লক্ষ্য করা যায় এখানে। ঠাকুর মশায় বহু লোককে তাঁর গান শেখান, তারা জঁগলোরের মতো বাংলাময় সেই গান ছড়িয়ে বেড়ায়। ত্রুবাদুরদের মতো তিনিও গর্ব করতে পারেন, এ সবই আমার রচনা কথায় ও সুরে।

এ কবিতার বাংলা কাব্যরূপ খানিকটা প্রভঁসাল্‌ কানৎসোনি আর প্লেইআড্‌দের গাথা, রাউণ্ডেল্‌ ইত্যাদির মাঝামাঝি। মিলের ব্যবহার অন্যরকম; বাংলাতে চার অক্ষর বা স্বরবৃত্তের মিল পাওয়া যায়, যা leonine বা মধ্যযুগের অন্তমধ্যমিলান্ত ষট্‌মাত্রিক শ্লোকের চেয়েও সূক্ষ্ম ও কঠিন।

বাংলা ছন্দবৃত্ত পশ্চিমের মধ্যে মুক্তছন্দের সব চেয়ে আধুনিক বিকাশের সঙ্গেই তুলনীয়। ভাষাটাও সংস্কৃতজ্ঞ। এর আওয়াজ আমার কাণে শুদ্ধ গ্রীক্‌ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি লাগে।

বাংলাভাষা বিভক্তিমূলক তাই এতে মিল সহজ। গ্রীক বা জর্মানের মতো বাংলাতে সমাস বা সন্ধি চলে। ঠাকুর মশায় বল্লেন তিনি এর ব্যবহার প্রায় সব কবিতাতেই করেন।

এসব দিয়ে দেখাতে চাই যে বাংলা ভাষা কবিতার সহায়, এর তারল্য এবং ব্যাকরণের নমনীয়তায় শব্দে সার্থক তীক্ষ্ণতা আনা যায়। এ ভাষায় কথার পারম্পর্য এদিক ওদিক করা যায়, ইংরেজির মতো অর্থের গোলমাল না করে'।

ঠিক মানেটা, ধারালো সার্থকতা এতে সহজ, কারণ প্রত্যেক বস্তুরই প্রায় স্বতন্ত্র নামশব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণত, ইংরেজিতে আমরা বলি স্কার্ফ, ঠাকুরমশায়ের গান শোনাতে শোনাতে অনুবাদে কথাটা এসেছিল কিন্তু বাংলায় স্কার্ফ্‌ এক নয়, যথা অঞ্চল ও উত্তরী বা কোঁচার খুঁট।.....

এ বই-এর শ' খানেক কবিতা সবই প্রায় গান। সুর আর কথা এখানে অঙ্গাঙ্গী এবং প্রাচ্যের সঙ্গীত এ বিষয়ে বিশেষ শোভন মনে হয়। প্রথমত, এখানে হার্‌মনির হাঙ্গাম নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রীক্‌ মোড্‌স্‌-এর মতো রাগরাগিনীর ব্যাপারটাও সাহায্য করে। কারণ এই রাগিনীতে ভাবানুষঙ্গ জাগে, ফলে বাঙালী শ্রোতা প্রথম চরণ শুনেই কবিতার স্থানকালপাত্র বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে।

রাগরাগিনীর এই সঙ্গতি আমার তো মনে হয় ভারি কার্যকরী। অন্তত এতে কবিতা বা গানে একটা ধর্মাচারমূলক প্রথাসিদ্ধ শক্তি আসে। এবং একটা বিশেষ কবিতা বা গান একটা স্বয়ম্ভু খাপছাড়া ব্যাপারও থাকে না, গানের ও জীবনের একটা সর্বগ্রাহী সম্পূর্ণতার অংশমাত্র হয়। তাই এ গানে

মানুষ ব্যক্তিত্বের গণ্ডী থেকে সহজে মুক্তি পেয়ে কালস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণতায়, যথাযথ বিধিবদ্ধ শান্তিতে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে।

লেখক মশায় বলেন, জানি না এতে আরো কিছু আছে কিনা, আমাদের কাছে এর মূল্য সমধিক, কিন্তু সে হয়তো অনুষঙ্গে। আগের সন্ধ্যায় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই অনুবাদে কি পাও? ইওরোপীয়কে টানবে বলে' কখনো ভাবিনি।

আশ্চর্যই বা কি যে ঠাকুর মশায় বিদেশী ভাষায় গদ্যে তাঁর কবিতায় কি থাকে তাই ভাবেন, মূলের আঙ্গিক সৌন্দর্য, সুর, ছন্দ, মিলের সূক্ষ্ম মিশ্রণ এ সবই তো অনুবাদে বাদ পড়েছে।

আমি বোধ হয়, তাঁর দিক থেকে সময় নষ্ট করেছি, কারণ আমি তাঁর কবি মানস বা বক্তব্য ছেড়ে তাঁর শিল্প ও তাঁর প্রকাশভঙ্গী নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলুম।

তাঁর ভাষার যাথার্থ্য তো রইল। শুধু চোখে পড়লে তাঁর ইংরেজি গদ্যের গতি এড়িয়ে যাবে। চেঁচিয়ে, একটু দ্বিধান্বিত চালে পড়লেই কিন্তু ছন্দের সুষমা ও সৌকুমার্য স্পষ্ট হয় এই ছন্দসৌভাগ্য আমার বিশ্বাস চৈতন্যের গভীরে ঘটেছে, আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল শব্দনির্মাণের পরে কোনো লোক এরকম গদ্যছন্দ ব্যবহার করতে পারেন। নিজের অজ্ঞাতসারেও তিনি শব্দের বেসুরো যোজনা করতে পারেন না।

তারপরে যেটা সব চেয়ে সহজে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে মধ্যে মধ্যে যে জলজ্যান্ত কথা পাওয়া যায়, সেগুলো,—কখনো বা তাতে হেলেনীক শুদ্ধি, কখনো বা দ'ণ্ডরমৌ বা বদলেয়রের চরম নাগরিক চাল।

কিন্তু এর ভিতরে আর একে ঘিরে আছে একটা শান্ত স্থিরতা। হঠাৎ আমরা খুঁজে পেলুম আমাদের নূতন গ্রীস্। রেনেশান্স্-এর সময়ে ইওরোপে যেমন সামঞ্জস্যবোধ ফিরে এল, তেমনি আমার মনে হয় যে আজকের এই যন্ত্রের বিষম ঝঞ্ঝায় আমাদের মধ্যে এল এই একটা সুস্থ ধীরতা।

অডিসির নীতি—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন, মধ্যযুগের বিড়ম্বিত চিন্তাধারাকে এর চেয়ে বেশি মুক্ত করতে পারে নি।

এ সব কথা হঠাৎ বলছি নে, আবেগের মাথায় বা একটা বড়ো কথার ঝোঁকে। এ বিষয়ে মাসাধিকাল ভেবেছি।

এখনো ঠাকুর মশায়ের অননুদিত অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে বলবার সময় আসে নি। যে বইটি সামনে রয়েছে তার সঙ্গে তুলনায় আমার জানা একটি বইই শুধু মনে পড়ছে, দান্তের পারাডিসো।

Ecco chi crescerá li nostri amori (ঐ! আমাদের প্রেমগুলি যিনি বিকশিত করেন)—দান্তে চতুর্থ স্বর্গে ঢুকে সহস্র আত্মার এই গান শোনেন। অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজের কণ্ঠ অন্যরকম, তার অতীন্দ্রির ভক্তি ততটা আবেগময় নয়, বরং শান্ত। এরকম কথা—

Poiche fur gioconde della faccia di Dio (যেহেতু ঈশ্বরের মুখশ্রীতে এদের প্রথম আনন্দের সঞ্চয়) প্রাচ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেবে ব'লেই মনে হয়।

বোধ হয় স্বর্গের মৌমাছিরা গোলাপের মধ্যেই অন্তর্স্ফুট, এই দিব্যচিত্রই রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের চাবি।

তার মধ্যে প্রকৃতির স্তব্ধতা সমাহিত। কবিতাগুলি মানসিক জলঝড় বা আগুনে তৈরি নয় ব'লে লাগে, মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক মনের ধরণটাই এইরকম। প্রকৃতিতে তিনি মিল পেয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে কোনো বৈষম্য বা বিরোধ নেই। প্রতীচ্যরীতির সঙ্গে এইখানে তাঁর দারুণ তফাৎ, 'মহৎ নাটক' আমরা লিখতে পারি মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিষয়েই। হেলেনীক যে ধারণা যে মানুষ দেবতাদের হাতের পুতুল মাত্র, এবং কী দেবতা কী মানুষ উভয়েই ভাগ্যের ক্রীতদাস, এ ধারণা এই প্রাচ্য কবিতার বিপরীত।

ছ'মাস আগে আমি রেণেশান্সের মানবধর্ম প্রসঙ্গে লিখেছিলুম মানুষ মানুষ নিয়েই জড়িত, ভুলে যায় সমগ্রকে, দেশকালসম্ভূতিকে। ফলে পাই প্রথমে নাটকের যুগ, তারপরে গদ্যের।

এ জাতের মানবধর্ম আজ স্রোত হারিয়ে শুকনো, মনে হয় বাঙলা থেকে বুঝি তার সংশোধন ও সুষমীকরণ এল।

প্রমাণ করতে পারব না। মহৎ সৃষ্টির সমালোচনা প্রমাণ করার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিতেই সার্থক।

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥

একশোটার একটা গান এটি, ইংরেজিতে এর রণ্ডেল-রূপও নেই, উন্মনা, সুকুমার সুরও নেই। ছন্দোবৃত্তের কথাটা ভাবো, প্রথম শব্দে গলার তীব্রতা, তারপরে তিন চারটি স্বরে তারই রেশ টানা, ট্রকেইকের চেয়ে দীর্ঘ ছন্দোবৃত্তে।

উদ্ধৃতির জন্যে যে কবিতাই তুলি, পরেরটা পড়েই ভাবি বুঝি ভুল করলুম। হয়তো সরল স্বীকারোক্তি সব চেয়ে ভালো সমালোচনা। ঠাকুর মশায়ের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনা মেশাতে চাই না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুইএর সম্পর্ক এত নিকট যে আমি দুটো কথা বলব কিছু বাখ্যা না করেই, সোজাসুজি।

ঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে যখন আসি, তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর, পরণে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র, মোটা, ভারি কাঁটা-ওয়ালা অস্ত্র।

একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে হয়তো কিরকম স্বস্তি তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ঠাকুর মশায় সোফায় ব'সে, বাংলা থেকে পড়ে আমায় শোনাচ্ছেন, এমন সময়ে বাড়ীর কর্ত্রীর তিন বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে ভীষণ হাসতে আর গোলমাল করতে লাগল। কবি তক্ষুনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, ঠিক শিশুটির সুরেই।

তিনি কি হঠাৎ শিশুর উল্লাসে এক হ'য়ে গেলেন? না একি প্রাচ্য ভদ্রতা? অথবা এটা কি সোজাসুজি স্বীকার যে বিশ্বের সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা আর শিশুর স্ফূর্তি একই ছকে পড়ে?

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

এ কবিতাগুলিকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভাবলে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা বদলে যাবে। কারণ এতে সেই তথাকথিত নেতিবাদ তো নেই, আছে গ্রহণের আলোক।.....

সংক্ষেপে এ কবিতাগুলিতে আমি পাই একটা চরম শুভবুদ্ধি, যাতে ক'রে আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের বিশৃঙ্খলায়, সহরের গোলমালে, কলে তৈরি

সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনের ঘূর্ণিতে যে সব জিনিষ চাপা প'ড়ে যায়, তাই আবার চোখে পড়ে।.....

যদি কোনো দোষ থাকে, তাহলে কবিতাগুলির সাধুভাষাই হয়তো জন-সাধারণের পক্ষে দোষ ব'লে গণ্য হবে। আমি অবশ্য তা মানি না। আমার তো করুণাই জাগে যখন দেখি কোনো পাঠক বোঝে না যে এ সাধুতা বা ভক্তি দান্তের কবিত্বজ ভক্তিই এবং সুন্দর।

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে বুনিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।—
যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।—
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পনের গান
গাবো নীরব অবসরে।

এই প্রশান্তিই দেখি মৃত্যুর কবিতাগুলিতে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।—
অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যতো নিয়েছি তার বেশি।

* * *

সুইন্‌বর্ণের কবিতার আবহাওয়া অবশ্য ঠাকুরের কবিতা থেকে একেবারে আলাদা—ঠাকুর মশায় সত্যই বলতে পারেন—

'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার ;
তোমার কাছে রাখে নি আর সাজের অহঙ্কার

(এর পরে দুপৃষ্ঠাব্যাপী বাংলাগানের আঙ্গিক আলোচনা তর্জমায় বাদ দেওয়া গেল, আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রধানত এই গান দুটি :

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কাণে কাণে।—
আমারে তুমি অশেষ করেচ
এমনি লীলা তব।)

নিছক স্বার্থে আমি গীতাঞ্জলির সমাদর চাই। ঠাকুর মশায়ের এ ছাড়াও অনেক রচনা আছে, নাটক, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। শিশুর কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, কবে বেরোবে আগ্রহে ভাবছি।

সমালোচনায় যখন কূল পাওয়া যায় না, তখন সমালোচ্য রচনার মূল্য সম্বন্ধে নিজেকেই ব্যক্তিগতভাবে জমা রাখতে হয়।

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

এ কথা ঠাকুরমশায় নিজের লেখার বিষয়ে খুবই বলতে পারেন, সব মহৎ শিল্পেই দূরের লোক বন্ধুতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে' ওঠে। পরস্পরের শ্রদ্ধা এতে বাড়ে, অর্থবিজ্ঞানের শান্তি প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতা দিয়ে স্বদেশসেবার চরম করলেন। তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিভাগের শ্রেষ্ঠ দূত।

তাঁর কবিতার সৌন্দর্য স্পষ্টই প্রাচ্যের, কিন্তু সংহত কঠিন। অধিকাংশ দক্ষিণপ্রাচ্যের শিল্পের অতিপ্রাচুর্য এতে নেই, আমাদের মন এত ব্যাহত হয় না। সর্বোপরি, তাঁর রচনা শান্ত ধীর, রৌদ্রদীপ্ত, বসন্তময়।···একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে আমার কাজ শেষ, এর পরে বলব বইটি পড়তে।

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

(এজরা পাউণ্ডের ১৯১৩ সালের মার্চের Fortnightly Review-র সমালোচনার আংশিক অনুবাদ। অনুবাদক :—বিষ্ণু দে)

পুস্তক পরিচয়

MY BOYHOOD DAYS—Rabindranath Tagore. Price Rs. 2/-

গল্পসল্প—১৲
আরোগ্য—১৲
জন্মদিনে—১৲

} শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

প্রথম বইখানি 'ছেলেবেলার' ইংরেজী অনুবাদ। মূল বাঙলায় তার অনেক প্রশস্তি বেরিয়েছে। রস ও শিশু-সাহিত্যের দিক থেকে সেটি অতুলনীয়। বাঙলা ভাষারও যুগ প্রবর্তন হবে তার সাহায্যে। Basic বাঙলা জন্মগ্রহণ ক'রেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন হল এটি কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ইংরেজী অনুবাদে সেই সরলতা রাখবার চেষ্টা সফল হয়েছে। ফলে বইখানির মূল্য অন্যধারে বৃদ্ধি পেল। অ-বাঙালীরা আজ রবীন্দ্রনাথের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনায় তাঁর প্রতিভা-উন্মেষের প্রতিবেশে আগ্রহান্বিত। একটি ব্যাপারে বড়ই বিস্ময় লাগে। শিশু-শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। তার একটি মোটা সুর এই : কাম-দমনের ফলে বিস্তর ক্ষতি হয়, অতএব ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সে জৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানদানই উচিত, বিশেষতঃ যখন ছ বছর বয়সেই শিক্ষা অর্থাৎ অর্জিত অভ্যাসের ধারাগুলি ঠিক হয়ে যায়। এই মতবাদের কোনো সমর্থন পেলাম না বইটিতে। আমার বক্তব্য এই : পৃথিবীতে যে কজন যথাসম্ভব পূর্ণ মানুষ জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। কেবল তাই নয়, ভদ্র-রুচির সতত পরিচয়ে তিনি তাঁদের থেকে পৃথক, অতএব সভ্যতার ইতিহাসের অধিক পরিমাণে অনুগামী। এ-ক্ষেত্রে হয় আমাদের মানতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ফর্মুলার বাইরে, না হয় স্বীকার করব যে ফর্মুলাগুলি আংশিকভাবে সত্য —অর্থাৎ হাইপথেসীস মাত্র। খণ্ডকে পূর্ণ করে দেখার ফলে পূর্ণকে অপমান করা হয়। তাতে পূর্ণের ক্ষতি হোক বা না হোক্ আপন বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয় নিশ্চয়।

'গল্পসল্প' নিয়ে একটি পরীক্ষা করলাম। পড়বার পর আমার ভাইঝিকে পড়ে শোনালাম। উৎসাহ তার দেখে কে! সন্ধ্যায় দেখি সে খাটের নীচে লুকিয়ে বইখানি পড়ছে। "বড়ো খবর' পড়লি? বুঝেছিস?" "খুব মজা—এ যেন সেই মাথা ও হাত পায়ের ঝগড়া।" "ম্যানেজার বাবু'টা কেমন লাগল?" "খুব ভাল; কিন্তু লোকটা পাজি। দুধে স্নান করে ত' রাজকন্যে, ম্যানেজার বাবু করতে গেলেন কেন?" ভাইঝি আমার মার্ক্সিষ্ট নয়, তার বয়স মাত্র আট বছর। আমি ভাবি রূপকের সাহায্যেই কি বামমার্গী সাহিত্য গড়ে উঠবে, যে রূপকের সূক্ষ্মতা ও কারুকার্য্য একাধারে সাহিত্য রসিককে আনন্দ দেবে, অন্যধারে যার সরল গতি শিশুমনকে নতুন সমাজের দিকে আকৃষ্ট করবে?

'রোগশয্যা' প্রকাশিত হবার পর-পর এই দু'খানি কবিতার বই বেরুল। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি নামকরণ না করতেন তা হলে বিশ্বাস হত না যে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়েছিলেন কিছুকাল পূর্ব্বে। বলতে কি আমার সন্দেহ হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা সাম্বাদিকের আবিষ্কার। তাঁদের দোষ দিই না, কারণ, সত্যই যুদ্ধের খবরে নতুনত্ব কমে আসছিল। নিজের অবিশ্বাসকেও দোষী করি না; যাঁর হাত দিয়ে এই ধরণের কবিতা এখনও বেরুতে পারে তিনি যে অবিনশ্বর। আর বয়স একাশী! হয় ঠিকুজীতে না হয় পাঁজিতে কোথায় ভুল আছে। নচেৎ, "মোর চেতনায় আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়"—এটা সম্ভব হত না। সমগ্র বিশ্বের, সকল ইতিহাসের, অনাদি ও অনন্ত প্রাণলীলার, আধুনিক কল্পান্তের স্পন্দন ও কম্পন যাঁর জীবনে অনুরণিত হয় তিনি প্রৌঢ়ত্বের কেন, যৌবন-সীমাও অতিক্রম করেন নি। প্রাণের এই সদা জাগ্রত অবস্থা, শক্তির এই পূর্ণ স্ফুরণ জয়ন্তী-উৎসবের অন্ততঃ একটি উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কেননা, তিনি এখনও লিখতে পারেন

"এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আমরণ,
সম্পূর্ণ যে-আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।' (জন্মদিনে ২)

কিংবা "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি

এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

পূর্ণতার আহ্বানে যে শক্তি সঞ্চিত হয় সে মৃত্যুঞ্জয়ী। পৃথিবীর ইতিহাসের এতবড় বিস্ময়ের বস্তু বোধ হয় কখনও ঘটেনি যে ষাট বৎসর সাধনার পরও বিশ্ববোধের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হচ্ছে এক কলম দিয়ে, এই পরাধীন দেশে সভ্যতার এই বিষম সংক্রান্তিতে। শুনুন আপনারা তিনি কি বলছেন

'এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।' (জন্মদিনে ২১)

সৃষ্টির আহ্বানে জাগ্রত হবে কে?

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কমে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" জন্মদিনে (১০)

কারা তারা?

'ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।' আরোগ্য (১০)

অথচ, অথচ কোলকাতায় এসে শুনলাম ও পড়লাম যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি। এককালে ছিলেন তিনি শেলী ও বায়রণ, আজ অন্য নাম অর্জ্জন করেছেন। আমাদের মনের দাসত্ব কি কখনও ঘুচবে না! আমি এইমাত্র বলি: ধরতাই বুলির নাগপাশে রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে গেলে নিজেদেরই অপমান করা হয়।

"তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হ'য়ে র'বে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা।—রবীন্দ্র সংখ্যা। সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু।

বাঙলাদেশে রবীন্দ্রভক্ত এমন কেউ আছেন কিনা জানি না—যিনি 'কবিতা'র রবীন্দ্রসংখ্যা প'ড়ে খুসি হবেন না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই একটি সংখ্যায় যতগুলি লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে তা' পুরো এক বৎসরে প্রকাশিত হ'লেও বিস্ময়কর হ'ত—অবশ্য, অনেকগুলি লেখা পড়ে আক্ষেপ হয় যে আরও একটু বিস্তৃত আকারে কেন লেখা হয় নি। কিন্তু তার উপায় ছিল না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই সংখ্যাটিকে অলঙ্কৃত ও সম্পাদকের কৃতিত্ব প্রমাণ করছে। বুদ্ধদেবের নিজের রচনাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সংখ্যার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক দুটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটি পড়ে আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে আশী বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে নতুন মহলের সন্ধান পেয়েছেন—তাতে এত সম্পদ আছে যে তার সামান্যমাত্র নমুনা আমরা পেয়েছি।

ক. খ. গ

সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ল্যাজামুড়োর তফাৎ থাকে না। এ কথার সব চাইতে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন থেকে। এমন সব কাজে তাঁকে অনেক সময়ে হাত দিতে হয়েছে যা নিতান্তই ল্যাজার যোগ্য, মুড়োর পক্ষে অশোভন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি হ'লেও কর্মিষ্ঠ লোক—কবিতা সারা জীবন লিখলেও কবিত্ব ক'রে তিনি কখনো সময় নষ্ট করেন নি। যখন যে-কাজের তাগিদ এসেছে—নিজের মনের প্রেরণায় বা বাইরের প্রয়োজনে—তাতেই তিনি উৎসাহে সাড়া দিয়েছেন। তাগিদ আসতে ত্রুটি হয়নি, কেননা এই দুর্গত দেশে যোগ্য কর্ম্মী পথে ঘাটে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে যেত না নবযুগের যে সূচনাকালে রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও মধ্যজীবন কেটেছে।

তা'ছাড়া মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের মতন বিচিত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভা মামুলী পথের মোলায়েম পরিসরের মধ্যে বিকাশের সুযোগ পায়না, তাকে নিজের পথ ক'রে নিতে হয় বিস্তর ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে এবং একাধারে ইঞ্জিনিয়রের মাথা ও কুলির গতর খাটিয়ে। তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যের রুগ্নশয্যা থেকে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের খবর তন্ন তন্ন ক'রে জেনে সঙ্গীত, চিত্রকলা, শিশুশিক্ষা, গ্রন্থপ্রকাশ, গবেষণা ও গ্রাম-সংগঠনকে এক সূত্রে গ্রথিত করছেন। স্বদেশী যুগে গানে ও বক্তৃতায় যখন রবীন্দ্রনাথ দেশ প্লাবিত ক'রে দিয়েছিলেন তখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে নেতাদের সঙ্গে যে বিষয়ে তাঁর নিত্য পরামর্শ চলত তা এই যে দেশের মধ্যে যে ভাবস্রোত এসেছিল কি ক'রে তাকে কর্মের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যায়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে এর আভাস আমরা পাই।

তারও আগে যখন বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় রবীন্দ্রনাথ কাটাতেন পদ্মা ও গোরাই নদীর সঙ্গমস্থলে, তখনো দেখি শিলাইদা কুঠির এক অংশে তিনি স্থাপন করেছেন তাঁতের ইস্কুল, আর এক অংশে তিনি কাছারিতে ব'সে চালাচ্ছেন জমিদারির কাজ, এমন কৃতিত্বের সঙ্গে যে হাড়ে ঘুন-ধরা ইংরেজ

সিভিলিয়ন পর্যন্ত সরকারি রিপোর্টে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে পারেন নি।" এরই ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ এবং তাই দিয়ে মাসের পর মাস ভ'রে উঠত 'সাধনা' পত্রিকা।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার যে সামান্য অংশের প্রকাশ বিশেষভাবে এই 'সাধনার' সঙ্গে জড়িত আজ তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি না—বলছি সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ যে-সব আশ্চর্য সাহিত্যিক রচনা প্রথমে 'সাধনা' ও পরে গ্রন্থাকারে ছাপা হ'য়ে চিরকালের জন্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই সব রচনা জনসাধারণের চোখের সামনে রয়েছে, সুতরাং তাদের আলোচনার প্রয়োজন থাকলেও তাদের সন্ধান দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এমন বহু রচনা 'সাধনায়' প্রকাশিত হয়েছিল যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এবং যার কথা এ যুগের অল্পসংখ্যক লোকই জানেন। 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা,' 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ,' 'সাময়িক সার সংগ্রহ,' 'আলোচনা,' 'প্রসঙ্গ কথা' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে 'সাধনা'-পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে সেগুলি ছাপা হ'ত। এই বিভাগগুলির সম্পূর্ণ ভার একা রবীন্দ্রনাথ বহন করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের একাধিক লেখকের রচনায় সমগ্র 'সাধনা' পত্রিকা এবং বিশেষ ক'রে এই বিভাগগুলি সমৃদ্ধ হ'ত। লেখিকা ইন্দিরা দেবীরও অভ্যুদয় হয় সেই সময়ে।

এইখানে বলা দরকার যে ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যখন 'সাধনা' মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন বৎসর সম্পাদনের পর 'যোগ্যতর হস্তে' পত্রিকার ভার অর্পণ ক'রে সুধীন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করেন। এই যোগ্যতর হস্ত রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ইতিপূর্বেই 'সাধনা'র প্রায় প্রতি রচনাতেই এই হস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাহিত্যিক মহলে বিশেষ সমাদৃত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমূল সংশোধন ক'রে দিতেন।

পরের রচনার সংশোধন অবশ্য সম্পাদকের যোগ্য কাজ এবং সাহিত্যিকের পক্ষেও অশোভন নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র বিভিন্ন বিভাগের উৎকর্ষের জন্যে যে-সকল কাজ করতেন বর্তমান অনেক সাহিত্যাকাঙ্ক্ষী পত্রিকার কনিষ্ঠতম সহকারী সম্পাদকও তা করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে সাধনার প্রথম বর্ষে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত 'মাকড়শার দাম্পত্য,' 'উটপক্ষীর লাথি,' ও 'ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা'। এরূপ দৃষ্টান্ত অজস্র দেওয়া যেতে পারে, কেননা রবীন্দ্রনাথের লেখনী এখনকার মত তখনও অবিশ্রান্ত রচনা বর্ষণ করত। আশ্চর্য এই 'উট-পক্ষীর লাথি' যে লেখনী থেকে বেরিয়েছে তারই থেকে সেই একই সময়ে বেরিয়েছে 'সোণার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি বই-র কবিতা ও গল্পগুচ্ছের বিখ্যাত সব গল্প। এই ভাবে মাসের পর মাস প্রতিযোগিতা চলত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের। সেই সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ আজ প্রাচীন-পত্রিকার জীর্ণস্তূপে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই স্তূপের মধ্যে সন্ধান করলে এমন এক একটি রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় যা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার পাশেও নিষ্প্রভ হয় না। মনে রাখতে হবে এগুলি লিখিত হয়েছিল বিশেষ ক'রে সাময়িক কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে—সাহিত্যসৃষ্টির গভীর প্রেরণা থেকে নয়। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার এমন একটি দিকের পরিচয় এই রচনাগুলিতে সন্ধান পাওয়া যায় যা আমরা তাঁর নিছক সাহিত্যিক রচনায় পাই না। এই জাতীয় রচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল। এগুলি সংগৃহীত হয়েছে 'সাধনা'র বিভিন্ন সংখ্যার থেকে।

'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার বই 'আর্যগাথা'র, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস 'ফুলজানি'র ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সমালোচনা 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। এগুলি অবশ্য অপেক্ষাকৃত বড় সমালোচনা। কিন্তু সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায় চুটকি সমালোচনাগুলিতে। 'সাধনা'র একই সংখ্যা থেকে এই জাতীয় চুটকি সমালোচনার দুটি নমুনা দেওয়া গেল :—

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন। প্রকাশক বলিতেছেন, "সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্মিণীকে

পত্র লিখিতেন! পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা। হয় ত রেল্‌ওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন।"—এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অতিশয় কঠিন কার্য্য। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না, পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাইনা। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপনপত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ সকল পত্র কবির জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোন বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ-আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় সম্বন্ধীয় যে সকল বিশ্রব্ধ কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভাল হইত। প্রথম পত্রেই উমেশ বাবু ও মধু বাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সঙ্কোচজনক বোধ হইয়াছে—এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে—প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গীটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করা যায়—কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়-বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীন বাবুও যে এই সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র। জগতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া জ-বি নামক প্রচ্ছন্ননামা কোন ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। জগৎ ক্ষমা করিবে কিনা জানি না কিন্তু এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং ঝুঁটা সেন্টিমেণ্টালিটির চূড়ান্ত দেখান হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে আড়ম্বর-পূর্ব্বক জগতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার অভিনয়টি সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য।

সাহিত্য সমালোচনা হ'লেও এই চুটকি রচনাগুলিকে ঠিক সাহিত্যিক রচনা না ব'লে সাংবাদিক রচনা বলাই ঠিক হবে। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্লেষ-নৈপুণ্য সাংবাদিকের সব চাইতে ধারালো অস্ত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'সাধনা'য় এই অস্ত্রের চরম প্রয়োগের নমুনা পাওয়া যায় পলিটিক্যাল মন্তব্যে। অথবা বলা যেতে পারে রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনায়। এক্ষেত্রে 'পলিটিক্যাল' বা 'রাষ্ট্রনৈতিক' কোন কথাটি ঠিক সে আলোচনাও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র কোনো এক সংখ্যায় করেছিলেন—যেমন করেছিলেন 'পঁহু' 'নিছনি' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নিয়ে। 'সাধনা'

থেকে নিচে একটি শ্লেষাত্মক রচনা উদ্ধৃত হ'ল যা প'ড়ে বর্তমান অনেক কৃতী 'স্তম্ভ' লেখক হতাশ হবেন।

সার লেপেল্ গ্রিফিন্

কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের যেই যেই আওয়াজের মধ্যে কোন প্রকার গাম্ভীর্য্য অথবা গৌরব নাই—কিন্তু সিংহের জাতে থেকি সিংহ কখনও শুনা যায় নাই। সার লেপেল্ গ্রিফিন জুন মাসের ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি একটা থেকি থেকি আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হৌক্, বাঙ্গালীদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোন ফল না হউক্ আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট্ করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কন্‌গ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানা কারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল, এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজে দেখে। এজন্য গ্রিফিন্ সাহেব ধন্য।

তিনি আরও ধন্য যে, তিনি কোন যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপক্কতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্ব্বল ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি জিনিষটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্ব্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এতপ্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। গ্রিফিন্ যখন সেই অশিষ্টতা

অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙ্গালীর কোন স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙ্গালী জিলাশাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙ্গালী মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি কোন অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূল তত্ত্ব গড়া যায় কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্ব-রচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরাজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোন কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্য্যাদা থাকে; কারণ যে লোক সৌভাগ্যবান্ এবং ক্ষমতাবান্ তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মত যাহারা দুর্ভাগা, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই, সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরাজি বড় কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন্ বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্ব্বে নিজেদের পার্লামেণ্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগযুদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরাজ মন্ত্রিসভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে—এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

এটি সংগৃহীত হয়েছে 'সাময়িক সার-সংগ্রহ' থেকে। নিম্নে এমন আর একটি শ্লেষাত্মক রচনা 'সাধনা'র আলোচনা-বিভাগ থেকে উদ্ধৃত হ'ল যার স্থায়ী মূল্য আছে।

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কিরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোন দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণ স্বরূপে নিম্ন-লিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ল্যুকস্ সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সব্‌ডিবিশানের হর্ত্তা কর্ত্তা। তাহার ভৃত্য সেই অভিমানে রেলোয়ে পুলীসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলোয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। পুলীস ইন্‌স্পেক্টর তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহেবের সেবককে জলন্ত অঙ্গারবৎ পরিত্যাগ করে।

সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায় রাত্রি পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে ধরিয়া রাখে। আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষ্যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন, বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ, তাহারা আমাদিগকে বড় মারে, আমাদের বড় লাগে!

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষ্য পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশিরে লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোন সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না, কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-বোধ নাই তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোন মর্ত্ত্য গবর্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্মেণ্ট কি কখনও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক্, পারেন; মনে করা যাক্ গবর্মেণ্ট এমন এক আশ্চর্য্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কি হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ইহার কি কিছু লাঘব হয়নি? গবর্মেণ্টের সতর্কতা যখনি শিথিল হইবে তখনি ত উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নত পৃষ্ঠে আবার চাবুক বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে নহে, চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া যে অপমান দূর করিতে পারে না সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মত আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার করিতেই শিখিয়াছি।

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকি সুরে নালিশ করিতেছেন, যে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে শিখাইতেছেন—সম্পাদক মহাশয় একথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্মেণ্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখাইতেছেন? যখন ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য্য করিয়া আদর পাইবার জন্য বাড়িতে কাঁদিতে আসে তখন অতিবৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় সেই পরকে গৃহ-কোণ হইতে বাগাস্ত করিতে বসার চেয়ে ছেলেকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্—এবং চাবুক খাইয়া অশ্রুনেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেণ্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্।

হিরণকুমার সান্যাল

সম্পাদকীয়

"There has been no one like him anywhere on our globe for many many centuries. That is, Rabindranath is the creator of a nation..... The last historical figure of this kind in Europe has been Homer....."

Hermann Keyserling in the *Golden Book of Tagore*.

রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের প্রবীণতম ও কনিষ্ঠতম সাহিত্যিক। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছাড়া তাঁর সমবয়স্ক সাহিত্যিক আর কেউ আছেন কিনা জানি না। গত ২৪শে বৈশাখ প্রকাশিত 'জন্মদিন' বোধহয় বাঙলা ভাষার আধুনিকতম কাব্যগ্রন্থ। সুতরাং যাঁর অধিকাংশ রচনা আজ বাঙ্গলা ভাষায় ক্লাসিক-এর পর্যায়ভুক্ত তাঁকে তরুণতম সাহিত্যিকরাও সমসাময়িক বলে দাবী করতে পারে। যাঁর সাহিত্যিক জীবন এত ব্যাপক সমগ্রভাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেওয়া মাসিক পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যার পরিসরে অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা আমরা করিনি। তাই পরিচয়ের এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে সম্পাদকীয় পরিকল্পনা বা নির্দেশের ছাপ আদৌ নাই: লেখকেরা শুধু নিজের রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করেন নি, তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পাদকীয় সংশোধনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হ'য়ে।

কিন্তু তবু সম্পাদকীয় মতামত ব'লে একটি ব্যাপার থাকতে পারে এবং এই সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা ব'লেই সেই মতামত প্রকাশ করার তাগিদ বোধ করা অস্বাভাবিক না। এই তাগিদের জোরে সর্বপ্রথম যে কথা মনে পড়ছে তা এই। রবীন্দ্রনাথের যে রচনাগুলিকে আমরা ক্লাসিকের মূল্য দিয়েছি, সেগুলির সঙ্গে যখন সমসাময়িক লেখকদের রচনার তুলনামূলক বিচার করি তখন আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সংখ্যায় প্রকাশিত "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে যখন এই পড়ি—"'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্প ছাড়া আর কোথাও কি পাওয়া যায়?"—তখন মনে সংশয় জাগে এই স্পষ্ট ধারণা আধুনিক বাঙলার তরুণ সমালোচকদের আছে কি না।

ব্যাপারটি তুচ্ছ তবু এর উল্লেখ করছি এই জন্যে যে সমসাময়িকের মোহে আমরা অনেক সময়ে ক্লাসিকের মর্যাদা ভুলি। অপর পক্ষে ক্লাসিকের প্রভাবে সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি যে বিমুখ হই না তাও বলা চলে না। যাই হোক—সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে স্পষ্ট চিন্তন ও স্পষ্ট ভাষণ নিতান্তই অপরিহার্য।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও গান' প্রবন্ধ প'ড়ে স্পষ্ট চিন্তনের প্রয়োজন আরো বেশি ক'রে মনে পড়ে। এই প্রবন্ধের ভূমিকায় ও উপসংহারে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন তা প্রথমত, অপ্রাসঙ্গিক; দ্বিতীয়ত, অস্পষ্ট, এবং, তৃতীয়ত, হেমেন্দ্রবাবুর বক্তব্য আমাদের যতটুকু বোধগম্য হয়েছে তাতে মনে হয়, অশোভন।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবু যা বলেছেন তা অবশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য এত গভীর ও ব্যাপক যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ছাড়া তার আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু তবু হেমেন্দ্রবাবু যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, কেননা, হেমেন্দ্রবাবু সঙ্গীতবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত। সুতরাং তাঁর উক্তি মূল্যবান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অবধানের যোগ্য।

হেমেন্দ্রবাবুর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গানগুলির 'প্রসারণে যে কোন সঙ্গীতীর লজ্জিত হওয়া উচিত' এই অত্যন্ত কড়া মত ব্যক্ত করেছেন ব'লে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একবার বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সুরের সঙ্গে কথা সংযোজন ক'রে যে সৃষ্টি করেছেন তা ছুয়ে ছুয়ে চার নয়—পাঁচ। শুধু এই ব'লে তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। এই পাঁচকে সাত, নয়, এমন কি উনপঞ্চাশ পর্যন্ত প্রসারিত করতে দিলীপকুমার যে কি-রকম প্রবল চেষ্টা করতেন তার প্রমাণ বাঙলাদেশের বহু আসরে আমরা পেয়েছি। হেমেন্দ্রলালের উক্ত মত দিলীপকুমারের গোচর হ'লে তিনি লজ্জিত হবেন এরকম দুরাশা আমরা করি না, কিন্তু এই আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে বাঙলাদেশের উদীয়মান সঙ্গীতীরা হেমেন্দ্রলালের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও পালন করবেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকদের মতামত সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বক্তব্য আমাদের নাই—যদি পাঠকদের থাকে তা জানালে 'পাঠকগোষ্ঠী'তে তার স্থান হবে। শুধু শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 'উৎসর্গ'-বইতে প্রকাশিত হিমালয়-বিষয়ক সনেটগুলির কথা। মনে হয় জ্যোতির্ময় বাবু এগুলি পড়েন নি, কেননা, পড়ে থাকলে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথের বর্ণ-বিন্যাসের পদ্ধতি এঁরা কেউ বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যা করেননি। এই বর্ণ-বিন্যাসের বিশেষত্ব এই যে রবীন্দ্রনাথ রঙ ব্যবহার করেছেন শুধু ছবির বিভিন্ন অংশগুলির উপর প্রলেপ দেবার জন্যে নয়, মুখ্যত এই অংশগুলি সৃজনের জন্যে। বহু ছবিতে নিছক রঙ দিয়ে তিনি রূপ সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বর্ণপ্রয়োগ অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল ও আজগুবি মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব দেখা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের চিত্রে।

সম্পাদকীয় মন্তব্যকে আর প্রসার করা চলে না। স্থানাভাব—তার ওপর ছাপাখানার তাগিদ এসেছে। শেষ কথা এই বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের বহু-মুখী প্রতিভার বিচিত্র ধারার পরিচয় বিভিন্ন লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে দেবার দুঃসাধ্য চেষ্টা আমাদের ছিল না। কিন্তু যে-টুকু পরিচয় দিতে পেরেছি তা সমগ্র না হ'লেও সার্থক, এই দাবি বোধ হয় করতে পারি। কেননা, যদিও বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রবির বর্ণ-বিশ্লেষণ আমরা করিনি তবু বলতে পারি—

But westward, look, the land is bright!

যে-দীপ্তিতে আজ সমস্ত দেশ উজ্জ্বল তার আভাস পাই মার্কস্‌বাদী বসুধা চক্রবর্ত্তীর দ্বিধাগ্রস্থ দৃষ্টিতেও। সমন্বয়যজ্ঞের সমাজতাত্ত্বিক পুরোহিত ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মতন তিনিও মুগ্ধ হ'য়ে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত প্রাচীন ভারতের আহ্বান-বাণী : আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৪৮

পরিচয়

কবিতার প্রকার

ভাবপ্রধান ও মননপ্রধান

আবেগের আর অর্থের বিভিন্ন ধারা কল্পনার প্রভাবে একটা সম্বন্ধ-বন্ধন বা ঐক্যে সংগঠিত হ'য়ে কবিতা হয়। অর্থ-সম্পন্ন বাক্য-ধারার মূলে অনুভূতি ছাড়া চিন্তার সূত্র থাকে। অতএব কাব্যের বাক্যে, অর্থাৎ প্রকাশের ক্ষেত্রে, রসরূপের এককালে একটা ভাবপ্রধান বা চিন্তাপ্রধান ব্যঞ্জনা থাকতে পারে। এটা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে কল্পনার ক্রিয়ারীতির ওপর। কল্পনা বলতে কি বুঝি তা প্রথম প্রবন্ধে বলা আছে। আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে কল্পনা ভাবগতির কিম্বা চিন্তাগতির পথে ঝোঁক দিতে পারে, আর সেই অনুসারে অভিব্যক্তির রূপ বা ভঙ্গীটি নির্দ্ধারিত হয়ে পড়ে।

কবিতায় এই ভাবপ্রধান আর চিন্তাপ্রধান নামক দুটি মূল বিভাগের অধীনে, কল্পনার প্রকৃতিভেদ অনুমান ক'রে, আরো তিনটি প্রকার নির্দ্দেশ করছি উচ্ছ্বাস-প্রধান, খেয়াল-প্রধান আর বাস্তবতা-প্রধান নাম দিয়ে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাবপ্রধান আর চিন্তাপ্রধান এই দুটি মূল বিভাগের কথা আছে। উপরোক্ত সব বিভাগগুলিই যেন রসের প্রকৃতির দিক থেকে। গঠনের দিক থেকে যে সব শিল্পরচনাই চিন্তাযুক্ত প্রণালী সে আলোচনা প্রথম প্রবন্ধে করা হয়েছে।

কবিতায় আবেগের প্রকাশের সব চেয়ে প্রাথমিক যে ভঙ্গী আমরা তর্কের অনুরোধে ধারণা করতে পারি তা হ'ল এই যে ভাব আবেগের সহজ স্বাভাবিক

প্রবাহ আর পূর্ণতার উচ্ছল তরঙ্গিত অবস্থাতেই রসিকের কাছে উপস্থিত হবে। চিন্তার আবরণ বা অর্থধারার সংগঠনের মধ্যে থেকে তাকে চিনে নিতে হবে না। বাস্তবে অবশ্য কবিতার প্রকাশ কখন এই ভাবে সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত হবে না কেননা অর্থপূর্ণ বাক্য দিয়েই কবিতার রচনা আর চিন্তাধারা না বহন ক'রে বাক্য কখন অর্থ-সম্পন্ন হ'তে পারে না। তবু যে পরিমাণে সে অর্থ মুখ্যতঃ ভাবাবেগকেই নিবেদন করতে তৎপর সেই পরিমাণে রচনার একটা সহজ সরল রূপ থাকবে যা সকল কালে সকল দেশে সকল লোকে উপভোগ করতে পারবে। "বঁধু কি আর কহিব আমি" ব'লে সাধারণ ভাষায় যে প্রেম নিবেদনের ভূমিকা রচিত হ'ল চিরদিনের জন্য তাই হ'য়ে রইল অসাধারণ ভাষায় প্রেমের কাব্যস্তুতিও, সার্ব্বভৌমিকতা, সর্ব্বকালীনতা, অনিবার্য্যতা প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্রের নানা লক্ষণে সমৃদ্ধ হয়ে।

ভাবপ্রধান আর চিন্তাপ্রধান কবিতার তুলনামূলক বিচার করতে একটি শিশুপাঠ্য কবিতার এই ছয়টি ছত্র লক্ষ্য করা যাক :—

Hark the little lambs are bleating,
And the cawing rooks are meeting
In the elms—a noisy crowd ;
And all the birds are singing loud,
There the first white butterfly
In the sun goes flitting by !
(Mary Howitt—A Spring Song).

এখানে প্রথম চার ছত্র আমাদের বর্ণিত সরল সহজ আবেগরূপের কবিতা। কারণ এখানে যে উল্লাসবোধের ব্যঞ্জনা আছে সেটা একটা সহজ, অবিমিশ্র, প্রাথমিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। শিশুপাঠকও তাকে অনায়াসে উপলব্ধি আর উপভোগ করতে পারবে। শেষের দুই ছত্র কিন্তু চিন্তাপ্রধান কবিতার শ্রেণীতে চলে যায়। এখানেও আনন্দের প্রকাশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স্কের, অভিজ্ঞতর, চিন্তাশীলের আনন্দ, যিনি স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আর বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে হৃদয়ের বোধকে সম্যক করবেন। ঐ যে "the first white butterfly" কথাটি, ওর অর্থাভাষেই এর প্রমাণ। ওখানে বলা হ'ল যে

বসন্তকালে দলবদ্ধ প্রজাপতি দেখা দেবার পূর্ব্বে প্রথম পতঙ্গটির সহসা আবির্ভাবে দর্শকের আনন্দ তীব্রতর আর গাঢ়তর হয় ; দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির সাহায্যে এ জ্ঞানটুকু পাঠকের আছে বলেই একটি প্রজাপতি দেখার আনন্দকে তিনি পূর্ণতর আনন্দ বলেও জানবেন। অর্থাৎ খুসীবোধেরও যে কমবেশী হয়, আর বিস্ময় প্রভৃতির যোগে যে সেই কমবেশীর তারতম্য হয় এই চেতনা এই দুই লাইনের পাঠকের থাকা আবশ্যক। তবেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রজাপতি দেখার সম্পূর্ণ আনন্দ তিনি পেতে পারবেন আর তবেই কবির ওভাবে বর্ণনা করা সার্থক হতে পারবে। পাঠক আনন্দকে গুণ ছাড়া প্রকৃতি আর পরিমাণের দিক থেকেও উপভোগ করবেন। আকর্ষণটা রসেরই ততটা হবে না যতটা রসধারণার ; emotion-এর চেয়ে idea-র ; ভাবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা আর বুদ্ধিগতও। উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ দুটি ছত্র ঠিক "শিশুপাঠ্য" নয়। ও দুটি ছত্র প্রবীণ Wordsworth-এর দুয়ারে হানা দেয় যেখানে আছে—"Fair as a star when only one shines in the sky"। ভাবপ্রধান কবিতার মূলে হৃদয়, চিন্তাপ্রধানের মূলে আবেগের জ্ঞানবিকাশ, রসের স্তব্ধ উপভোগ।

আসলে এখানে আমরা শিল্পের তত্ত্ব আর ইতিহাস নিয়েই একরকম আলোচনা করছি। শিল্পের জন্ম ত তখনই যখন মানুষ তার হর্ষবোধকে ধ্বনি বা ভাষাতে, বা রঙে রেখায় সচেষ্ট হয়ে প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। আর এই সচেষ্ট প্রকাশ করার অর্থ হল এই যে তার হর্ষকে সে তার ভাবাবেগের উপভোগ ব'লে সজ্ঞানে চিনেছে বা জেনেছে। আমরা বলি বটে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রচনা, কিন্তু সেটা হ'ল চেতনা বা উপলব্ধি আর প্রকাশের মধ্যে সময়ের অল্পতার ইঙ্গিত। ক্যামেরার পটে যেমন, তেমনি কল্পনারও পটে instantaneous exposure-এর ছবি হ'তে পারে ; কিন্তু ব্যবস্থা ক'রে exposure দেওয়াটা একটা জ্ঞান-অধিগম্য চিন্তাযুক্ত পদ্ধতিই বটে। যা হোক এটা মনুষ্যজাতিরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম যে সে তার ভাবাবেগকে আবেগ ব'লে জেনে দ্বিতীয় দফায় তাকে প্রকাশ করতে যায়। এই জানাতেই তো তার উপভোগের ক্রিয়া ন্যায়তঃ সম্পূর্ণ হচ্ছে। Viscount Grey of Fallodon তাঁর "The Charm of Birds" নামক গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন :—

"One who reviews pleasant experiences and puts them on record increases the value of them to himself ; he gathers up his own feelings and reflections and is thereby better able to understand and measure the fullness of what he has enjoyed. This may account sufficiently for the impulse to write."

অর্থাৎ প্রকাশ করবার প্রবণতা হ'ল বুঝে, পরিমাপ ক'রে, রসের মূল্যবৃদ্ধি করবার জন্যে। এই বোধ আর পরিমাপের কথা আসে ব'লেই শেষ পর্য্যন্ত রসের উপভোগকে জ্ঞান বা মননেরই ক্রিয়া আর তার প্রকাশকে চিন্তাজগতেরই একটা অভিব্যক্তি ব'লে বুঝি। এর ওপর যে পরিমাণে শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক আর পরিণত হ'তে থাকে শিল্পের সৃষ্টিও সেই অনুপাতে মননশীলতায় সমৃদ্ধতর হ'তে থাকে।

আবেগের সহজ সরল অভিব্যক্তি আর বুদ্ধি-বন্ধুর পথে তার প্রকাশরূপের তারতম্য ব্যাখ্যাকল্পে এইবার কয়েকটি দুরূহতর কবিতা নির্ব্বাচন করি যেখানে কবিতার বিষবস্তুও বিশেষ ক'রে চিন্তাধর্ম্মী যার ফলে প্রকাশের মননশীল রূপ আরো স্পষ্ট ক'রে অনুধাবন করা যায়। "পূরবী"র "মুক্তি" শীর্ষক কবিতাটির প্রথম কলি এই :—

মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা
সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের
মাঝে দেয় সাড়া।
সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মত লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন, নগ্ন, নিরুদ্দেশ ;
সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

এখানে বক্তব্যের সারাংশ হ'ল যে সকলের মুক্তির পথ এক নয়, এবং কবির মুক্তি সেইখানে যেখানে তাঁর সৃষ্টি প্রকৃতি আর শিল্পের নানা সৃষ্টির সঙ্গে মেলে

(বিশ্বের লীলা যখন তাঁর সঙ্গীতের সুরে প্রতিরূপ পায়)। কবিতার বিষয়বস্তু হ'ল কবির ভাবজীবনের একটা দিক সম্বন্ধে তাঁর মতামতের চিন্তাসাপেক্ষ আর জ্ঞানগোচর দার্শনিক বিবৃতি। ফলে, প্রকাশভঙ্গী যুক্তিতর্কের ধ্বনিতে আশ্রিত। সর্ব্বজনগ্রাহ্য সাধারণ সুরে, স্বল্পালঙ্কার সহজ সরল ভঙ্গীতে, শান্ত সংযত গতিতে, বর্ণনা অগ্রসর হয়। ছন্দের সঙ্গীতে সুরের খেলা বড় নয় ; অর্থই যেন প্রাধান্য পায়। শব্দবিন্যাসে চিত্রমূল্যের মহার্য্যতা নেই ; ধ্বনি সরব নয়। রসলাবণ্যের যে অনুভূতি কবিতাটি থেকে পাওয়া যায় সেটা এ সকলের পরে, যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ওজনটা ভাবের দিকে একটু ঝুঁকবেই।

কিন্তু এই ঝোঁকটা যে আরো কতটা যেতে পারে সেইটে দেখিয়েই আমরা ভাব আর মননপ্রধান প্রকাশভঙ্গীর প্রভেদটা স্পষ্ট করতে চাই। উদ্ধৃত কবিতাটিই আমাদের সে কাযে সাহায্য করবে এবং "পরিশেষ" থেকে "পান্থ" কবিতাটিও, যার আরম্ভও বিচারপ্রবণ :—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

প্রথমে উদ্ধৃত কবিতার আরম্ভের ঐ কথাগুলি—'সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা সেথা পাই ছাড়া, মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের মাঝে দেয় সাড়া'—কবিতার শেষ কলিতে বিলম্বিত হয় এই ভাবে :—

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবস রাত্রির নৃত্যের নূপুর,
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ-যাত্রীর আলোক বেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত !
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চির-বাঞ্ছিত।
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে যে-ভঙ্গীতে কবিতা আরম্ভ হয়েছিল সে

ভঙ্গীতে শেষ হ'ল না। মননের চেয়ে আবেগের ওজন বেড়ে গেল। চিন্তা-রাজ্যের তর্ক-মীমাংসার সুরে যে কথাটা বলা আরম্ভ হয়েছিল তারই ব্যঞ্জনা ব্যক্তিগত রঙে রঙে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। কবির নানা আশা বাসনার মধ্যে সঞ্চরণ ক'রে, কল্পনায় সমৃদ্ধ হয়ে, বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে শরীরী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে, সৃষ্টি কবির 'সৃষ্টি সাথে' মিললো। এমন মিললো যে তাঁরই রক্তে 'শুনা যাবে দিবস রাত্রির নৃত্যের নূপুর'। মুক্তি শুধু সঙ্গীতের মাঝে সাড়া দিয়ে ক্ষান্ত হ'ল না, বক্ষের মধ্যে নক্ষত্র বাজালে 'বংশী-ধ্বনি আকাশ-যাত্রীর আলোক বেণুর।' কবিতায় অর্থধারার রেখা-বঙ্কিমা মিলিয়ে গেল আবেগের ব্যাপক পরিধির মধ্যে।

'পান্থ'-তেও যখনই কবি বললেন 'আমি কবি ; আছি ধরণীর অতি কাছাকাছি, এ পারের খেয়ার ঘাটায়,' তখনই সেই ঘাটেতে তাঁর মননের তরী ভাঙ্গলো। যুক্তির বাঁধন গেল ভেসে, সহস্র স্মৃতি তাঁকে এসে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুললে, এল প্লাবন :—

সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্না হাসি,—
এক তীরে গড়ি তোলে অন্য তীরে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ;
সেই প্রবাহের পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া ;
পড়ে চন্দ্রালোক রেখা জননীর অঙ্গুলির মতো।
কৃষ্ণরাতে তারা যতো
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্তসূর্য্যে রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায় ; সে তরঙ্গে মাধবী-মঞ্জরী
ভাসায় মাধুরী ডালি
পাখী তার গান দেয় ঢালি।

এমন অবস্থায় যে কবি—যে সাধক নয়—তার পক্ষে তো কোন কথা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব, তাই ওপরের ঠিক পরের ছত্রগুলিতেই আবারও সেই একই কথা ঘুরে এল :—

সে তরঙ্গ-নৃত্য ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে,
সে ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।

দুটি কবিতা থেকেই দেখতে পাই যে তাদের গোড়ার দিকের কলিগুলিতে যে কবিত্ব ছিল চিন্তা বা মননপ্রধান, পরবর্ত্তী ছত্রগুলিতে তাই হয়ে উঠেছে ভাবপ্রধান, আর সেই অনুপাতে প্রকাশের ভঙ্গীও হয়েছে ছবিল, রঙে রেখায় উজ্জ্বল, অলঙ্কৃত, ধ্বনিগুঞ্জিত, প্রবাহময়, ছন্দে আন্দোলিত, ব্যক্তিগত।

মনন আর হৃদয়ধর্ম্মের ভারসাম্যের ওঠানামার ফলে প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যের কারণও এখানে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। জ্ঞানের সাহায্যে সেই সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করি (যদি কোন থাকে) যেটা চিত্তের তৃপ্তির মতন একান্ত ব্যক্তিগত নয়, বরং একক, দৃঢ়, স্থির, সর্ব্বকালীন, ব্যাপক, অনাসক্তির রাজ্যে দূরে অবস্থিত। সম্ভব হ'লে তাই এর প্রকাশও গ্রহণ করবে একটা স্থায়ী, অবিচিত্র, অবিমিশ্র, সরল, নিরলঙ্কার, ধ্রুব, সর্ব্বজনগ্রাহ্য রূপ, যেটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা, বাসনা বা কামনার দ্বারা ব্যাহত নয়। অপর পক্ষে হৃদয়ের উপলব্ধি চোখে দেখা সজীব সত্তার সঙ্গে প্রাণের যোগের মতন। হৃদয়ের ধর্ম্মই হ'ল রূপকে কামনা করা ; চোখে দেখার, হাতে ছোঁয়ার, বুকে ধরার, ভালবাসা। অতএব পরিপূর্ণ হৃদয়ভাব যেখানে, সেখানে আবেগকে কল্পনা মনের মতন ক'রে সাকার রূপে গ'ড়ে নেয় ; দর্শনের তথ্য স্পর্শনের সত্য হয়ে দাঁড়ায় ; বর্ণনা পায় আঙ্গিকতা ; ভাষা হয় চিত্রল।

মননপ্রধান কবিতা সম্বন্ধে এ অনুমান করলে ভুল হবে যে ও শ্রেণীর কবিতা শুষ্ক নীরস। এ প্রকারের কবিতার যুক্তি-রূপ যেটা সেটা রসেরই প্রকাশ-রূপ সে কথা গোড়াতে বলেছি। তা' না হ'লে তো কবিতা কবিতাই হবে না। শ্রেণী বা জাতিবিচার শুধু এই হিসাবে যে যেখানে রসের প্রভাব বুদ্ধির আবরণের মধ্যে এক দফা আত্মগোপন করে সেখানেই কবিতাকে বলি চিন্তাধর্ম্মী বা মননশীল। কবিতা বিশেষে এ আবরণের কাঠিন্য কম বেশী হ'তে পারে, বা একই কবিতার কোন অংশ হ'তে পারে আবেগপ্রধান আর কোন অংশ চিন্তাপ্রধান, যেমন উদ্ধৃত কবিতা দুটিতে। শুধু পরিমাণ আর সামঞ্জস্যের মাত্রাভেদে বিভিন্ন নামকরণ। বাস্তব পক্ষে চিন্তাশ্রিত কবিতার মূলে আবেগের

যথেষ্ট প্রবল সিঞ্চন না থাকলে তার পল্লবিত রূপ প্রাণবন্ত আর সতেজ হবে না। তাকে এমন হ'তে হবে যে মানসতার বর্ম্ম ভেদ ক'রে ভাবাবেগের স্পন্দন হৃদয়কে দোলা দিতে পারে। সে বর্ম্ম যদি এত কঠিন হয় যে হৃদয়-বৃত্তি তাতে মাথা ঠুকেও প্রবেশ লাভ করতে না পারে, কিম্বা, অন্য কথায়, বাক্যের অর্থে যদি ভাবের সম্পূর্ণ জাগরণ না থাকে, আর শুধু তার স্বরূপের একটা ক্ষীণ ছায়ামাত্র বা কঙ্কালের ওপর দুর্জ্জয় মননশক্তির প্রয়োগে যদি রক্ত মাংস আরোপ করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তাহ'লে সে কবিতার কোন আবেদনই থাকবে না ; রসরূপের কোন সংবাদই চিত্তে পৌঁছবে না ; আঙ্গিক ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে প্রতি মুহূর্ত্তে। অতএব সার্থক কবিতার এই কষ্টিপাথরই চিরদিন মনে রাখবার যে সে প্রাণ চঞ্চল কি না ; সে সঞ্চারিণী কি না ; তার শিরায় রক্ত জোরে চলে কি না।

ভাব আর মানসের সমঞ্জস সুষ্ঠু মিলনের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন 'পান্থ' কবিতাটিরই শেষ কলি :—

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশ দিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম।
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি নাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্ব্বে পর্ব্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

মননপ্রধান কবিতার স্বরূপ কবিতাতেই বর্ণনা করতে হ'লে এই বিবরণ খাটবে :—

ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

[পূরবী—"বনস্পতি"]

শ্রীনবেন্দু বসু

প্রহসন

সচল গাড়ীখানাকে ব্রেক কসিয়া অচল করিয়া ফেলা—মুহূর্ত্তের ব্যাপার, ইহার পর লাফাইয়া নামিয়া পড়ার অপেক্ষা মাত্র।

সুমিতার একান্ত কাছে সরিয়া আসিয়া সুকোমল বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া ওঠে—ও গড্! আপনি? কী সাং—ঘা—তিক! আরটু হলেই চাপা দিচ্ছিলাম তা' জানেন? এ রকম একলা বেরোবার মানেটা কি? যাচ্ছিলেন কোথা?

—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে বাধ্য নই নিশ্চয়। রুষ্ট স্বরে উত্তর দেয় সুমিতা।

—খুব চটেছেন দেখছি, কিন্তু বাস্তবিক বলছি, কিছু মনে করবেন না ইয়ে—এ রকম বেকুবের মত পথ চললে গাড়ী ফাড়ি চালানো দায়।

—দয়া করে চালাবেনও না। আহাম্মুকের মত গাড়ী হাঁকান দেখলে পথের লোককে বাধ্য হয়েই বেকুব বনতে হয়। নিজেই বা যাচ্ছেন কোথা এ রকম ঊর্দ্ধশ্বাসে?

উদ্ধত প্রশ্ন করে সুমিতা।

—সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য, দেখও, শুধু ভাবছি আপনার বিনয় কী প্রশংসনীয়! "টিলের বদলে পাট্‌কেল" প্রথার প্রচলনটা কে করেছিল বলুন তো? কোন মহিলাই হবেন বোধ করি?

সুকোমল একটু কোমল ব্যঙ্গ হাস্যে সুমিতার মুখ পানে তাকায়, অবশ্য উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

সুমিতা জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—মহিলা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান অসীম, সেটা আর বেশী খরচ নাই বা করলেন! এখন অনুগ্রহ ক'রে সরুন, কাজ আছে।

—মেয়েদের আবার কাজ!

—কেন মেয়েদের কাজ থাকারও অধিকার নেই নাকি?

—কই? 'কাজ কাজ' বলে যেটা নিয়ে বড়াই করেন আপনারা, সেটা নেহাৎই বাজে ব্যাপার, বুঝলেন? বিধাতাপুরুষ মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন শুধু পুরুষজাতির আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে, সেইটাই তা'র সর্ব্বপ্রধান কাজ।

—ধন্যবাদ, বিধাতাপুরুষের উদ্দেশ্য তত্ত্ব না বুঝলেও চলবে—কিন্তু রাস্তার মাঝখানে এ রকম ওপর পড়া হয়ে ঝগড়া বাধানোর উদ্দেশ্যটা কি শুনি ?

—সত্যি কথাটা শুনবেন তা' হলে ? গত কয়েক দিন ধ'রে না দেখতে পেয়ে ভা-রী খারাপ লাগছিল, এ রকম অপ্রত্যাশিত দর্শনে খুসী হয়ে একটু ঝগড়া করবার সখ হচ্ছে।

—খুসীর প্রতিক্রিয়া ঝগড়া ?

—নিশ্চয়। ঝগড়া বাধানোর মত নির্ম্মল আনন্দ জগতে আছে নাকি আর ?

হাসি আর কতক্ষণ চাপিয়া রাখা যায় ? মুখ ফিরাইয়া আড়াল করিবার চেষ্টা করা চলে মাত্র।

—তবু ভালো যে মুখের ওজনটা একটু হাল্কা হ'ল, যা ভয় লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। এতদিন কামাই করছেন কেন ? প্রেফেসর বোস ক্লাসে ঢুকেই চোখে অন্ধকার দেখতে সুরু করছেন যে—

—দেখুন এই সব পচা পুরোনো ঠাট্টাগুলো ছাড়ুন দয়া ক'রে, নতুন কথা কিছু থাকে না থাকে—চুপ ক'রে থাকবার চেষ্টা করবেন।

—নতুন কথা ? সহসা একটা উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠে সুকোমলের চশমা ঢাকা চঞ্চল দুই চোখে।

—অজস্র রয়েছে, কিন্তু শোনে কে ? সময় সুবিধা আর সাহস, তিনটেই আমাদের প্রতিকূল। তবে করুণা ক'রে যদি ভরসা দেন সাহস সংগ্রহ করবার চেষ্টা দেখতে পারি। বোধহয় আমাদের মত হতভাগ্য শ্রেণীর লোকদের ভেবেই কবিগুরু বলে রেখেছেন—"গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে হায় সাহস নাহি পাই—মনে মনে হাসবে কি না বুঝবো কেমন করে—হাল্কা করি তাই—নিজের কথাটাই।"

—আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে—রাজরাস্তায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-কাব্য আওড়াতে হবে না। রাস্তায় ভীড় জমে যাচ্ছে।

—দেখুন, দুটি প্রাণীকে দৈবাৎ একটু কাছাকাছি দেখলেই যারা ভীড় ক'রে দেখে তাদের আমি লোক ব'লে গ্রাহ্য করি না।

—আমি কিন্তু করি—কাজেই পাশ কাটাতে হচ্ছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন যান, আমি নিজের পথ দেখি।

—তার চেয়ে দুজনের গন্তব্যস্থলটা এক হোক না কেন ? ক্ষতি কি ?

—অর্থাৎ ? দুই ভ্রু বাঁকাইয়া প্রশ্ন করে সুমিতা।

—ভয় পাবেন না। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম—একটা লম্বা পাড়ি দেবার বাসনায়, চলুন না দুজনেই ঘুরে আসা যাক, বিধাতার উদ্দেশ্যটাও খানিকটা সফল করুন।

—দায় পড়েছে, আপনার গাড়ীতে আমি চড়তে যাবো কি জন্যে ?

—কেন যাবেন না ? শাস্ত্রবাক্য ভাবুন—"ধনবানে কেনে গাড়ী জ্ঞানবানে চড়ে।"

—যাক্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল বেশ—উদাস ভঙ্গীতে সুমিতা বলে—পরের গাড়ী চ'ড়ে বেড়াবার সখ আমার নেই।

চশমা খুলিয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে সুকোমল মৃদু হাস্যে বলে—অপরকে বাহন ক'রে ঘুরে বেড়ানোই তো মেয়েদের ধর্ম্ম, আদি অন্তকাল তাই চলে আসছে না কি ? তা' ছাড়া নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন ক'রে লাভ ? জ্ঞানবানের মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছিল ভুলে যাচ্ছেন কেন ? নিন্—উঠুন।

গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ সরিয়া দাঁড়ায় সুকোমল। কণ্ঠস্বরে অনুনয়ের পরিবর্ত্তে একটা প্রবল দাবীর ভঙ্গি সুস্পষ্ট।

এ দাবী এড়ানো কঠিন। তাই অপর পক্ষের যুক্তিটা হইয়া পড়ে দুর্ব্বল।

—"ভারী কিন্তু অন্যায় আপনার, ভীষণ কিন্তু কাজের ক্ষতি হবে আমার, বাড়ীতে সকলে ভাববেন কিন্তু," ইত্যাদি 'কিন্তু'-সম্বলিত কয়েকটি ক্ষীণ আপত্তি ভাসিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না।.....

দীর্ঘ দিন নিত্য সাহচর্য্যের মধ্যেও যে দূরত্ব বজায় ছিল এত সহসা কমিয়া গেল কেমন করিয়া ? এই আকস্মিক বন্যার জন্য দায়ী কি আজিকার চঞ্চল সন্ধ্যা ? পূর্ণিমার চাঁদ ? গত কয়েক দিনের বিরহ ?

সুমিতা সুকোমল, ক্ষণপূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন দুইজনে পাশাপাশি সিটে বসিয়া ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিবে ?

গাড়ীর গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকে, কর্ম্মব্যস্ত কলিকাতা পড়িয়া

থাকে পিছনে। জনবিরল পথ শব্দহীন, ঝিঁ ঝিঁ পোকার দলও বোধহয় জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হইয়া গাছে গাছে ঘুমাইয়া আছে।

আরোহী যুগলও নির্ব্বাক।

গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাহাদের বাক্ শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে।

বহুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুমিতাই প্রথম কথা কহিয়া উঠে—কি একেবারে মৌনব্রত নিলেন যে?

সুকোমল চমকিয়া চোখ ফেরায়—বলছো কিছু?

—বলছি একেবারে বোবা বনে গেলেন কেন?

—না বোবা বনে যাইনি, হৃদ্‌যন্ত্রকে প্রকৃতিস্থ হবার সময় দিচ্ছি।

—কেন হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হল যে? আওয়াজ করিয়া হাসিয়া ওঠে সুমিতা।

—আমার নয়, আপনার।

—ওঃ, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। আমি অত নার্ভাস নই, আপনি তো আর মোটর ডাকাতি ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন না আমায়?

—বিশ্বাস কি? কলকাতাকে ষোল মাইল পেছনে ফেলে এসেছি, চেঁচিয়ে লোক জড় করবার উপযুক্ত লোকও পাবে না রাস্তায়। এখন তো তুমি সম্পূর্ণ আমার এলাকায়, ইচ্ছে করলে যা খুসী করতে পারি তা জানো?

মুহূর্ত্তের জন্য কি কাঁপিয়া ওঠে সুমিতা?

ভয় করে তার সতীর্থ সুহৃদকে?

কিন্তু কেন? ভয় পাইবার সত্যই কিছু আছে না কি? না ভরসাটাই যথার্থ বাঞ্ছনীয়?

ভয় না করুক তবু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনায়; হয়তো উদ্দাম বাতাসে উড়িয়া যায় শঙ্কাজড়িত মৃদু কণ্ঠস্বর।

—পারেন হয়তো—কিন্তু সে ইচ্ছে করবেনই বা কেন? হাতের চাকায় চোখ রাখিয়া সুকোমল স্থির স্বরে উত্তর দেয়,—কেন করবো না বল? মনুষ্য ধর্ম্মে সেইটাই তো স্বাভাবিক।

নাঃ এ রকম আবহাওয়ায় হাসিয়া ফেলাই নিরাপদ।

সুমিতা চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ওঠে—তাই নাকি? আপনার মনুষ্যধর্ম্ম এখন কি আদেশ দিচ্ছে?

—বলছে—এই অমূল্য সময়টুকু বৃথা অপচয় করার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, অহরহ কথার জাল বুনে আমরা সত্যকে এড়িয়ে চলছি, সত্যি তাতে লাভ হচ্ছে কিছু? আমাদের ভালবাসাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবার দিন কি এখনো আসবে না?

গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া আসে।······

—এসো সুমিতা, এইখানে একটু নেমে বসি। এখুনি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—নাই বা ফিরলেন? আরো খানিকটা এগিয়ে চলুন না, নামার চাইতে সে তো ভালো। মন্দ কি এ রকম বেহিসেবি এগিয়ে চলা? চলাই তো মানুষের জীবনের ছন্দ।

—পরিহাসপ্রিয় সুকোমল সহসা সশব্দে হাসিয়া ওঠে—কিন্তু ওর মধ্যে অনেক 'ধন্দ' আছে, আর এগোলে ফেরার পথে পেট্রোল জবাব দেবে। অগত্যা নিরুপায় দুটি মানব সারারাত্রি একটি ছোট্ট গাড়ীতে—

থাক্ আর বলতে হবে না—অন্ধকারে মুখের রক্তিমাভা চোখে পড়ে না—তবে ফেরাই যাক্, নেমে আর কাজ নেই। ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে—

—ক্ষতি কি সুমিতা? জীবনে শুভক্ষণ ক'বার আসে?

না আসে না—দুইবার আসে না। যে অনুপম বসন্ত সন্ধ্যাটিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বকাব্যের একটি মধুচ্ছন্দ শ্লোক রচিত হইয়াছিল সে সন্ধ্যা আর আসিল কই? রূঢ় বাস্তবের প্রখর দীপ্তিতে সে সুর কোথায় হারাইয়া গেল কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে? সহসা যখন দুইটি প্রাণী আবিষ্কার করিয়াছিল—পরস্পরকে বাদ দিয়া জীবনের অর্থ হয় না—সে কি ভুল করিয়াছিল? সে আবিষ্কার এমন অর্থহীন হইয়া গেল কেমন করিয়া? যে বলিষ্ঠ আশ্রয়ের আড়ালে থাকিয়া বিশাল পৃথিবী তুচ্ছ হইয়া যায়, সে আশ্রয় কি এতই ভঙ্গুর?

আকাশের তারা সাক্ষ্য দিতে জানে না ; শুধু পৃথিবীর হাল চাল দেখিয়া মূক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। চাঁদ আর অবাক হয় না, অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক অবাক বনিয়া, এতদিনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বেচারা। তাই সুযোগ পাইলেই বসিয়া বসিয়া মুচকি হাসে।

অবাক্ হইবার অভ্যাস থাকিলে হয়তো সেদিন চাঁদ মূর্চ্ছা যাইতে পারিত। যে দিন……

অনেক পূর্ণিমা পার হইয়া গেলে…আর এক পূর্ণিমার রাত্রে—যশোর রোডের সেই জনবিরল পথে একদা দুইখানা ভিন্নমুখি গাড়ী ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল ; নামিয়া আসিল দুই দল আরোহী খোলা আকাশের নীচে, স্পষ্ট জ্যোৎস্নায়।

'দল' নয়—দুই যুগল।

কী আশ্চর্য্য আপনি ?…ও গড্। আরট্ হলেই দিচ্ছিলাম উল্টে।

—তা'তে আর আশ্চর্য্য কি ? গাড়ী চাপা দেবার অভ্যাস তো আপনার নতুন নয় ?

ক্ষণিক নীরবতা,—মৃদু হাসির ধ্বনিতে ভাঙিয়া যায় ;—মাপ করবেন—ইয়ে—এ রকম বেকুবের মত গাড়ী চালাবেন না আর।

—ক্ষমা করবেন—ইয়ে—ও রকম ষাট মাইল স্পীডে ছুটে আসাটা ছাড়বেন এবার। আহাম্মুকের মত কাণ্ড দেখলে বাধ্য হয়েই বেকুব বনতে হয়।… পূর্ণিমা রাত্রির ঘন জ্যোৎস্না ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া পড়ে আকস্মিক হাসির তরঙ্গে।……

সর্বাক অভিনেতা যুগলের পিছনে যে দুইটি নির্ব্বাক ছবি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন হাতের সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অসহিষ্ণু স্বরে বলিয়া ওঠেন—

—গাড়ীর কোনো ক্ষতি হ'ল কি না আগে দেখা দরকার।

—ও নিশ্চয়, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মিষ্টার—মিষ্টার

—স্যান্যাল।

—মিষ্টার স্যান্যাল। নমস্কার, ভবিষ্যতে আলাপের সুযোগ হবে আশা করি। নমস্কার সুমিতা দেবী, ভারী সুখী হ'লাম, বেরিয়ে ফিরছেন বোধহয় ?

—না এখানে আমার নির্জ্জন সাধনা চলছে ; বাট্ মাইল স্পীডটাও আয়ত্ত ক'রে রাখা ভাল। নইলে তো আপনাদের মত লোকের কাছে মান থাকে না ? যখন তখন বেকুব বলতে হয়। ও কি চলে যাচ্ছেন যে—মিসেসের সঙ্গে ইনট্রোডিউস্ করিয়ে দিলেন না ?

—ক্ষমা করবেন, বড় দুঃখিত। ছুটছেন বান্ধবীর বিবাহ সভায়, এমনিতেই দেরী হয়ে যাওয়ায় চটিতং। আচ্ছা নমস্কার।

ভিন্নমুখী দুইটি গাড়ীর আলোচনা চলিতেছিল প্রায় অভিন্ন।

…মেয়েটা তো ভারী বাচাল, কে ও ? নাম তো শুনিনি কই ?

—কে নাম মনে ক'রে বসে আছে ? দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—কথা শুনে তো মনে হ'ল খুব ভাব ছিল।

—ক্ষেপেছ, ভাব করবার মতন মেয়েই বটে। কলেজে পড়তো একসঙ্গে—এই পর্য্যন্ত।

—খপ্ করে ভদ্রলোককে আহাম্মুক ব'লে বসলো কি বলে ?

—ওই রকম বেয়াড়া কথাবার্ত্তা ওর, সরে বোসো একটু—হাতটা আটকাচ্ছে তোমার শাড়ীতে। অজানা রাস্তা—সাবধান হওয়া দরকার—

—এদিকে কখনো আসোনি বুঝি ?

—কই ?

—লোকটা কে ? তোমার ক্লাশফ্রেণ্ড বুঝি ?

—ফ্রেণ্ড না ছাই, আমাদের সময়ে পড়তো—এই পর্য্যন্ত। বার দুই ফেল্ ক'রে ছেড়ে দিলে শেষটা। বাপের পয়সা আছে অগাধ, হরদম মোটর চড়ে বেড়ায়—আর কি।

—সভ্যতার লেশ নেই, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কইতে জানে না। আমাদের ইয়োরোপে ও রকম লোককে—

—বাঙাল তো কতই আর হবে ?···কিন্তু শোনো আমার আর চালাতে সাহস হচ্ছে না—তুমিই চালাও এবার, এখুনি তো একটা এ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচলো।

—তাতে কি ? এ্যাক্সিডেণ্ট থেকেই তো এক্সপিরিয়েন্স আসে।

—নাঃ অচেনা রাস্তা, বিপদ ঘটলে মুস্কিল।

—মুস্কিল কোথা ? চাপা দিয়ে পালালে ধরবার লোক নেই। এ দিকে কখনো আসোনি না কি ?

—না তো।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

সু-যোগ ও কু-যোগ

(২)

বৈশাখের 'পরিচয়ে' আমরা সু-যোগ ও কু-যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম এক ধরণের যোগী আছে—যাহারা সু-যোগী নয়, কু-যোগী—এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্মান দিগ্‌বিজয়ী হিট্‌লারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম। যাহাকে 'সিদ্ধি' বলে—দিব্যদৃষ্টি দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি—ঐ সব ক্ষমতার অর্জনও (acquirement of psychic powers) প্রকৃত যোগ নহে। এ সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিতে চাই।

মিসেস্ ডেভিড্ নীল (Mrs. Alexandra David-Neel)-এর প্রণীত 'With Mystics and Magicians in Tibet'-গ্রন্থে ঐ জাতীয় সিদ্ধির কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ আছে। প্রথমতঃ মিসেস ডেভিড্ নীলের কিছু পরিচয় দিই। ইনি একজন ফরাসী মহিলা—প্যারিসের সুর্বো বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করার পর ব্রাসেল্‌স্-এর বিশ্ববিদ্যালয় 'Universite Nouvolle-এ কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে তিনি তিব্বত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কালিম্পং-এ আগমন করেন। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তারপর তিনি সিকিমের রাজকুমারের সাহায্যে সিকিম হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন। সেখানে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং তিব্বতী ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিয়া তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী (যাহাকে 'Lady Lama' বলে) হন, এবং প্রায় ১৪ বৎসর তিব্বতের নানাস্থানে অবস্থান করিয়া তিব্বতীদিগের রীতিনীতি ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থ 'With Mystics and Magicians in Tibet'। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে ধারণা হয় যে, তিনি সত্যবাদী ও সত্যদর্শী লেখক এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায়। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক ডাঃ ডারসন্ ভাল্ (Dr. D'arson Val) লিখিয়াছেন—

"This well-known and courageous explorer of Tibet unites in herself all the physical, moral and intellectual qualities that could be desired in one, who is to observe and examine a subject of this kind. I must insist on saying this, however much her modesty may suffer.

Madame David-Neel understands, writes and speaks fluently all the dialects of Tibet. She has spent fourteen consecutive years in the country and neighbouring regions. She is a professed Buddhist, and so has been able to gain the confidence of the most important Lamas."

ঐ গ্রন্থে মাদাম্ নীল প্রসঙ্গতঃ তিব্বতীয় যোগী, সন্ন্যাসী ও সাধক সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে তিব্বতে যাহাকে টুমো (Tumo) ও লুঙ্গোম্ (Lunggom) বলে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ বেশ কৌতুকাবহ।

প্রথমতঃ 'টুমো'-র কথা বলি। তিব্বতীয় ভাষায় 'টুমো'-র অর্থ উত্তাপ,—উষ্ণতা; কিন্তু পারিভাষিক অর্থে টুমো একজাতীয় হঠযোগ, যদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে এরূপ উগ্র তাপ জনিত হয় যে, টুমো-সাধক তাহার ফলে তিব্বতের উত্তুঙ্গ তুষার পর্বতে ঘোর শীত কালেও—যে পর্বতের উচ্চতা এগার হাজার হইতে ১৮ হাজার ফিট—সজীব ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারেন। মাদাম্ নীল বলেন, যে রাত্রে বেশ তুষারপাত হইতেছে এবং নদী বা সরোবরের জল জমিয়া বরফ হইয়াছে সেই সময় টুমো-পরীক্ষায় প্রতিযোগীরা—যাঁহারা মনে করেন কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন—তাঁহারা ঐরূপ নদী বা সরোবরের তীরে সমবেত হন। সাধারণতঃ একটি চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনী বাছিয়া লওয়া হয়—যখন বেশ প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। পরীক্ষার্থীরা নগ্নদেহে ভূমিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলে পর এক একখানি চাদর সেই তুষার-শীতল জলে ডুবাইয়া প্রত্যেকের গাত্রে জড়াইয়া দেওয়া হয়—ঐ চাদর তাহাদিগের নিজের দেহের উত্তাপ দ্বারা যেমন শুষ্ক হয়, অমনি উহা জলে ডুবাইয়া পুনরায় টুমো-যোগীর দেহে জড়াইয়া দেওয়া হয়। সূর্যোদয় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, এবং ঐ ভাবে যিনি যত অধিক সংখ্যক চাদর নিজের দেহের তাপে শুকাইতে

পারেন (দেখা গিয়াছে কেহ কেহ ৪০খানি পর্যন্ত ভিজা চাদর নিজের দেহে শুষ্ক করেন), তিনিই প্রতিযোগিতার বিজয়ী বলিয়া নির্ণীত হন।

মাদাম্ নীল্ বলেন যে এই প্রক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং নিজেও কথঞ্চিৎ টুমো অভ্যাস দ্বারা বেশ ভাল ফল পাইয়াছেন।

তিন চার শত বৎসর পূর্বে তিব্বতে একজন সিদ্ধ যোগী ছিলেন—তাঁহার নাম মিলারেস্পা। তিব্বতীরা আজ পর্যন্ত তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। তিনি একবার মাউন্ট এভারেষ্টের সন্নিহিত লাচিকাং গুহায় ঘোর শীতের সময় প্রবল তুষারপাতের মধ্যে কিছুদিন একান্তে বাস করিতে বাধ্য হন। তিনি ঐ দারুণ শীতে ও হিমে টুমো-অভ্যাস দ্বারা কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা নিজের একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই কবিতার ভাবানুবাদ এই :—

Disgusted with the Worldly Life
I sought solitude on the slopes of Lachi Kang.

* * * *

It snowed continually for nine days and nights.
The biggest flakes were as big as the fleece of wool,
They came down flying like birds,
The small ones were the size of peas and mustard seeds,
They came down rolling and whirling.
The greatness of the snowfall was beyond all expression;
High up it covered the crest of the glacier ranges,
Low down it buried, up to their tops, the trees
of the forest.
The black hills appeared to be whitewashed.

* * * *

The blue running streams were hidden under the ice,
The mountains and the valleys were levelled and
looked like a plain.
During that time of calamity,
The snow, the wintry blast and my thin cotton garment
Fought against each other on the white mountain.

The snow, as it fell on me, melted into a stream,
The roaring blast was broken against the thin
cotton robe which enclosed fiery warmth.
The life and death struggle of the fighter could there
be seen
And I, having won the victory, left a landmark for the
hermits,
Demonstrating the great virtue of *tumo*.

অতএব টুমো যে একরূপ যোগসিদ্ধি—এ কথা নিঃসন্দেহ।

এইবার লুংগাম্-এর কথা বলি। উহাও একপ্রকার হঠযোগ। যিনি লুংগাম্-সিদ্ধ—তিনি, তন্ত্রে যাহাকে 'খেচর গতি' বলে, সেই গতি লাভ করেন; এবং আশ্চর্য দ্রুততা ও লঘুতার সহিত যোজনের পর যোজন অতিক্রম করিয়া সুদূরস্থ গন্তব্যে উপনীত হন। লুংগ-সিদ্ধ যে দৌড়িয়া চলেন তাহা নয়,—ভূমিতে তাঁহার পাদস্পর্শ হয় না—তিনি যেন লম্ফে লম্ফে অগ্রসর হন—তাঁর মুখে অপার্থিব ভাব—চক্ষু পূর্ণ-উন্মীলিত এবং দৃষ্টি আকাশের গায়ে কোন দূরস্থ অলক্ষ্য লক্ষ্যে নিবদ্ধ। ফলতঃ বোধ হয় লুংগং-সিদ্ধের শরীর এত লঘু হয় যে তাহা শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায়। যে সিদ্ধযোগী মিলারেস্‌পার কথা বলিলাম তিনি বলেন লুংগং-সিদ্ধির পূর্বে যে প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিতে তাঁহার এক মাস সময় লাগিয়াছিল, সিদ্ধির পর তিনি তাহা কয়েক দিনে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি একজন সিদ্ধকে চিনিতেন যিনি অশ্বের অপেক্ষাও বেগশালী ছিলেন।

মাদাম্ নীল বলেন যে তিনি তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে তিন জন ঐরূপ লুংগং-সিদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। একজনের কথা বলি।

উত্তর তিব্বতে চাংথাং-প্রান্তরে তাঁহার সহিত মাদামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মাদাম লিখিতেছেন—একদিন অপরাহ্নে আমরা ধীরে ধীরে একটা মালভূমি পার হইতেছিলাম—তখন Field-glass-এর সাহায্যে লক্ষ্য করিলাম সেই জনশূন্য প্রদেশে কে একজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার গতির ভঙ্গী অসাধারণ এবং দ্রুততাও বিস্ময়কর। কে ঐ ব্যক্তি? আমার এক সঙ্গী Field-glass-এর সাহায্যে দেখিয়া বলিল—উনি লুংগাং-সিদ্ধ যোগী। ক্রমশঃই

সেই যোগী আমাদের নিকটবর্তী হইলেন এবং তাঁহার আশ্চর্য গতি আরও স্পষ্টতর হইল। আমি ইচ্ছা করিলাম, যোগীকে থামাইয়া দুই চারিটা প্রশ্ন করি। আমার সঙ্গী আমাকে নিষেধ করিল—'না না ওরূপ করিবেন না—এ যোগী অর্দ্ধ সমাহিত, ধ্যানস্থ আছেন। হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ করিলে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।' কাজেই ঐ অদ্ভুত পর্যটককে থামাইবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলাম।

মাদাম্ নীল্ লিখিতেছেন—

By that time he had nearly reached us; I could clearly see his perfectly calm impassive face and wide-open eyes with their gaze fixed on some invisible far-distant object situated somewhere high up in space. The man did not run. He seemed to lift himself from the ground, proceeding by leaps. It looked as if he had been endowed with the elasticity of a ball and rebounded each time his feet touched the ground. His steps had the regularity of a pendulum. * * * My servants dismounted and bowed their heads to the ground as the lama passed before us, but he went his way apparently unaware of our presence,

মাদাম নীল্ অশ্বারোহণে সেই যোগীর পিছু পিছু—চলিলেন—যোগী পদব্রজে। প্রায় ২।৩ মাইল অগ্রসর হইলে যোগী চলন-পথ ছাড়িয়া একটা তুঙ্গ পাকদণ্ডীতে উঠিয়া গেলেন। সে পথে ঘোড়া চলে না। কাজেই অনুসরণ হইতে মাদামকে নিবৃত্ত হইতে হইল। মাদাম্ নীল বলেন, তিনি পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, ঐ যোগী অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা দিন রাত্রি ঐরূপ দ্রুত গতিতে হাঁটিবার পর তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিলেন। কে জানে আরও কতদূর হইতে ঐ যোগী যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব লুংগম্ বা খেচর গতি যে একটা যোগসিদ্ধি এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

লুংগম্ ও টুমো ছাড়াও অনেকপ্রকার যোগসিদ্ধি আছে যথা—দিব্যদৃষ্টি, (Clairvoyance) দিব্যশ্রুতি (Clairaudience), চিন্তাচালন (Telepathy), Psychometry ইত্যাদি। ঐ দিব্যদৃষ্টি—বিশেষতঃ প্রাক্‌দৃষ্টি (Prevision) সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি—এখানে বিস্তার করিব না। ঐ প্রাক্‌দৃষ্টি সম্বন্ধে পতঞ্জলি সাধারণভাবে সূত্র করিয়াছেন—

পরিণামত্রয়-সংযমাদ্ অতীতানাগত-জ্ঞানম্
—যোগসূত্র, ৩।১৬

দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি সম্বন্ধে পতঞ্জলির সূত্র এই—

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট জ্ঞানম্
—যোগসূত্র, ৩।২৪

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সংবন্ধ-সংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্
—ঐ, ৩।৪০

পতঞ্জলি ঐ তৃতীয় অধ্যায়ে আরও কয়েক প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ভূতরুত-জ্ঞান, পূর্বজাতি জ্ঞান (জাতিস্মর হওয়া), পরচিত্ত জ্ঞান, সূর্যে সংযম দ্বারা ভুবনজ্ঞান, তারাব্যূহ জ্ঞান, কায়ব্যূহ জ্ঞান, সর্বজ্ঞাতৃত্ব (omniscience), ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তি, পরশরীরাবেশ, সিদ্ধদর্শন, অন্তর্দ্ধান, উৎক্রান্তি ও আকাশগমন (Levitation), ভূতজয়, ইন্দ্রিয়জয়, প্রধানজয়, কায়সম্পৎ, বলসিদ্ধি, অণিমাদি প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি। এ বিষয় বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়, অতএব ঐ সকল সিদ্ধির বর্ণনা করিব না। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হয় যে এই সকল সিদ্ধি প্রকৃতপক্ষে 'psychic sports' মাত্র? ধরুন কোন যোগী ঐ সকল সিদ্ধিতে পারদর্শী হইলেন এবং ঐ সকল ব্যাপার তাঁহার পূর্ণ আয়ত্ত হইল। কিন্তু ততঃ কিং? তদ্দ্বারা তাঁহার কি আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইল? এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে একটি কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। পাঠককে তাহা শুনাইতে চাই।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব একদিন শিষ্য সহিত এক অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন বনের মধ্যে এক কুটীরে একজন জীর্ণশীর্ণ যোগী বসিয়া আছেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন—'আপনি কতদিন তপস্যা করিতেছেন?' যোগী বলিলেন, 'পঁচিশ বৎসর'। বুদ্ধদেব পুনরপি বলিলেন, 'এই দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়া আপনি কি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন?' যোগী সগর্বে উত্তর দিলেন, 'আমি হাঁটিয়া নদী পার হইতে পারি।' বুদ্ধদেব সকরুণ ভাবে উত্তর করিলেন, 'তাই নাকি! হা হতভাগ্য! এই তুচ্ছ ফলের জন্য এত বৎসর অপব্যয় করিয়াছ? কেন, খেয়ার মাঝি দুই পয়সার বিনিময়ে তোমাকে ত পরপারে পৌছাইয়া দিতে পারে।'

প্রশ্ন এই—সিদ্ধিকামী সাধক কি প্রকৃত যোগী? তাঁহার পথ কি প্রকৃত যোগপথ? কখনই না। দুই হাজার বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, সিদ্ধি সাধনপথের অন্তরায় *—

তে ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ সমাধৌ উপসর্গাঃ
—যোগসূত্র, ৩।৩৭

সেইজন্য থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট বলিতেন—এ সকল সিদ্ধি যোগ নয়—'যোগাভাস'—Occultism নয়, 'pseudo-Occultism' এবং তাঁহার সহযোগী ও সহকর্মী অধুনা স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাধককে সাবধান করিয়া দিতেন যে, তাঁহারা যেন সাধন পথে ঐরূপ আলেয়ার আলোর দ্বারা না প্রলুব্ধ হন। ঐ আলো আমাদিগকে কু-যোগের বক্রপথে পথভ্রষ্ট করে এবং সূক্ষ্ম লোকের মায়াবিনী মায়ায় বিমুগ্ধ করে। কারণ (মিসেস বেসান্ট ঠিকই বলিয়াছেন) ঐ সকল সিদ্ধি প্রায়শঃই স্বার্থপর ও স্বার্থান্বেষী প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয়,—লোকহিতে নয়—জনসেবায় নয়,—জীবের অভ্যুদয়ের জন্য নয়। ঐরূপে আমাদের ভূতাত্মা (Lower Self) বললাভ করে,—যাহার লক্ষ্য প্রদান নয়—আদান, জীবহিতৈষণা নয়—আত্মম্ভরিতা। ঐ পথের সাধক ক্রমশঃ বামমার্গী হইয়া মারের অনুচর হন এবং সয়তানের গণভুক্ত হইয়া চরমে অধোগতি লাভ করেন।

সত্য বটে, কোন কোন সাধক তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম শরীরের বৈশিষ্ট্য বশতঃ বিনা চেষ্টায় সিদ্ধির অধিকারী হন—ভাগবতকারের ভাষায়, শুদ্ধদাসীর ন্যায় ঋদ্ধি-সিদ্ধি তাঁহাদের করতলগত হয় এবং ইঙ্গিত পালনের জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যে হেতু তাঁহারা প্রকৃত যোগী, অতএব কোনদিনই ঐ সকল সিদ্ধিকে আত্মম্ভরিতা বা আত্মসমৃদ্ধির জন্য—এমন কি আত্মবিকাশের জন্যও ব্যবহার করেন না। এই সকল সিদ্ধিকে তাঁহারা ন্যাস রূপে গ্রহণ করেন এবং লোকহিতৈষণায় এবং জীবের অভ্যুদয়ের জন্যই ঐ সকল সিদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য এই থাকে—যেন তাঁহারা পরমেশ্বরের করুণাধারার

* The socalled Siddhis are really hampers—not helps but hindrances for the yogi.

ভাজন হইয়া বিশ্বময় সেই করুণা পরিবেশন করিতে পারেন। ঐরূপ করিতে পারিলেই তাঁহারা নিজেদের ধন্য বিবেচনা করেন।

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, 'বিভূতি'-সংগ্রহ কিছুতেই প্রকৃত যোগ নহে। তবে প্রকৃত যোগ কি ? আগামী বারে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাফো

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তার দিন কয়েক পরে গোসঁ্যা অফিস গিয়ে দেখল তার টেবিলে একটা ভিজিটিং কার্ড : সি. গোসঁ্যা দ' আরমেন্দি-র নাম লেখা।

তার কাকা, কেজ্যার তাহ'লে প্যারিসে! এর মধ্যেই! অপিসের বেয়ারা তাকে জানায়, ভদ্রলোক ছু'বার এসে তার খোঁজ ক'রে গেছেন। তার কাকা যে তাকে উপদেশ দিতে সশরীরে এসে উপস্থিত হবেন তারই বিস্ময়-বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে, সে দেখতে পায় স্বয়ং তাঁকেই। হেলতে ছুলতে ভদ্রলোক অগ্রসর হচ্ছেন তার দিকে।

তাঁর নিজেরও একটা কি কাজ ছিল প্যারিসে—তাও বটে, আর, ফানি-গোসঁ্যার ব্যাপারের একটা কিনারার জন্যও ; তিনি একেবারে যথাস্থানে চলে আসাই সমীচীন মনে করলেন। একজন অভিজ্ঞতা-প্রবীণ উপদেষ্টার সান্নিধ্যে জঁ্যা-ও অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে।

ওদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা কি রকম চলেছে, মন দিয়ে শোনেন কেজ্যার। তারপরে, এক কথায় একেবারে সমস্যার উপসংহারে গিয়ে উপনীত হন :

'বুঝেছ বাপু, এ হচ্ছে আমার লাইন। এ সব ব্যাপারের আদি-অন্ত সবই আমার জানা। যখন প্রেমে পড়ে তোমার খুড়িকে বিয়ে করতে যাই তখন আমার যৌবনকালে ঠিক এমনি কাণ্ডই ঘটেছিল। আমার নায়িকাটিকেও যখন পরিত্যাগ করি—'

এই বলে সূচনার মুখেই, কাহিনীকে স্থগিত ক'রে, অকস্মাৎ একটা ছোট্ট পকেট-বুক তিনি বের করেন তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে :

'তার প্রথম উপায় হচ্ছে এই বস্তু। হঁ্যা—টাকা, টাকাই। এই টাকা দিয়েই তোমার মুক্তি কিনতে পারবে।'

গোসঁ্যা মাথা নাড়তেই :

'নাও, নাও। কাছে রাখো। টাকায় সব হয়।'

গোস্যাঁ বলে :

'তোমার পকেট-বই তোমার কাছেই রেখে দাও, কাকা। তুমি নিজেই তো সব চেয়ে ভালো জানো যে টাকাকড়ি গ্রাহের মধ্যেই আনে না ফানি।'

'হুঁ্যা, ফানি মেয়েটা ভালোই ছিল—' প্রায় শোকসভার বক্তৃতার সুরে সুরু করেন কেজ্যার :

'তবু তুমি তোমার কাছেই রাখো, গোস্যাঁ! প্যারিসের নানাবিধ প্রলোভন, জানোই ত,' টাকা আমার কাছে থাকা ঠিক নয়। হয়ত সেবারের মত জুয়া খেলেই উড়িয়ে দেব আবার!'

তিনি ইতিমধ্যে, তাঁর আঙুর ক্ষেতের আয় থেকে, ফানির দেওয়া সেই আট হাজার ফ্রাঙ্ক ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন—ফানি কি করেছে সে-টাকাটা? গোস্যাঁর কাছে তিনি জানতে চান। ফানি? সে টাকাটা? পাওয়া-মাত্রই দ'শেলেৎকে গিয়ে দিয়ে এসেছে? বটে? সে তো নিজেই রাখতে পারত ইচ্ছে করলে—! আঃ, ফানি সে ধরণের মেয়েই নয়, টাকাকড়ির লোভ নেই তার। ভারি চমৎকার মেয়ে, কিন্তু—যাক—তথাপি কেজ্যার পরামর্শ দেন :

'আচ্ছা তবু রেখে দাও। টাকার দরকার সব ব্যাপারেই—কি যুদ্ধে আর কি প্রণয়ে! বুঝেছ বাপু!'

সেদিন সকাল-সকালই গোস্যাঁ ফিরল অপিস থেকে। আজই একটা হেস্তনেস্ত করবে সে—বদ্ধপরিকর হয়েই সে এসেছে।

'তুমি? আজ এত সকালে যে!' জাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে ফানি।

কিন্তু জাঁর গুরুগম্ভীর মুখ দেখে থমকে যায় সে :

'কি? কী হয়েছে?'

'না, না, এমন কিছু হয় নি। কি চমৎকার দিন আজ—কি মিষ্টি রোদ। বসন্ত ঋতুর শেষ দিন আজ—ভাবলাম, দু'জনে আবার বেড়াতে যাই সেই বনের ধারে। তাই চলে এলাম অপিস থেকে।'

'কী ভাগ্যি আমার!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ফানি।

ফানির স্ফূর্তি দেখে গোস্যাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাদের সম্বন্ধ, তাদের সান্নিধ্য আর তো দু'ঘণ্টার জন্য কেবল—তারপরেই, এতদিনের ভালো-

বাসার, ঈর্ষা-বেদনার, মান-অভিমান-কলহের আকস্মিক পরিসমাপ্তি! তার মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু—না, তাকে শেষ করতেই হবে, কঠোর হতেই হবে তাকে। এখনই—আজই এই শৃঙ্খল না ভাঙতে পারলে—আর কবে? আর কোনদিন কি সে শক্ত হ'তে পারবে জীবনে?

কিন্তু এই ছলনা কেন? কেন এই বনে বেড়ানোর প্রস্তাব—বিশেষ ক'রে সেই বনে যেখানে তাদের প্রেমের সূত্রপাত! তার ইচ্ছা করে তখনই গিয়ে ফানিকে সব বলে দেয়, সেই মুহূর্তে, সেখানেই—কিন্তু তার ভয় করে এখনই হয়ত ফানি এমন চেঁচাবে, এমন গোলমাল আর হট্টগোল বাঁধিয়ে তুলবে, তারপরে দৌড়ে আসবে হেতেমারা, আর সব প্রতিবাসীরা—সেদিনের সেই অগ্নিকাণ্ডের মতন—কি কেলেঙ্কারি।

'চলো আমি তৈরি হয়েছি।' পোষাক পরে এসে বলে ফানি।

স্নিগ্ধ, সূর্য্যকরোজ্জ্বল অপরাহ্ণ। ওরা আস্তে আস্তে চলে বনের পথ দিয়ে। এক এক জায়গায় এত ঝরাপাতা জমেছে যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যায়। মড় মড় ক'রে তার ভেতর দিয়ে চলে যেতে এত ভালো লাগে ফানির! উৎসাহের তার অন্ত নেই।

যেতে যেতে কত কি সে ব'কে যায়, কিন্তু গোস্যাঁর কান নেই সেদিকে। অন্যমনস্ক হয়ে সে চলে, চলে ভাবতে ভাবতে—'এই কি ঠিক মুহূর্ত? এখনই বলব কি?' কেবলই সে এই প্রশ্ন করে আপনাকে।

সাহস হয় না তার, নিজের মধ্যেই নিজে সে ভেঙে পড়তে থাকে। অবশেষে আত্মদ্বন্দ্বে নিজের মনকে সে প্রস্তুত ক'রে আনে। ফানি তার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে; হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে সে :

'কি হয়েছে তোমার বলত?'

'একটা খারাপ খবর আছে। অপিস থেকে আমাকে বদলি করছে—'

খুব দুঃখের সঙ্গেই বলতে সে সুরু করে, কিন্তু তার কণ্ঠের ভগ্ন কর্কশতা বিস্মিত ক'রে দেয়—এ কার গলা? কে কথা কইছে? কিন্তু শেষের দিকে ক্রমশই সে শক্ত হয়ে আসে, বেশ জোরালো-গলাতেই তার আগে-থেকে-

বানিয়ে-রাখা গল্পটা বলে যেতে পারে। অফিস থেকে তাকে বদলি করছে সুদূর চীনে—সেখানকার কন্‌সুলার অপিসের কেরানীর কাজে।

বিনা প্রতিবাদে নীরবে আগাগোড়া শোনে ফানি, তারপর গোস্যাঁর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে :

'তাহ'লে কবে তোমাকে যেতে হচ্ছে ?'

'আজই—আজ রাত্রেই।' তার কণ্ঠস্বর কৃত্রিম দুঃখপূর্ণ। 'এখান থেকে যাবো দেশে, তারপরেই মার্সাইয়ে উঠবো জাহাজে।'

'থামো। আর মিথ্যেয় কাজ নেই।'

ফানি বাঘিনীর মত ঠিক্‌রে ওঠে গর্জ্জন ক'রে :

'হয়েছে। মিথ্যে বলা তোমার কর্ম্ম নয়। আমি বুঝতে পেরেছি সব। আসল কথা, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। তোমার বাড়ির লোকেরা অনেকদিন থেকেই সেই চেষ্টায় আছেন। তোমার কাকা বাড়ি গিয়ে সব লাগিয়েছেন—তারপর থেকে আর তাঁদের ঘুম নেই, আহার নেই। বেশ, বেশ, ভালো ভালো। আশা করি কনে তোমার মনের মতই হয়েছে।'

হা-হা ক'রে হাসতে থাকে ফানি অদ্ভুত হাসি।

'শোনো আমার কথা।' গোস্যাঁ বলে অবিচলিত স্বরে : 'আমি বিয়ে করব, তা তুমি জানো। কিন্তু তাতে তোমার কি—তুমি তো একথা জানোই যে একদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই—'

ফানি রুখে ওঠে :

'আর এই কথা বলবার জন্যে তুমি এতদূরে টেনে এনেছ আমাকে। কী দরকার ছিল তার। তুমি যাও, যেখানে তোমার খুশি—এখুনি যেতে পারো। তোমার কনে বৌ নিয়ে যেখানে খুশি। এক ফোঁটাও চোখের জল পড়বে না আমার।'

তারপর, ফানি ক্ষেপে যায় যেন। গালাগালি, লাঞ্ছনা, কটুভাষার আর অন্ত থাকে না—যা মুখে আসে তাই সে বলে যায়। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, 'কাপুরুষ, মিথ্যুক, কাপুরুষ,' এই কটি কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে কেবল।

চুপ ক'রে শুনে যায় জঁা, একটি কথা বলে না, বাধাও দেয় না। ফানিকে নীরব করবার চেষ্টাও করে না সে।

অকস্মাৎ ফানি ঝাঁপিয়ে পড়ে জঁার কোলে, অশ্রুজলের ভারে উচ্ছ্বসিত হয়ে :

'ক্ষমা করো—দয়া করো আমায়। তুমি আমার—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমার কী হবে ভেবে দেখো।'

এইবার জঁার মন বিচলিত হয়, আঃ, এই ভয়ই সে করেছিল। গালমন্দ তাকে টলাতে পারবে না সে জানত, কিন্তু এই কান্নাকাটি—এ সে সহ্য করতে পারে না। তার অন্তর বিগলিত হতে থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ফানি :

'বলো, বলো যে এ কথা মিথ্যে। বলো তুমি যাচ্ছো না কোথায়। আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো না তুমি।'

জঁার মানসিক অবস্থা তখন ফানির চেয়ে কম খারাপ নয়—ফানির আদর কিম্বা অবহেলা কিছুতেই তার ভয় ছিল না, কিন্তু এই অশ্রুজলের ঝাপটা, এই হতাশার কারুণ্যের সামনে সে কাতর হয়ে পড়ে।

সূর্য্য তখন অস্তায়মান। বনের পথে সন্ধ্যার ম্লান আবছায়া বিস্তৃত হচ্ছে।

জঁা অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে। অন্য সময় হ'লে, আগে হ'লে, হয়ত সে বলে ফেলত : 'আমি যাব না, থামো, ঠাণ্ডা হও। থাক্‌ব আমি।'

কিন্তু এখন তার সম্মুখে, নতুন প্রেমের উজ্জ্বলতা, নতুন রূপের সম্মোহন, নতুন আকর্ষণের দুর্নিবার অন্ধতা—তাই তাকে এখন শক্ত রাখে, কঠোর রাখে, তাকে অবিচলিত রাখে, ফানির অনুনয়ের সামনে, উন্মাদনার সামনে তাকে ভেঙে পড়তে দেয় না।

না, যাবেই সে—যেতেই হবে তাকে। আর পথ নেই অন্য।

১৩

গোস্যাঁ সোজা গিয়ে ওঠে ডাক্তারের বাড়ি, প্লেস ভেন্দামে।

ফানির ভবিষ্যতের,—যতটা সম্ভব, সুব্যবস্থা সে করে এসেছে। ফানি

নিতে চায়নি, তবু কাকার দেয়া পকেট-বই সে দিয়ে এসেছে তাকে—সেই টাকাতেই কয়েক বছর তার স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। ইতিমধ্যে সে কি আর নিজের সুরাহা একটা করে নিতে পারবে না? আর যাই হোক, জাঁ নিষ্ঠুর নয়।

কয়েক সপ্তাহ কেটেছে, ফানির কোন খবরই সে রাখে না—সেধারের পথও সে মাড়ায় না আর। তার অপিসের কাজ—আর অপিস থেকে ফিরে, নতুন-প্রেমের নেশা নিয়েই সে মশগুল!

একদিন অপিসে বসে একটা ডাকের চিঠি সে পায়। ফানির হাতের অক্ষর—প্রথম খুলে পড়তে ইচ্ছা হয় না তার। অবশেষে, সে খোলে চিঠিখানা।

বাঁকা-চোরা লাইনে কয়েকছত্র লেখা: আর কোনো কিছুর প্রার্থনা নয়, কেবল একমাত্র এই অনুগ্রহ সে চায় জাঁর কাছে, কেবল মাঝে মাঝে দেখতে চায় তাকে। কেবলমাত্র চোখের দেখা, আর কিছু নয়। ফানি তাকে কিছু বলবে না, বকবে না, গালমন্দ দেবে না, তার ভাবী বিবাহের সম্বন্ধেও কোনো কথা তুলবে না—তার এবং ফানির বিচ্ছেদকে সে সম্পূর্ণ রূপেই স্বীকার করে নিয়েছে, সে-সম্বন্ধে আর কোন অভিযোগই নেই তার। কেবল তাকে সে দেখতে চায়!

চিঠির প্রথম থেকে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত একই করুণ আর্ত্তনাদ—'এসো, এসো!' 'আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্য, অশ্রুপাত করছি তোমার জন্য!' যে-বাড়িতে এতদিন আনন্দে আমরা কাটিয়েছি সেখানে আজ আমি একাকী—!'

চিঠি পড়ে অবধি গোস্যাঁর মন ছটফট করতে থাকে, কি করবে ভেবে পায় না। যাবে? যাবে সে?

সে চলে আসার পর কি করে ফানির দিন কাটছে কে জানে! হেতেমার কাছে খবর নিলে হয়।

পরদিন বেলা দশটার সময় হেতেমার অপিসের পথে সে প্রতীক্ষা করে।

ঐ যে আসছে হেতেমা, স্থূল বর্ত্তুল দেহ, মুখে মোটা পাইপ, হেলতে দুলতে—দূর থেকেই দেখতে পায় গোস্যাঁ।

জাঁকে দেখে হেতেমা বিরক্তি আর চাপতে পারে না: 'এই যে, এখানে তুমি! মূর্ত্তিমান! এই এক সপ্তাহ ধরে কি শাপান্তই না করেছি তোমায়! শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা আর আমাদের বরাতে—ছিঃ!'

জাঁ সমস্ত শোনে হেতেমার মুখ থেকে। গত রবিবার তারা ফানিকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিল। ফানি আছে কেমন? না বল্লেও চলে সে কথা। তার মুখ দেখলে পাষাণেরও বুক গলে যায়—সে চলে আসার পর এতদিন তো কেটে গেছে, কিন্তু এখনো ফানির ভাবান্তর দেখা গেল না। তেমনি বিষাদিনী প্রতিমা এখনো।

হ্যাঁ, তারা ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিল এই রবিবারে। টেবিলে বসেছে, কিন্তু ফানি আর আসে না। হোলো কি তার? অলিম্প যায় ডেকে আনতে, একটু পরেই সে চেঁচিয়ে ওঠে—ওগো এসো এসো, ফানি বিষ খাচ্ছে! হেতেমা ছুটে যায়, তারপর তার সঙ্গে সে কি ধস্তাধস্তি! ফানি তার মুখে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছে, বিষের বোতল ভেঙে তার জামা কাপড়ের দফা একেবারে রফা—সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার বলা যায় না। তারপর থেকে আর শান্তি নেই জীবনে! শান্তি-প্রিয় মানুষের জীবনে এই সব নাটকীয় দৃশ্যের পরিস্থিতি সামলে ওঠা খুব সহজ নয়, হেতেমা বলে।

স্পষ্ট করে সে গোস্যাঁকে জানিয়ে দেয় যে:

'খুব হয়েছে, আর না। আসছে মাসেই আমরা বাসা বদলাচ্ছি। নোটীশ দিয়ে দিয়েছি বাড়িওয়ালাকে।'

এ-সব শোনার পর জাঁর মাথার মধ্যে সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে যায়। হেতেমা—হেতেমারাও চলে যাবে অবশেষে? ফানি, ফানি একেবারেই একলা পড়বে—তখন—তখন—?

তখন—তখন যে কি হবে, সে কথা ভাবতে সাহস হয় না তার। ভয়ানক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায় সে—যাবে, যাবে সে আবার ফানির কাছে ফিরে? আবার স্বেচ্ছায় সেই ভারি লৌহশৃঙ্খল সাধ ক'রে গলায় তুলে নেবে? আবার সেই মোহাচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন বিশ্রী জীবন?

ফানির ভবিষ্যৎ সে ভাবে। তার দেয়া টাকা ফুরিয়ে গেলে তখন কী দশা হবে ফানির। কোথায় সে যাবে, কি সে করবে, কত নিচুতে নামতে হবে তাকে? অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায় এক সন্ধ্যার মুখে এক অপরিচ্ছন্ন, বাজে, বিজন রেস্তঁরার দৃশ্য—মনে পড়ে যায় পথবাসিনী সেই তৃষ্ণার্ত্ত মেয়ের কথা, যে ঝল্‌সানো স্যালমন গোগ্রাসে গিলছিল, কিন্তু গলা ভেজানোর জন্য মদ কেনার পয়সা ছিল না যার। ফানিরও ভাগ্যে হয়ত এই-ই আছে, ফানির—তার ফানির, যার রূপ-যৌবন আদর ও ভালোবাসা এতদিন সে সম্ভোগ করেছে।

ভারি বিচলিত হয়ে ওঠে গোসঁ্যা। কিন্তু কি করবে সে? কি করতে সে পারে? যেহেতু, এই মেয়েটির সঙ্গে এক নাচের আসরে তার অকস্মাৎ সাক্ষাতের দুর্ভাগ্য হয়েছিল, যেহেতু তার সঙ্গে কিছুদিন সে একত্রে কাটিয়েছে, সেই জন্যেই কি যাবজ্জীবন তাকে এই মেয়েটির নাগপাশে নিজেকে বেঁধে রাখতে হবে—চিরদিনের জন্য জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে? নিজের সুখ শান্তি সব তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে তার জন্য? সেই বা কেন এত মূল্য দিতে যাবে এবং আর কেউ নয়? কেনই বা ফানির আগেকার প্রণয়ীরা নয়? সেই সব বিখ্যাত ও বিপুল মানুষরা? এই বা কোন্ সুবিচার?

ফানির চিঠি আসে আবার:

'তোমাকে আমি কি বলেছিলাম তোমার মনে আছে। আমি নিজেকে তোমার স্ত্রী—পরিণীতা পত্নী বলেই মনে করি—চিরদিন তাই মনে করব, যাই ঘটুক না আমাদের মধ্যে! এই বাড়ি—যেখানে একদিন আনন্দে কেটেছে আমাদের—এই বাড়িতেই আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য, তোমার বিশ্বস্ত বধূটির মতো। এখান ছেড়ে কোথাও যাব না, যাই থাকুক আমার ভাগ্যে। তুমি এসো একদিন, শুধু চোখের দেখা দিতে, দূর থেকে এক পলকের জন্য—একবারটি এসো।'

জঁা যায় না। কিন্তু এক রবিবার, কাজের চাপে ছুটির দিনেও অফিসে বেরুতে হয়েছে তাকে; একলা বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে, এমন সময়ে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ তার কানে আসে।

সে চমকে ওঠে—এ কর-শব্দ যে তার চেনা। অনেক দিন আগে, যখন সে ছাত্র ছিল, তার হোষ্টেলের ঘরের দরজায় এ-শব্দ সে শুনেছে।

জঁা এগিয়ে যায়, পুরু কার্পেটে তার পদধ্বনি শোনা যায় না।

দরজার ফাঁক থেকে ফানির গলা আসে:

'জঁা, তুমি আছো ওখানে?'

আহা! কী করুণ ভগ্ন কণ্ঠ। বিদীর্ণ বিগলিত স্বর!

আরেকবার ঈষৎ অনুচ্চ চীৎকার—

'জঁা!'

তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একটা চিঠি ঘরের ভিতরে ফেলে দিয়ে, ফিরে যায় ফানি।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌তে থাকে ফানি,—আশা করে এখনই পেছন থেকে ফেরার ডাক শুনবে।

জঁা চিঠিখানা তুলে নেয়, খুলে পড়ে। একই কথার পুনরাবৃত্তি। ফানি প্রত্যেকটি সিঁড়ি গুণে গুণে নামে—একেবারে পৌছয় গিয়ে রাস্তায়। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান আসে না।

চিঠি পড়তে পড়তে জঁার চোখ ভরে যায় অশ্রুজলে। রু-দেলা'কার্দের সেই প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর কথা মনে পড়ে, তারও এই ভাবে সেই চিঠি গুঁজে দিয়ে যাওয়া আর ফানির হৃদয়হীন হাসি।

সে ইরেণকে বা ইরেণ তাকে যা ভালোবাসে তার চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে ফানি তাকে। ভালোবাসা—ভালোবাসার জন্যই—এই অহঙ্কৃতা নারীর এই বিনতি! তার দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়ায়।

যতই সে ভাবে ফানির কথা, ততই তার যন্ত্রণা হয়; কেবল ইরেণের পাশটিতেই এসে সে সান্ত্বনা পায়, সব জ্বালা ভুলতে পারে। এই সরল, অবোধ, ফুলের মত মেয়ের নিঃসঙ্কোচ স্নিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখেই সে নিজেকে, নিজের জীবনকে আর বিশ্বজগতকে ভুলতে পারে। কেবল এক অপরিসীম ক্লান্তি থেকে যায়, তার ইচ্ছা করে, ঐ মেয়েটির কোলে মাথা রেখে সে বিশ্রাম করে—নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে, পরম শান্তির আশ্রয়ে।

'কী হয়েছে তোমার?' এক এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে ইরেণ: 'তুমি কি সুখী নও?'

'ওঃ! নিশ্চয়! সুখী বই কি! ভয়ানক সুখী!'

৫

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
11857
LIBRARY

তবে ? তবে কেন এই বিষণ্ণতা ? আনন্দের মধ্যে এতো মুখভার ?

কেন ? এক একবার তার মনে হয় সব কথা খুলে বলে ইরেণকে। ব'লে নিজের মনের বোঝা হাল্‌কা করে। কিন্তু আবার ভাবে নিজের, বিগত জীবনের সমস্ত প্রকাশ ক'রে তার সরল মনে আঘাত দেবে না তো, হারাবে না তো তার বিশ্বস্ত হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি ?

বিয়ের দিনক্ষণ সব স্থির হয়ে গেছে। জঁার দেশে, তার বাড়িতে বিয়ে হবে।

কিন্তু বিবাহের আসন্নতায় কই তার উৎসাহ ? জঁার নিজের মনে হয়, এই বয়সেই যেন সে অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছে—জীবনের বহু পথ অতিক্রম ক'রে সে এখন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

ইরেণের আনন্দ ধরে না—বিয়ের কথা, বিয়ের গল্পই তার মুখে দিনরাত। কোথায় হানিমুনে, কেমন ক'রে তাদের দিন কাটবে তারই স্বপ্নময় কাহিনী।

জঁার মনে হয়, এ সব তার ছেলেমানুষী। নিতান্তই ছেলেমানুষী।

ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আনাতঁল দোদের 'সাফো' হইতে অনূদিত

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

এই অস্ত্রশাস্ত্রে কি প্রকার রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। প্রবাদ আছে, কৌটিল্য গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকায় ও কদাকার (১) ছিলেন বলিয়া একদা মহারাজ নন্দ কর্ত্তৃক ভীষণ অপমানিত হন। এই অপমানের প্রতিশোধকল্পে তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা তিনি নিজ প্রতিহিংসা কামনা পূর্ণ করিলেন। তাহার ব্রাহ্মণাভিমানের ছাপ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, অথচ তাহাতে আবার শূদ্রেরও কথঞ্চিৎ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। আমাদের অনুসন্ধানের প্রথম ও প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে শূদ্র ও পতিতদের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে কি ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "শূদ্র গোলামরূপে জন্মগ্রহণ করে নাই ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এবং জন্ম দ্বারা সে 'আর্য্য' (আর্য্যপ্রাণ) * ; তাহাকে তাহার জ্ঞাতিরা বিক্রয় করিলে অথবা বাধা দিলে তাহারা ১২ পণ শাস্তি পাইবে ; বৈশ্যদের

১। কোন কোন লেখক তাঁহাকে সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আজকালকার মত এই যে "মুদ্রা রাক্ষস" নাটক খৃষ্টীয় ৫০০—৬০০ শতকে লিখিত হয়। অধ্যাপক হরোউইচ বলেন, ইহা মুসলমান আক্রমণের পর লিখিত হয় (Prof. Horowitch—History of Sanskrit Literature)। 'অর্থশাস্ত্রে'র জার্ম্মান অনুবাদক J. J. Meyer তাহাকে দক্ষিণ-ভারতীয় বলিয়া অনুমান করেন ; Jolly-রও এই মত (Das Altindische Buch Vom Welt und Stacts leben : P L IV.)

* জয়সওয়াল ও জয়চন্দ্র নারঙ্ (ভারতীয় ইতিহাস কী রূপরেখা দ্রষ্টব্য) 'আর্য্যপ্রাণ' শব্দটির এক অদ্ভুত নরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহারা বলেন, যে-শূদ্রের শরীরে আর্য্যরক্ত আছে, সে-ই 'আর্য্যপ্রাণ' এবং এই মিশ্রিত রক্তের লোকই এই আর্য্যের সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু মায়ার 'আর্য্যপ্রাণ' অর্থে 'আর্য্য' বলিয়াছেন।

এই প্রকার হইলে ২৪ পণ, ক্ষত্রিয়দের ৩৬ পণ, ব্রাহ্মণদের ৪৮ পণ···ম্লেচ্ছদের মধ্যে এই প্রকারের কার্য্য দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু কোন 'আর্য্য' গোলামে পরিণত হইতে পারে না (২)।" তিনি আবার বলিতেছেন, "যে নিজেকে গোলামরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এরূপ ব্যক্তির পুত্র একজন 'আর্য্য' হইবে (৩)। যে পরিমাণ টাকার জন্য একজন গোলামে পরিণত হইয়াছে, সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিলে সেই গোলাম পুনঃ তাহার 'আর্য্যত্ব' ফিরিয়া পাইবে (৪)। যাহারা গোলামরূপে জন্মিয়াছে কিম্বা বাঁধা দিয়া (pledged) গোলাম হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও উক্ত আইন খাটিবে (৫)।' কৌটিল্যের আইনে গোলামের পুত্র 'আর্য্য', অর্থাৎ স্বাধীন নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইবে; এই ব্যবস্থায় জগতে আমরা তাঁহাকে একটা নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করিতে দেখি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে গোলামের ছেলে গোলাম হয়। কৌটিল্যের পূর্ব্বে ভারতীয় আইন-ব্যবস্থাপকদের পুস্তকে দাসের পুত্র স্বাধীন হওয়ার কোন বিধি-ব্যবস্থা উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। অর্থশাস্ত্রে বিবাহ বিষয়ে কতগুলি নূতন আইন দৃষ্ট হয়—যেমন, কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মন্দ চরিত্রের লোক হইলে বা রাজদ্রোহী হইলে অথবা স্ত্রীর জীবনকে বিপজ্জন করিলে বা জাতিচ্যুত কিম্বা ক্লীব হইলে, তাহার স্ত্রী উক্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে (৩য় অধ্যায়)। আবার কৌটিল্য বিবাহ বিচ্ছেদের (divorce) ব্যবস্থা যাহা অন্য কোন আইনকারকদের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই—(কারণ আইনতঃ যে-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না (৩,৩)।) তাহাও দিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয় (৬)। তবে তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকিলেও এই বিচ্ছেদ হইতে পারিবে; এতৎসঙ্গে তিনি 'নিয়োগপ্রথা'ও অনুমোদন করিয়াছেন। কৌটিল্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রী গ্রহণেও অনুমতি দিয়াছেন (৭)।

এই আইন দ্বারা আমরা ভারতের ইতিহাসের একটি বড় তথ্য পাইলাম—

২। R. Shamasastry; Kautilya's Arthasastra,—Pp 222—223.

৩—৫। R. Shamasastry; Kautilya's Arthasastra—P. 224.

৬। Kane—History of Dharmasastras, Pp. 96—97.

৭। Kane—History of Dharmasastras, Pp. 96—97.

শূদ্রের 'আর্য্যত্ব' প্রাপ্তি। এই আইনে 'আর্য্য' শব্দটি নরতত্ত্ববাচক নহে, রাজনীতিবাচক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই আইনের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্বাধীন বা মুক্ত প্রজারা সকলেই 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তক সমূহে বর্ণিত কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর লোকই 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য হইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে সকলশ্রেণীর স্বাধীন লোকই 'আর্য্য' বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। শূদ্রদের পক্ষে ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তের বিপ্লবের ইহাই হইতেছে প্রকৃত খাঁটি লাভ! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে শূদ্রেরা এই লাভ পায়! কৌটিল্যের অন্যান্য আইনের সর্ত্তাদি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে তিনি ব্রাহ্মণকে চারিবর্ণের স্ত্রীলোক বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহার স্বজাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সম্পত্তির অধিকাংশ ভাগ (৪ অংশ) পাইবে। তাঁহার আইনে প্রতিলোম বিবাহের সন্তানগণ নিন্দনীয় হইয়াছে, কারণ রাজারা স্বধর্ম্ম ভঙ্গ করিলে ইহারা উৎপন্ন হয়। ইহার অর্থ কি এই নয় যে, যে-সব রাজা ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি ভঙ্গ করিয়া উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের অনুজ্ঞা প্রদান করে তখনই প্রতিলোমজ সন্ততি সৃষ্ট হয়। ইহা খুব বিপ্লবী মত বলিয়াই কি নিন্দনীয় হইয়াছে*? ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইতেছে যে, কোন ব্রাহ্মণেতর লোক অরক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীয় স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলে সে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। শূদ্রের বেলা দণ্ড হইবে তাহাকে মাটুরে জড়াইয়া পোড়ান (৮)।

* ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুস্তক সমূহে প্রাচীনকালের বেণ রাজার কথা উল্লেখ আছে এবং তাহাতে তাঁহাকে গালিগালাজ করা হইয়াছে। ইনি নাকি প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন যেন তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন দেবতার উপাসনা করা না হয় এবং সমাজে বর্ণভেদ উঠাইয়া দিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্বারা আমরা প্রাচীনকালের দুইটি তথ্য পাই: যথা—প্রথম বেণ নিজেকে Man-God রূপে প্রচার করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়ত তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। রাজা বেণ উহারই একটি দৃষ্টান্ত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা বেণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বিকৃত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছে।

৮। Arthasastra—Pp. 283—285.

কৌটিল্যে আমরা ব্রাহ্মণদের দাবী পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিতে দেখিতে পাই ; তবু এই আইনের ফলে শূদ্রদের জীবন কতকটা ধারণোপযোগী হয় ; শূদ্রেরা নাগরিক অধিকার লাভ করে। তবে ইহার মধ্যেও একটা ব্যবধান (প্রভেদ) করা হইয়াছিল, অর্থাৎ property qualification দ্বারা নাগরিকত্ব পাওয়া যাইত। গোলাম নয় সেইরূপ 'আর্য্য,' অর্থাৎ যে অর্থনীতিক ব্যাপারে স্বাধীন, এইজন্য ভাল অবস্থার লোক—সে শূদ্র হইলেও 'আর্য্য' ! সে আর্য্যের অধিকার পাইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতন্ত্রের (Democracy) যুগেও আর্থিক আয়ের উপরই একজনের নাগরিক অধিকার লাভ নির্ভর করিত ! রোমের একজন প্রলেটারিয়েটেরও আড়াইশত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি থাকিলে সে রোমের নাগরিকত্বের অধিকার পাইত (৯)। তদ্রূপ কৌটিলের আইনে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একজন স্বাধীন পুরুষ 'আর্য্য' বলিয়া পরিগণিত হইত। 'আর্য্য' হইলে যে সেই ব্যক্তি কতগুলি অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে পাইত তাহার প্রমাণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৮২ শ্লোকে পাওয়া যায়ঃ 'কোন গোলামের টাকা ঠকাইলে অথবা সে আর্য্য বলিয়া যে সুবিধা সমূহ ভোগ করে, তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে (আর্য্যভাব অপহরন্ত), একজন আর্য্যের জীবনকে গোলামীতে পরিণত করিলে যে জরিমানা হয় তদূর্দ্ধ জরিমানা প্রবঞ্চকের প্রতি শাস্তি বিধান হইবে (১০)। অবস্থাপন্ন শূদ্র পতিতেরা যদিবা কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পাইল, তবে যথার্থ দরিদ্র ও পতিতেরা পূর্ব্বের ন্যায়ই সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিল। কৌটিল্যের বিধানে জাতিচ্যুত লোকেরা বা তাহাদের বংশধরেরা কোন সম্পত্তির বখরা পাইবে না ; সূত, মাগধ,ব্রাত্য এবং রথকারদের বেলা সম্পত্তি উপযুক্তদের অর্শাইবে ; চণ্ডালেরা পূর্ব্ববৎ নির্য্যাতীত হইত। কৌটিল্যের শূদ্রদের প্রতি এইরূপ নরম গরম ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হয় বৌদ্ধদের হাত হইতে শূদ্রদের রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের 'আর্য্যত্বরূপ ঘুস দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল অথবা চন্দ্রগুপ্ত পতিত শূদ্রোকুলোদ্ভব ছিলেন না *। শূদ্র রাজত্বে শূদ্র

৯। H. G. Wells—Outlines of History ; P 390.

১০। Arthasastra—P 223.

* J. J. Meyer বলেন, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সৃষ্টি প্রকরণ এবং চতুর্ব্বর্গ

পূর্ণমুক্তি পাইল না কেন ? উপরোক্ত প্রশ্নের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে জয়সওয়ালের মতানুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মোরিয়' ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিলেন। কিন্তু পুরাণে তাহাকে শূদ্রা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয় চন্দ্রগুপ্তের পোত্র অশোকের রাজত্বকালে। যদি চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আধিপত্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম * গ্রহণ করিয়া তাহাদের সেই আশায় ছাই দেয়। অশোক বৌদ্ধ হইয়া একটি অনুশাসনে (Edict) যজ্ঞে জীবহিংসা নিষেধ করিয়া দেন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত (১১), এই অনুজ্ঞা সমগ্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় ; ব্রাহ্মণদের নিকট ইহা বিশেষ দোষণীয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ইহা একজন শূদ্র রাজার হুকুম। অপর একটি অনুশাসনে অশোক খুব জাঁক করিয়া বলিয়াছেন,—যাহারা পূর্ব্বে পৃথিবীতে দেবতা বলিয়া মান্য হইতেন, তাহাদের তিনি মিথ্যা দেবতায় পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর মতে ইহার অর্থ—যাহারা 'ভূদেব' বলিয়া সম্মান ও পূজা পাইত তাহাদিগকে তিনি ঝুটা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর অশোক ধর্ম্ম-মহামাত্র, অর্থাৎ নীতি-পর্য্যবেক্ষণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকার ও সুবিধা ভোগের উপর হস্তক্ষেপ করেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর এই মর্ম্মে এক কড়া হুকুম দেন যে তাহারা

বিধান সবই রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনি শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়াছেন ; তাঁহার মতে, যে দুই এক জায়গায় শূদ্রের প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান মূলক শ্লোক আছে, সেগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহা বেশ পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যায়। ডক্টর কালিদাস নাগ ("Les theories dipiom de l' Inde ancienne et l' Arthasastra, 1923, P. 116) এবং অন্যান্যেরা বলেন, অর্থশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত অংশ অনেক আছে। Meyer—P. LIV.

* আজকালকার কোন কোন ভারতীয় লেখকের মতে অশোক যে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ বা তথ্য নাই ; কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখক সংস্কৃতের এক জার্ম্মাণ প্রফেসরের মুখে শুনিয়াছেন যে অশোক একটি শিলালিপিতে বলিয়াছেন :—"এতদিন লোকে যাহাদের 'ভূ-দেবতা' বলিয়া বিশ্বাস করিত এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহারা মিথ্যা।" এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তিনি পুরাপুরিই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। H. P. Sastry—Journal of the Asiatic Society of Bengal—1910, P. 259.

যেন বিচারকালে "দণ্ড-সমতা" ও "ব্যবহার-সমতা" প্রদর্শন করে। এতদ্বারা আইনে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আইনের যে-সব অসুবিধা ভোগ করিত তাহা অশোক শোধরাইয়া দেন। ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে শূদ্রগণ এখন রাষ্ট্রে ও আইনে সাম্য ব্যবহার পায় এবং উহারও নীচের পতিতশ্রেণীর লোকেরা আইনের সমানাধিকার ভোগ করিতে পায়। শাস্ত্রিজী বলেন, এতদ্বারা জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মে অশোক সাম্য স্থাপন করেন। এই সাম্য ব্যবহার ব্রাহ্মণদের নিকট অতি অসহ্য ও আপত্তিজনক ঠেকিতেছিল, কারণ এই নববিধানে 'ব্রাহ্মণেরা অবধ্য ও মৃত্যুদণ্ডের অতীত' এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

শাস্ত্রিজী ও জয়সওয়ালের মতে ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়ার ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। জয়সওয়াল এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (১২)। অশোকের প্রপৌত্র বৃহদ্রথের রাজত্বকালে বাহ্লিকের হেলেনিষ্টিক রাজা মিনানডার (ইহাকেই বৌদ্ধপুস্তক মিলিন্দাপহ্নে উল্লিখিত রাজা বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন) ভারত আক্রমণ করিয়া সাকেত (বর্ত্তমান অযোধ্যা) পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন, তখনও রাজা বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোন উদ্যোগ করেন নাই; কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অশোক বলিয়া গিয়াছেন, "প্রেম দ্বারাই জয় করিতে হইবে"। এই অবস্থায় জনৈক ব্রাহ্মণ বলেন, * "কেবল মোহাত্মারাই বলে যে প্রেমদ্বারা শত্রুজয় করিবে," অর্থাৎ আহাম্মকেরাই প্রেমদ্বারা শত্রুজয় করিতে চায়। ব্রাহ্মণদের মৌর্য্যশাসনের প্রতি বিদ্বেষের ইহা একটি পরিচয় †। এইকালেই একদিন পাটলিপুত্র নগরে রাজসৈন্যের কুচকাওয়াচের সময় ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়া এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়; এই সময়ে বৌদ্ধশাসন ভঙ্গ করিয়া রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাধিপত্য প্রথম বিবর্ত্তিত হয়, আর এই সময়েই "মানবধর্ম্মশাস্ত্র" বা মনুস্মৃতি পুনঃ সঙ্কলিত বা নূতনভাবে লিখিত হয়। জয়সওয়ালের মতে এই স্মৃতি

১২। Jayaswal—Age of Manu and Jagnavalka.

* 'গার্গী সংহিতা দ্রষ্টব্য।

† দেবী মাহাত্ম্য বা চণ্ডী নামক ধর্ম্ম পুস্তকে মৌর্য্যদিগকে দৈত্যদের সহিত গণনা করা হইয়াছে। শূদ্র শাসনের প্রতি ব্রাহ্মণদের ইহা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাবের চরম পরাকাষ্ঠা।

পাটলীপুত্রের সুমতী ভার্গব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মত আছে; জয়সওয়ালের মতে এই সকল মত পুষ্যমিত্রের কার্য্যাবলীর পোষকতা করিয়া লিখিত হইয়াছে। পোষ্যমিত্র রাজহন্তা (Parricide)। এইজন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্রে (৭, ২৭, ২৮, ১১১) কি প্রকার অবস্থায় অথবা কি চরিত্রের রাজা বিনষ্ট হয় তাহার বর্ণনা আছে। জয়সওয়াল বলেন, রাজহন্তা পুষ্যমিত্রের কার্য্যের পক্ষে ওকালতী করিবার জন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্রে এই-সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। এই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং শূদ্রের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিসমূহে শূদ্র-বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল না—ইহা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। কৌটিল্যে কর্ম্মবিশেষে শূদ্রকে মাতৃর জড়াইয়া জীবন্ত দগ্ধ করিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু মনুস্মৃতি বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে এই ধারণা জন্মে যে, ইহা যেন শূদ্রের প্রতি বিশিষ্টভাবেই ক্ষিপ্ত। মনুর মতে, শূদ্র বিচারকের পদ পাইতে পারে না (৮, ২০); যে রাজ্য শূদ্রবহুল, নাস্তিকতাক্রান্ত এবং দ্বিজশূন্য—সেই রাজ্য অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও বহুবিধ ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে (৮, ২২)। এই পুস্তকে প্রথমে ব্রাহ্মণকে শূদ্রকন্যা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে (৩, ১২—১৩); কিন্তু পরে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে (৩, ১৪—১৯)। এই পুস্তকেই 'নিয়োগ প্রথা' সমর্থিত হইয়াছে (৯, ৫৯—৬৩); কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিজজাতির মধ্যে উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (৯, ৬৪—৬৯)। এতৎসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোলাম স্ত্রীলোকের পুত্র তাহার মনিবের হয়; কারণ তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্ততি তাহাদের প্রতিপালকেরই হয় (৯, ৫৫)। এইস্থলে মনু বলিতেছেন, যেমন গরু ঘোড়া প্রভৃতির বাচ্চা ইহাদের মালিকদেরই হয়, তেমনি দাসীর পুত্র তাহার মালিক প্রতিপালকেরই হয়। গোলামের ছেলে 'আর্য্য' হয়—অর্থশাস্ত্রের এই অনুজ্ঞা মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অশোকের দণ্ড-সমতাও প্রত্যাহার করা হয়; উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর অত্যাচার করিলে দণ্ড কম হইবে, কিন্তু বিপরীত ঘটনা ক্ষেত্রে দণ্ড অধিক হইবে—এই আইন পুনঃপ্রচলিত হয়। কিন্তু শূদ্রের প্রতি মনুর জীঘাংসা

প্রবৃত্তি চরমে উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে যখন তিনি বলিতেছেন নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজ জাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একটি জলন্ত দশ অঙ্গুলি পরিমিত লৌহ শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য (৮,২৭১); দর্পের সহিত শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয় তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন (৮,২৭২); শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতি কোন প্রকার হিংসামূলক কার্য্য করে তাহা হইলে তৎকৃত অপরাধের জন্য হস্ত বা পদচ্ছেদ, পাছা কাটিয়া দেওয়া অথবা ওষ্ঠাধর ছেদন করা প্রভৃতি হইবে (৮,২৭৯-২৮৩)। আইনের দিক দিয়া দাস আবার বঞ্চিত হয়; কারণ মনু বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ বিত্রস্তচিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; কোন জিনিষই তাহার নিজস্ব নহে; তাহার সমুদয় অর্থই ভর্ত্তৃহার্য্য (৮,৪১৭)।

এতদ্বারা গোলাম তৈজসপত্রের ন্যায় (Chattel) বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। মানবধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটা বিকৃত (morbid) মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে শ্রেণীসংগ্রামের জন্য শ্রেণী-বিদ্বেষ কত ভীষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত অনুজ্ঞা দ্বারাই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোন্ প্রকারের কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে সেই বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে মনু বলিতেছেন, "মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ···যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ—এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই * (৩১৮)—ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিপদ কালেও শূদ্রাকে ভার্যারূপে গ্রহণের কোন কথা নাই (৩,১৪)।" কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছে এবং মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা তাহার ব্যবস্থাও দিয়াছেন। রাজাদের কয়েকটি ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের 'শুশ্রূষা-সাধন' অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম শ্রেয়স্কর (৯, ৮৮)। রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখন কর গ্রহণ করিবেনা (৭,১৩৩)। অন্যদিকে রাজা কারুশিল্পী, শিল্পকর, দাস-দাসী অথবা যাহারা কেবলমাত্র

* যাঁহারা ভারতীয় আর্য্যদের Nordic বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বর্ণভেদ (Caste-System) সমর্থন করেন, তাঁহারা মনুর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে blond beauty ভারতীয়দের আদর্শ নয়; তাহা হইলে ভারতীয় আর্য্যের নর্ডিক (Nordic) উৎপত্তি কোথা হইতে সম্ভব হয়?

শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের দ্বারা রাজা মাসিক একদিন নিজকার্য্য করাইয়া লইবেন (৭,১৩৮)। এই প্রকারে পতিতগণের শোষণ (exploitation) করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল। পুনঃ আদালতে কে কে সাক্ষ্য দিবার যোগ্য সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, —'দাস,' লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তি, চণ্ডালাদি নীচজাতি' প্রভৃতি লোকদিগকে অথবা এক ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না (৮,৬৬)। মনু নির্দ্দিষ্ট চরিত্রবিশিষ্ট সাক্ষী যখন আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য শপথ করিবে তখন ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল,' বৈশ্যকে 'গো-বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল,' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের শপথ করিয়া বল'—বর্ণ বিশেষে প্রাড়্‌বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন (৮,৮৮)। এইরূপে আমরা দেখি যে আদালতে শপথ গ্রহণের সময়ও শ্রেণী-বৈষম্য ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শূদ্রকে শপথ গ্রহণ করাইবার জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে: যথা, "শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জল পরীক্ষা কিম্বা স্ত্রী-পুত্রাদির শিরস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে" (৮,১৪৪)। এতদ্বারা শূদ্রের কথা সত্য কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য trial by ordeal ব্যবস্থা হইল। অর্থনীতিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়: যথা, "উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুইপণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ, বৈশ্যের নিকট চারিপণ, এবং শূদ্রের নিকট পাঁচপণ হিসাবে প্রতিমাসে সুদ লইতে পারেন" (৮,১৪২)। এইস্থলে দেখা যায় যে সুদ দেওয়ার ব্যাপারে উপরের শ্রেণীগুলিকে নিম্নশ্রেণীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধার অধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণ ব্যভিচার করিলে প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে—ইহাই বিধান; কিন্তু অন্যান্য বর্ণসমূহের প্রাণদণ্ড হইতে পারে (৮,৩৭৮—৩৭৯)। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের চূড়ান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে: যথা, সকল পাপের পাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ বধ করিবে না (৮,৩৮০)। রাজা কাহার দ্বারা কোন কার্য্য করাইয়া নিবেন তাহাতে বলা হইয়াছে—"পরন্তু ক্রীত হউক কিম্বা অ-ক্রীত হউক, শূদ্রের দ্বারা তিনি দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন; কারণ বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামী (master) কর্ত্তৃক বিমুক্ত

হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে" (৮,৪১২—১৪)? এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পদ্ধতিতে শূদ্রকে চির-অভিশপ্ত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইল। আর কৌটিল্য যে দাসের পুত্র "আর্য্য" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন উহা প্রত্যাহার করা হয় যখন সাত প্রকারের দাসের মধ্যে গৃহস্থ দাসীর পুত্র, পিত্রাদি ক্রমাগত দাস গোলামের মধ্যে নির্দ্ধারিত হয় (৮,৪১৫)। ইহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে দাস বা দাসীর পুত্র অথবা বংশধর পুরুষানুক্রমে দাস হইবে—জন্ম হইতেই সে গোলাম হইবে। আবার এই দাস কোন ধন রাখিতে পারিবে না—উহা তাহার মনিবের হইবে (৮,৪১৬)। এতদ্বারা গোলামকে আবার Chattel (তৈজস পত্রের) ন্যায় করা হইল!

এবম্প্রকারে শ্রেণী-বৈষম্য জীবনের সকল বিভাগেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া বিষয় সম্পত্তি বিভাগকালে বলা হইতেছে—"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারিবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-দিগের প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে: ব্রাহ্মণ তিন অংশ (ব্রাহ্মণী গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান খাটি 'ব্রাহ্মণ'), ক্ষত্রিয়া-সূত দুই অংশ; বৈশ্যাসূত দেড় অংশ এবং শূদ্রা-সূত একাংশ প্রাপ্ত হইবে (৯,১৪৯—১৫১)। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে (১৫৩) যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌটিল্য প্রদত্ত ব্যবস্থার সহিত মিলে। এই আইনে যেমন উচ্চশ্রেণীর দাবীর পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রূপ অপর এক শ্লোকে উচ্চশ্রেণীর রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অপর ব্রাহ্মণকে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক ভাবে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে সপ্তম পুরুষে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ * বীজের উৎকর্ষতার জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়;

* হিট্লারের অধীনে জার্ম্মানীতে এই প্রকারের একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। সেখানে কোন লোকের ধমনীতে ইহুদী রক্ত থাকিলে সে পতিত ও নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু যাহার ধমনীতে এই প্রকারে ইহুদী রক্ত থাকা সত্ত্বেও পুনঃ যদি ক্রমাগত তিন পুরুষ খাঁটি জার্ম্মাণ রক্ত প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে আবার নাগরিকত্ব ফিরিয়া পাইবে। ইহা শ্রেণীগত বীজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার পরিচায়ক।

এবং এইক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে" (১০, ৬৪—৬৫)। এতদ্বারা আমরা এই বুঝি যে উচ্চশ্রেণীর রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; মনুর ভাষায় "সুবীজ সতত প্রশংসিত হইয়া থাকে" (১০,৭২)। উক্ত অভিমতটি নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে; "ব্রাহ্মণের অনার্য্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং অনার্য্যের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান—এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ব্রাহ্মণের অনার্য্যা গর্ভোৎপন্না সন্তান পাক-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানযুক্ত হইলে সবিশেষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু অনার্য্যের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান স্বভাবত নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট হইয়া থাকে" † (১০,৬৬-৬৭)।

ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দাবী রাজনীতিক্ষেত্রে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; ক্লাসিক্যাল বা তৎপূর্ব্ব যুগের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী-সংগ্রামকালীন ব্রাহ্মণদের দাবী-সমূহ মনু ব্রাহ্মণ সম্রাটের শাসনকালে পুনঃ উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন: "রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও কখন ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইবেন না; কারণ ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে সবলবাহন রাজ্যকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারেন…অবিদ্বানই হউক আর বিদ্বানই হউক ব্রাহ্মণ মহাদেবতা স্বরূপ" (৯,৩১৩,৩১৭)। এইস্থলে আমরা আবার উপরোক্ত যুগের দাবীগুলির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

মনুতে শূদ্রের দুরাবস্থার চুড়ান্ত হইয়াছে যখন শূদ্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে গেলে তাহার কাণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে (৮, ২৭২)। আর ব্রাহ্মণের দাবী চুড়ান্ত হইয়াছে যখন মনু বলিতেছেন, "সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানীগণ ইহাকে মানুষের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় স্বরূপ মনে করেন। সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ড প্রদান নেতৃত্ব এবং

† মনুর উক্ত শ্লোকের 'অনার্য্য' শব্দের কুল্লুকভট্ট অর্থ করিয়াছেন—'শূদ্র'। কিন্তু 'অনার্য্য' হইলেই 'শূদ্র' হয় না—এই ব্যাপারটি ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। Buchler 'অনার্য্য' শব্দটির মানে করিয়াছেন—'Non-Aryan'; এই অর্থ ঠিক নহে। Jones ইহার মানে করিয়াছেন—'base-man' ও 'base-woman'। 'অনার্য্য' শব্দ 'নীচ', 'হীন' এবং ব্রাহ্মণ বিরোধী; কাজেই জোন্সের প্রদত্ত অর্থই এস্থলে ঠিক বলিয়া মনে হয়।

সর্ব্ব লোকাধিপত্য বেদশাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পাইবার উপযুক্ত" (১২,৯৯,১০০)। এইস্থলে স্পষ্ট বলা হইয়াছে কেবল বেদশাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পদ পাইতে পারে, অন্য লোকে নয়। ইহা দ্বারা কি রাজদ্রোহী বৌদ্ধ মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকিবার জন্য বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের দাবী এত উচ্চে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে? জয়সওয়াল বলেন, এই শ্লোকে পুষ্যমিত্রকে উল্লেখ করা হইয়াছে (১৩)। সর্ব্বশেষ এই পুস্তকে আর একটি বিশেষ তথ্য পাই। মনু বলিতেছেন, রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; পরন্তু তিনি মহান্ দেবতা, মনুষ্য-রূপে অবস্থান করিতেছেন" (৭ ,৭, ৮)। এইস্থলে ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞানে আমরা একটি নূতন অনুষ্ঠান প্রচারিত হইতে দেখি—Divine Right of Kings। রাজা ভগবানের প্রতিভূ, তিনি Man-god—এই মত আমরা পূর্ব্বে ভারতীয় সাহিত্যে পাই না, কিন্তু মনুতেই ইহা প্রথম পাই। প্রাচীন ঈজিপ্ত, ব্যাবিলন ও রোমের সাম্রাজ্যকালে যেমন রাজা হয় ভগবানের অবতার বা প্রতিভূ এই ভাবটি লক্ষ্য করি এবং মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবকালে এই মত দেখিতে পাই, ভারতেও মনুতে আমরা এই মত পাইতেছি। ইহা হইতে আমরা এই হৃদয়ঙ্গম করি যে সমাজে শ্রেণী-বিভেদ যত পাকাপোক্ত হইয়া স্থাণুবৎ হইতে লাগিল ততই উচ্চশ্রেণীর রক্তের বিশুদ্ধতা প্রচারিত হইতে লাগিল, কাহার সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান ও সামাজিক আহার বিহারাদি চলিবে—এইসব ব্যাপারে বিধিনিষেধও প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ পাকাপোক্ত হইতে লাগিল। প্রাচীন গ্রীস্, রোম ও মধ্যযুগের ইউরোপের অভিজাত শাসনের যুগে আমরা এই অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। এই অবস্থায় সেই সকল দেশ সমূহে পতিতেরা পোষাক বা বাহ্য চিহ্নের বিভিন্নতা দ্বারা স্বাধীন ও উচ্চবর্ণের নাগরিকদের সহিত নিজেদের পার্থক্য ও প্রভেদ প্রদর্শন করিত। মনুতেও আমরা পতিতদের জন্য সেই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতের শ্রেণীসমূহ যত বনিয়াদি স্বার্থ বিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের স্থানুবৎ অচল করিতে লাগিল ততই উচ্চশ্রেণীর রক্তের বিশুদ্ধতা, জন্মের পবিত্রতা, আচার

১৩। Jayaswal—Age of Manu and Jagnavalka. Kane—History of Dharmasastras.

ব্যবহারের নানাপ্রকার বিভিন্নতা ও দাবী সমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল। শেষে আসিল Divine Right of King (রাজার ঐশিক ক্ষমতা বা অধিকার) মতবাদ! এইসব দ্বারা আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও শূদ্র এবং পতিতদের প্রতি বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা দেখিয়াই জয়সওয়ালের অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় যে মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিবার পর ব্রাহ্মণাধিপত্যের সময় ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া এই পুস্তক লিখিত হয়। এই মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুস্মৃতির উপরে আমাদের অধিক সময়ক্ষেপ করিতে হইতেছে, কারণ এই পুস্তক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুদের সমাজ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পুস্তক; এবং ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশ সমূহেও মনুস্মৃতি হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সেই সকল দেশের আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে (১৪)। ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির ইতিহাসে কৌটিল্য, মনু, যাজ্ঞবল্ক—এই তিনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দ্দেশক খুঁটি। এইস্থানে মনু আবার প্রামাণিক যদিচ যাজ্ঞবল্কের আইন বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জয়সওয়ালের মতে রাষ্ট্রীয় আইন বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রামাণিক আইন গ্রন্থ; মনু উহা সম্পূর্ণ উল্টাইতে পারেন নাই; সম্পত্তি বন্টন বিষয়ে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু শূদ্রের নাগরিকত্ব এবং অশোকের দণ্ড ও ব্যবহার সমতা মনু উঠাইয়া দিয়া ভেদ ও বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকপাঠে পাঠকের দুইটি বিষয় বিশেষ করিয়া চোখে পড়িবে—ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও শূদ্রের দুরবস্থা। এক্ষণে কথা এই, মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে শূদ্রের এত দুর্দ্দশা করা হইল কেন? নারদস্মৃতিতে উক্ত আছে যে আদিপুরুষ মনু ১০০,০০০ শ্লোকের একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। নারদ ইহাকে ১২,০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন, ভৃগুর পুত্র সুমতী ইহাকে পুনঃ ৪,০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। মনুর এই সংক্ষিপ্তসারই সমাজে এখন প্রচলিত আছে (১৫)। এই সংবাদটি প্রথম স্যার উইলিয়াম জোন্স্ আবিষ্কার করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, এই মনুস্মৃতিতে দুইটি স্তর আছে, সেই জন্যই

১৪। Jolly—"Recht und Sitte."
১৫। Jolly—Recht und Sitte : P. 21.

এত পরস্পর বিসম্বাদী মতসমূহ পাশাপাশি রহিয়াছে (১৬)। প্রচলিত সংকলনটিই সর্ব্বশেষ সংকলন বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাতেই শূদ্রবিদ্বেষ ও ব্রাহ্মণের রাজত্ব করিবার অধিকার প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জয়সওয়ালের মতে সুমতী ভার্গব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের রাজত্ব-কালে পাটলীপুত্রে বাস করিত এবং সে-ই এই শূদ্র-বিদ্বেষপূর্ণ এবং পুষ্যমিত্রের কার্য্যের ওকালতী করিয়া মনুস্মৃতির শেষ সংকলন করে। পুষ্যমিত্রের অধীনে রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার চিহ্নও এই পুস্তকে পাওয়া যায়: যথা, 'বেদ-বিরুদ্ধ-মার্গাবলম্বী, বর্ণান্তর বৃত্তিজীবি, বিড়ালব্রতী, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, বেদবিরুদ্ধ তার্কিক ও বকব্রতী—ইহাদিগকে বাক্যদ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। পরন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই (৪,৩০)। এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট 'পাষণ্ডিনো' অর্থে "শাক্যভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ" বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বীদের বুঝিয়াছেন।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা জয়সওয়াল যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখনও সর্ব্বজনসম্মত না হইলেও অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া কানে ধার্য্য করিয়াছেন (১৭)। জয়সওয়াল পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৮৪ সাল বলিতেছেন। উভয়েই অন্ধ শতবাহন বংশের শাসন সময়ের পূর্ব্বে এই পুস্তকের শেষ সংকলনের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এই কারণেই আমরা ইহাতে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধদের এবং শূদ্রদের বিরুদ্ধে এতটা ক্ষিপ্ত হইতে দেখি। এই পুস্তকের তারিখ নির্ণয়কালে জয়সওয়াল বৌদ্ধ ও শূদ্র এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই—সকল শূদ্রগণই কি বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিরোধী হইয়াছিল? ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু মৌর্য্যেরা বৌদ্ধ ও শূদ্র দুই একাধারে ছিল বলিয়া orthodox counter-revolution * (প্রতিক্রিয়া-শীল বিপ্লব) যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ লেখকেরা শূদ্রগণের প্রতি এত ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই বিষয়ে শেষ কথা এই যে মনুসংহিতা রাষ্ট্রমান্য আইনপুস্তক বলিয়া কখন গৃহীত হয় নাই—ইহাই জয়সওয়ালের অভিমত। কিন্তু এই

১৬। Kane—History of Dharmasastaas. Jolly—Recht und Sitte ; P. 21.
১৭। Kane—History of the Dharmasastras. P. 194.
* Jayaswal—Pp 40—41.

প্রতিক্রিয়ার সময় হইতে যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য আরম্ভ হয়; ব্রাহ্মণ প্রথম বর্ণ, ব্রাহ্মণ রাজা হইতে পারে, ব্রাহ্মণ দেবতা ইত্যাদি—যে সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল যাহার জের আজও পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে চলিতেছে, 'মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র' তাহার index-রূপে আজও ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। আর একটি তথ্য কৌটিল্য ও মনু পাঠে আমরা অবগত হই,—যে-শ্রেণীর হস্তে শাসনযন্ত্র আছে রাষ্ট্রের আইন প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাও সেই শ্রেণীর সুবিধানুযায়ী সৃষ্টও বিধিবদ্ধ হয়। পুষ্যমিত্রের রাজত্ব রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রথম যুগ; রাষ্ট্রীয় আইন তখন সেই শ্রেণীর সুবিধানুসারে সৃষ্ট হয়।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সন্দেহ করেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের মত যে অশোকের দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা এবং ব্রাহ্মণদের 'অবধ্যতা' রদ হওয়ায় তাহারা মৌর্য্যশাসনের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিল—তাহা সত্য নয়; কারণ পূর্ব্বেও স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণ প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে; সাহিত্যেই তাহার উল্লেখ আছে। কুরুপাঞ্চালের ব্রাহ্মণেরা যাহারা পলাইয়া জনকের সভায় গিয়াছিল তাহাদের কাছে ব্রাহ্মণের 'অবধ্যতা' অজ্ঞাত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩,৯,২৬) উল্লিখিত আছে যে একজন ব্রাহ্মণ তার্কিক যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় মস্তকচ্যুত হইয়াছিল *। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (Vedic Index—II. P 84.) বর্ণিত আছে যে মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে পুরোহিতের মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে। আবার কৌটিল্যে (m 29) আছে যে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ব্রাহ্মণকে জলে নিমজ্জিত করিয়া দিবে। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বলেন যে অশোকের বশংধরগণের সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি ছিল না; তাহারা ভেরীঘোষ অপেক্ষা ধর্ম্মঘোষ অধিক শ্রবণ করিয়াছিলেন (২৭)।

* বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কে সাকল্যের মস্তক পতিত হওয়ার গল্প (৩।৯।২৬) রাজাদেশে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই।
২৭। H. C. Roy Choudhury—Political History of Ancient India. Pp 245—350.

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী ব্রাহ্মণের বধ্যতার যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন তাহা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিল, কাজেকাজেই ব্রাহ্মণের বধ্যতা মানিয়া লইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর যুক্তি জয়সওয়ালের 'Age of Manu and Jagnavalkya' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতেও ধর্ম্মঘোষ শ্রবণে বৃহদ্রথের ধ্বংস হয় বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা মুখ্য কারণ নয়। কি সুবিধা পাইয়া পুষ্যমিত্র নিজের রাজত্ব সংস্থাপন করিতে পারিল তাহাই হইতেছে মুখ্য কারণ। বৌদ্ধ আন্তর্জ্জাতিকতার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় জাতীয়তাবাদ গ্রীক মেনানডারের আক্রমণ সময়ে লোকের নিকট অধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; এবং মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের একটি উপায় ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণীর অসন্তোষ। এইজন্যই পুষ্যমিত্রের রণভেরী অধিক ফলপ্রদ হইয়া ব্রাহ্মণাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে *।

বৌদ্ধবিপ্লবের স্বরূপ কি ছিল আজ তাহা কেহই সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। অনেকের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্ব্বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া একটা সাম্যবাদীয় নূতন সমাজ সংগঠন করিয়াছিল। পতিতেরা বুদ্ধ প্রচারিত সাম্যবাদের বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। সমাজের বেশীর ভাগ লোক এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই বোধ হয় কৌটিল্য শূদ্রকে "আর্য্যত্ব" প্রদান করেন। আবার মনুর শূদ্রের প্রতি এত ক্রোধের কারণ শূদ্রকে হাতে রাখিবার জন্য অথবা শূদ্র রাজার শাসন প্রচলন হওয়ায় শূদ্রসাধারণকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করা হয়; তজ্জন্য শূদ্র মৌর্য্যদের অধীনে নবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। যখন দেশের অধিকাংশ লোক বুদ্ধের ধর্ম্মঘোষ শ্রবণ করে তখন পুরোহিত ডাকাইয়া যাগযজ্ঞ করে কে? শূদ্রাধিপত্যের সময়ে ব্রাহ্মণের বনিয়াদী স্বার্থে বিশেষ আঘাত লাগে, তাই ব্রাহ্মণ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে মনু শূদ্রকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাহার (শূদ্র) বিরুদ্ধে এত কড়া বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করেন। ফিক্ বলেন, বৌদ্ধপ্লাবন

* শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর পুস্তকের সমালোচনায় মিঃ বার্ণেট স্বীকার করিয়াছেন—'Brahminical infuences can not be ignored.'

ভারতীয় সমাজকে ভাঙ্গে নাই; লোকে একই সমাজ-পদ্ধতির মধ্যে থাকিত, তবে তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিত। তাহার মতে ভারতীয় সমাজে প্রাচীন শ্রেণীসংঘগুলি একই বিবর্ত্তনের ধারা ধরিয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান জাতিতে পরিণত হয়। বৌদ্ধবিপ্লব জাতিভেদ ভাঙ্গে নাই। সামশাস্ত্রীর মতে বৌদ্ধদের আক্রমণের ফলে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আহার ও বিহার বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য গণ্ডীবদ্ধ হইয়া জাতিতে (Caste) পরিণত হয় এবং অন্যান্য শ্রেণীরাও এই প্রথার নকল করিয়া জাতিতে বিবর্ত্তিত হয় (২৮)। কিন্তু কোন তর্কই সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইহা হয়ত সত্য যে বৌদ্ধেরা মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের ন্যায় ভারতে পৃথক সমাজ সংগঠন করে নাই। তাহারা একই আইনে বিধিবদ্ধ ও ব্যবস্থিত সমাজে বাস করিত। ভারতে তাহাদের পৃথক আইন ছিল না। বৌদ্ধদের Civil Law ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সহিত এক বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন; কারণ তাহাদের আলাদা আইন পুস্তক আজও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদেশী বৌদ্ধেরাও প্রাচীন মনুস্মৃতি হইতে আইন গ্রহণ করিয়াছে। তবে ধর্ম্মবিষয়ক আইন যদ্বারা সংঘ ও ক্রিয়াকাণ্ডাদি পরিচালিত হইত তাহা পৃথক ছিল। বোধ হয় ভারতে নব-বৌদ্ধগণ (neo-Buddhists)—যেমন, বৈষ্ণবপন্থী, কবীরপন্থী, নানকপন্থী প্রভৃতি যাহা আজও পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতেছেন, প্রাচীন বৌদ্ধেরাও তাহাই করিতেন। উদাহরণতঃ একদল সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ সংঘারামে গিয়া ভিক্ষু হইত; একদল মন্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া সমাজেই গৃহস্থরূপে অবস্থান করিত এবং অপর একদল নানাকারণে জাতি ভাঙ্গিয়া (বাঙ্গলার জাতবৈষ্ণবদের ন্যায়) পৃথক সমাজ সংগঠন করিত। পরবর্ত্তী সময়ে যে বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় সহজযানী নেড়ানেড়ীর ন্যায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বৌদ্ধদের বিবাহাদি ব্যাপারে কোন প্রকার জাতি বা বর্ণভেদ ছিলনা; এতদ্বারাই ইহা অনুমিত হয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের বাহিরেও একটা বৌদ্ধ-সমাজ সংগঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম শূদ্র ও পতিতদের আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং উভয় ধর্ম্মের লোকেদের মধ্যে যে প্রবল রেষারেষি ও সংঘর্ষ বিদ্যমান ছিল তাহারও যথেষ্ট এবং প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে।

২৮। S. Sastry—Pp 40—41.

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবদান কি? বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্যবাদের সুমহান বাণী প্রচার করে। এইজন্য বৌদ্ধেরা সাম্যবাদকে প্রথমে ধর্ম্মজীবনে কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করে; সংঘারাম সমূহে কমুনিসম্ প্রচলিত ছিল, ধর্ম্মে শ্রেণী, বর্ণ বা মূলজাতীয় কোন পার্থক্য বা প্রভেদ করা হইত না। এই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবেই আন্তর্জ্জাতিক ছিল; বৌদ্ধপ্রধান দেশ সমূহে এই লক্ষণ এখনও বিরাজমান। কিন্তু সমাজে এই সাম্যবাদ কি প্রকারে প্রয়োগ করা হইত? অশোক একজন বৌদ্ধ সম্রাট, তাহার অধীনে একটি বিরাট আমলাতন্ত্র ছিল: এই বৌদ্ধরাষ্ট্রে সামাজিক স্তরভেদ বেশ ভালভাবেই বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ পরিচালিত এই রাষ্ট্রে সামাজিক সাম্যবাদ বিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কোন প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই না। অর্থনীতিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যবস্থিত না হইলে সামাজিক সাম্যও হয় না,—এই সত্য মানবসমাজ তখনও উপলব্ধি করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ (Caste-System) ভাঙ্গিয়া দেয়, কিন্তু শ্রেণীভেদ (Class-System) কোথাও ভাঙ্গিতে পারে নাই। তবে সম্রাট অশোকের আইনসমূহ হইতে ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় যে দণ্ড ও ব্যবহার সমতা প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রে সকলকে এক আইনাধীন করতঃ এক রাজনীতিক সাম্যের উদ্ভব ও বিবর্ত্তনের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চলিতেছিল। হয়ত মৌর্য্য সাম্রাজ্য আরও অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিলে, রোমীয় সম্রাট জাসটিনিয়ান যেমন সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বমূলজাতীয় প্রজাদের আইন দ্বারা রোমীয় প্রজার অধিকার প্রদান করতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে সকলকে এক করিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্লব যেমন সর্ব্বফরাসী নাগরিককে রাজনীতিক সাম্য প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ রাজনীতিক সাম্য (Political democracy) অভিব্যক্ত করিতে পারিত। কিন্তু পুষ্যমিত্রের অধীনে ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা বিনষ্ট হইয়া ভারতের রাজনীতিক ও তজ্জন্য সামাজিক পদ্ধতি ভিন্ন পথে চালিত হয়। বহু পরে যখন পাল রাজাদের অধীনে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ পূর্ব্বভারতে (মগধ ও বঙ্গ) রাষ্ট্রধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আবার সেই সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই রাষ্ট্রের বৌদ্ধধর্ম্মও মহাযান পন্থা উদ্ভূত করিয়া স্থানীয় আচার ও কুসংস্কার সমূহের সহিত আপোষ-রফা করিয়াছে, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম পুরাপুরি বৈপ্লবিক নয়। তখন ব্রাহ্মণেরা পাল

রাজাদের উপহাস করিয়া বলিত—"বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ-জাতি। ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলে বলায় যত্র তত্র"। কাজেই সাম্যবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবে কে? তবে বুদ্ধ একটা সংঘপ্রণালী (২৯) (Organization System) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর অস্থি-মজ্জায় রহিয়াছে'—ইহা হইতেছে বর্ত্তমানের ইউরোপীয় অ্যানার্কিষ্ট নামধারী সাম্যবাদীগণের গঠন-পদ্ধতি—Anarchist Communist Organization System-এর ন্যায়। ইহার অর্থ, প্রত্যেক সংঘ নিজের সংঘারাম মধ্যে কমুনিষ্ট সাম্যবাদ মানিয়া চলে, অর্থাৎ খাওয়া, থাকা ও অর্থাদি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই কমুনিষ্ট (এই সম্পর্কে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে ইহা ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছিল)। কিন্তু প্রত্যেকটি সংঘারাম অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন। উভয়ের উপরে কোন সংঘ বা একটা নেতৃমণ্ডলী ছিল না; উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং বুদ্ধ তাহা মিটাইতেন। এই পদ্ধতিতে কোন কেন্দ্রীয়সভা (Central body) ছিল না। এইজন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মমণ্ডলী বিচ্ছিন্নভাবে থাকিত এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভব হইবার সুযোগ পাইত। কিন্তু পরস্পরের মতানৈক্য মিটাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে Council (৩০) আহ্বান করা হইত। কিন্তু এই প্রকারের সংঘ বা ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন প্রণালী বুদ্ধের সময়ে অন্যান্য ধর্ম্ম-পন্থাতেও প্রচলিত ছিল। এতদ্বারা আমরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, ভারতীয় মস্তিষ্ক কেন্দ্রীভূত হইয়া কার্য্য করিবার বিপক্ষে চিরকাল পরিচালিত হইয়াছে। এই বিশাল দেশের জনগণকে একটা সংঘাধীনে আনয়ন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে পরিচালনা করিবার প্রচেষ্টা কখনও হয় নাই। এই জন্যই ভারতীয় সমাজ আজ শতধা বিভক্ত, এই জন্যই হিন্দু সমাজে এত

২৯। Dr. R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India & Dr. Narayan Chandra Banerjee—Development of Hindu Polity and Political Theories, Part I, P 260. দ্রষ্টব্য। ইনি বলেন এই সময় অন্যান্য ধর্ম্মগুরুদের সংঘ বুদ্ধ হইতেও more democratic ছিল, কতকগুলির সংঘে গোলামদের গ্রহণ করা হইত, কিন্তু বুদ্ধের সংঘে তাহা হইত না।

৩০। Dr. R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India.

অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলতা। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতকে এক কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা বার কতক হইয়াছিল; তাহার ফলে মৌর্য্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় এবং সাময়িকভাবে রাজনীতিক একজাতীয়তা সংস্থাপন হয়। কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতের জাতীয় জীবনে সর্ব্ববিষয়ে মাৎস্য ন্যায় চিরকাল কার্য্যকরী হইয়াছে (৩১)। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় জীবনে ও সমাজে অর্থনীতিক সাম্যবাদ আনয়ন করিতে পারে নাই বলিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩১। ইউরোপের খৃষ্টীয় সমাজ অনুরূপ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করিয়াছে। খৃষ্টীয় মণ্ডলী পোপের (Pope) অধীনে দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের অনুকরণে খৃষ্টান চার্চ্চ নিজেকে সংগঠন করে। এইজন্যই ইউরোপ আজ এত প্রবল।

একটি প্রেমের কবিতা

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যতো।
নিভানো তন্দ্রাহত
সহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যতো।

মৌন আলোর থামে,
ক্ষণিক ক্ষিপ্র ট্রাফিকে
পথে পথে দিকে দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় সার্সিতে
ছাতে দরজায় ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

চুপিসাড়ে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইসারায়
সে মানে না ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি ঈগল তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত
বেদনায় জবুথবু ;

শেষবার পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল
ছিঁড়ে গেছে সব মিল
তবুও খুঁজি তোমায়—
যদিও আয়ু ঝিমায়—
স্বল্প সত্য যদি
জ্বলে' ওঠে সাবলীল ॥

বিষ্ণু দে

রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়

রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়।
স্বপ্ন দেখে রাজার কুমারী
রাজপুত্র বসি আছে শয্যায় তাহারি
নয়ন ভরিয়া দেছে অজস্র চুমায়।

বহুদিন আগে যবে ঘুম এল চোখে
সেদিন ফাল্গুন ছিল বসন্তের দিন।
কানে কানে কিসে বুঝি বলেছিল ওকে
সোনার কাঠির স্পর্শে রাজপুত্র জাগাবে তাহায়।
তাই
কতদিন কত রাত্রি কত কত যুগ হোল শেষ,
কত রাজ্য ভেঙ্গে গেল ধ্বংস হোল কত শত দেশ ;—
যবে চোখে ঘুম এল সেদিন যাহারা ছিল
তাহারা কোথায় !
সেদিনের স্বপ্ন দেখে তবুও রাজার মেয়ে অঘোরে ঘুমায়!
রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়।

রাজকন্যা আজ যদি জাগে ?
সোনার কাঠিতে নয়, রাজপুত্র আসিবার আগে
প্রাসাদের বাহিরের নিপীড়িত মানবের আর্তনাদ
আজ যদি তাহারে জাগায় ?
তাহার হৃদয় কোনে স্পন্দন জাগায় ?
প্রাসাদ রাজার ছেলে ফেলে যদি ছুটে আসে
মানুষের মাঝে ?—
যে মানুষে দলিয়াছে রাজপুত্র আধুনিক রাজার কুমার—
দাম্ভিক, কলুষচিত্ত, স্বার্থান্বেষী, কামক্রীতদাস—

তারে হেরি আধুনিক প্রমোদের পঙ্কিলতা পাঁকে
নয়ন ফিরাবে নাকি দুঃসহ ঘৃণায় ?
তবু হায়—
রাজপুত্র আজও জানে শুধু রাজকন্যা নয়
আরো আরো বহু বহু মেয়ে
সোনার কাঠির স্বপ্নে অঘোরে ঘুমায়।

শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের-(য)-য়-ফলা

ঐক্যশূন্য বাক্য আছে। মাণিক্য অঙ্গার।
মুখ্য তাই অখ্যাতির লক্ষ্য উপাখ্যান ;
ভাগ্য-তরণীতে নাই যোগ্য কর্ণধার,
আরোগ্য পেল না পঙ্গু কাব্যের বিজ্ঞান।

বাচ্য বস্তু বিচারের বিবেচ্য বিষয়
বিধি বহির্ভূত হ'লে হয় কক্ষচ্যুত—
সূর্য্য-পরিক্রমা পথে। নৈরাজ্য উদয়
নৈর্ব্যক্ত বিপ্লবী আত্মা করে মনঃপুত।

স্বপ্নলীন রাজ্যহীন বিভাজ্য সমাজ
ধ্বংসের নৈকট্য লভি কাপট্যে মাতিয়া,
শাঠ্যপূর্ণ কাব্যে করে অপাঠ্য অকাজ
স্বাদেশিক নাট্যমঞ্চে আসন পাতিয়া।

জাড্য, জাড্য, ঘোর জাড্য, আচ্যচর জাতি
ধ্বংসিতেছে পণ্যশিল্প ধনাঢ্য বিলাসে,
অসত্য-অনিত্য-হত্যা-মৃত্যুময় রাতি
সংখ্যাহীন কঙ্কালেরে গিলিছে গোগ্রাসে।

রোগমুক্তি মিথ্যা জানি, পথ্যহীন দেশে
গো-হত্যায়, বাদ্য ভয়ে ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি,
বর্ম্ম ঢাকা ধর্ম্ম যেথা স্কন্ধকাটা বেশে
অবিদ্যায় ভূতাবিষ্ট অদ্ভুত মূরতি।

অন্যে পরে কিবা কথা বন্যেরাও ভালো
ধন্য তা'রা মান্য তা'রা অরণ্যে পর্ব্বতে,

মনুষ্যত্ব শূন্য নয় হোক্ বর্ণ কালো
অন্যায় করে না মিথ্যা পুণ্য ধর্ম্মপথে।

ঐস্পাতিক সভ্যতার রৌপ্যশুভ্র মনে
পরস্বাপহারী বিদ্যা নিত্য বিদ্যমান,
মূর্খে করে আপ্যায়িত লভ্য আকর্ষণে
অভ্যাসে সভ্যের মত সাজিয়া বিদ্বান।

আর্ত্তের অগম্য চির, রম্য হর্ম্ম্যমালা
বৈষম্যের আতিশয্যে স্পর্দ্ধিত গম্বুজে
উড়ায় ঐশ্বর্য্যধ্বজা। ঘৃণ্যদীপজ্বালা—
কক্ষে কক্ষে মেদমজ্জা সুপ্ত চক্ষু বুজে।

সভ্যতায় প্রভু ভৃত্য তুল্যমূল্য নয়,
অবাধ্য ভৃত্যেরা নাশে জাতীয় কল্যাণ,
বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে সন্ধি আনে মহাভয়
বৈপরীত্যে পূর্ণ তাই ঐতিহ্য আখ্যান।

আসেনিকো নব্যন্যায় দিব্যদৃষ্টি মেলি'
তালব্য সৃকনী শব্দে শবভুক শিবা—
শ্মশানের বশ্যতায় করে ক্রূর কেলি—
ক্ষুরদন্তে দীপ্যমান মাৎসর্য্যের বিভা।

দুষ্ক্ষত চিকিৎসার দ্রুত আবশ্যক,
নতুবা শ্যামল প্রাণ অবশ্য মরণে,
ভূম্যধিকারীর লোভে হ'বে আরণ্যক
পোষ্য আর শিষ্যবর্গে রাখি অনশনে।

পরম ঔদাস্যভরে আলস্যে আরামে
ব্যঙ্গ হাস্যে নস্য লয়ে ভুলি অসন্তোষ,

চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দক্ষিণে ও বামে—
নৈবেদ্য সাজায়ে কাব্য রচে আত্মঘোষ।

অনৈক্যের আর্য্যসত্য অনার্য্য বোঝে না—
বোঝে যারা বিজ্ঞ এই অসহ্য আখ্যান
বিচার্য্য বৈদিক তথ্য অজ্ঞেরা খোঁজে না
সহ্যশীল কবি ভনে শুনে পুণ্যবান।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

রুশিয়াতে দিন কয়েক

বিগত মহাযুদ্ধের পরে রুশিয়া বহির্জগতের কাছে একটি পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়াই সাধারণতঃ গণ্য হইয়া থাকে। একদিকে অন্যদেশের লোকেদের ওখানে যাওয়া একটি বিশেষ দুরূহ ব্যাপার, অপর দিকে অনেকেরই রুশিয়ার প্রতি আকর্ষণ তেমন একটা আছে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়াতে যাইতে হইলে রুশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া (visa) আবশ্যক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অনুমতি পাওয়া যায় না, এবং যখন পাওয়া যায় তখনও পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয়। বাহিরের লোকের রুশিয়া যাওয়ার পথে ইহা একটি বড় অন্তরায়। অপর দিকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যান্য দেশের প্রতি সাধারণতঃ পর্য্যটকদিগের যেরূপ আকর্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রুশিয়ার প্রতি সেরূপ আকর্ষণ থাকা দূরের কথা উপরন্তু তাঁহাদের অনেকের ধারণা আছে যে রুশিয়ার লোকেরা দৈত্যদানব, মানুষ দেখিলেই খুন জখম করিয়া বসে। ফিন্‌ল্যাণ্ড রুশিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ এবং পূর্ব্বে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গতই ছিল। কিন্তু এই দেশের লোকেদের মধ্যেও রুশিয়া সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা এখনও আছে। এখানকার এক দম্পতির সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই উচ্চশিক্ষিত এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারাও বলিলেন, "রুশিয়া যাচ্ছেন, ভয় করছে না ?"

ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইবার সময় রুশিয়া যাইব এরূপ সিদ্ধান্ত আমিও করিয়াছিলাম না। নিউ ইয়র্কে যাইয়া স্থির করিলাম যে রুশিয়া যাইবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে ওখানকার ব্রিটিশ কন্‌সালের আপিসে যাইয়া পাসপোর্টে রুশিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলাম। এই অনুমতি অতি সহজেই পাওয়া গেল। রুশিয়া যাইবার প্রথম চেষ্টায় কোন বাধা পাইলাম না। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া রুশ কন্‌সালের আপিসে যাইয়া রুশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। যাইবার সময় ভাবিয়াছিলাম এই আপিসের লোকেরা গম্ভীর মুখ করিয়া বলিয়া দিবে যে রুশিয়া যাইবার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা আগ্রহই দেখাইলেন এবং যাহাতে রুশ

গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিতে কোন আপত্তি না করেন সে বিষয়ে মস্কোতে লিখিবেন বলিয়া আশ্বাসও দিলেন। তবে নিয়ম অনুসারে রুশিয়াতে পর্য্যটক হিসাবে যাইতে হইলে ইন্‌টুরিষ্ট (Intourist) নামে সেখানকার পর্য্যটন বিভাগের মধ্যস্থতায় দরখাস্ত করিতে হয়। এই বিভাগের একটি আপিস নিউইয়র্কে আছে। সুতরাং সেই আপিসে যাইয়া দরখাস্ত করিবার জন্য কন্‌সাল মহাশয় বলিলেন। তদনুসারে সেখানে কয়েকখানি ফটোগ্রাফযুক্ত দরখাস্ত পেশ করিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যে মস্কো হইতে অনুমতি পাওয়া যাইবে এইরূপ আশ্বাসও পাইলাম। কিন্তু তিন সপ্তাহ অতীত হইল অনুমতি আসিল না। তখন ভাবিলাম রুশিয়া যাওয়া হইল না। এদিকে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রুশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই লণ্ডনের পথে যাত্রা করিলাম। পাঁচ দিন পরে জাহাজখানি প্লিমাউথ বন্দরে পৌঁছাইলে নিউইয়র্কের ইন্‌টুরিষ্ট আপিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলাম যে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোলমের ইন্‌টুরিষ্ট আপিসে গেলে রুশিয়ার ভিসা (visa) পাওয়া যাইবে। সুতরাং যাইবার অনুমতি যখন পাওয়া গেল তখন যাওয়াই উচিত এই স্থির করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পথে রওয়ানা হইলাম।

ষ্টকহোলমে আসিয়া ইন্‌টুরিষ্টের কর্ম্মচারীদিগের সহিত দেখা করিয়া ভিসা (visa) সংগ্রহ করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়াতে কিছু দিন থাকিবার উপযোগী কুপন্ ক্রয় করিলাম। এই কুপনগুলির বিনিময়ে রুশিয়াতে হোটেলে থাকিবার, চারিবেলা খাইবার, গাড়ীতে করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার এবং ট্রেণে করিয়া এক সহর হইতে অপর সহরে যাইবার ব্যবস্থা হইবে। ষ্টকহোলম হইতে রুশিয়া যাইতে হইলে প্রথমে জাহাজে করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের এবো (Abo) বন্দরে আসিতে হয়। যে জাহাজখানিতে আমি এবো আসিলাম তার নাম ব্রিন-হিল্ড। এবো হইতে ট্রেণে করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে (Helsinki) আসিতে হইল। ওখানে ১০।১১ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সহরটি ঘুরিয়া দেখিয়া রাত্রি ১১টার সময় লেনিনগ্রাডের ট্রেণে উঠিলাম। পরদিন সকাল ৯।১০টায় ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রুশিয়ার সীমান্ত ষ্টেশন রাইয়াইওকিতে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। এখানে ইন্‌টুরিষ্টের একজন মহিলা কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ হইবে, গলায় একটি ফার জড়ানো এবং

অন্যান্য পোষাক পরিচ্ছদেও তাঁহাকে অপর কোন দেশের মহিলা হইতে পৃথক বলিয়া মনে হইল না। তিনি পরিষ্কার ইংরাজী বলিতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ অনুসারে আমার সঙ্গে যে কয়েকটি সুটকেশ ছিল সেগুলি ষ্টেশনের রুশ-কাস্‌টমস (Customs) আপিসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেখানে যাইতে হইল। সেখানে সর্ব্বপ্রথম রুশ গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। দেখিলাম সেখানে দুইজন অল্পবয়স্কা মহিলা আর কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক বাক্স খুলিয়া জিনিষপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহার পূর্ব্বে অনেক দেশের কাস্‌টমস্ পার হইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায়ও সশস্ত্র সৈনিক দেখি নাই এবং এখানে যে প্রকার পরীক্ষা হইল তাহার তুলনাও অন্য কোথাও মিলিবে না। বাক্সগুলি খুলিয়া দেওয়া মাত্র সেগুলিকে উপুড় করিয়া যাবতীয় জিনিষপত্র ডেস্কের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল এবং তাহার পর প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হইল। দুই ঘণ্টা পরে রেহাই পাইলাম। পুনরায় ট্রেণে উঠিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই লেনিনগ্রাডের একটি ছোট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে ইনটুরিষ্ট আপিসের লোকজন উপস্থিত ছিল। তাহারা আমাকে এবং অন্যান্য পর্য্যটকদিগকে ট্যাক্‌সি করিয়া একটি বড় হোটেলে লইয়া গেল।

লেনিনগ্রাডে অতি অল্প দিনই ছিলাম। এই অল্প সময়ে রুশিয়ার এই বৃহৎ সহর এবং পুরাতন রাজধানীর যতটা সম্ভব দেখিয়া লইলাম। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে বহু পূর্ব্বে মস্কো রুশিয়ার রাজধানী ছিল। কিন্তু প্রায় আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে পিটার দি গ্রেটের সময় নেভা নদীর তীরে লেনিনগ্রাড নগরী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিটার রাজধানী ঐ সহরে স্থানান্তরিত করেন। ইনি শাসনতন্ত্রের, সমাজের এবং ধর্ম্মের নানাপ্রকার সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু মস্কোতে গতানুগতিকতার প্রভাব ছিল এত বেশী যে ওখানে রাজধানী থাকিলে সংস্কারের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং রাজধানী উত্তরে স্থানান্তরিত করা হইল এবং পিটারের নাম অনুসারে নূতন রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গ নামে অভিহিত হইল। বল্‌শোভিক বিপ্লবের পরে সেণ্ট পিটর্সবার্গ নাম বদ্‌লাইয়া এই সহরের নূতন নামকরণ হইল লেনিনগ্রাড। সেণ্ট পিটর্সবার্গ কথাটি হইতে সকলেই

বুঝিলেন যে পিটার দি গ্রেট্ সেণ্ট (Saint) বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ কেবল তিনি নহেন, রুশিয়ার যাবতীয় অধীশ্বরগণকেই সেণ্ট বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহার উদ্দেশ্য অতি সহজেই অনুমেয়। জারগণ "সেণ্ট" বলিয়া খ্যাত হইলে তাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মভীরু প্রজাবৃন্দের সম্মান বিশেষ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের মনে দেশের অধীশ্বর সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা জন্মিবে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই "সেণ্ট" হইলেন।

লেনিনগ্রাড এখন আর রুশিয়ার রাজধানী নহে। যে সকল কারণে পিটার রাজধানী মস্কো হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন প্রায় সেই সমস্ত কারণ বশতঃই বলশোভিক আমলে আবার রাজধানী লেনিনগ্রাড হইতে মস্কোতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু লেনিনগ্রাডের রাজধানীর গৌরব এখন না থাকিলেও ইহা মোটেই নগণ্য জায়গায় নহে। ইহার লোকসংখ্যা বৎসরের পর বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এখানে ২৭ লক্ষ লোকের বাস। সহরটি নেভা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। নেভা নদী এইস্থানে বেশ চওড়া। এখান হইতে আরও ২০।২২ মাইল বহিয়া যাইয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে।

নূতন আমলের রুশিয়ার অন্যান্য স্থানের ন্যায় লেনিনগ্রাডেও লোকের মানসিক এবং বাহ্যিক পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে মস্কোকে যেমন নূতন রুশিয়ার প্রতীক্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তেমনই লেনিনগ্রাড পুরাতন জার-শাসিত রুশিয়ার কেন্দ্রস্থান ছিল। এখনও জারের আমলের জাঁক-জমক তাঁহাদের স্বৈর-শাসন এবং তাঁহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে অল্প সময়ে কোন ধারণা করিতে হইলে লেনিনগ্রাডে যাওয়া আবশ্যক। পিটারের সুবিখ্যাত কীর্ত্তি 'পিটার এণ্ড পল' দুর্গ এখনও নেভা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহার ভিতরে বর্ত্তমান রুশ-গভর্ণমেণ্টের ট্যাকশাল স্থাপন করা হইয়াছে। দুর্গের ভিতরের প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা এখনও সগৌরবে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে যীশুখৃষ্টের ভজনা হয় না। কেবলমাত্র জার ও জারিনাদিগের গোরস্থান হিসাবে এইখানে দর্শকের দল যাইয়া থাকেন। জার ও জারিনাদিগের কবরগুলি সারি সারি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পিটার দি গ্রেট ও তাঁহার পত্নী প্রথম ক্যাথারিণের

কবর দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত। ক্যাথারিণ পিটারের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁহার প্রথম স্ত্রী তাঁহার সংস্কার-নীতির মোটেই অনুরাগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরাতনপন্থী। সেই অপরাধে তাঁহাকে মনাষ্টারিতে (Monastery) নির্ব্বাসন দিয়া পিটার দ্বিতীয়বার এক রজকিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনিই ইতিহাসে প্রথম ক্যাথারিণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এবং পিটারের বিশেষ গুণগ্রাহিনী ছিলেন। পিটার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর তাঁহার হস্তে রুশিয়ার শাসনভার কিছুদিন ন্যস্ত ছিল। সুতরাং কেবল জারের পত্নী হিসাবে নহে রুশিয়ার শাসনকর্ত্রী হিসাবেও ইনি জারিনা ছিলেন। 'পিটার এণ্ড পলের' অপর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে ইহার ভিতরকার রাজনৈতিক কয়েদখানা। ফ্রান্সের বিখ্যাত কয়েদখানার (Bastille) ন্যায় ইহা জগতে তেমন পরিচিত না হইলেও ইহার মধ্যে দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর রাজনৈতিক বন্দিগণ যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার পরিমাণ মোটেই অল্প ছিল না। এই জেলটির ছোট ছোট ঘরগুলির সম্মুখে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কয়েদীগণ ওখানে এক সময়ে বাস করিতেন তাঁহাদের ইতিবৃত্ত লিখিয়া টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে।

লেনিনগ্রাডের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় শীতকালের রাজপ্রাসাদ (Winter Palace)। এই প্রাসাদটি বিরাট। সম্মুখে প্রকাণ্ড খোলা জায়গা। ১৯০৫ সনে এই জায়গাতে এক বৃহৎ জনতার উপর জারের আদেশে গুলি চালানো হয় এবং বহু ব্যক্তি তাহার ফলে হতাহত হয়। এই বৎসর রুশিয়াতে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকৃতকার্য্য হয় এবং আরও ১২ বৎসর পূর্ব্ব-প্রতাপে দ্বিতীয় নিকোলাস রুশিয়ায় রাজত্ব করেন। কিন্তু যে বিদ্রোহানল ১৯০৫ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা ১২ বৎসর পরে আরও বৃহদাকারে এবং ব্যাপকভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই সাঙ্গ জারের শাসনের অবসান ঘটিল। Winter Palace পিটার দি গ্রেটের কীর্ত্তি নহে। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে জারিনা এলিজাবেথ ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদ এখন লেনিনগ্রাডের একটি বিরাট মিউজিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাসাদের একদিকে ললিতকলার (Fine Arts) মিউজিয়ম খোলা হইয়াছে, অপর দিক জারের আমলে যেমন সুসজ্জিত ছিল

ঠিক সেইরূপই রাখা হইয়াছে। দর্শকগণ ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া জার-দিগের জাঁকজমক সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাইয়া থাকেন।

লেনিনগ্রাড হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে নেভা নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে প্রায় সেই সঙ্গমস্থলে পিটার দি গ্রেট অতি রমণীয় এক গ্রীষ্মপ্রাসাদ (Summer Palace) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নানা গ্রামের মধ্য দিয়া বাসে করিয়া এই প্রাসাদ দেখিতে যাইতে হইল। অতি বিস্তৃত ভূমি লইয়া প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার একদিকে একটি গীর্জ্জা, কিন্তু সেখানে উপাসনাদি কিছুই আর এখন হয় না। প্রাসাদের ঘরগুলি আগেকার দিনের মতই সুসজ্জিত রহিয়াছে। বাহিরে বাগানের পর বাগান এবং ঝরণার পর ঝরণা। কিন্তু এই সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে পিটার নিজে থাকিতে ভালবাসিতেন না। নিজের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তিনি অনতিদূরে একটি ছোট কুটির নির্ম্মাণ করেন—তাহাতে ৪।৫টি ছোট ছোট ঘর। একটি রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং রান্নার কার্য্য তাঁহার স্ত্রী প্রথম ক্যাথারিণ স্বহস্তেই করিতেন। রান্নার তৈজসপত্র এখনও আগেকার দিনের মত সাজানো রহিয়াছে।

লেনিনগ্রাডে কয়েকদিন থাকিবার পর একদিন রাত্রি ১০ ঘটিকার ট্রেনে মস্কোর পথে রওয়ানা হইলাম। মস্কোর ট্রেনখানি বিশেষ দ্রুতগামী ছিল। পরের দিন সকাল ৯॥ টায় মস্কো সহরে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সহর বর্ত্তমান রুশিয়ার রাজধানী এবং নূতন সভ্যতার প্রতীক এবং কেন্দ্র-স্থান। সুতরাং মস্কোর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়াই রুশিয়ার এই নূতন সভ্যতা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিব। অবশ্য ইহা এইখানে বলা প্রয়োজন যে আমি মস্কোতে অল্পদিনই ছিলাম। সুতরাং যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা হইতেই যে রুশিয়ার নূতন সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

১৯১৭ সনে বলশেভিক বিপ্লবের পরে মস্কোতে রাজধানী ফিরাইয়া আনিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্ত্তমানে মস্কো নগরীতে প্রায় ৩৭ লক্ষ লোকের বাস। ক্রমশঃ এই জনসংখ্যা আরও

বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই তবে নূতন আমলে রুশিয়াতে সকল কার্য্যই কল্পনা-অনুমোদিত পথে হইয়া থাকে। নদী যেমন আপনার ইচ্ছানুসারে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যায় অন্যান্য দেশেও সেই প্রকার জনসাধারণ আপনাদের ইচ্ছা এবং সুযোগ অনুসারে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া থাকেন; গভর্ণমেণ্টের তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই। কিন্তু রুশিয়াতে নিজেদের খেয়াল অনুসারে সাধারণের এই প্রকার স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন এবং নিষ্ক্রমণ সম্ভব নয়। শুনিয়াছি রুশ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে মস্কোর জনসংখ্যা কখনও ৫০ লক্ষ অতিক্রম করিতে দেওয়া হইবে না। একস্থানে বহু লোক সমাগম হইলে নানাদিক হইতে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোক লণ্ডন সহরে এবং তাহার উপকণ্ঠে বাস করিয়া থাকে। ইহা যে ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ব্যাপার নহে তাহা অনেক ইংরাজ এখন বুঝিতে পারিতেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বিশেষ করিয়া ইহা যে বিপদসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফ্রান্সে সমস্ত দেশের উপর প্যারিস নগরীর আধিপত্যের কথা সকলেই জানেন। সকল দিক হইতেই ফরাসী জীবন প্যারিসে কেন্দ্রীভূত। কি খাইতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে, কোন ধারায় চিন্তা করিতে হইবে সে বিষয়ে সমস্ত ফরাসী দেশ প্যারিসের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। রুশ জননায়কেরা মস্কোকে এইভাবে রুশিয়ার কেন্দ্রস্থান করিয়া তুলিতে প্রস্তুত নহেন। মস্কো যুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলির রাজধানী বটে, কিন্তু তাহার উপরে আর বেশী কিছুই নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী যেমন ওয়াশিংটন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীও তেমনি মস্কো। কিন্তু ফরাসীদেশের সহিত রাজধানী প্যারিসের যে সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ওয়াশিংটনের ঠিক সেই সম্পর্ক নহে। তেমনি মস্কো নগরী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী মাত্রই। লোকসংখ্যা ক্রমশঃ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাইলে মস্কোর আধিপত্য সবদিক হইতে বাড়িয়া যাইতে পারে, এই কথা ভাবিয়াই বোধহয় রুশ জননায়কগণ সে পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মস্কোর জনসংখ্যা অধিক পরিমাণে, বৃদ্ধি পাইলে এবং নানাপ্রকার শিল্পের কারখানা মস্কোর আশে পাশে স্থাপিত হইলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় বিপদের আশঙ্কা থাকিতে পারে এই ভাবিয়াও বোধহয়

বর্ত্তমান রুশিয়ার কর্ণধারগণ মস্কোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মস্কোতে যে হোটেলে আমাদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই হোটেলটি মস্কো নদীর উপরেই স্থাপিত। এই নদীটি পূর্ব্বে বিশেষ প্রশস্ত এবং গভীর ছিল না। রুশ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই অবস্থায় নদীটিকে রাখা উচিত মনে করিলেন না। তাই বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং অনেকখানি গভীর হইয়াছে। এখন এই নদী দিয়া নানাপ্রকার ষ্টিমার আসা যাওয়া করে। রুশিয়ার প্রসিদ্ধ ভল্‌গা নদী অনেক দূর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মস্কোর সহিত ভল্‌গার পূর্ব্বে কোনই যোগ ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইল একটি বিরাট খাল (Canal) কাটিয়া ভল্‌গার সহিত মস্কো নদীর যোগাযোগ সংগঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে হোয়াইট হল গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় ব্যাপারের কেন্দ্রস্থান; সেইরূপ মস্কোর ক্রেমলিন (Kremlin) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় ব্যাপারের কেন্দ্রস্থান। ইহা মস্কো নদীর উপরেই অবস্থিত। পূর্ব্বে ক্রেমলিনেই রুশিয়ার জার বাস করিতেন। মস্কো যখন রুশিয়ার রাজধানী ছিল তখন ক্রেমলিনের জাঁকজমক কিছু কম ছিল না। পরে রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তরিত হইলেও প্রায় প্রতি বৎসরই জার মস্কোতে আসিতেন এবং ক্রেমলিনে বাস করিতেন। সুতরাং ক্রেমলিন দিনে দিনে একেবারে নগণ্য হইয়া গেল না। বর্ত্তমানে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভিতরের গির্জ্জাগুলিতে আর উপাসনা হয় না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট এখন ক্রেমলিনেই বসিয়া থাকে। অন্যান্য নানাপ্রকার জরুরী সভাসমিতিও এইখানে হইয়া থাকে। তাহার জন্য বিশদ ব্যবস্থা নূতন আমলে করা হইয়াছে। ক্রেমলিন উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণতঃ কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ক্রেমলিনে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে একটি ঘণ্টা রহিয়াছে, এবং সন্ধ্যাবেলা সেখানে একটি লাল বাতি জ্বালিয়া রাখা হয়। ভিতর হইতে কোন গাড়ী বাহির হইবার পূর্ব্বে এই ঘণ্টা বাজানো হয় এবং তদনুসারে পথচারীরা পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়। তাহার পর গাড়ী চলিয়া গেলে যে যাহার মত চলিতে থাকে। শুনিলাম ষ্টালিনের গাড়ী বাহির হইবার

সময় অন্য আর একখানা গাড়ী সাধারণতঃ সঙ্গে থাকে। রাত্রিবেলা বহুদূর হইতে কোনটি ক্রেমলিন তাহা জানিতে পারা যায়। ক্রেমলিনের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের উপর মাস্তুলের মত করিয়া অনেক উঁচুতে পাঁচটী লাল তারকা (Red Star) বসানো আছে। রাত্রিতে ইলেকট্রিকের আলোতে এই লাল তারাগুলি জ্বলিতে থাকে এবং সেইগুলি বহুদূরেও ক্রেমলিনের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়।

ক্রেমলিনের সম্মুখেই বিখ্যাত রেড্ স্কোয়ার (Red Square) অবস্থিত। ইহা যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনই প্রস্থে অতি বিস্তীর্ণ। সাধারণতঃ স্কোয়ার বলিলে যেরূপ একটি বাগান মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, রেড স্কোয়ার আদৌ সেরূপ বাগান নহে। এখানে বড় ছোট কোন গাছ গাছড়াই নাই, নীচে কোন ঘাসের বালাইও নাই, রাস্তাগুলি যেমন পাথর ও সিমেণ্ট দিয়া তৈয়ার হইয়া থাকে রেড্ স্কোয়ারও সেইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে বাগান না বলিয়া একটি বিস্তৃত পাথর নির্ম্মিত সমতল খোলা মাঠ বলা যাইতে পারে। একসঙ্গে বহু সহস্র লোক এইখানে সমবেত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। তথাপি রুশ জননায়কগণ স্থির করিয়াছেন যে এই বিস্তীর্ণ ভূমিকে আরও বিস্তীর্ণ করিতে হইবে। এইকথা শুনিয়া প্রথমে ভাবিলাম ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। একদিকে ক্রেমলিন অপর দিকে নূতন প্রতিষ্ঠিত বড় বড় বাড়ী। রেড্ স্কোয়ার আরও প্রশস্ত করিতে হইলে এই বাড়ীগুলি কি ভাঙ্গিতে হইবে না? কিন্তু শুনিলাম বাড়ীগুলি ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। একটি ছোট চারাগাছ যেমন এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া বসাইয়া দেওয়া যায়, এই বৃহৎ বাড়ীগুলিকেও নাকি সেইরূপ একটু দূরে সরাইয়া বসাইয়া দেওয়া যাইবে। তাহাতে এই বাড়ীগুলির কোনই ক্ষতি হইবে না। প্রথমে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিকটেই একটি রাস্তায় যাইয়া দেখিলাম যে রাস্তাটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রশস্ত করা হইতেছে। ডাইনে বাঁয়ের বাড়ীগুলিকে মাটি হইতে কাটিয়া ইঞ্জীনিয়ারেরা একটু দূরে সেগুলিকে বসাইয়া দিতেছে। বাড়ীগুলি নষ্ট না করিয়া যে ভাবে রাস্তাগুলি প্রশস্ত করা হইতেছে, সেই ভাবে রেড্ স্কোয়ারও আরও প্রশস্ত করা হইবে।

রেড্ স্কোয়ারের একদিকে এবং ক্রেমলিনের প্রাচীরের পার্শ্বে লেনিনের

স্মৃতি সৌধ স্থাপন করা হইয়াছে। আগ্রার তাজ বলিলে যে স্মৃতিসৌধ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এই সৌধ সেরূপ কিছুই নাই। এই ইমারতটি লাল রংয়ের এবং ক্ষুদ্রায়তন। কিন্তু রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে এই ক্ষুদ্রায়তন এবং দেখিতে নগণ্য সৌধটির প্রভাব অতি বিস্তৃত। ইহাকে একটি জাতীয় তীর্থস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রতিদিন শত শত লোক এই তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকে। একের পর এক দর্শকেরা সারি বাঁধিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে এবং একে একে সৌধের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়। সেইখানে লেনিনের দেহটি কাঁচের আবরণের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কথিত আছে যে লেলিনের স্ত্রী তাঁহার দেহটিকে এইভাবে রক্ষা করিবার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন এবং এই বিরুদ্ধতায় অনেক ছোট খাট নেতারাও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ গভর্ণমেণ্ট এই বিরুদ্ধতা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। লেনিন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং জগতে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই হিসাবে জননায়কেরা স্থির করিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহটি রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে দুনিয়ার লোককে তাহা দর্শন করিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্মৃতিসৌধের মধ্যে লেনিনের মৃতদেহের দুই দিকে দুইজন সশস্ত্র সৈনিক দিবারাত্র মোতায়েন থাকিয়া পাহাড়া দিয়া থাকে। দেখিলাম লেনিনের দেহটি অতি শীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে অসুখে ভুগিয়া তিনি শীর্ণকায় হইয়াছিলেন।

মস্কোতে নানাজাতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান রুশিয়ার সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকিলে প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতে পারা যাইবে না। সাধারণতঃ অনেকের ধারণা যে রুশিয়াতে সাম্যবাদ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই দেশে বিভিন্ন লোকের মধ্যে অবস্থাবৈষম্য কিছুই নাই। ইহা ঠিক নহে। আবার অনেকের এইরূপ ধারণাও আছে যে রুশিয়াতে টাকা পয়সার প্রচলন আর নাই। লোকেরা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কেবলমাত্র একটি টিকিট পাইয়া থাকে এবং তাহার

উপর নির্ভর করিয়াছি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র গভর্ণমেণ্টের দোকান হইতে পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশের ন্যায় রুশিয়াতে লোকে কাজ করিয়া বেতন পাইয়া থাকে। এই বেতন কার্য্য হিসাবে এবং কর্ম্মীর যোগ্যতা অনুসারে কম বেশী হইয়া থাকে (১)। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূল নীতি অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কর্ম্ম পাইবার এবং করিবার অধিকারী। অবশ্য এই কাজ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠানেই পাইতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। অনেকে ব্যক্তিবিশেষের গৃহেও কার্য্য করিয়া থাকে। অবশ্য যদি কেহ কার্য্যক্ষম হইয়াও কাজ করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে রাষ্ট্র বাধ্য নহে (২)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্য্য এবং যোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মীদিগের বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে। শুনিলাম গভর্ণমেণ্ট মোটামুটিভাবে সর্ব্বনিম্ন বেতন কত হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন *। মস্কো এবং লেনিনগ্রাড এই দুই জায়গাতেই শুনিলাম এই সর্ব্বনিম্ন বেতন মাসিক ১৭৫ রুব্‌ল্ (১ রুব্‌ল্ মোটামুটিভাবে ১ শিলিংএর সমান, ১ শিলিং=৷৶০)। একদিকে যেমন সর্ব্বনিম্ন বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপর দিকে সেই প্রকার সর্ব্বোচ্চ বেতনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে মস্কোতে একজন অধ্যাপককে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদিও সর্ব্বোচ্চ বেতন ঐভাবে নির্দ্দিষ্ট নাই তথাপি মাসিক ২০০০ রুব্‌লের বেশী কাহারও বেতন সাধারণতঃ হয় না। তিনি যতটা জানেন তাহাতে ২০০০ রুব্‌ল্ সর্ব্বোচ্চ বেতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি আরও বলিলেন যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টরাই এই সর্ব্বোচ্চ বেতন পাইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ৬০০ হইতে ১০০০ রুব্‌ল্ মাসিক পাইয়া থাকেন।

১। 'From each according to his ability, to each according to his work.' —Article 12 of the constitution of the U. S. S. R.

২। "He who does not work, neither shall he eat." Ibid.

* সর্ব্ব নিম্ন বা সর্ব্বোচ্চ বেতন নির্দ্দিষ্ট করিতে কন্‌ষ্টিটিউসন্ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য নহে।

বাহিরের লোকের এইরূপ ধারণাও আছে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। বাস্তবিক পক্ষে, কেবল যে এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু জমাইয়া সরকারী ব্যাঙ্কে রাখিতে পারে তাহা নহে, তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ সঞ্চিত অর্থ তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার অধিকারী। সঞ্চিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা জমি এবং বাড়ী কিনিবার অধিকারও তাহাদের আছে। বস্তুতঃ গ্রামগুলিতে অনেক কৃষক নিজেদের বাড়ীতেই বাস করিয়া থাকে। অর্থ সঞ্চয় করিয়া উহা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয় এইরূপ শুনিলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে হয়ত অনেক অন্যান্য দেশের ধনাঢ্যদিগের ন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণাই করা হইবে। প্রথমতঃ দালালী করিয়া অথবা কারখানার মালিক হইয়া হাজার হাজার টাকা দিনের পর দিন রোজগার করা রুশিয়ায় অসম্ভব। চাকুরী করিয়াও অতিরিক্ত মোটা মাহিনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ জমা রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে। সভ্য জগতে অধিকাংশ লোক সাধারণ অবস্থায়ও একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যতটা সম্ভব টাকা জমাইয়া রাখেন। বিপদে আপদে, বৃদ্ধ বয়সে, কখন কিরূপ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু রুশিয়াতে এই সকল কথা ভাবিবার তত প্রয়োজন হয় না *। নানাবিধ বীমার বন্দোবস্ত থাকায় প্রয়োজন মত সকলেই অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। সুতরাং সামাজিক আবহাওয়ার জন্যও অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা অর্থ সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ অথবা তদনুরূপ জমিজমাই তাহাদের আভিজাত্যের মাপকাঠি। এইগুলি যাহাদের বেশী আছে সমাজে প্রতিপত্তি তাহাদের বেশী। সুতরাং সকলেরই যে এই দিকে দৃষ্টি থাকিবে তাহাতে

* Citizens of the U. S. S. R. have the right to maintenance in old age and also in case of sickness or loss of capacity to work. This right is ensured by the extensive development of social insurance of workers and employees at small expense, free medical service for the working people etc. Article 120 of the constitution of the U. S. S. R.

সন্দেহ নাই। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আভিজাত্যের অন্য মাপকাঠি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সেখানে ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ জমাইয়া কেহ গৌরববোধ করিবার সুযোগ পায় না। উপরন্তু এই কারণে সমাজে তাহাকে হেয় হইতে হয়। কর্ম্মীদিগকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয় সচ্ছলভাবে থাকিবার জন্য। এইভাবে না থাকিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অর্থ জমাইলে তাহাতে সামাজিক উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই নূতন সামাজিক ব্যবস্থা ও আবহাওয়ার জন্য এক এক ব্যক্তি প্রচুর অর্থ জমাইয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহা ভোগদখল করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু আইন অনুসারে কাহারও অর্থ সঞ্চয় করিবার এবং তাহা দ্বারা বাড়ীঘর কিনিবার কোন বাধা নাই।

মস্কোতে পাইওনিয়ার এবং অক্টোব্রিষ্টদিগের একটি প্রতিষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটিকে একই সঙ্গে তাহাদের ক্লাব এবং শিক্ষাকেন্দ্র বলা যায়। এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে পাইওনিয়ার এবং অক্টোব্রিষ্টদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। এই সভ্যগণ নানাপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাচিত হন। একবার নির্ব্বাচিত হইলেই যে বরাবর সভ্য থাকিয়া যাইতে পারেন তাহাও নহে। চরিত্রবল, কর্ম্মকুশলতা এবং সমাজসেবার যে মাপকাঠি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে যে কোনও সভ্যকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়া হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যদিগকে সর্ব্বদাই রাষ্ট্র এবং সমাজ সেবার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিতে হয়। যদিও আঠারো বৎসর পূর্ণ হইলেই যে কোন আদর্শ ব্যক্তি বা নারীকে কমিউনিষ্ট দলভুক্ত করা যাইতে পারে, তথাপি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেই সভ্যগণ মনোনীত হইয়া থাকে। যাহাতে এই দলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দেশের যুবকযুবতী এবং ছেলেমেয়েরা সামাজিক জীবন যাপন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। প্রথমতঃ চৌদ্দ হইতে তেইশ বৎসরের বালকবালিকা এবং যুবকযুবতীদিগকে লইয়া 'কমসোমল' গঠিত

হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা সমগ্র দেশে প্রায় ষাট লক্ষ। সভ্যগণ সংঘবদ্ধভাবে খেলাধূলা করে, জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় সর্ব্বদা সেইদিকে দৃষ্টি রাখে। দশ হইতে ষোল বৎসরের বালকবালিকাদিগকে লইয়া পাইওনিয়ার দল এবং আট হইতে এগারো বৎসরের ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া লিট্‌ল্ অক্টোব্রিষ্ট সংঘ গঠন করা হইয়াছে। ক্রমশঃ এক দল হইতে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সভ্যগণ অপর দলে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

যে ক্লাব বা শিক্ষাকেন্দ্রটি দেখিতে গিয়াছিলাম সেখানে আট হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক অক্টোব্রিষ্ট এবং পাইওনিয়ারগণ ছুটির দিনে এবং অন্যান্য দিন বিকালে যাইয়া থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের সময় কাটাইবার জন্য নানাপ্রকার খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে। একটি ঘরে দাবা খেলিবার সরঞ্জাম রহিয়াছে দেখিলাম। এই দাবা খেলায় বার চৌদ্দ বৎসরের বালকবালিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। শুনিলাম নিউ ইয়র্ক হইতে এক বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় ইহাদের সহিত খেলিতে বসিয়াছিলেন। তের বৎসরের একটি বালককে খেলায় হারাইয়া দিতে তাঁহাকে সাত ঘণ্টা খেলিতে হইয়াছিল। আর একটি জায়গায় দেখিলাম ফটো তুলিবার কতকগুলি ছোট বড় ক্যামেরা এবং অন্যান্য তৈজসপত্র রহিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কেবল যে এখানে ভালরূপে ছবি তুলিতেই শেখে তাহা নহে, ক্যামেরাগুলির কলকব্জা সম্বন্ধেও তাহারা বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করে। কেহ কেহ ক্যামেরা তৈয়ারী করিবার প্রণালীও শিখিয়া থাকে। আর একটি বিভাগে ছেলেমেয়েদের উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উদ্ভিদ এবং মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্য একটি ঘরে বিমান সম্বন্ধে বালকবালিকাদের উৎসাহ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ছোট ছোট নানা-প্রকার নির্ম্মিত বিমান রাখা হইয়াছে। ক্লাবটিতে আহারাদি করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যাহাতে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা সভ্যভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে সাধারণের সম্মুখে খাইতে শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। নাচ গান এবং থিয়েটার করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও এখানে আছে। বাস্তবিক পক্ষে এক মস্কো সহরেই এইরূপ ছোটখাট প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি

রহিয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য দেশে যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, কি মস্কোতে, কি লেনিনগ্রাডে সেরূপ দেখি নাই।

মস্কোর বিশ্রাম এবং জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত উদ্যানের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই উদ্যানে ইন্‌টুরিষ্টের কোন গাইড না লইয়াই অন্য তিন চারিজন সঙ্গীর সহিত প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অনেকের ধারণা আছে যে রুশিয়াতে কোন পর্য্যটক ইচ্ছামত কোন দর্শনীয় স্থানে যাইতে পারে না। ইন্‌টুরিষ্টের লোকেরা তাহাকে যেখানে লইয়া যায় সেইখানেই যাইতে হয়, অপর স্থানে যাইবার সুযোগ হয় না। প্রকৃতপক্ষে রুশ ভাষা না জানিলে ইচ্ছামত অপর স্থানে যাইতে গেলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অনেক। আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে দুইজন ভালরকম এষ্টোনিয়ান এবং কাজ চালাইবার মত রুশ ভাষা জানিতেন। সেইজন্য তাহাদের সহিত গিয়া বিপদে পড়িতে হয় নাই। উদ্যানটিতে উপরের রাস্তা দিয়া না যাইয়া টিউবে গিয়াছিলাম। এই টিউব রেলওয়ে বা সাবওয়ে রুশদিগের একটি বিশেষ গর্ব্বের বস্তু। ওখানে ইহাকে মেট্রো বলা হইয়া থাকে। ১৯৩৫ সনে সর্ব্বপ্রথম মেট্রো খোলা হয়। গাড়ীগুলি নিউইয়র্কের সাবওয়ে গাড়ীগুলি অপেক্ষা ত বটেই লণ্ডনের টিউব গাড়ীগুলি হইতেও উৎকৃষ্টতর এবং আরামদায়ক বলিয়া মনে হইল। অবশ্য এইগুলি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেইজন্য এখনও বেশ পরিষ্কার এবং ঝকঝকে তকতকে রহিয়াছে। উদ্যানটিতে বেড়াইবার, বক্তৃতা শুনিবার, নানাবিধ দ্রষ্টব্য দেখিবার, খেলাধূলা করিবার এবং থিয়েটার দেখিবার বন্দোবস্ত আছে। এক জায়গায় দেখিলাম রুশিয়ার যাবতীয় কবি এবং মনস্বীদিগের ছবি টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার নীচে তাহাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য বিশদভাবে লিখিয়া রাখা হইয়াছে। এই মনস্বীদিগের মধ্যে ম্যাক্সিম গর্কিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান দেখাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর এক জায়গায় দেখিলাম বেশ উচ্চ একটি মনুমেণ্টের মত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপরে উঠিয়া প্যারাসুট খুলিয়া লোকে নীচে নামিয়া আসিতে পারে। অনেকে এইভাবে প্যারাসুট ব্যবহার করিতে শিখিতেছে দেখিলাম।

মস্কোতে আর একটি প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। এখানে তাহার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। ইহাকে ষ্টাখানোভাইটদিগের উদ্যান সম্মিলন বলা যাইতে পারে। ষ্টাখানভ রুশিয়ার একজন সাধারণ কর্ম্মী। ইনি প্রথম সাধারণ মজুর হইয়াও কি প্রকারে প্রোডাক্‌সন বাড়ানো যায় সেই দিকে দৃষ্টি দেন এবং কিছুদিন পরে উপায় উদ্ভাবন করিয়া অল্প সময়ে বেশী জিনিষ উৎপন্ন করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য কর্ম্মীরাও ম্যানেজারদিগের মুখাপেক্ষী না হইয়াও ইচ্ছামত এইরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অনেকে এবিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মীরা এইভাবে কোন না কোন প্রকারে কারখানা বা খনির উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে তাহাদিগকে ষ্টাখানভের নাম অনুসারে ষ্টাখানোভাইট বলা হইয়া থাকে। এই ষ্টাখানোভাইটদিগের সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্রামের জন্য এক উদ্যান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। উদ্যানটিতে বিশ্রাম করিবার, নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক করিবার, বক্তৃতাদি শুনিবার এবং খাইবার ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকালে উঠিয়াই এই শ্রমিকগণ পার্কটিতে চলিয়া আসে। কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি এবং আমোদ আহ্লাদ করিবার পর তাহারা সকালের ভোজন সারিয়া লয়। তাহার পর মস্কো নদীতে নৌবিহারে বাহির হইবার বন্দোবস্ত আছে। অনেকে এই সুযোগে নৌকায় বেড়াইয়া আসে। তাহার পর মধ্যাহ্নভোজন আরম্ভ হয়। ভোজনান্তে কেহ কেহ আরামকেদারায় শুইয়া নিদ্রা যায়, আবার অনেকে এই সময় বক্তৃতাদি শুনিয়া থাকে। আমি যে সময় এই উদ্যানে প্রবেশ করিলাম তখন অনেকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিদ্রা যাইতেছিল। আবার দুইটি জায়গায় বক্তৃতাও হইতেছিল। একটি স্থানে বক্তা সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ৫০।৬০ টি হইবে। সকলেই মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল বলিয়া মনে হইল। অপর স্থানে একজন সৈনিক পুরুষ (army man) একটি ম্যাপের সাহায্যে ড্যানজিগ্‌ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে শ্রোতৃবৃন্দের কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশ্নও করিতেছিল। গাইড আমাকে বলিলেন যে একজন শ্রোতা বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ডানজিগ্‌ লইয়া জার্ম্মানী যখন এতটা ঔদ্ধত্য দেখাইতেছে তখন

পোলিশ গভর্ণমেণ্ট এত চুপচাপ রহিয়াছে কেন? পোলিশরা ইহা লইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দেয় না কেন? সমস্ত দিন পার্কে কাটাইয়া এই শ্রমিকগণ সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিয়া যায়।

এইখানে দুইটি কথা আর একটু পরিষ্কার করিয়া করিয়া বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিশ্রামের জন্য যে ধরণের পার্কের কথা বলিলাম এইরূপ পার্ক রুশিয়াতে নানাস্থানে ছোট বড় সব রকম আকারের স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিবার পর কিছুদিনের জন্য শ্রমিকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যকরস্থানে যাইয়া বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারে নানাস্থানে বহু স্যানিটোরিয়াম এবং রেষ্ট হোম নির্ম্মাণ করাইয়া সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিনে দিনে স্বাস্থ্যান্বেষীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭।২৮ খৃষ্টাব্দে স্যানিটোরিয়ামে চুয়াত্তর হাজার এবং রেষ্ট হোমে সাড়ে চার লক্ষ লোক বিশ্রামের জন্য আসিয়াছিল। দশ বৎসর পরে ১৯৩৮ সনে স্যানিটোরিয়ামে সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপর এবং রেষ্ট হোমে উনিশ লক্ষ লোক বিশ্রাম করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছিল। ইহাদের অনেকে মিল, ফ্যাক্টরী এবং অন্যান্য কর্ম্ম-স্থান হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া এইরূপ বিশ্রামের সুযোগ পাইয়া থাকে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাহাদের এই খরচ বহন করে। ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা হইতেও অনেকে বিশ্রামাগারে যাইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

রুশিয়াতে লোকশিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ার চিঠিতে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন; এখানে ঐরূপ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব হইবে। তবে এই মাত্র উদ্যান সম্মিলনে ষ্টাখানোভাইট শ্রমিকদিগের জন্য যে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। এই সূত্রে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও সামান্য কিছু বলা যাইতে পারে। একদিন ইনট্যুরিষ্টের গাড়ীতে করিয়া এক প্রতিষ্ঠান দেখিতে যাইবার সময় গাইড (ইনি স্থানীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট) বলিলেন যে রুশিয়াতে শিক্ষার উৎসাহ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে; পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রমিকদের অবসর এখন বেশী হইয়াছে। এই অবসর সময়ে অন্তত এক তৃতীয়াংশ লোক কোন না কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকে—কেহ সাহিত্যে, কেহ ললিতকলায়, কেহ সঙ্গীতবিজ্ঞানে,

কেহ বা অন্য বিষয়ে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে কেবল যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষাই রুশিয়ায় অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক তাহা নহে। কি স্কুলে, কি য়ুনিভার্সিটিতে, পড়িতে গেলে ছাত্রদিগকে বেতন ত দিতেই হয় না, উপরন্তু থাকিবার খাইবার ব্যবস্থার জন্য অনেকেই গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। ১৯৩৮ সনে ইউনিভার্সিটি ও কলেজগুলিতে যে সকল ছাত্র পড়াশুনা করিত তাহাদের শতকরা একানব্বই জন গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী ছিল। নানা-প্রকার স্কুল কলেজের সংখ্যা যে রুশিয়াতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে সে সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরী সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯১৪ সনে রুশিয়াতে সাড়ে বার হাজার লাইব্রেরী ছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সত্তর হাজার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের সংখ্যা নব্বই লক্ষ হইতে প্রায় তের কোটি হইয়াছে। এই লাইব্রেরিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে দি অল-ইউনিয়ন লেনিন লাইব্রেরি ইন মস্কো। (The All-union Lenin Library in Moscow)। এখানকার পুস্তকের সংখ্যা বিরানব্বই লক্ষ।

সকলেই জানেন যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের ধনসম্পত্তি বাড়ীঘর বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীঘর কাড়িয়া লইলে তাহার এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের মনে স্বভাবতঃই একই সঙ্গে কষ্ট এবং ক্রোধ জন্মিতে পারে। এইরূপ বাজেয়াপ্ত করা যে অন্য দিক দিয়াও সমীচিন তাহাও নহে। তবে রুশিয়াতে বাজেয়াপ্ত বাড়ীঘরগুলি যে সৎকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পূর্ব্বেকার মালিকেরা জানিলে তাহাদের মনে কতকটা সান্ত্বনা আসিতে পারে এবং তাহারা বিগত হইয়া থাকিলে তাহাদের আত্মাও কিছু পরিমাণে শান্তি পাইতে পারে। লেনিনগ্রাড হইতে পিটারের 'সামার প্যালেস' দেখিতে যাইবার পথে একটি গৃহ দেখিবার জন্য আমরা বাস হইতে নামিয়াছিলাম। এই সুবৃহৎ গৃহখানি পূর্ব্বে রুশিয়ার একজন ধনাঢ্য বণিকের ছিল। বৎসরে পনর কুড়ি দিনের জন্য একবার হয়ত তিনি ওই বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন। বাকী সমস্ত বৎসর দুই চারিজন পরিচারক মাত্র এই বাড়ী আগলাইয়া থাকিত। এখন এই গৃহে অতি বৃদ্ধা

৪০।৪৫ জন মহিলাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে সরকারী খরচে এই অসহায় এবং অনন্যোপায় বৃদ্ধারা এখানে শান্তিতে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইতেছে। লেনিনগ্রাড সহরে আর একটি বৃহদায়তন বাড়ী দেখিয়াছিলাম। এটি পূর্ব্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ (Stock exchange) ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ক্লাব হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। মস্কো সহরেও একটি গৃহ এখন স্প্যানিশ রেভোলিউসনের মিউজিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই মিউজিয়মে ঢুকিয়া স্পেন দেশে কি ভাবে রেভোলিউসন কিছুদিনের জন্য কৃতকার্য্য হইয়াছিল এবং পরে কি ভাবে বিদেশী রাজ্যগুলির সাহায্যে ফ্র্যাঙ্কোর দল ইহার গলা টিপিয়া মারিয়াছিল সে সম্বন্ধে যে কোনও দর্শক পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে। এই গৃহখানি পূর্ব্বে একজন ধনী জমিদারের ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

মস্কোতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেণ ধরিয়া পোল্যাণ্ডের পথে রওয়ানা হইলাম। পরের দিন সীমানায় আসিয়া পৌঁছাইলে পুনরায় রুশ কাষ্টমসে যাইতে হইল। অনেক্ষণ ধরিয়া আবার সকল জিনিষ পরীক্ষা হইলে রেহাই পাইলাম।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

পাঠ প্রচয়—প্রথম ভাগ।

সহজ পাঠ—তৃতীয় ভাগ। বিশ্বভারতী পাঠ ভবন, শান্তিনিকেতন।

একবার এক প্রবাসী আত্মীয়ের বাড়ী সুদীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে এসেছিলাম। আতিথেয়তার প্রতিদানে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গল্প বলতে বসতাম। এক পাল ছোট বড় ছেলে মেয়ের পুরোভাগে বসতেন আমার এক কাকিমা। তিনি ছিলেন যেমন বিপুলাকায় তেমনি রাশভারী। তাঁর ভয়ে সে সভায় এমন কোন ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না যে ঘণ্টা দুয়েকের মত স্থির হয়ে না বসতে পারে। সেইজন্যে নির্ব্বিরোধ ভাল-মানুষ কাকা আমার গল্প শুনতেন পাশের ঘরে অলক্ষ্যে বসে সকলের অজ্ঞাতে। একমাস ক্রমান্বয় গল্প চললো আফ্রিকা ও উড়িষ্যার বন্য জানোয়ার আর ভূত প্রেতের। তারপর অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনী যখন নিঃশেষ হয়ে এল তখন গল্পের মাল মসলা সংগ্রহ সুরু হলো উর্ব্বর কল্পনার ক্ষেত্র হতে। একদিন কাহিনী উদ্ভট হতে উদ্ভটতর হয়ে চলেছে, ব্যাপার রোমহর্ষ হ'য়ে ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় আড়াল হতে কাকার কণ্ঠে প্রশ্ন উঠলো—

'গল্পটা কি সত্যি ?'

পাছে স্বীকার ক'রে বসি যে নিছক কল্পনা-প্রসূত সেই ভয়ে পূর্ব্বোক্ত কাকিমা বাঘিনীর মত হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'সত্যি নয় ত' কি, ওকি কখনও আমার সামনে মিথ্যা বলে। বিশ্বাস না হয় কে মাথার দিব্যি'—ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয় কাকিমার প্রশস্ত অভয় সত্ত্বেও গল্প আর জমলো না। পরবর্ত্তী কাহিনীগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে প্রকাশ করতে গিয়ে আড়ষ্ট ক'রে ফেললাম আর শ্রোতাদের একাগ্রতা গেল ভেঙে।

আলোচ্য স্কুল-পাঠ্য পুস্তক দুখানির পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পটির অবতারণা করলাম এই কথা ব্যক্ত করবার জন্যে যে মাথার ওপর কাকিমার মত রসজ্ঞ গুরুদেব না থাকলে ক্ষিতীশবাবু ও তাঁর সহযোগীরা এত সহজে প্রথাগত

নিয়ম—নীতিমূলক ও তথ্য-সর্ব্বস্ব বিষয়বস্তু পরিহার ক'রে এমন সম্মিত ও মনোরঞ্জক গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন না।

বিশ্বভারতীর আওতায় অনেক চিরাচরিত বদ-অভ্যাস ও ঝুঁ-সংস্কার পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু সুকুমার বালক বালিকার কোমল চিত্ত নিয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব গুরুতর এবং সেইজন্য যখন ক্ষিতীশবাবুর মত অনভিজ্ঞ (আপেক্ষিক অর্থে) ও নবীন অধ্যাপক পুস্তক দুটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন তখন অন্তরালে দেখেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভয় বাণী।

বলা বাহুল্য উৎসাহী সম্পাদক মহাশয় তাঁর দায়িত্বকে নিজের মনোমত ভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে অনুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নি এবং ফলে যা দাঁড়িয়েছে তাতে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে আনন্দের সংক্রমণ যে শিক্ষার্থীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়েছে—'গীতবিতান থেকে যে গানগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি পাঠ্য কবিতা হিসাবেই যে শুধু পড়তে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। শব্দে যদি সুর সংযোগ সহজেই এসে পড়ে তা হোলে সে ব্যাপারটাকে যেন কোনো অধ্যাপক বে-আইনী ঘোষণা না করেন—এই অনুরোধ।'

এই উক্তি থেকে বোঝা যাবে যে সম্পাদক মহাশয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাম্ভীর্য্যের ব্যবধান ভেঙে দিতে চান আর তাঁর দুঃসাহসের অন্ত নেই। তিনি শিশু-বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের তৈরি লাইনো-কাটের প্রতিলিপিগুলিকে নন্দলালবাবু ও কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীদের আঁকা ছবির সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দিয়ে ছেপেছেন। কাঁচা হাতের অপটুত্ব স্পষ্ট হলেও প্রতিলিপিগুলি অদ্ভুত ভাবে প্রাণবন্ত হয়েছে।

মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে ছেলেরা আটপহুরে চলতি ভাষার সাহায্যে নানা বিষয় পড়ুক শিখুক জানুক এই চাই। উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য মুখস্থ করা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে নানাদিক দিয়ে কী ভাবে ছোটদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তারই একটু ইঙ্গিত দেওয়া যথা-সম্ভব সরল ভাষায়।

ভাষা শুধু সরল হয় নি, সজীব হয়েছে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনও হয়েছে

অনবদ্য। তবে গ্রন্থ দুটির মধ্যে তারতম্য উপলক্ষ করে একটি অপ্রিয় কথা বলবার আছে।

'পাঠ প্রচয়' প্রকাশিত হয়েছিল গত পৌষ মাসে এবং 'সহজ পাঠ' মুদ্রিত হয় আরও চার মাস পরে। দ্বিতীয়টি হয়েছে বিচিত্রতর ছবির উৎকর্ষে ও রচনার বহুবিধত্বে তথাপি প্রথমটির তুলনায় নিকৃষ্টতর প্রতীয়মান হয় কেন?

আমি যেমন কাকার বেরসিক প্রশ্নে সচেতন হয়ে গল্পের আবহ নষ্ট করে ফেলি তেমনি 'সহজ পাঠে'র প্রবন্ধ লেখক ও সম্পাদক কি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী পরিহার করেছেন? ভাষা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই অথচ প্রথম পুস্তকে প্রবন্ধ রচয়িতাদের আন্তরিক আবেগ ও ব্যক্তিগত প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট দ্বিতীয়টিতে তেমনি অস্পষ্ট। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান এ আলোচনায় ধর্ত্তব্য নয়।

'পাঠ প্রচয়' আমি প্রথমে পড়ি এবং বিশেষ করে ক্ষিতীশবাবুর রচনাগুলি আমাকে এমন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে যে 'সহজ পাঠ'টি বোধ করি অতিরিক্ত আগ্রহান্বিত হয়ে খুলেছিলাম এবং সেইজন্য হয় ত' মানসিক প্রতিক্রিয়া সুস্থ ভাবে অনুভূত হয়নি। তথাপি পুস্তক দুইটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রণিধান-যোগ্য।

যাই হোক, বিশ্বভারতীর উভয় চেষ্টাই মূল্যবান এবং সম্পাদক ছবি নির্ব্বাচনে ছেলে মেয়েদের সাহায্য গ্রহণ করে এমন একটি অনিয়মের প্রবর্ত্তন করেছেন যার অস্তিমে আছে অশেষ কল্যাণ।

গান ও কবিতার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সম্পাদকের নিবেদনে একটি সুন্দর কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'কেবল গুরুদেবের কবিতাই দেওয়া হলো; অপেক্ষাকৃত ভালোর চাইতে সব চেয়ে ভালোর মূল্য বেশি—এই ভেবে।'

'গণ্ডার শিকার' প্রবন্ধের রচয়িতা তেজেশবাবু আফ্রিকায় গণ্ডারের চামড়ার একটি অতি প্রচলিত ব্যবহারের বিবরণ না দিয়ে ভালই করেছেন। সেটা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ কুলি-চালকদের নিত্য ব্যবহার্য্য এক প্রকার মারাত্মক চাবুক —'কিবোকো' নামে পরিচিত।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Propaganda—By E. H. Carr (No. 16); The Fourteen Points and the Treaty of Versailles—By G. M. Gathorne-Hardy (No. 6); The British Empire—By H. V. Hodson (No. 2); Economic Self-Sufficiency—By A. G. B. Fisher (No. 4); Can Germany Stand the Strain ?—By L. P. Thompson (No. 19); Russian Foreign Policy—By Barbara Ward (No. 34)—Oxford Pamphlets.

আধুনিক যুদ্ধের পটভূমি বা জগতের অশান্তির কারণ জানতে বা বুঝতে হলে স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতিসমূহের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসে দেখা যায় যে যাঁরা স্বাধীন ও ধনশালী, জগতের অমঙ্গলের অগ্রদূত তাঁরাই। কিন্তু যাঁরা পরাধীন ও দুর্ব্বল—তাঁদের নিঃশেষে আত্মদান আছে, কিন্তু ব্যগ্র বা উগ্রভাবে গ্রহণ নেই, তাই তাঁরা বিভীষিকা সৃষ্টি করেন না। অক্সফোর্ড প্রেসের পুস্তিকাগুলির মূল্য হল যে, সেখানে অশান্তির হেতু আখ্যাত হয়েছে—এবং তার জন্য কোন জাতির কতখানি দায়িত্ব, তা বন্টিত হয়েছে। ভারতবাসী দুর্বল—জগতে অশান্তি সৃষ্টি করবার মত শক্তি তার নেই; আমরা পরাধীন, তাই কোন অমঙ্গলের দায়িত্ব আমাদের নেই। আমাদের বর্ত্তমান নেই—ভবিষ্যতের আশায় দিন কাটাই। এই কুহকে যাঁরা বিশ্বাস করেন অর্থাৎ আমরা, তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করতে পারেন কিন্তু অপরের ক্ষতি করেন না। এই পুস্তিকাসমূহ পড়ে আমাদের এই সান্ত্বনা যে, জগতের এই বিবিধ অন্যায়ের বিভিন্ন অঙ্কের ভিতর আমাদের বলবার বা প্রবেশ করবার সুযোগ নেই। এই সান্ত্বনায় যাঁরা সান্ত্বনা পান, তাঁরা যে কী ভয়ঙ্কর দুর্বল, সে-সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক জগতের বিধি ব্যবস্থার ভিতর স্বাদেশীকতার প্রথম নিদর্শন হল প্রোপাগাণ্ডা। যাঁরা প্রচারের কৌশল জানেন না—তাঁরা নিজেদের বা নিজের দেশের সেবা করতে অনুপযুক্ত—এবংবিধ চিন্তন স্বাধীন জাতির মগজে রি রি করছে। প্রোপাগাণ্ডা বা মতবাদ প্রচারণকে কার্য্যকরী করতে হলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিধিকে সংকীর্ণ করা প্রয়োজন এবং প্রচারের কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ নেই, ডেমোক্রেসি সম্বন্ধে তাঁদের মোহ বেশিদিন থাকতে পারে না। ডেমোক্রেসির ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যবসাক্ষেত্রে নির্বিরোধ বাণিজ্য

থাকবে না, সমাজ সেবায় স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—দেশ সেবায় ব্যক্তির মত মূলহীন হবে—কিন্তু শাসনবিধিতে ডেমোক্রেসির রূপ ও গুণ থাকবে, তা' সম্ভব হয় না। মানুষ গড়ে উঠবে নিজের মর্জিতে—প্রচার করবে নিজের রুচি—দেশে গৃহীত হবে শ্রেষ্ঠ মতবাদ—এসব হল উনিশ শতকের "লিবারেলিজম"-এর কথা। আজ যাঁদের হাতে শাসনভার—তাঁদের নিজস্ব পথ ও পাথেয় আছে। তাঁরা সেই পথে নিজেরা চলেন, পরকে চালান এবং দেশকে চলতে অনুপ্রাণিত করেন। যাঁরা জবরদস্তি করেন, তাঁদেরকে আমরা নিন্দে করি এবং যাঁরা জবরদস্তি করেন না—তাঁরা প্রশংসা পান। মোটকথা, আধুনিক জগতে বা রাষ্ট্রীয় শাসনবিধিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ডেমোক্রেসির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। প্রোপাগাণ্ডা যখন শিক্ষার স্থান অধিকার করেছে—অর্থাৎ শিক্ষার মন্দিরে যখন প্রোপাগাণ্ডার ঘণ্টা সগৌরবে বেজে উঠেছে তখন স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ হয়েছে প্রধান। এবং বিভিন্ন জাতির ভিতর বিরুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ যখন প্রকট হয়ে উঠে, তখন সেই বিরুদ্ধতা সংঘাতে পরিণত হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অর্থাৎ সর্বদেশের নিয়ন্ত্রণবিধি যখন একই সূত্রে গ্রথিত হবে, সংঘাতের অবসান শুধু তখনই সম্ভব। ১৬নং পুস্তিকায় মিঃ ই, এইচ, কার বলতে বাধ্য হয়েছেন—"In democratic countries, conditions vary, but are everywhere tending towards more and more centralised control. War has inevitably led to the elaboration of far-reaching schemes for the controlling and moulding of opinion by the state, and thereby stimulated the nationalisation of thought, as well as of other aspects of national life." যদি তাই হয়, তাহলে একই মহাসাগরে মিলিত হবার জন্য নির্ঝরগুলির স্বপ্নভঙ্গ হল ?

বিরুদ্ধ স্বার্থের আঘাতে যে-সংঘাত সৃষ্টি হবে, তাকে দমন করবার জন্য ভার্সাই-সন্ধিপত্রে চৌদ্দ নম্বর দফায় কল্পিত হয়েছিল যে তাঁরা সবাই মিলে সবার স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হবেন। অর্থাৎ যে ব্যবস্থা সংস্থাপিত হল, তা' যাতে সংরক্ষিত হয়, সে চেষ্টা বিভিন্ন স্বাধীন "ষ্টেট"-সমূহ সম্মিলিত ভাবে করবেন। স্বার্থের এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে, যাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে সর্বদা আকুল, তাঁরা পরের সম্বন্ধে ব্যাকুল হলেও অকূলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে

সম্মত নন। এই অসম্মতি সংঘাতের ধিকি ধিকি বহ্নিকে থাণ্ডব দাহনে পরিণত করেছে—একে অস্বীকার করা চলে না। ৬নং পুস্তিকায় ভার্সাই সন্ধির বিশ্লেষণ আছে কিন্তু সেই সন্ধি সংরক্ষণে স্বাক্ষরকারীগণ কতটা অবহেলা প্রদর্শন করেছেন তার কোন ইঙ্গিত নেই।

মিঃ এইচ্, ভি, হডসন "দি ব্রিটিশ এম্পায়ার" পুস্তিকায় অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু উক্ত সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, তা' তিনি দেখান নি। "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" না-কি আমাদের দেওয়া হবে, যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ঐক্যের তানে ধ্বনিত করতে পারি। মিঃ হডসন এমন কথাও বলেছেন যে, ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারানুযায়ী যদি আমাদের ফেডারেশন স্থাপিত হত, তাহলে আমরা প্রায় ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারতাম এবং তারপর একটু নাড়া পড়লেই ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের ক্রোড়ে নিপতিত হতাম। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হয়নি—তখন আর আমাদের মাথাব্যথার কারণ নেই—বিশেষতঃ যখন মিঃ হডসন ব্রিটিশ এম্পায়ার সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন—"Through all its affairs blows the keen and cleansing wind of democracy, based on freedom of speech, of the press, of faith, and of association." একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারলে খুসী হতুম, এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশের নীতির কোন অসঙ্গতিই দেখেন না।

৪নং পুস্তিকায় মিঃ ফিশার "Economic Self-Sufficiecny" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা' প্রশংসা দাবী করে। দেশের প্রয়োজনীয় মাল নিজের দেশে উৎপন্ন ক'রে পরনির্ভরশীলতা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী অনুভব করা যায় এবং যাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চান, তাঁদের পক্ষে অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাহিরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জ্জন ক'রে নিজের দেশের উৎপন্ন ও তৈয়ারী করা মালের ভিতর প্রয়োজনীয়তাকে আবদ্ধ রেখে অর্থ অর্জ্জন করার চেষ্টার ভিতর জাতিকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তার "standard of living" অনেক নিম্নস্তরে আটক থাকবে। প্রত্যেক দেশ নিজেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সংঘাতের হেতু যে নিঃশেষিত হবে, তা

ভাববার কারণ নেই। যেহেতু, নিজেকে জোর ক'রে সীমাবদ্ধ রাখা কোন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এবং পৃথিবীর সব দেশ একই আদর্শে গঠিত না হলে "autarchy" সম্পূর্ণভাবে স্থাপন করা সম্ভব নয় এবং যুক্তিপূর্ণও নয়। জার্ম্মানী নিজেকে সেইভাবে গড়ছিল জাতীয় সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কিন্তু তা-ই যদি চিরকালের বন্দোবস্ত হয়, তাহলে জার্মানীর ক্ষতির অংশ বেড়েই যাবে। যাঁরা বাইরে থেকে মাল কিনবেন না, তাঁদের মাল বাইরে কেনা হবে একথা আশা করা যায় না এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই আদান প্রদান না থাকলে বাণিজ্যের লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর রূপ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। তদুপরি সবদেশে "autarchy" স্থাপন সম্ভব নয়—অর্থাৎ সর্ববিধ মাল দেশের সর্বলোকের চাহিদা মেটাতে পারে না। এই 'autarchical" দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক অর্থনৈতিক জগতে অচল—অথচ যুদ্ধের সময় এই দর্শনই জাতিকে সচল রাখে। মিঃ ফিশার সহজ ও সরল ভাষায় এই "autarchy"র নীতিকথা আলোচনা করেছেন, যা পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করবে। এই কথাটি ভুললে চলবে না যে, "Unless we are to take seriously the possibility of a return to the miserable existence of the isolated individual, or the isolated family group, an existence which at the best must always be highly precarious and insecure, we must face the fact that interdependence is an essential element in all human life." এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা মানবজাতির শান্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃত হচ্ছে এই আধুনিক যুদ্ধে।

কিন্তু জার্মানীর অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী সমরের পক্ষে অনুকূল কিনা, তা' ১৯নং পুস্তিকায় থম্পসন আলোচনা করেছেন। অবশ্য এই আলোচনায় প্রচারিত হয়েছে যে, জার্মানী দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয় এবং সেই প্রস্তুতির অভাবে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারের সমস্ত আলোচনা এই বিশ্বাস-প্রসূত। জার্মানীর পরাজয় আমরা কামনা করি বলেই এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু আজ জার্মানীর অধিকার ও প্রভাব বহুদেশে প্রসারিত ও বিস্তৃত—তাই জার্মানীর অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সুস্পষ্ট হতে হয়ত আরও সময় লাগবে। এই সমস্যাই আজ যুদ্ধের বড় সমস্যা।

অনেকে বলেন যে, বাহিরের রাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার রাজনীতিতে রাজনীতি নেই—সে চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এই 'সিকিউরিটি' পাবার জন্য রাশিয়ার কি করতে হবে তা' বোধ হয় রাশিয়া জানে না। কিন্তু যা করবার প্রয়োজন হবে, তা' করতে রাশিয়া সংকোচ বোধ করবে না। য়ুরোপের রাজনীতির খেলায় নিজের চিন্তাটাই বড় এবং নিজের সুবিধার জন্য নিজের ঘোষণা বা চুক্তিকে অবহেলা করা য়ুরোপে নতুন জিনিষ নয়। তাই রাশিয়া বাহিরের রাষ্ট্রের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করবে, তা তার নিজের দেশের শাসন-নীতি বা দর্শন নিয়ন্ত্রণ করবে না। বাহিরের সঙ্গে যোগসূত্রের নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় নিজের সুযোগ ও সুবিধার জন্য—তাই সে আজ জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ এবং প্রয়োজন হলে সেই চুক্তিপত্র ভেসে যাবে। এই নীতিহীন নীতি আমাদের পরাধীন জাতিকে বিস্মিত করে—চমৎকৃত করে দেয়, কিন্তু রাজনীতি খেলায় আত্মনীতিই যে বিশ্বনীতির স্থান অধিকার করেছে—এই কথাটা জানা না থাকলে য়ুরোপের অনেক কথাই মানা যাবে না। মিস্ বারবারা ওয়ার্ড ৩৪নং পুস্তিকায় রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—রাশিয়ার প্রতি প্রীতি নেই বলে বিচারও প্রীতিহীন হয়েছে—কিন্তু এই কথাটি বোধ হয় ঠিক—'Only one thing is certain in Russia's future policy : its underying principle, security. But what annexations, what alliances, what compromises, defeats or triumphs the pursuit of security will bring, not even Russia knows.' রাজনীতি আঁকা পথে চলে না—বাঁকা পথে চলে—তাই ভবিষ্যতে কোন পথ গৃহীত হবে, বর্তমানে তা' নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এতে অপবাদ নেই, বিস্ময় নেই—কারণ এ-ই হল রাজনীতি। পরাধীন দেশের রাজনীতির সঙ্গে এই বিভেদ ও বিভাগ জেনে রাখা প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় রাশিয়ার রাজনীতিতে বিচলিত হই। আমরা আদর্শে বিশ্বাসী—তাই আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে এত সঙ্কুচিত। আধুনিক রাজনীতিতে নীতি বড় জিনিস নয়—দেশের স্বার্থ ই হল বড় কথা।

শচীন সেন

নির্জ্জন গৃহকোণে—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সি।
পৃথিবীর বড় মানুষ—শ্রীগোপাল ভৌমিক। ,,
ছুটির চিঠি— ত্রিভঙ্গ রায়। ,,
গ্রামে ও পথে— শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। ,,

প্রথম বই-এর লেখক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়-এর নাম সাহিত্যানুরাগী বাঙালি পাঠকের পরিচিত। ইতঃপূর্বে মৌলিক রচনায় এবং অনুবাদে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমান বইখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি চমকপ্রদ না হ'লেও মোটের উপর সুলিখিত। প্রথম গল্পের নামানুসারেই বই-এর নামকরণ হ'য়েছে এবং সেটি পড়ে সহজেই রবীন্দ্রনাথের "মালঞ্চের" আখ্যানটি মনে পড়ে,—অর্থাৎ সেই রুগ্না স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান স্বামী এবং অত্যাবশ্যক তৃতীয়ার কাহিনী। তবে সাদৃশ্য মাত্র এইটুকুই। "খাঁচার পাখী", "আবার আগামী কাল" এবং "ভাইবোন" লেখকের শক্তির পরিচয় দেয়। আমার মনে হয় "রজনীগন্ধা" গল্পটি অতিবর্ণনের দোষে নষ্ট হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ মূল এবং মুখ্য বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথোচিত মনোনিবেশ করেন নি—তা না হ'লে গল্পের শেষ পাতার বিষয়টি আরো ভালো ক'রে উপভোগ করা যেতো এবং লীলার মৃত্যুতে আমরা আরো বেশী অভিভূত হ'তাম। কিন্তু "জয় পরাজয়"-এর মতো অসার্থক গল্পটি প্রকাশ না করাই সঙ্গত ছিলো, একথা জোর ক'রে বলা চলে। আর একটি কথার উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি,—পুরাণোল্লেখ সাহিত্যের চমৎকার উপকরণ হ'তে পারে তখনই যখন মূল বর্ণনীয়ের সঙ্গে তার সহজ এবং শোভন সঙ্গতি থাকে, অন্যত্র পুরাণোল্লেখ বিসদৃশ ; এর দৃষ্টান্ত বর্তমান বই-এর "উজ্জীবন" নামক গল্পে 'প্যান'-এর উল্লেখ (পৃঃ ১০০)। ভবানীবাবুর এই বইখানির উপর এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপের কারণ অবশ্য এই যে, আমি তাঁর অনুরাগী পাঠক এবং গল্প লেখার হাত তাঁর সত্যিই আছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়—দু'খানি বই-ই কিশোরদের উপযোগী এবং সানন্দে বলা যায়, দু'খানিই ভালো বই। অবশ্য দুই লেখকই ভাষা সম্বন্ধে যথোচিত সজাগ নন। গোপাল বাবুর রচনায় চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাধু

ভাষার সর্বনামের প্রয়োগ একাধিক বাধার সৃষ্টি করেছে, তা'ছাড়া ইংরেজী নামের উচ্চারণ সম্বন্ধেও এক জায়গায় তাঁর অনুচিত অনভিজ্ঞতা দেখা গেলো (পৃঃ ৩৫)। পৃথিবীর বড় মানুষ নির্বাচনের আদর্শটিও শিথিল ব'লতে হয়, কারণ, এই ভারতবর্ষের-ই জীবিত মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচিত হ'লেও মহাত্মাজীর সম্বন্ধে লেখক নীরব। তবু গোপালবাবু-কে তাঁর কিশোর পাঠক-পাঠিকা ধন্যবাদ জানাবেন কারণ যে ক'টি বড় মানুষের কথা তিনি লিখেছেন, সে ক'টির পরিচয় পেয়ে তাঁরা খুসী হবেন। ত্রিভঙ্গ রায়ের 'ছুটির চিঠি' ভাষার শৈথিল্য সত্ত্বেও উপাদেয়। চিঠির মাধ্যমে তিনি হিমালয়ের অঞ্চলবিশেষ পর্য্যটনের কাহিনী লিখেছেন। বইখানি আমার ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয় ছেলেমেয়েদের কৌতূহল উদ্রেক করতে এমন একখানি বই বেশ সাহায্য করবে।

চতুর্থ বই "গ্রামে ও পথে" কংগ্রেস-সেবীর ভ্রমণ-কাহিনী। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ঘুরে ঘুরে ঘুরে লেখক জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় পেয়েছেন, এ বই-এ তাই লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। এই ধরণের বই-এ সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু থাকে না, বর্তমান গ্রন্থেও নেই। তবে কংগ্রেসের কিছু কিছু কার্যকলাপ, চরকার উপকারিতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রভৃতি প্রসঙ্গকে সাহিত্যিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা এ বই-এ দেখা গেলো।

হরপ্রসাদ মিত্র

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো। মূল্য—দুই টাকা।

এই বইখানি সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এর দাম। যুদ্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ নাই এই রকম লোক কম, কিন্তু তার চাইতেও কম দু' টাকা খরচ ক'রে এই বই পড়ার মতন লোক। এতে আক্ষেপের প্রধান কারণ এই যে বইটি সত্যি

সুলিখিত। লেখক যুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প'ড়ে সংবাদপত্র পাঠকদের বহু বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ হবে। তা ছাড়া হবে যুদ্ধের ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। এই রকম সরস বাংলায় এই সকল অনভ্যস্ত বিষয়ে লেখা সহজ নয়। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতী লেখক সন্দেহ নাই।

সমরেন্দ্রনাথ সিংহ

মধুসূদন গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। রাজ সংস্করণ—১৫৲। সাধারণ সংস্করণ—১০৲।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সমগ্র মধুসূদন গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৲), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (৷৶০), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৲), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৷০), মেঘনাদবধ কাব্য (২৸০), বিবিধ (৷০)। ছাপা ও বাঁধাই সাহিত্য পরিষদের যোগ্য হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় এ-গুলির বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।